বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পর্ব : অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় অধ্যাপক

ও

বাংলা বিভাগের অধ্যক্ষ

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়

পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় সংস্করণ

মডার্ণ বুক এজেন্সী প্রাইভেট লিমিটেড

১০, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট,

কলিকাতা-৭০০০৭৩

BÁNGLĀ SĀHITYER ITIVṚTTA

(History of Bengali Literature)

Vol. III

Part II

by

Prof. Asit Kumar Bandyopadhyay
Head of the Department of Bengali
Calcutta University

বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত

তৃতীয় খণ্ড

দ্বিতীয় পর্ব

সূচীপত্র

লেখকের নিবেদন

(পুনর্বিন্যস্ত দ্বিতীয় সংস্করণ)

'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব (অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) প্রকাশ প্রসঙ্গে দু-একটি কথা নিবেদন করিবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি। ১৯৬৬ সালে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ড (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ) প্রকাশিত হইয়াছিল। দ্বিতীয় পরিমার্জিত সংস্করণ প্রকাশ করিতে গিয়া মনে হইল, এই বিশাল-কলেবর গ্রন্থ দুই পর্বে পৃথগ্‌ভাবে প্রকাশিত হইলে পাঠক-পাঠিকার পক্ষে সুবিধা হইবে। তাই শুধু সপ্তদশ শতাব্দীকে অবলম্বন করিয়া এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্ব প্রকাশিত হইয়াছে। এবার অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে অবলম্বন করিয়া তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব প্রকাশিত হইল। প্রসঙ্গক্রমে বক্তব্য এই যে, এই পর্বটিকেও আমূল সংশোধন করা হইয়াছে, প্রয়োজন স্থলে কিছু কিছু নূতন তথ্যও যুক্ত হইয়াছে। চতুর্থ খণ্ডে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কবিগান প্রভৃতি নাগরিক লৌকিক গানের বিষয় আলোচিত হইয়াছে। সে খণ্ডটি নিঃশেষও হইয়া গিয়াছে। তাহার নূতন সংস্করণ দ্রুত প্রকাশের চেষ্টা চলিতেছে।

ডঃ শ্রীমান ব্রতীশচন্দ্র ঘোষ এবারেও অত্যন্ত ব্যস্ততার মধ্যে এই গ্রন্থের নির্ঘণ্ট প্রস্তুত করিয়াছেন। তাঁহাকে স্নেহাশীর্বাদ জানাইতেছি।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
বাংলা বিভাগ

অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রমোহন ভট্টাচার্য

শ্রদ্ধাস্পদেষু

পটভূমিকা

সূচনা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ দিয়া তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব আরম্ভ করা গেল। বাংলা সাহিত্যের ভরা গাঙে কোটালের বান তখন সরিয়া যাইতে শুরু করিয়াছে। কিন্তু পলিমাটির নূতন ফসল আর ফলিল না, শুষ্ক খাতে বারিহীন শূন্যতা মৃত্যুর পরোয়ানা বহিয়া আনিল। তবু এখানে-সেখানে দুটি-একটি বনফুল ফুটিতে লাগিল, ধনীর প্রাসাদে অভিশাপ লাগিলেও চারিদিক তখনো একেবারে শূন্য হইয়া যায় নাই। এই পর্বে সেই কথাটা একটু যাচাই করিয়া লওয়া যাক।

ইতিপূর্বে তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বের অন্তর্ভুক্ত সপ্তদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা উক্ত শতাব্দীর সাহিত্য-সংস্কৃতি-ইতিহাসের বিবর্তন লক্ষ্য করিয়াছি। সেই বিবর্তনে একটা কথা বেশ পরিষ্কার হইয়া উঠিয়াছে যে, সপ্তদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের শাখাপ্রশাখা বৃদ্ধি পাইয়াছে, প্রচুর পুঁথিপত্র রচিত হইয়াছে, পুরাতন কাব্যের অসংখ্য নকল হইয়াছে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষ ক্রমেই ম্লান হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সত্য কথা বলিতে কি, মহাপ্রভু চৈতন্যদেবের প্রভাবে ষোড়শ শতাব্দীতে বাঙালীর সাহিত্য, সংস্কৃতি ও সাধনার চূড়ান্ত বিকাশ হইয়াছিল, সপ্তদশ শতাব্দীর কিছুকাল ধরিয়া তাহার জের চলিলেও একথা বেশ স্পষ্ট হইয়া উঠিল যে, বাঙালীর সাহিত্য ও সাধনার পূর্ণচন্দ্রে গ্রহণ লাগিয়াছে। রাষ্ট্রে লোভী ও অত্যাচারী মুঘল সুবাদারের হস্তক্ষেপ, দেশের অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে শোষণের চূড়ান্ত প্রকাশ, জমিদারি ব্যবস্থার আংশিক বিনাশ, বিদেশী বণিকের শনৈঃ শনৈঃ ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে প্রতিপত্তি লাভ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনায় বাঙালী-জীবন যে কিরূপ দুর্যোগের মধ্যে নামিয়া আসিল তাহা বুঝা গেল অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে, আলমগীর বাদশাহ ঔরংজেবের মৃত্যুর (১৭০৭) পর। তখন দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ঔরংজেবের বংশধরদের শ্বাপদের মতো কাড়াকাড়ি, আহ্‌মদশাহ্‌ আবদালির ভারত আক্রমণ, মারাঠা শিখ শক্তির নবোদ্যমে উত্থান, দিল্লীর সভাতলে ও পণ্যবিপণিতে বিদেশী বণিকের সতর্ক পদসঞ্চার—এই ভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দশকেই আসন্ন রাত্রির দুর্যোগ ঘনাইয়া আসিল।

বাংলা দেশের রাষ্ট্র ও সমাজেও সর্বনাশা বিনাশের মারীবীজ চতুর্দিকে অঙ্কুরিত হইতে লাগিল। খ্রীঃ দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে যেমন সমগ্র উত্তরাপথে মনুষ্যত্বহীন অবক্ষয়ী সমাজ-আদর্শ মুসলমান শক্তিকে কোনও বাধা দিতে পারে নাই, ঠিক সেইরূপ রাষ্ট্রিক, সামাজিক ও ঐতিহ্যগত অধঃপতন অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সমগ্র ভারতবর্ষেই দ্রুততর হইল—আর সেই অধঃপতিত জাতির জীবনসন্ধ্যায় দূর দিগন্ত হইতে নূতন ইশাবা ভাসিয়া আসিল। পশ্চিম সমুদ্র-তীরবাসী শ্বেতবণিক এই অরাজকতা, সামাজিক অবক্ষয় ও নৈতিক হতাশার চূড়ান্ত সুযোগ গ্রহণ করিল—নূতন যুগের আনা-গোনা শুরু হইয়া গেল। তবে বাত্রি প্রভাতের পূর্বে গাঢ় অন্ধকাবের যবনিকা যেন কিছুতেই অপসারিত হইতে চাহে না। ঔবংজেবের মৃত্যু (১৭০৭) হইতে পলাশীর যুদ্ধের (১৭৫৭) কাল—এই অর্ধশতাব্দীই জাতীয় জীবনেব চূড়ান্ত বিপর্যয়ের কাল। মুঘল মহিমা অনেক পূর্বেই অস্তমিত হইয়াছে, শাসনব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়িয়াছে। দুই একজন সুবাদার বাংলা শোষণ করিয়া, ঐশ্বর্য-বিলাসে ঘৃণ্য জীবন যাপন করিয়া বাংলাব রাষ্ট্র-ব্যবস্থাকে অনেক পূর্বেই অন্তঃসারশূন্য করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সমাজেও তখন ঘুণ ধরিয়াছিল, পুরাতন ভূস্বামিসম্প্রদায় ক্ষমতাচ্যুত হইয়া পড়িয়াছিল, শিক্ষাদীক্ষাও প্রায় সম্পূর্ণরূপে লোপ পাইতে বসিয়াছিল,—এই অর্ধ শতাব্দী বাংলা দেশের পক্ষে চূড়ান্ত হতাশার কাল; চারিত্র, মনুষ্যত্ব, সুস্থ জীবন—সব দিক দিয়াই বাঙালী-জীবনে ক্ষয়ব্যাধি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। সাহিত্যের দিক দিয়াও এরূপ বন্ধ্যাযুগ কদাচিৎ দেখা দিয়াছে। অবশ্য রাশি রাশি পুঁথি নকল করা হইয়াছে, পুরাতন ধারার উচ্ছিষ্টাবশেষ অবলম্বনে চর্বিত চর্বণের চেষ্টাও হইয়াছে অজস্র। কিন্তু সেই স্তূপাকার পুঁথি হইতে সাহিত্য ও জীবনের কোন আশাপ্রদ বৈশিষ্ট্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। পুরাতনের নকল, নকলের নকল—এই ভাবেই সাহিত্য চলিয়াছিল ক্লান্ত মন্থর পদচারণায়। অপরদিকে রাষ্ট্র ভাঙিল, সমাজ ভাঙিল, জীবনের সুস্থ আদর্শ ভাঙিল, এবং জীবন হইতে যে-সাহিত্যের জন্ম হয়—তাহাও ভাঙিয়া পড়িল। তাই বাংলা দেশের অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধকে ভাঙিয়া পড়ার ইতিহাস বলা যাইতে পারে। সে কথা স্পষ্ট হইবে এই যুগের সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করিলে। সর্বপ্রথমে এই যুগের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাক।

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের

ইতিহাস বিবর্তন

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের ইতিহাস বাংলা দেশে যে পরিবর্তন ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করিয়াছিল, যাহার উত্তাপ বাঙালী জনসাধারণকেও স্পর্শ করিয়াছিল, বাংলা সাহিত্যের সঙ্গে তাহার প্রত্যক্ষ যোগ না থাকিলেও পরোক্ষ যোগাযোগ অস্বীকার করা যায় না। ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহার সন্তানসন্ততিদের মধ্যে দ্বন্দ্বকলহের ফলে রাজনৈতিক ইতিহাসে ঘন ঘন পালা বদল চলিতেছিল, ফলে শাসনগত শিথিলতা সৃষ্টি হইয়াছিল। বিদেশী বণিকদের অসাধুতার ফলে দেশের স্বাভাবিক অর্থনৈতিক কাঠামোও বিপর্যস্ত হইয়াছিল। সর্বোপরি বর্গীর হাঙ্গামার ফলে পশ্চিমবঙ্গের ধনপ্রাণ, মান-ইজ্জত এমনভাবে লুণ্ঠিত হইয়াছিল যে, বাঙালী সে দুঃস্বপ্নের কথা বহুদিন ভুলিতে পারে নাই। এরূপ অব্যবস্থার যুগে সাহিত্যে মৌলিক সৃষ্টিক্ষম প্রতিভা আত্মপ্রকাশের পথ পায় না, তখন শুধু পুরাতনের রোমন্থন চলিতে থাকে। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাংলা সাহিত্যেও সেই অবক্ষয়ী জীবন ও সামাজিক-রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলার গভীর ছায়াপাত হইয়াছে। যাহা হউক এই অর্ধশতাব্দীব মধ্যে চারি জন সুবাদার বাংলার ইতিহাসে বিচরণ করিয়াছিলেন—মুর্শিদকুলি খাঁ, সুজা উদ্দিন, আলীবর্দি খাঁ, ও সিরাজদ্দৌলা। মুর্শিদ ও আলীবর্দি বাংলার মসনদকে নানা দিক দিয়া নিরাপদ করিয়া উত্তরাধিকারীদের হস্তে তুলিয়া দিতে চাহিয়াছিলেন, আংশিক সফলও হইয়াছিলেন। কিন্তু নানা ঐতিহাসিক কারণে সেই মসনদ ভাঙিয়া পড়িল, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেই ইংরাজ বণিক মুঘল রাজশক্তিকে হঠাইয়া দিয়া ছলে-বলে-কৌশলে সেই মসনদ অধিকার করিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ॥

মুঘল সুবাদারদের মধ্যে মুর্শিদকুলি খাঁ যে একজন অতি বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। শাসন ও রাজস্ব বিষয়ে তাঁহার সূক্ষ্ম জ্ঞান এখনও আমাদের বিস্ময় উদ্রেক করিয়া থাকে। ঔরংজেবের জীবিতকালে

১৭০০ খ্রীঃ অব্দের ডিসেম্বর মাসে মুর্শিদ বাংলার দেওয়ান হইয়া আসেন এবং ১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে সুবাদার ও দেওয়ানের উভয় কর্তব্য সুষ্ঠুভাবে সম্পাদন করিয়া বাংলায় শেষশয্যা গ্রহণ করেন। তিনিই বাংলা দেশে স্বাধীন শাসক বংশের প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ মুর্শিদকুলি ও আলীবর্দির সুবাদারী কালে বাংলা দেশের কোন কোন ক্ষেত্রে যে কিছু উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। আলীবর্দির সময় বর্গীর হাঙ্গামার ফলে সেই শান্তি, শৃঙ্খলা ও সচ্ছলতা নষ্ট হইয়াছিল। সে যাহা হউক, ঔরংজেবের মৃত্যুর পর দিল্লীর সিংহাসন লইয়া ঘন ঘন পরিবর্তন এবং তাহার ফলে নানা স্থানে অব্যবস্থার সৃষ্টি হইলেও মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দি খাঁয়ের শাসনে বাংলায় তাহার কোন প্রতিক্রিয়া দেখা দেয় নাই।

১৭০০ খ্রীঃ অব্দে হায়দ্রাবাদের দেওয়ান কারতালব খাঁ ঔরংজেব কর্তৃক বাংলার দেওয়ান ও মুখসুদাবাদের ফৌজদার নিযুক্ত হন। তাঁহার কর্ম-দক্ষতায় খুশি হইয়া ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে ঔরংজেব তাঁহাকে 'মুর্শিদকুলি খাঁ' উপাধি দান করেন। পরে তিনি এই নামেই প্রসিদ্ধ হন। শুনা যায় তিনি হিন্দু-সন্তান[১] ছিলেন। অবশ্য পরবর্তী কালে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া তিনি হিন্দুসমাজের উপর উৎপীড়ন করিতে কসুর করেন নাই। ১৭০৩ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাংলার সহকারী সুবাদার হইলেন, দেওয়ানী পদও রহিল। কিন্তু ঔরংজেবের মৃত্যুর পর তাঁহাকে কিছুটা পদাবনতির অগৌরব সহ্য করিতে হইয়াছিল। ১৭০৮-৯ খ্রীঃ অব্দে তিনি বাংলা হইতে দূরে দাক্ষিণাত্যে দেওয়ানের পদে যোগদানের জন্য প্রেরিত হন। যাহা হউক, নানা ভাগ্য-বিপর্যয়ের পর তিনি পুনরায় পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইলেন। ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে তিনি দিল্লীর বাদশাহ কর্তৃক "মুতামন-উল-মুলক আলাউদ-দৌলা জাফর খাঁ বাহাদুর, নাসিরি, নাসিরি জঙ্গ" এই গালভরা উপাধিতে ভূষিত হইয়া বাংলার পুরাপুরি সুবাদারি লাভ করিলেন। যখন ঔরংজেবের পৌত্র

১. মুর্শিদকুলি খাঁ দাক্ষিণাত্যের ব্রাহ্মণ সন্তান ছিলেন। বাল্যকালে হাজি সফি ইসফাহানী নামক এক ব্যক্তি তাঁহাকে ক্রয় করিয়া মুসলমান করেন। তখন তাঁহার নামকরণ হয় মুহম্মদ হাজি। হিন্দু থাকাকালীন তাঁহার নাম বা অন্যান্য পরিচয় জানা যায় না। ইহার পর তিনি পারস্যে নীত হন এবং সেখানে ইসলামি শিক্ষাদীক্ষায় অভিজ্ঞ হইয়া ওঠেন। দ্রষ্টব্য ঃ HOB—II, pp. 399-400

আজিম-উশ-সান (প্রথম বাহাদুর শাহের পুত্র) বাংলার সুবাদার ছিলেন (১৬৯৭-১৭১২), তখন মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলার দেওয়ানী পদে নিযুক্ত ছিলেন। সুবাদার ও দেওয়ানে নিত্য মতান্তর হইতে বলিয়া নিজ নিরাপত্তার জন্য মুর্শিদ রাজধানী ঢাকা নগরী ত্যাগ করিয়া মুখসুদাবাদে দেওয়ানি উঠাইয়া লইয়া আসেন। তাঁহার নামানুসারে ইহার নাম হয় মুর্শিদাবাদ। প্রথম বাহাদুরশাহের মৃত্যুর পর (১৭১২) তাঁহার পৌত্র ফারুক সায়ার (আজিম-উশ্-সানের পুত্র) দিল্লীর সিংহাসন দাবি করিয়া বসিলেন। ছোট-খাট যুদ্ধবিগ্রহের পর ফারুক সায়ারই শেষ পর্যন্ত সিংহাসন অধিকার করিলেন (১৭১৩)। মুর্শিদ প্রথমে তাঁহাকে বাধা দিলেও যখন সম্রাট-পৌত্র সত্যই বাদশাহ বনিয়া গেলেন, তখন বিচক্ষণ মুর্শিদ আর তাঁহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইলেন না, তাঁহাকে সম্রাট বলিয়া কুর্নিশ জানাইলেন এবং বাংলা হইতে প্রচুর রৌপ্যমুদ্রা উপঢৌকন স্বরূপ নূতন বাদশাহকে প্রেরণ করিলেন।

১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁ বাদশাহ্ কর্তৃক বাংলার সুবাদার নিযুক্ত হইলেন। অতঃপর তিনিই বাংলার দণ্ডমুণ্ডের কর্তা হইলেন। দিল্লীর সম্রাট তখন অন্তর্ঘাতী বিদ্রোহ ও ষড়যন্ত্রে এমন জড়াইয়া পড়িয়াছিলেন যে, সুবার প্রতি মনোযোগ দিবার সময় পান নাই। বার্ষিক রাজস্ব হাতে পাইলেই তিনি নিশ্চিন্ত হইতেন। এই সুযোগে মুর্শিদ বাংলার রাজস্ব-ব্যবস্থার পাকাপাকি সুবন্দোবস্ত করিলেন, ফলে উর্ধ্বতন ও অধস্তন কর্মচারীদের অত্যাচারও অনেকটা হ্রাস পাইল। কারণ সুবাদার ও দেওয়ান তখন একই ব্যক্তি। অবশ্য মুর্শিদকুলি খাঁ প্রাপ্য রাজস্বের এক কপর্দকও ছাড়িতেন না, এবং তাহা কড়ায় গণ্ডায় বুঝিয়া না পাইলে আদায়ের জন্য যে-কোন ঘৃণ্য ও নির্মম পন্থা অবলম্বনে কুণ্ঠিত হইতেন না। কিন্তু প্রাপ্যের অতিরিক্ত আদায়ের প্রতি তাঁহার কোন লালসা ছিল না। রাজস্ব ব্যবস্থার সুবন্দোবস্তের ফলে তাঁহার সুবাদারি কালে কিছুদিন বাংলার ভাগ্যে সুখস্বাচ্ছন্দ্য ফিরিয়া আসিয়াছিল।

অন্যান্য সুবাদারদের তুলনায় (শায়েস্তা খাঁ, খান জাহান, আজিম-উশ্-সান প্রভৃতি) মুর্শিদকুলি লোভী ছিলেন না। তাঁহার সময়ে বাড়তি 'আবওয়াব' ধরা বন্ধ হইয়া যায়—তিনি নিজেও খুব সংযত জীবন যাপন করিতেন। অবশ্য কোন কোন বিষয়ে সুবাদার সাহেব অত্যন্ত নির্মম

ছিলেন। হিন্দু জমিদারগণ রাজস্ব দিতে অপারগ হইলে বা বিলম্ব করিলে তিনি তাহাদিগকে অমানুষিক শাস্তি দিতেন, অনেককেই বলপূর্বক মুসলমান করিতেন। কিন্তু চরিত্রদুষ্টি ও অন্যান্য ঘৃণ্য আচরণ হইতে তিনি দূরে থাকিতেন। যাহা হউক তাঁহার সুবাদারি কালে বাংলার শাসন ও অর্থনৈতিক অবস্থার যে একটু উন্নতি হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য জনসাধারণের আর্থিক অবস্থার যে বিশেষ উন্নতি হইয়াছিল তাহা মনে হয় না। সমসাময়িক ঐতিহাসিক সলিমুল্লা তাঁহার 'তারিখ-ই-বঙ্গালা'তে বলিয়াছেন যে, মুর্শিদাবাদের কোষাগারে প্রতিবৎসর বাড়তি টাকা রাখিবার জন্য মুর্শিদকুলি নূতন নূতন লোহার সিন্দুক নির্মাণ করাইলেও অসহায় বুভুক্ষু জনসাধারণ গোমহিষাদির মতো মারা পড়িত।[২] অথচ মুর্শিদাবাদের কোষাগারে সোনারূপা হীরা জহরতে ধূলা জমিত।[৩] তখন ঐশ্বর্য বলিতে রাজ-কোষাগারে সঞ্চিত স্তূপীকৃত টাকাকড়ি সোনা-রূপাকেই বুঝাইত। জনসাধারণের সঙ্গে তাহার কোন সম্পর্ক ছিল না। যাহা হউক মুর্শিদকুলি রাজস্ব ও শাসনের সুবন্দোবস্ত করিয়া দেওয়ানি বিভাগে বিশ্বাস-ভাজন পদস্থ হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিয়া, ইংরাজ ও অন্যান্য বণিকদের ব্যবসা বাণিজ্যের সুবিধা করিয়া দিয়া খানিকটা যে বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

সলিমুল্লা ('তারিখ-ই-বঙ্গালা') ও গোলাম হুসেন ('রিয়াজ-উস-সালাতিন') মুর্শিদকুলি খাঁর চরিত্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। তিনি ইসলামি আদর্শ ও আচার নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করিতেন, স্বহস্তে কোরান নকল করিতেন, দুই হাজার কোরানপাঠককে ভরণপোষণ দিতেন। অশনেবসনে তিনি প্রায় ঔরংজেবের মতো মিতব্যয়ী ও সদাচারী ছিলেন। দেশে দুর্ভিক্ষ মড়ক লাগিলে তিনি যথাসাধ্য দান-খয়রাত করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না। নিজে ইসলামি ধর্মতত্ত্ব ও সাহিত্যের প্রতি আকৃষ্ট ছিলেন,

২. Salimullah—*Tarikh-i-Bangala* (Tr. by Gladwin)

৩. পলাশীর যুদ্ধের পর ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে গিয়া কোষাগারের দ্বার খুলিয়া তাজ্জব বনিয়া গিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে পার্লামেণ্টে সিলেক্ট কমিটীর কাছে সাক্ষ্য দিতে গিয়া তিনি বলিয়াছিলেন, "I walked through vaults which were thrown open to me alone, piled on either hand with gold and jewels !"

দরবারে অনেক জ্ঞানীগুণী উলেমাকে স্থান দিয়াছিলেন। শাসন ও বিচার বিভাগে তাঁহার প্রত্যক্ষ হস্তক্ষেপের ফলে মোল্লা বা কাজীর বিচারের মতো অবিচার ঘটিত না। স্ত্রীঘটিত ব্যাপারে তিনি বিশুদ্ধ জীবন যাপন করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন, এক-স্ত্রী লইয়া সুখে বাস করিয়া গিয়াছেন। হারেমে খোজা প্রহরী ও আওরত সম্বন্ধে তিনি সর্বদা সতর্ক হইয়া থাকিতেন, যাহাতে শুদ্ধান্তঃপুরে অনাচার প্রবেশ করিতে না পারে। তাঁহার চরিত্রে এই রূপ নানা সদ্‌গুণ ছিল। ব্রাহ্মণ-সন্তান মুর্শিদকুলি খাঁ মুসলমান হইয়াও ব্রাহ্মণের মতো ভোগবিলাসহীন সরল জীবন যাপন করিয়া সে যুগের মুসলমান ঐতিহাসিকের প্রশংসা ভাজন হইয়াছিলেন। অবশ্য ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ এরূপ মুক্তকণ্ঠে তাঁহার প্রশংসা করেন নাই। স্টুয়ার্ট সাহেব তাঁহার গ্রন্থে[৪] বলিয়াছেন যে, মুর্শিদের চরিত্রে কিছু কিছু সদ্‌গুণ থাকিলেও তিনি নির্মম ও প্রতিহিংসাপরায়ণ ছিলেন। উপরন্তু তাঁহার ধর্মমতের উগ্রতা ও সঙ্কীর্ণতা তাঁহাকে উদারমতি শাসকে পরিণত হইতে দেয় নাই। গোলাম হুসেন, সলিমুল্লা ও স্টুয়ার্ট—তিনজনের মন্তব্যের কিছু কিছু গ্রহণ-বর্জন করিয়া লইলে দোষে-গুণে মুর্শিদকুলি খাঁকে সেকালের পক্ষে একজন বিচক্ষণ শাসক বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে। হিন্দু জমিদার, ভূস্বামী ও অভিজাত সম্প্রদায়ের উপর তাঁহার উৎপীড়নের অনেক কাহিনী প্রচলিত আছে তাহা ঠিক বটে। কিন্তু সেই দুষ্কৃতি হইতে কোন্ মুসলমান শাসকই-বা সম্পূর্ণ মুক্ত হইতে পারেন?

১৭২৭ খ্রীঃ অব্দে মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মৃত্যু হইলে তাঁহার জামাতা সুজা উদ্দিন মুহম্মদ খাঁ বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হইলেন। কারণ মুর্শিদকুলির কোন পুত্র-সন্তান ছিল না। অবশ্য জামাতার সঙ্গে শ্বশুরের সম্পর্ক বেশ মধুর ছিল না, যদিও মুর্শিদকুলির চেষ্টাতেই সুজা উদ্দিন উড়িষ্যার সহকারী সুবাদার হইয়াছিলেন। সুজা উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁ—তিনি আলীবর্দির দ্বারা নিহত হইয়াছিলেন।

সুজা উদ্দিন ॥

জীবিতকালেই মুর্শিদকুলি দৌহিত্র সরফরাজকে নিজের গদিতে বসাইতে

৪. *History of Bengal* (1810), Chap. VII (স্যার যদুনাথ সরকারও মুর্শিদকুলি খাঁয়ের নির্জলা প্রশংসা করিতে পারেন নাই। দ্রষ্টব্য: তৎসম্পাদিত ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত *History of Bengal*, Vol. II)

চেষ্টা করিয়াছিলেন, কারণ তিনি তাহাকে অত্যন্ত স্নেহ করিতেন এবং জামাতাকে বড়ো একটা পছন্দ করিতেন না। অকস্মাৎ মৃত্যু আসিয়া তাঁহার এই সঙ্কল্প কার্যে পরিণত করিতে দিল না। সুজা উদ্দিন দিল্লীর দরবারে প্রভাব বিস্তার করিয়া বাংলা ও উড়িষ্যার সুবাদার হইলেন এবং সুবাদারি লাভ করিয়াই প্রিয়পাত্র ও বন্ধুবান্ধবদিগকে বড়ো বড়ো পদে নিযুক্ত করিলেন। পুত্র সরফরাজকে নামেমাত্র দেওয়ানী পদ দেওয়া হইল। আলীবর্দি, আলমচাঁদ প্রভৃতি উপদেষ্টা ও শুভানুধ্যায়ীদের তিনি রাতারাতি উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। প্রধান কর্মচারী আলীবর্দি খাঁ ও আলীবর্দির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহ্‌মদ সুজা উদ্দিনের উপর গুরুতর প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। সুজার সময়েই মুর্শিদাবাদে জগৎশেঠ ফতেচাঁদ বংশের ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়। সুবাদার ইঁহাদের উপদেশেই শাসনকার্য নির্বাহ করিতেন।

সুজা উদ্দিন সুবাদার হইয়া মোটামুটি বুদ্ধি বিবেচনা ও কর্মশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। রাজস্ব না দিতে পারায় যে সমস্ত জমিদার মুর্শিদকুলির দ্বারা কারারুদ্ধ হইয়াছিলেন, সুজা তাঁহাদিগকে মুক্তি দিয়া সদ্‌বুদ্ধিরই পরিচয় দিয়াছিলেন। মুর্শিদকুলির সময়ে যে সমস্ত জমিদার গোপনে গোপনে তাঁহার বিরুদ্ধতা করিবার চেষ্টা করিতেছিলেন, সুজা উদ্দিনের সদয় ব্যবহারের ফলে তাঁহারা কথঞ্চিৎ শান্ত হইলেন। তাঁহার নির্দেশে মুর্শিদাবাদ শহরে অনেক ভালো ভালো বাগ-বাগিচা কোঠা-বালাখানা নির্মিত হইল, শহরের শ্রী ফিরিয়া গেল। সামরিক বিভাগে প্রায় আড়াই লক্ষ সৈন্য নিযুক্ত করিয়া তিনি নিজ নিরাপত্তা সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হইলেন। উপরন্তু বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা—তিনটি প্রদেশের সহকারী সুবাদার নিযুক্ত হইলে তাঁহার ক্ষমতাও বৃদ্ধি পাইল।

তিন সুবার বিরাট অংশকে কয়েকটি উপবিভাগে ভাগ করিয়া সুজা উদ্দিন উহার কিয়দংশ নিজ প্রত্যক্ষ শাসনাধীনে রাখিলেন এবং বাকি অংশগুলির শাসনভার নবাব নাজিমদের (সহকারী সুবাদার) হস্তে অর্পণ করিলেন। পুত্র সরফরাজ খাঁয়ের উপর ঢাকা বিভাগের শাসন অর্পিত হইল। সুজা উদ্দিন পদস্থ হিন্দুকর্মচারীদিগকে বিশেষ সম্মান করিতেন। যশোবন্ত রায় নামক এক হিন্দু কর্মচারী ঢাকার দেওয়ান হইয়া সরকারী কর্মে খুব বিচক্ষণ-তার পরিচয় দিয়াছিলেন। অবশ্য সুজার শাসনকালের শেষের দিকে তাঁহার

পরিবারে ও শাসনবিভাগে নানা বিশৃঙ্খলা ঘনাইয়া আসিল, অনেক জমিদার বিদ্রোহী হইল। তিনি নিজের চরিত্রটিও বিশেষ শুদ্ধ রাখিতে পারেন নাই; হারেমে হুরীপরী লইয়া বৃদ্ধবয়সে মাতিয়া উঠিলেন এবং শাসনকার্যে উদাসীন হইয়া রহিলেন। ফলে শাসনবিভাগে নানা বিশৃঙ্খলা প্রবেশ করিল। ১৭৩৯ খ্রীঃ অব্দে বৃদ্ধ সুজা উদ্দিন জীবনের মায়া কাটাইয়া জমি লইলেন, মৃতদেহ মুর্শিদাবাদের অদূরে তাঁহার অতি প্রিয় স্থান ডাহাপাড়া গ্রামে সমাহিত হইল। পুত্র সরফরাজ 'আলা-উদ্দৌলা হায়দার জং' এই উপাধি লইয়া মসনদে বসিয়া তিনি সুবার মালিক হইলেন—নিরাপদেই ইহা সমাধা হইয়া গেল।

সরফরাজ মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়া কিছুকাল নিরুপদ্রবে রাজ্য শাসন করিতে লাগিলেন। মুমূর্ষু পিতার শয্যাপার্শ্বে বসিয়া সরফরাজ প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন যে, পিতার পুরাতন কর্মচারীদিগকে তিনি তাঁহাদের নিজ নিজ পদে বহাল রাখিবেন। সুবাদার হইয়া তিনি সেই প্রতিজ্ঞানুসারে কাজ চালাইতে লাগিলেন। কিন্তু দেশ শাসন করিবার মতো কোনরূপ বুদ্ধি, চরিত্র ও শক্তিসামর্থ্য তাঁহার ছিল না। তিনি অচিরে মুসলমান ওমরাহদের মতো কুৎসিত আমোদপ্রমোদে আসক্ত হইয়া পড়িলেন, এবং শাসনকার্য হইতেও হাত গুটাইয়া লইলেন। পিতার সদগুণের কোনটিই তিনি পান নাই, কিন্তু দোষগুলি পাইয়াছিলেন পুরামাত্রায়। দেড হাজার আওরত লইয়া মুর্শিদাবাদের 'চিহিল সাতুনে' (চল্লিশ থামের প্রাসাদ) তিনি দিব্য আরামে দিন কাটাইতে লাগিলেন। সুযোগ বুঝিয়া ধূর্ত উলেমা-মোল্লার দল তাঁহাকে মিষ্ট কথায় বশ করিয়া বেশ কিছু গুছাইয়া লইল। বুদ্ধিভ্রষ্ট কামুক সরফরাজ ক্রমেই আসমান-জমিনের ফারাক ভুলিয়া মাটিতেই বেহেস্ত রচনার দিবাস্বপ্ন দেখিতে লাগিলেন। ফলে দেশের শাসন ও শৃঙ্খলা প্রায় সম্পূর্ণরূপে ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল; আমীর-ওমরাহ, জমিদার, বণিক ও কর্মচারীরা নবাবের উপর নবাবি করিতে লাগিল। অবশ্য সরফরাজের খোয়াব দেখিবার দিন ক্রমেই হ্রস্ব হইয়া আসিতে লাগিল। অন্যতম প্রধান ব্যক্তি আলীবর্দি খাঁয়ের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে যুদ্ধে সরফরাজ নিহত হইলে (১৭৪০) বাংলার মসনদ বিশ্বাসঘাতক কিন্তু বিচক্ষণ প্রবীণ আলীবর্দির দ্বারা অধিকৃত হইল।

আলীবর্দি খাঁ ॥

আরব-তুর্কী বংশোদ্ভূত মির্জা মহম্মদ আলী এবং তাঁহার অগ্রজ মির্জা আহম্মদ—দুই ভাই ভাগ্যান্বেষীরূপে আবির্ভূত হইলেও শুধু বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার দ্বারাই কনিষ্ঠ মির্জা মহম্মদ আলী বাংলার মসনদে অধিষ্ঠিত হইয়াছিলেন। ইনিই বাংলার নবাব আলীবর্দি খাঁ। প্রথমে তাঁহাদের পিতা আজমশাহের (ঔরংজেবের পৌত্র) সামান্য কর্মচারী ছিলেন। ইহার পর নানা দুঃখকষ্টে দুই ভাই সংসার যাত্রা নির্বাহ করিতেন। কিন্তু তাঁহারা সুজা উদ্দিনের কর্মে যোগ দিয়া তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও বিচক্ষণতার গুণে অল্পদিনের মধ্যেই সুবাদারের দক্ষিণহস্ত স্বরূপ হন এবং ক্রমে ক্রমে উচ্চ পদ লাভ করেন। সুজা উদ্দিনই কনিষ্ঠ ভাই মির্জা মহম্মদকে 'আলীবর্দি খাঁ' উপাধি দানে সম্মানিত করিয়াছিলেন। অতঃপর তিনি এই নামেই পরিচিত হন। তাঁহার উপদেশেই সুজা উদ্দিনের শাসনকার্য এত শৃঙ্খলার সঙ্গে চলিত।[৫] সুজা উদ্দিন আলীবর্দির উপর এত সন্তুষ্ট ছিলেন যে, তাঁহাকে ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে বিহারের সহকারী সুবাদারের পদ দিয়াছিলেন। আলীবর্দিও অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে এই কর্মভার পরিচালনা করিয়া নিজ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে কুণ্ঠিত হন নাই।

সুজা উদ্দিনের মৃত্যুর পর তাঁহার অপদার্থ পুত্র সরফরাজ খাঁ বাংলার সুবাদার হইলে তাঁহার অপদার্থতার সুযোগ লইবার অভিপ্রায়ে আলীবর্দি ও তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা তলে তলে ষড়যন্ত্রের জাল পাতিলেন। তখন দিল্লীর মুঘল বাদশাহও হতবল হইয়া পড়িয়াছেন। কারণ তৎপূর্বেই নাদির শাহের আক্রমণে তিনি এতটা ভাঙিয়া পড়িয়াছিলেন যে, কোন সুবায় কোনরূপ অন্যায় অনুষ্ঠিত হইলে তাহার প্রতিবিধান করিবারও তাঁহার কোন সামর্থ্য ছিল না। দিল্লীর দুর্বলতা ও সরফরাজের অপদার্থতায় উল্লসিত আলীবর্দি সরফরাজের সভাসদদের মধ্যে কয়েকজনকে হাত করিয়া তাহাদের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিতে লাগিলেন। ষড়যন্ত্রের মূল লক্ষ্য—মসনদ হইতে প্রভুপুত্রের বিতাড়ন।

৫. কেহ কেহ মনে করেন যে, এই দুই ভাই নিজ ইষ্ট সাধনের জন্য যে-কোন পন্থা গ্রহণ করিতেন। সলিমুল্লা, হলওয়েল প্রভৃতির মতে আলীবর্দি ও তাঁহার অগ্রজ—কামুক সুজাউদ্দিনের হারেমে নিজেদের অন্তঃপুরিকাদের পাঠাইয়া সুবাদারের উপর এতটা প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার এই বৃত্তান্তকে অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে করেন। দ্রষ্টব্য—HOB—II, p. 437—438

এদিকে সরফরাজও এই ব্যাপারের আভাস পাইয়া প্রস্তুত হইতে লাগিলেন। মসনদ লইয়া রাজসভার ষড়যন্ত্র প্রথম শুরু হয় এই সময় হইতে। ১৭৩৯-৪০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে গোপন ষড়যন্ত্র শক্তি অর্জন করিল এবং বিহারের সহকারী স্থবাদার আলীবর্দি খাঁ সরফরাজকে আক্রমণ করিবার জন্য লোক লস্কর সেনা-বাহিনী লইয়া ১৭৪০ খ্রীঃ অব্দের মার্চ মাসে আজিমাবাদ (পাটনা) ত্যাগ করিয়া রাজমহলে উপস্থিত হইলেন। এখানে তাঁহার জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা হাজি আহম্মদও সরফরাজের চোখে ধূলা দিয়া কনিষ্ঠের সঙ্গে মিলিত হইলেন। যাহা হউক গিরিয়ার প্রান্তরে যুদ্ধার্থী দুই দল হাজির হইল। একদিকে বিহারের সহকারী স্থবাদার আলীবর্দি খাঁ, আর একদিকে স্থবে বাংলা-বিহার-উড়িষ্যাব দণ্ডমুণ্ডের কর্তা সরফরাজ খাঁ। আলীবর্দির কূট বুদ্ধির ফলে সরফ-রাজ গভীর রাত্রিতে অতর্কিতে আক্রান্ত হইলেন এবং গুলিবিদ্ধ হইয়া তৎক্ষণাৎ প্রাণত্যাগ করিলেন। আলীবর্দি বিজয়গর্বে সসৈন্যে আত্মীয়স্বজনসহ মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিয়া 'চিহিল সাতুনে' সাড়ম্বরে স্থবাদার হইয়া বসিলেন।

অতি ধূর্ত আলীবর্দি সরফরাজের পরিবাববর্গের সহিত সদয় ব্যবহার করিয়া এবং যথাযোগ্য জনে প্রচুর অর্থ উপঢৌকন দিয়া মুর্শিদাবাদের প্রতিকূল শক্তিকে নিজ করায়ত্ত করিলেন। ইতিমধ্যে এই নূতন স্থবাদার দিল্লীর অপদার্থ বাদশাহ মহম্মদ শাহ্‌কে ঘুষ দিয়া নিজ নামে স্থবাদারের ফারমান আনাইলেন। যাহা হউক তাঁহার বিচক্ষণ শাসন ও সদয় ব্যবহারে দেশ-বাসী তাঁহার কৃতঘ্ন চরিত্রের কথা ভুলিয়া গেল।

এই সমস্ত ঘটনায় দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর তৃতীয়-চতুর্থ দশকে মুঘল সাম্রাজ্য ও বাংলা দেশের কিরূপ শোচনীয় নৈতিক অধঃপতন হইয়া-ছিল। আলীবর্দি নিজ প্রভু ও পৃষ্ঠপোষক স্থবাদার স্থজা উদ্দিনের পুত্র সরফরাজ খাঁকে ঘৃণ্যপন্থা অবলম্বন করিয়া বিনাশ করিলেন এবং দিল্লীর বাদশাহের প্রসারিত করকমলে কিছু স্বর্ণরৌপ্য বৃষ্টি করিয়া নির্বিবাদে বাংলার তখ্‌তে চড়িয়া বসিলেন। প্রথম দিকে সরফরাজের পরিবারবর্গ ও প্রভুভক্ত কর্মচারিগণ বোধ হয় আলীবর্দির কর্তৃত্ব মানিতে চাহেন নাই। বুদ্ধিমান আলীবর্দি মিঠাবুলির সঙ্গে সোনা-রূপার ঝঙ্কার মিশাইয়া তাঁহাদেরও জয় করিয়া লইলেন। অবশ্য তিনি যে ষড়যন্ত্রের সাহায্যে প্রভুপুত্রকে বিনাশ করিয়াছিলেন, ভাগ্যের পরিহাসে ঠিক তাহার সতের বৎসর পরে তাঁহার

নয়নের মণি দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলাও অনুরূপ ষড়যন্ত্রের দ্বারাই পরাভূত ও নিহত হন। আলমচাঁদ, জগৎশেঠ—সরফরাজের যে সমস্ত কর্মচারী ও উপদেষ্টারা আলীবর্দির সঙ্গে গোপন ষড়যন্ত্র করিয়া সরফরাজের বিনাশ ত্বরান্বিত করেন, ভাগ্যের পরিহাসে তাঁহারাই আবার সিরাজ-বিনাশের কর্ণধার হইয়াছিলেন। সে যাহা হউক, আলীবর্দি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবাদার (নবাব) হইয়া নিজের নিকট-আত্মীয় ও বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদিগকে গুরুত্বপূর্ণপদে নিয়োগ করিয়া বাংলার শাসনে প্রত্যক্ষভাবে হস্তক্ষেপ করিলেন এবং মুর্শিদকুলি খাঁয়ের মতো পারদর্শিতা দেখাইয়া সরফরাজের বিশৃঙ্খল শাসনব্যবস্থাকে পুনরায় নিয়মশৃঙ্খলার মধ্যে আনিলেন—অনেক হিন্দুকেও তিনি উচ্চ রাজপদে নিয়োগ করিয়া অসাম্প্রদায়িক মনোভাবের পরিচয় দিয়াছিলেন। এ আদর্শ তিনি মুর্শিদকুলি খাঁয়ের নিকট পাইয়াছিলেন।

বাংলার নবাব হইয়া প্রবীণ আলীবর্দি বেশী দিন সুখশান্তি ভোগ করিতে পারিলেন না, বা বাংলার রাজস্বব্যবস্থা ও শাসনসংক্রান্ত সুপরিকল্পনাগুলিরও রূপ দিবার সুযোগ পাইলেন না। নবাব হইয়াই তাঁহাকে উড়িষ্যার বিদ্রোহী সহকারী সুবাদারকে দমন করিতে বহু পরিশ্রম ও অর্থ ব্যয় করিতে হইল। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে যখন তিনি উড়িষ্যাকে বশীভূত করিয়া বিদ্রোহী সহকারী সুবাদারকে খেদাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত হইয়া মুর্শিদাবাদের অভিমুখে আসিতেছিলেন, তখন বালেশ্বরের নিকটে পৌঁছাইয়া সংবাদ পাইলেন যে, মারাঠা বর্গীরা দেশ লুঠিতে বাংলার দিকে চলিয়াছে। বুদ্ধি, বিচক্ষণতা ও কৃতঘ্নতার দ্বারা তিনি যে বাংলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বৃদ্ধ বয়সে যাহার নিরাপত্তার জন্য দিবারাত্র ছুটাছুটি করিতেন, সেই রাজ্য নিরুদ্বেগে ভোগ করিবার অবকাশ পাইলেন না। বর্গীর হাঙ্গামায় বাংলা দেশ শ্মশান হইয়া গেল—আলীবর্দির চোখের সামনেই তাঁহার সাধের সুবা লুণ্ঠিত হইল—অল্পদিনের মধ্যেই তিনি হৃতগৌরব, হতাশ ও অর্থশূন্য হইয়া পড়িলেন। ইহার উপর আবার তাঁহার আফগান সেনাবাহিনীর বিদ্রোহ[৬] তাঁহাকে আরও চিন্তিত করিয়া তুলিল। কিন্তু বর্গীর লুঠতরাজের ফলেই তাঁহার বিচক্ষণ শাসন ও রাজস্বব্যবস্থা ভাঙিয়া পড়ে, পশ্চিমবঙ্গের অনেকটাই এই মারাঠী

৬. ১৭৪৫ ও ১৭৪৮ খ্রীঃ অব্দে দুইবার বিদ্রোহ হয়।

পঙ্গপালের অত্যাচারে শ্মশান হইয়া যায়। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত পুনঃ পুনঃ মারাঠা বর্গীর আক্রমণে আলীবর্দিকে এত ব্যস্ত থাকিতে হইয়াছিল যে পঁচাত্তর বৎসরের বৃদ্ধ আর আঘাত সহ্য করিতে পারিলেন না। রোগজীর্ণ আলীবর্দি খাঁয়ের আয়ু ধীরে ধীরে পশ্চিম দিগন্তে ঢলিয়া পড়িল।

১৭৪২ খ্রীঃ অব্দে সর্বপ্রথম পশ্চিম বাংলায় লুঠেরা বর্গীরা আক্রমণ ও লুঠতরাজ শুরু করে। আলীবর্দি তাহাদিগকে দেশ হইতে তাড়াইয়া দিলে ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দে তাহারা নাগপুরে রঘুজী ভোঁশলের অধীনে মিলিত হইয়া পুনরায় লুণ্ঠন শুরু করে। কিন্তু রঘুজী ও পেশোয়া বালাজী রাওয়ের বিরোধের ফলে রঘুজী বর্গী সৈন্যদিগকে লইয়া মানভূমের দিকে পলাইয়া গেলেন। তখন পেশোয়ার সঙ্গে আলীবর্দি এই মর্মে সন্ধি করিলেন যে, নবাব মারাঠী রাজা সাহুরাজাকে বাংলার রাজস্বের এক-চতুর্থাংশ (চৌথ) দিবেন. বালাজীকে বাইশ লক্ষ টাকা দিবারও সর্ত স্বীকৃত হইল। তাহার প্রতিদান স্বরূপ বালাজী কথা দিলেন যে, রঘুজী প্রভৃতি বর্গী নেতারা আর কোন দিন বাংলায় উৎপাত করিবেন না। ১৭৪৩-৪৪ খ্রীঃ অব্দ ধরিয়া প্রায় পুরা এক বৎসর বাংলায় শান্তি বিরাজ করিয়াছিল। কিন্তু সমস্ত সর্ত লঙ্ঘন করিয়া রঘুজীর সেনানায়ক ভাস্কর পণ্ডিত ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দে আবার দলবল লইয়া বাংলায় নির্মম অত্যাচার শুরু করিলেন। বাধ্য হইয়াই আলীবর্দি তাঁহার হিন্দু-মুসলমান প্রধান কর্মচারীদের সহিত পরামর্শ করিয়া গোপন ফাঁদ পাতিলেন। সন্ধিসর্তের লোভ দেখাইয়া ভাস্কর পণ্ডিত ও তাঁহার অনুচরদিগকে আলীবর্দির শিবিরে আনা হইল—এবং চকিতের মধ্যে তাঁহাদিগকে হত্যা করা হইল। এই প্রয়োজনীয় বিশ্বাসঘাতকতার ফলে আলীবর্দি বৎসর খানেক শান্তি পাইলেন। পুনঃ পুনঃ মারাঠার আক্রমণে রাজকোষ শূন্য হইয়া পড়িয়াছে, সিপাহীরা বেতন পায় না। অর্থের জন্য আলীবর্দি জমিদার ও ইংরাজ-ফরাসী বণিকদের উপর জোর-জুলুম চালাইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহার আফগান সেনাপতি মুস্তাফা খাঁ বিদ্রোহী হইয়া মারাঠা বর্গীদের পক্ষে যোগ দেওয়ার ফলে আলীবর্দির অবস্থা আরও শোচনীয় হইয়া পড়িল। এই সুযোগে ১৭৪৬ খ্রীঃ অব্দে বর্গীরা পুনরায় বাংলায় আসিয়া লুঠিতে লুঠিতে মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইয়াছিল। অবশ্য বৃদ্ধ আলীবর্দি তাহাদিগকে তাড়াইয়া দিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার কর্মচারীরা তাঁহার এই

বিপদের দিনে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করিয়াছিলেন। তাঁহার আত্মীয় মীর জাফর ও রাজমহলের ফৌজদার আতাউল্লা তাঁহাকে বিনাশ করিবার জন্য গোপন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া আলীবর্দি তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিলেন। এদিকে ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে বর্গীরা মেদিনীপুর ও উড়িষ্যা অধিকার করিয়া ফেলিল। বিপদের উপর বিপদ—নাদির শাহের উত্তরাধিকারী আহমদশাহ্ দুরাণী পাঞ্জাব আক্রমণ করিলে দিল্লীর 'শাহান্-শাহ' টলটলায়মান হইলেন, এবং এই সন্ত্রাস ও বিশৃঙ্খলার সুযোগে দ্বার-ভাঙার আফগান সেনারা পাটনা আক্রমণ করিয়া আলীবর্দির জ্যেষ্ঠভ্রাতা হাজি আহমদ ও জামাতা জৈনুদ্দিনকে হত্যা করিল। শোকে অভিভূত বৃদ্ধ আলীবর্দি তাহাদিগকে পরাভূত করিয়া তাড়াইয়া দিলেও উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের কিয়দংশ মারাঠাদের অধিকারে রহিল। ১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের দিকে আবার তাহারা মুর্শিদাবাদ পর্যন্ত উপস্থিত হইয়া লুঠপাট আরম্ভ করিল। তখন আলীবর্দির জীবনীশক্তি নিঃশেষ হইয়া আসিয়াছে। যাহা হউক ১৭৫১ সালে পঁচাত্তর বৎসর বয়সের বৃদ্ধ নবাব মারাঠা লুঠেরাদের সঙ্গে সন্ধি করিতে বাধ্য হইলেন। বার্ষিক ১২ লক্ষ টাকা চৌথ দিয়া এবং উড়িষ্যা হারাইয়া আলীবর্দি রোগজীর্ণ শরীরে কোনও প্রকারে শান্তি স্থাপন করিলেন। অপরিণামদর্শী তরুণ দৌহিত্র সিরাজ-উদ্দৌলার হস্তে সুবে বাংলা-বিহারের গুরুভার অর্পণ করিয়া ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দে ১০ই এপ্রিল অতি প্রত্যুষে আলীবর্দি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করিলেন।

আলীবর্দি খাঁ নিজ স্বার্থসাধনের জন্য নীতিবিরোধী কৃতঘ্নতার আশ্রয় লইয়া বাংলার মসনদ অধিকার করিয়াছিলেন, বিশ্বাসঘাতকতা করিয়া সানুচর ভাস্কর পণ্ডিতকে হত্যা করাইয়াছিলেন—তাহা ঠিক বটে। কিন্তু সুবায় সুশাসন স্থাপনের জন্য তিনি যেরূপ বিচক্ষণতা, দূরদর্শিতা ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাকে মুর্শিদকুলি খাঁ অপেক্ষাও প্রশংসা করিতে হইবে। অতিশয় স্নেহপ্রবণ ও বিশুদ্ধ পারিবারিক জীবনে একনিষ্ঠ এই সুবাদার কখনও কুৎসিত আমোদপ্রমোদে লিপ্ত হন নাই, সর্বদা সজ্জীবন যাপন করিয়াছেন। উপরন্তু তিনি হিন্দু মুসলমানের মধ্যে কোন ভেদ করেন নাই। অবশ্য বিদেশী বণিক ও জমিদারদের উপর মাঝে মাঝে উৎপীড়ন করিতেন বটে, কিন্তু তাহা নিজের জন্য নহে—বর্গীর আক্রমণ বাধা দিবার জন্যই তিনি

কোন কোন ক্ষেত্রে অর্থের জন্য পীড়ন করিয়াছিলেন। তবে তাঁহার একটি ত্রুটি মারাত্মক হইয়া বাংলার সর্বনাশ করিয়াছিল। অন্ধ স্নেহবাৎসল্যের জন্য তিনি নয়নের মণিস্বরূপ দৌহিত্র সিরাজকে যথোচিত 'মানুষ' করিতে পারেন নাই, রাজোচিত কোন শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা করেন নাই—অত্যধিক আদরে এই কিশোরের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিলেন। সিরাজের জন্মের পর আলীবর্দির অভূতপূর্ব উন্নতি হয়। এইজন্যই তিনি অত্যধিক আদরে সিরাজকে ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী করিয়া গড়িতে পারেন নাই। ফলে তরুণ সিরাজ নির্বুদ্ধিতার জন্য শোচনীয়ভাবে নিহত হইয়াছিলেন এবং বাংলার শাসনভার বিদেশী বণিকের হাতে চলিয়া গিয়াছিল। অবশ্য তখন সারা-ভারতের যেরূপ অবস্থা, তাহাতে সিরাজ বুদ্ধিমান হইলেও বাংলাকে অধিকারে রাখিতে পারিতেন না। তখন চারিদিকে শাঠ্য-ষড়যন্ত্র লোভক্ষোভের অন্ধকার নামিয়া আসিতেছে। ভবিতব্যের গতিকে, সিরাজ কেন—স্বয়ং ভবিতব্যই বাধা দিতে পারিত না।

সিরাজউদ্দৌলা ॥

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের এপ্রিল মাসে আলীবর্দি খাঁয়ের উত্তরাধিকারী দৌহিত্র সিরাজউদ্দৌলা প্রায় ২৩ বৎসর বয়সে সুবে বাংলা বিহারের নবাব হইলেন। বৎসর খানেক গত হইতে না হইতেই ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩-এ জুন তিনি পরাভূত হইয়া মুর্শিদাবাদ ছাড়িয়া পলায়ন করেন এবং পথিমধ্যে ধৃত হইয়া ২রা জুলাই রাত্রিতে মুর্শিদাবাদে নীত ও নিহত হন। বাংলায় মুসলমান শাসন ফুরাইল, বাংলার স্বাধীনতা জবাহ্ হইল, বিদেশী বণিক তুলাদণ্ডকেই যাদুদণ্ডরূপে ব্যবহার করিয়া প্রাচ্য বিশ্বে নূতন ইতিহাসের পথ খুলিয়া দিল।

শেষ জীবনে বৃদ্ধ আলীবর্দি বড় হতাশার মধ্যে দিন কাটাইতেছিলেন। বর্গীর হাঙ্গামা দমন করিতে গিয়া তাঁহার রোগজীর্ণ দেহ ভাঙিয়া পড়িয়াছে, সেনাবাহিনীর একটা বড়ো অংশ বিদ্রোহী হইয়া তাঁহাকে চরম বিপদে ফেলিয়াছে, একবৎসরের মধ্যে তাঁহার দুই জামাতা ও একটি দৌহিত্র মারা গিয়াছে, তাঁহার জীবিতকালেই তাঁহার তিনকন্যা বিধবা হইয়াছেন। তাঁহার জ্যেষ্ঠা কন্যা ঘসেটি বেগম (মিহিরউন্নিসা) অপুত্রক ছিলেন। দ্বিতীয় কন্যা পূর্ণিয়ার সুবাদারের বেগম ছিলেন। তাঁহার দুই পুত্র—সৌকৎজঙ্গ ও মির্জা

রমজানি। কনিষ্ঠা কন্যা আমিনা বেগমের দুই পুত্র, সিরাজউদ্দৌলা ও মির্জা মেহ্‌দি।

সিরাজের জন্মের (১৭৩৩) পর আলীবর্দি অতি দ্রুত সৌভাগ্যের শিখরে আরোহণ করেন, সামান্য অবস্থা (মাত্র ১০০৲ টাকা বেতনের কর্মচারী) হইতে তিনি তিন প্রদেশের সর্বময় কর্তা হইয়াছিলেন। তিনি আবার কিছু কুসংস্কারাচ্ছন্নও ছিলেন, জ্যোতিষ করকোষ্ঠীতে তাঁহার অগাধ ভক্তি ছিল। এই সৌভাগ্যের জন্য নবজাত দৌহিত্র সিরাজকে তিনি এত স্নেহ করিতেন যে, মুহূর্তের জন্যও তাহাকে চোখের আড়াল করিতে দিতেন না। পরে বালকের বয়স বাড়িতে থাকিলেও স্নেহান্ধ আলীবর্দি তাহার সাধারণ শিক্ষা ও অস্ত্র-শিক্ষার কোন ব্যবস্থা করিলেন না—পাছে তাহার কোন ক্ষতি হয়। ফলে যে তাঁহার ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারী হইবে, সে তাঁহারই বুদ্ধিভ্রষ্টতার জন্য অশিক্ষিত, দুর্বিনীত, বর্বর বলীবর্দে পরিণত হইল। আলীবর্দির মৃত্যুর পর তেইশ বৎসরের যুবক সিরাজের হাতে বিপুল শক্তি ও কুবেরের ঐশ্বর্য সমর্পিত হইল। আলীবর্দির জীবিতকালেই সিরাজ যেরূপ উদ্ধত জঘন্য চরিত্রের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে রাজ্যের ভবিষ্যৎ ভাবিয়া বিচক্ষণ আলীবর্দি কেন যে অন্য ব্যবস্থা করেন নাই, তাহা এক চিন্তার বিষয়। মাত্রাতিরিক্ত স্নেহ যে বিচক্ষণ ব্যক্তির বুদ্ধিবিবেচনাকে কতদূর গ্রাস করিতে পারে আলীবর্দিই তাহার সাক্ষাৎ দৃষ্টান্ত।

আলীবর্দি মৃত্যুশয্যা লইলে বাংলা-বিহারের মসনদলাভের জন্য দুই অপরিণামদর্শী মূঢ় যুবক প্রস্তুত হইতেছিলেন। একজন স্বয়ং সিরাজ, আর একজন তাঁহার মাসতুতো ভাই পূর্ণিয়ার সৌকৎজঙ্গ। আলীবর্দির মৃত্যুর পর সিরাজ দুইজন প্রত্যক্ষ শত্রুর প্রতিকূলতার সম্মুখীন হইলেন। একজন তাঁহার মাসী ঘসেটি বেগম, আর একজন সেনাবিভাগের সর্বাধ্যক্ষ এবং তাঁহার আত্মীয়[৭] মীরজাফর আলী খাঁ। নিঃসন্তানা, বিধবা, লোভী ও চরিত্রহীনা ঘসেটিবেগম সৌকৎজঙ্গকে পূর্ণিয়া হইতে গোপনে ডাকিয়া পাঠাইলেন, সিংহাসন লাভে তাঁহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশ্বাস দিলেন। অপর দিকে বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর এই সুযোগে কাজ গুছাইয়া

৭. মীরজাফরের সঙ্গে আলীবর্দি নিজ সম্পর্কের ভগিনীর (শাহ্ খানুম) বিবাহ দিয়া তাঁহাকে সর্বোচ্চ পদে নিয়োগ করেন। সেদিক দিয়া সিরাজ মীরজাফরের আত্মীয়।

লইবার ব্যবস্থা করিলেন। যাহা হউক সিরাজ মাসীমাতাকে কারারুদ্ধ করিয়া তাঁহার ধনভাণ্ডার হস্তগত করিলেন—এইরূপে একটি বড়ো শক্তিকে হতবল করিয়া ফেলিলেন। সেই সঙ্গেই মীরজাফরকে পদচ্যুত করিয়া তিনি মীরমদনকে সেই পদ দান করিলেন; মোহনলাল কাশ্মীরীও প্রায় প্রধান উজীরের মর্যাদা লাভ করিলেন। সমস্ত বিভাগে নিজ মনোমত ব্যক্তিদের নিযুক্ত করিয়া সিরাজ সৌকৎজঙ্গকে শাস্তি দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু পথিমধ্যে সব মিটমাট হইয়া গেলেও তিনি নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। কারণ তাঁহার প্রধান শত্রু ইংরাজ বণিকদের সঙ্গে তাঁহার মনান্তর প্রবলাকার ধারণ করিল। কলিকাতাব ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীদের উপর সিবাজের ক্রুদ্ধ হইবার যথেষ্ট কারণ ছিল। ইংরাজ বণিক য়ুরোপে ফরাসীদের সঙ্গে ইংবাজ জাতির যুদ্ধের অছিলায় কলিকাতায় নিজেদের কেল্লা সুদৃঢ় করিয়া এবং মারাঠা খাল আরও চওড়া করিয়া কাটাইয়া ফার্মানের সর্ত লঙ্ঘন করিয়াছিল। ব্যবসাবাণিজ্যেও তাহারা দস্তকের অপব্যবহার করিয়া সরকারী রাজস্বের প্রচুর ঘাটতি করিত. এইরূপে নবাবের সঙ্গে সম্পাদিত সর্তচুক্তি তাহারাই সর্বাগ্রে লঙ্ঘন করিল।

আরও একটা কারণে সিরাজ ইংরাজ বণিকের উপর ভয়ানক ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। রাজবল্লভের পুত্র কৃষ্ণদাসকে ইংরাজগণ আশ্রয় দিয়া দেশের রাজশক্তিকে তুচ্ছ করিয়াছিল। সুতরাং ন্যায্য কারণেই সিরাজ ইংরাজদের উপর রুষ্ট হইলেন। পূর্ব হইতেই ইহাদের প্রতি তাঁহার বিদ্বেষ সঞ্চারিত হইয়াছিল; এই সমস্ত কারণে তাহা প্রকাশ্য ক্রোধের আকারে ফাটিয়া পড়িল।

১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের ১৬ই জুন সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতা আক্রমণ করিলেন। ১৮ই জুনের মধ্যে স্থানীয় ইংরাজের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। ১৯এ জুন গভীর রাত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়া বীর ব্রিটনগণ জরুজহরতসহ পলাইবার ব্যবস্থা করিল। গভর্নর ড্রেক সকলের আগে চুপিসাড়ে নৌকায় উঠিয়া 'যঃ পলায়তি স জীবতি' এই মহাবাক্য অনুসরণ করিলেন। কলিকাতা হইতে গভর্নর এবং সামরিক কর্তৃপক্ষ পলাইয়া গেলে হলওয়েল অবশিষ্ট ভীত সৈন্যদিগকে কোনও প্রকারে জুটাইয়া নবাবের আক্রমণ বাধা দিতে অগ্রসর হইলেন। কিন্তু সিরাজের অগ্নিবর্ষণের

সম্মুখে তাঁহার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইল। কেল্লার মধ্যে চারিদিকে বিশৃঙ্খলা, কেল্লার প্রাচীরের পার্শ্ব হইতে চিৎপুর পর্যন্ত সমস্ত অঞ্চল নবাবের গোলাবর্ষণে জ্বলিতে লাগিল। সিরাজের বাহিনী অতঃপর কেল্লার প্রাচীর টপকাইয়া ভিতরে প্রবেশ করিতে লাগিল। ইতিমধ্যে সন্ধ্যার দিকে কে-একজন কেল্লার ফটক খুলিয়া দিলে নবাবের বাহিনী বিজয়গর্বে কেল্লার মধ্যে বিনা বাধায় প্রবেশ করিল, যুদ্ধ বন্ধ হইল। কিন্তু সিরাজ ইংরাজপক্ষীয় কাহাকেও বন্দী করিলেন না। সিরাজেব সৈন্যেরা লুঠতরাজ করিতে লাগিল বটে, কিন্তু তাহারাও ইংরাজদের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করে নাই। ইতিমধ্যে রাত্রির দিকে একটা দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। সিরাজ পরাভূত ইংরাজদের প্রতি বিজয়ীসুলভ কোন উদ্ধত ব্যবহাব করেন নাই, তাহাদেব প্রায় ছাডিয়াই দিয়াছিলেন। হলওয়েলসহ ইংরাজপক্ষীয়দিগকে কামানের মুখে উডাইয়া দিলে ভারতের ইতিহাস হয়তো অন্যরূপ হইত এবং তাহাই যুদ্ধের সাধারণ রীতি। সিরাজ আত্মপ্রসাদেব বশে বোধ হয় রণক্লান্ত হৃতসর্বস্ব ইংরাজ সৈন্যদিগকে কৃপার চোখেই দেখিয়াছিলেন। ফলে অর্ধবর্বর টমিরা মহানন্দে মদ গিলিয়া সেই রাত্রেই দেশীয় লোকের প্রতি অত্যাচার শুরু করিল। রাত্রে যাহাতে দুর্দান্ত ইংরাজ সিপাহীরা বেশী গোলমাল সৃষ্টি করিতে না পারে, এই অভিপ্রায়ে সিরাজ মাতাল গোরা সৈন্য ও তাহাদের চেলাচামুণ্ডাদের কোন ঘরে আটকাইয়া রাখিবার আদেশ দিয়া ঘুমাইতে গেলেন। সেদিন ১৭৫৬ সাল, ২০এ জুন, রবিবার। কেল্লার ইংরাজ কর্তৃপক্ষ দুর্বিনীত টমিদের শাস্তি দিবার জন্য কেল্লার মধ্যেই একটি ক্ষুদ্র কয়েদখানা নির্মাণ করাইয়াছিলেন—ইহাই কুখ্যাত Black Hole বা 'অন্ধকূপ'। সিরাজের কর্মচারীরা সেই অপরিসর প্রকোষ্ঠে (১৮ ফুট × ১৪ ফুট-১০ ইঞ্চি) ১৪৬ জন সৈন্যকে (হলওয়েল সহ) নিক্ষেপ করিয়া তালা বন্ধ করিয়া দিল। তাহার পরের ঘটনার একমাত্র প্রত্যক্ষদর্শী হলওয়েলের বিবরণ ভিন্ন আর কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরদিন সকালে দরজা খুলিয়া দেখা গেল, জ্যৈষ্ঠ মাসের দারুণ গ্রীষ্মে জানালাহীন রুদ্ধপ্রকোষ্ঠে বন্দী ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্গের মধ্যে ১২৩ জনই মরিয়া গিয়াছে।

এই ব্যাপারের যাথার্থ্য লইয়া এদেশে ও বিদেশে বহু বাদানুবাদ হইয়াছে। প্রাচ্য দেশের লোকের ঘৃণ্য চরিত্র ঘৃণ্যতম করিবার জন্য পাশ্চাত্ত্যের

ঐতিহাসিকগণ এখনও এই উপকথা বাইবেলের মতো বিশ্বাস করেন এবং মিথ্যাবাদী হলওয়েলের নির্জলা মিথ্যা কথাকে মেসায়ার বাণী বলিয়া ভক্তিভরে হজম করিয়া থাকেন। কিন্তু অনেক ভারতীয় ও কিছু কিছু পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত এ বিষয়ে গবেষণা করিয়া হলওয়েলের মিথ্যা কথার গলা টিপিয়া ধরিয়াছেন। প্রথমতঃ, এই ব্যাপারে সিরাজের কোন অপরাধ ছিল না। মাতাল ও দুর্বিনীত টমিদিগকে সিরাজ গুলি করিয়া মারিয়া ফেলিবার আদেশ না দিয়া কোন কক্ষে আটক করিবার নির্দেশ দিয়াছিলেন—ইহাই তাঁহার একমাত্র অপরাধ। ১৪৬ জন শ্বেতাঙ্গের সংখ্যাও মিথ্যাবাদী হলওয়েলের মস্তিষ্কপ্রসূত। কারণ উক্ত মাপের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে কোনও প্রকার গণিত-জ্যামিতি-পরিমিতির হিসাবেই ১৪৬ জন ব্যক্তির দাঁড়াইবার স্থান হইতে পারে না। সুতরাং এ সংখ্যা সর্বৈব মিথ্যা। মনে হয় এই সংখ্যা বড় জোর ৬০ জন হইতে পারে।[৮] যাহা হউক পরদিন সিরাজ বিজয়গৌরবে মুর্শিদাবাদ যাত্রা করিলেন। যে সমস্ত শ্বেতাঙ্গ ধৃত হইয়াছিল তাহারা মুক্তি পাইয়া ফলতায় অপেক্ষমান ইংরাজের জাহাজে আশ্রয় পাইল।

এদিকে সিরাজ সংবাদ পাইলেন যে, সৌকৎজঙ্গ মীরজাফরের সঙ্গে গোপনে ষড়যন্ত্র করিয়া দিল্লীতে ঘুষ দিয়া নিজ নামে সুবাদারের ফারমান আদায়ের চেষ্টা করিতেছেন। সিরাজ সসৈন্যে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিলেন, পূর্ণিয়া তাঁহার অধিকারে আসিল (১৭৫৬, অক্টোবর)। এই সময়ে কয়েকমাস তিনি বেশ নিশ্চিন্ত গৌরবে আসীন ছিলেন। প্রথমতঃ, তিনি কলিকাতার ইংরাজদের বহু ক্ষতি করিয়া তাঁহাদিগকে কলিকাতার বাহিরে খেদাইয়া দিয়াছিলেন, দ্বিতীয়তঃ, সওকত জঙ্গের বিনাশে আর কেহ তাঁহার প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী রহিল না, তৃতীয়তঃ, তিনি দিল্লী হইতে নিজ নামে ফারমান লাভ করিলেন। সিরাজ মনে করিয়াছিলেন, পরাভূত ইংরাজ বণিক দন্তে তৃণ লইয়া তাঁহার প্রসাদ প্রার্থনা করিবে। কিন্তু হঠাৎ সংবাদ পাইলেন যে, পলাতক ইংরাজগণ আবার কলিকাতায় উপস্থিত হইয়াছে এবং নবাবের প্রজাদের উপর অত্যাচার করিতেছে।

১৭৫৭ সালের ২রা জানুয়ারী ক্লাইভ স্থলপথে এবং ওয়াটসন জলপথে

---

৮ হিল সাহেবের *Bengal in 1756-57*-এ হলওয়েল প্রদত্ত তথ্যের কঠোর সমালোচনা করা হইয়াছে।

ফলতা হইতে কলিকাতায় উপস্থিত হইলেন এবং কলিকাতা অক্লেশে পুনরধিকার করিয়া সেই দিনই সিরাজের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন। ইহার ঠিক একমাস পরে ৩রা ফেব্রুয়ারী সিরাজ সসৈন্যে কলিকাতার উপকণ্ঠে উপস্থিত হইলেন। ৫ই ফেব্রুয়ারী গভীর রাত্রে চতুর ক্লাইভ কিছু সৈন্য লইয়া অতর্কিতে নবাবের শিবির আক্রমণ করিলেন, কিন্তু বিশেষ ক্ষতি করিতে না পারিয়া তিনি আবার কেল্লায় ফিরিয়া আসিলেন। অবশ্য এই নৈশ আক্রমণে নবাবের পক্ষে প্রচুর লোক মারা পড়িল। এই ব্যাপারে নবাব সিরাজউদ্দৌলা সহসা অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িলেন এবং ইংরাজের সংস্পর্শ হইতে দূরে ঢাকুরিয়া অঞ্চলে সরিয়া গিয়া সন্ধির কথাবার্তা চালাইতে লাগিলেন। এই সন্ধির সর্তানুসারে ইংরাজ বণিক পূর্বগৌরবে প্রতিষ্ঠিত হইল, নবাব তাহাদের যাবতীয় ক্ষতি পূরণ করিলেন, তাহারা কেল্লা মেরামত ও মজবুত করিবার অনুমতি আদায় করিয়া লইল। শুধু ইহাই নহে, তাহারা কলিকাতায় নিজেদের টাকশাল স্থাপন করিয়া সেখান হইতে টাকা মুদ্রণের অনুমতিও পাইল। বস্তুতঃ এই সন্ধিই সিরাজের অধঃপতনের প্রথম সোপান বলিয়া গৃহীত হইতে পারে—পলাশীর যুদ্ধ তাহার চূড়ান্ত পরিণাম। এই সময় জয়োদ্ধত ইংরাজ ফরাসী-চন্দননগর আক্রমণ করিয়া ধ্বংস করিলেও সিরাজ মূঢ়ের মতো হাত গুটাইয়া রহিলেন। চন্দননগরের পতনের ঠিক তিনমাস পরে পলাশীর যুদ্ধে সিরাজ পরাভূত হইলেন। কলিকাতার সন্ধি হইতে সেই পরাজয় শুরু হইয়াছিল, ব্রিটিশের দ্বারা চন্দননগর ধ্বংসের ফলে সিরাজ শুভানুধ্যায়ী ফরাসীদের সহায়তা হারাইলেন. পলাশীর প্রান্তরে সমস্ত ঘটনার উপসংহার হইল।

ইতিমধ্যে দিল্লী হইতে আবার এক দুঃসংবাদ আসিল—আহমদশাহ্ আবদালী দিল্লী-আগ্রা-মথুরা লুঠিতে লুঠিতে আসিতেছে, হয়তো সেই লুঠেরা অযোধ্যা হইয়া বাংলা মুলুকেও আসিতে পারে। ভীত সিরাজ তখন পূর্বের বিরোধ মুলতুবি রাখিয়া ইংরাজদের পরামর্শ চাহিলেন। কিন্তু যেই আবদালী দিল্লী হইতে প্রস্থান করিল (১৭৫৭, এপ্রিল), অমনি সিরাজ ইংরাজদের ত্যাগ করিয়া চন্দননগর ও কাশিম বাজারের আশ্রয়প্রার্থী ফরাসীদিগকে সানন্দে আশ্রয় দিলেন। এই ব্যাপারে ইংরাজ বণিক প্রমাদ গণিল। তাহারা দেখিল, নবাব যদি ফরাসী সৈন্যের সাহায্য পান তাহা হইলে

বাংলা হইতে ইংরাজদের। পাততাড়ি গুটাইতে হইবে, ব্যবসাবাণিজ্য দরিয়ায় ভাসাইয়া দিয়া নূতন কোন বন্দরের সন্ধানে যাত্রা করিতে হইবে। সুতরাং ইংরাজ সব দুশ্চিন্তার মূলোচ্ছেদ করিবার জন্য সিরাজকে সিংহাসনচ্যুত করিয়া তাহাদের প্রতি অনুকূল কোন ব্যক্তিকে বাংলার মসনদে বসাইবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিল। অনুকূল বায়ুপ্রবাহে তাহারা বেশ ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া ষড়যন্ত্রের তরণীতে পাল তুলিয়া দিল।

বৎসর খানেক রাজত্ব করিয়া উদ্ধত সিরাজ রাজসভার প্রধান পুরাতন কর্মচারীদের শত্রু করিয়া তুলিয়াছিলেন। বিশেষতঃ পুরাতন কর্মচারীদের বরখাস্ত করিয়া তিনি নিজ আস্থাভাজন তরুণদের সেই সমস্ত পদে নিয়োগ করিয়া নিজের পতনকেই ত্বরান্বিত করিয়া আনিলেন। দরবার, মসনদ ও অন্তঃপুরকে ঘেরিয়া পুরাতন অসন্তুষ্ট কর্মচারীরা গোপনে ষড়যন্ত্রের জাল পাতিলেন। উদ্ধত সিরাজ অনেক সময় মানীর মান রক্ষা করিয়া চলিতেন না। প্রবীণ জগৎশেঠকে প্রায়ই শাসাইতেন, সুন্নত দিয়া তাঁহাকে মুসলমান করিবেন। পূর্বতন দেওয়ান 'রায়দুর্লভ এবং বখশী মীরজাফরের তো পূর্বেই চাকরি গিয়াছিল। সুতরাং হিন্দু-মুসলমান অভিজাতশ্রেণী—সকলে মিলিয়া গোপনে মিলিত হইয়া এই উদ্ধত মূর্খ যুবকের হাত হইতে বাংলার মসনদ কি করিয়া রক্ষা করা যায় তাহারই সলাহ্-পরামর্শ করিতে লাগিলেন। ধনকুবের জগৎশেঠ এই ষড়যন্ত্রের প্রধান পাণ্ডা হইলেন ; ইঁহারা গোপনে কলিকাতার ইংরাজের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করিলেন। যোগাযোগের প্রধান সেতু হইলেন মীরজাফর। ইংরাজ বণিক ইঁহারই অপেক্ষায় খাদন্ত শানাইয়া বসিয়াছিল। সুযোগ আসিল অপ্রত্যাশিতভাবে।

ইংরাজদের কলিকাতার কাউন্সিল ১লা মে তারিখে এই সর্তে মীরজাফরের সঙ্গে সন্ধিষড়যন্ত্রে সম্মত হইল : উভয়ের মধ্যে সহযোগিতামূলক সন্ধি স্থাপিত হইবে, ফরাসী চন্দননগরের সমস্ত ফরাসী আশ্রয়প্রার্থীদের ইংরাজদের হস্তে সমর্পণ করিতে হইবে, কলিকাতা আক্রমণে ইংরাজদের যত ক্ষতি হইয়াছিল সমস্ত পূরণ করিতে হইবে, ফারমানে উল্লিখিত ইংরাজদের প্রতি প্রদত্ত সমস্ত ধারা-উপধারা স্বীকার করিতে হইবে, কাশিমবাজার ও ঢাকার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কুঠী অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত করিবার অধিকার দিতে হইবে, হুগলীর পরে নবাব আর কোন কেল্লা নির্মাণ বা সৈন্য রাখিতে

পারিবেন না, ইংরাজ সেনাবাহিনীর জন্য নবাবকে উপযুক্ত জমিজমা দিতে হইবে, নবাবের জন্য ইংরাজ সৈন্য সংরক্ষণের যাবতীয় ব্যয়ভার নবাবকেই বহন করিতে হইবে, কলিকাতার সীমার মধ্যে ইংরাজের একচ্ছত্র অধিকার মানিতে হইবে,—সর্বোপরি নবাবের দরবারে কোম্পানীর এক শ্বেতাঙ্গ কর্মচারী অবস্থান করিয়া সব কিছু লক্ষ্য করিবেন। কাশিমবাজার কুঠীর অধ্যক্ষ উইলিয়াম ওয়াট্‌স্ অদ্ভুত নিপুণতা সহ। গোপনে ষড়যন্ত্র চালাইতে লাগিলেন। পূর্ব পরামর্শ মতো ১২ই জুন ওয়াট্‌স্ তাঁহার দলবল সহ মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পলাইয়া আসিলেন এবং ঐ তারিখেই ক্লাইভ আট শত শ্বেতাঙ্গ ও বাইশ শত কালা সিপাহি সহ মুর্শিদাবাদের উদ্দেশে যাত্রা করিলেন। ১৯শে জুন ইংরাজ কাটোয়ায় উপস্থিত হইল। কিন্তু তখনও ক্লাইভ মীরজাফরের নিকট হইতে ফাঁকা আশ্বাস ছাড়া নির্ভরযোগ্য কোন ইঙ্গিত পান নাই। তিনি কাটোয়ায় গঙ্গার ধারে পৌঁছাইয়া ইতস্ততঃ করিতে লাগিলেন—গঙ্গা পার হওয়া উচিত কিনা। সঙ্গী-সাথীরাও ইহাতে অনিচ্ছা প্রকাশ করিতে লাগিল। কিন্তু ২২শে জুন প্রভাতে ক্লাইভ সমস্ত সংশয় ফুৎকারে উড়াইয়া দিয়া সেনাবাহিনী সহ গঙ্গা পার হইয়া নবোদ্যমে অগ্রসর হইলেন এবং প্রচণ্ড বারিবর্ষণ ও প্রখর রৌদ্র মাথায় লইয়া শ্রান্তক্লান্ত শরীরে গভীর রাত্রে পলাশীর লক্ষবাগ আমবাগানে উপস্থিত হইলেন।

২৩এ জুন, ১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দ। পলাশীর প্রান্তরে সকাল আটটার সময়ে সিরাজ ও ক্লাইভের বাহিনীর মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ হইয়া গেল। সিরাজের পক্ষে ছিলেন ফরাসী সেনানায়ক মঁসিয়ে দে সিন্‌ফ্রে, মীরমদন (গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক), মোহনলাল কাশ্মীরী, ইয়ার লতিফ খাঁ, রায় দুর্লভ ও মীরজাফর। প্রায় ৫০,০০০ সৈন্যসহ সিরাজ রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হইলেন। ক্লাইভের অধীনে ছিল ৯৫০ জন শ্বেতাঙ্গ সৈন্য, ১৫০ জন গোলন্দাজ, ২,১০০ দেশী সিপাহি (বাঙালী মুসলমানের দ্বারা গঠিত 'লাল পল্টন' এবং মান্দ্রাজী তেলেঙ্গা সৈন্য)। বেলা এগারটা পর্যন্ত যুদ্ধ চলিল, দুই পক্ষেরই ক্ষতি হইতে লাগিল। তাহার পরই শুরু হইল দারুণ ঝড়-বৃষ্টি। জলে কাদায় পলাশীর প্রান্তর নরককুণ্ড হইয়া উঠিল। নবাবের বিস্ফোরক বারুদ অনাবৃত অবস্থায় ছিল বলিয়া জলে ভিজিয়া সব নিষ্ক্রিয় হইয়া গেল। কিন্তু বুদ্ধিমান ইংরাজ

পূর্বেই ঝড়-বৃষ্টি অনুমান করিয়া গোলাবারুদ ঢাকা দিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। ফলে ইংরাজ পক্ষ হইতে অবিরাম প্রবল গোলাবর্ষণ হইতে লাগিল। মীরমদন ও অন্যান্য সৈন্যাধ্যক্ষ নিহত হইলেন। এই ব্যাপারে ভীত হইয়া সিরাজ-পক্ষীয় সৈন্যেরা শিবিরে পলাইবার উদ্যোগ করিল। এইবার বিশ্বাসঘাতকতার খেলা শুরু হইল, শিবিরে বসিয়া সিরাজও তাহা বুঝিতে পারিলেন। বিপদে পড়িয়া তিনি দম্ভ হঠকারিতা বিসর্জন দিয়া মীরজাফরের কাছে উপস্থিত হইলেন এবং তাঁহার পায়ের কাছে পাগড়ি খুলিয়া রাখিয়া সকাতরে সাহায্যের অনুরোধ করিতে লাগিলেন। মীরজাফর বুঝিলেন, এইবার ষড়যন্ত্র সফল হইবার মুহূর্ত আসিয়াছে। মূঢ়, বিপন্ন, বুদ্ধিভ্রষ্ট তরুণ নবাবকে তিনি মিথ্যা স্তোকবাক্য দিয়া সেদিনকার মতো সৈন্য সরাইয়া লইতে বলিলেন। পরদিন নবোদ্যমে যুদ্ধ করা যাইবে—সিরাজকে তিনি এই আশ্বাস দিলেন। এইরূপ নির্দেশ দিয়াই তিনি দ্রুতবেগে নিজের শিবিরে ফিরিয়া ক্লাইভের কাছে গোপনে এক পত্রবাহকেব মারফতে সংবাদ পাঠাইলেন, নবাব ভীত, কিংকর্তব্যবিমূঢ়—নবাব-বাহিনীও পলায়নের উদ্যোগ করিতেছে—এই সময়ে নবাবকে আক্রমণ করিলেই ক্লাইভ জয়ী হইবেন। এদিকে মীরজাফরের কারসাজিতে নবাবপক্ষীয় অবশিষ্ট সেনাবাহিনী রণে ভঙ্গ দিয়া শিবিরে চলিয়া যাইতে লাগিল। অবশ্য সিরাজের প্রভুভক্ত রাজপুত সৈন্য ফিরিল না, খাড়া দাঁড়াইয়া লড়াই করিতে লাগিল এবং ক্লাইভের গুলিবর্ষণে একে একে নিহত হইল। কিন্তু মীরজাফর, দুর্লভরাম ও ইয়ার লতিফের সেনাবাহিনী নীরবে দূরে দাঁড়াইয়া ঢেউ গণিতে লাগিল, কেহ একটাও গুলি ছুড়িল না।

বেলা চারিটা বাজিয়া গেল। সিরাজের বাহিনী পলাইতেছে, চারিদিকে বিশৃঙ্খলা। ক্লাইভের বাহিনীকে বিজয়গর্বে অগ্রসর হইতে দেখিয়া বেলা অপরাহ্নের দিকে নবাব যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া মুর্শিদাবাদের অভিমুখে পলাইতে লাগিলেন। সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিল, রক্তাক্ত পলাশী প্রান্তরের অদূরে ভাগীরথী নীরে মুসলমান ভাগ্যরবি চির অস্তাচলে ডুবিয়া গেল।

পরাভূত নবাব সিরাজউদ্দৌলা অবশিষ্ট সৈন্য-সেনাপতিদের রণক্ষেত্রে ফেলিয়াই দ্রুতগামী উটের পিঠে চড়িয়া প্রাণভয়ে রাজধানীর অভিমুখে ছুটিয়া চলিলেন, এবং প্রায় মধ্যরাত্রিতে গভীর অন্ধকারে মুর্শিদাবাদে

পৌঁছাইলেন। চারিদিকে তখন বিশ্বাসঘাতকতা ও বিশৃঙ্খলা শুরু হইয়াছে—হাওয়ার আগে যেন পলাশীর বার্তা রাজধানীতে পৌঁছাইল। ২৪শে জুন গভীর রাত্রে সিরাজ একটি খোজা ও পত্নী লুৎফ-উন্নেসাকে সঙ্গে লইয়া ছদ্মবেশে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করিলেন। ২৯শে জুন ক্লাইভ সদলবলে বিজয়গর্বে মুর্শিদাবাদে প্রবেশ করিলেন এবং অপরাহ্ণের দিকে সমবেত গণ্যমান্য ব্যক্তি ও সভাসদদের সম্মুখে বৃদ্ধ মীরজাফরকে বাংলার মসনদে বসাইয়া তাঁহাকে নবাব বলিয়া কুর্নিশ করিলেন। বাংলার স্বাধীন নবাবের দিন ফুরাইল, বিদেশী বণিকের অঙ্গুলি-সঙ্কেতে চালিত পুতুল-নবাবের নবাবি লীলা শুরু হইল।

পরবর্তী কাহিনী খুবই সংক্ষিপ্ত। ৩০এ জুন ছদ্মবেশী সিরাজ রাজমহলের কাছে নৌকা হইতে নামিয়া আহারাদির আয়োজন করিলে দানসা ফকির নামে এক ভিক্ষোপজীবী তাঁহাকে চিনিয়া ফেলিল এবং ধরাইয়া দিল। তাঁহাকে গ্রেফতার করিয়া খুব গোপনে ২রা জুলাই মুর্শিদাবাদে আনা হইল। সেই রাত্রি তাঁহাকে লইয়া কি করা যাইবে তাহা ভাবিয়া না পাইয়া মীরজাফর সিরাজকে পুত্র মীরনের হাতে দিয়া রাত্রির মতো বিশ্রাম করিতে গেলেন। মীরন কাহারও অনুমতি উপদেশের অপেক্ষা না করিয়া সেই রাত্রেই বাংলার শেষ স্বাধীন নবাবকে ঘাতকের দ্বারা হত্যা করাইলেন।[১] পরদিন প্রভাতে সিরাজের রক্তাক্ত মৃতদেহ হাতীর পিঠে চড়াইয়া সমস্ত মুর্শিদাবাদ শহর ঘুরাইয়া আনা হইল। বৃদ্ধা মাতা আমিনা বেগম হারেমের বাধানিষেধ তুচ্ছ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে পথে আছড়াইয়া পড়িলেন। লোকে এই দৃশ্যে শিহরিয়া উঠিল। অবশ্য সিরাজ হত্যার পিছনে ক্লাইভের কোন সম্মতি ছিল না, তিনি এ বিষয়ে কিছুই জানিতেন না।

সিরাজচরিত্রে ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ স্বাভাবিক কারণেই কালি লেপিয়া দিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষপাতদুষ্ট অতিরঞ্জন নিন্দার যোগ্য তাহাতে সন্দেহ নাই। সিরাজ মাত্র বৎসরখানেক মসনদে বসিয়াছিলেন, তাও আবার অনেকটা সময়ই যুদ্ধবিগ্রহে কাটিয়াছে। সুতরাং ইংরাজ ঐতিহাসিকগণ প্রাচ্য রাজার ঘৃণ্য চরিত্রের উদাহরণ হিসাবে যে সিরাজের চরিত্র তুলিয়া ধরিয়াছেন,

১. মীরন সিরাজের একমাত্র জীবিত ভ্রাতা মির্জা মেহ্‌দি এবং ভ্রাতুষ্পুত্র মুরাদউদ্দৌলাকেও নির্মমভাবে হত্যা করিয়া আলীবর্দির বংশধারা নিশ্চিহ্ন করেন।

তাহা অন্যায়, অযৌক্তিক ও অনৈতিহাসিক। ঐ সময়ে, তাহার পূর্বে বা পরে সুসভ্য য়ুরোপে বহু দাম্ভিক রাজা সিরাজ অপেক্ষাও কুৎসিত জীবন যাপন করিয়াছেন, তাঁহার অপেক্ষাও নির্বুদ্ধিতা ও নির্মমতা দেখাইয়াছেন। তাই চারিত্রিক কদাচারের জন্য সিরাজকে বাছিয়া লইয়া গালিগালাজের গোলাবারুদ অনর্থক অপব্যয় করিবার প্রয়োজন নাই। আলীবর্দির সর্বনাশা আদরে সিরাজ কৈশোরেই বিগড়াইয়া গিয়াছিলেন; যৌবনে মসনদে বসিয়া এবং বিপুল ঐশ্বর্য হাতে পাইয়া এই অপরিণামদর্শী তরুণের মস্তক ঘুরিয়া গিয়াছিল। তবে তদানীন্তন সমাজ, ইতিহাস ও ঐতিহ্য বিচার করিলে সিরাজকে পৃথক করিয়া নিন্দা করিবার প্রয়োজন হইবে না। অবশ্য তিনি যে উদ্ধত, নির্মম, বুদ্ধিহীন ও কামুক প্রকৃতির ছিলেন, তাহা তাঁহার শুভানুধ্যায়ীরাও স্বীকার করিয়াছেন। কাশিমবাজারের ফরাসী কুঠিয়াল মঁসিয়ে জঁা ল' সিরাজের বন্ধু ছিলেন, বিপদের দিনে তিনি সিরাজকে সাহায্যও করিয়াছিলেন। তিনিও সিরাজ সম্বন্ধে স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন, "The character of Siraj-ud-daulah was reputed to be one of the worst ever known. In fact he had distinguished himself not only by all sorts of debaucheries, but by a revolting cruelty···Everyone trembled at the name of Siraj-ud-daulah"[১০] সম্ভবতঃ আলীবর্দির অত্যধিক আদরে কাঁচা বয়সে সিরাজ এতটা বখিয়া গিয়াছিলেন যে, লোকে তাঁহার নামে ভয় পাইত। তাঁহাকে যথারীতি বিদ্যাশিক্ষা বা অস্ত্রশিক্ষা কোনটাই দেওয়া হয় নাই, মাতামহের আদরে তিনি নবাব হইবার পূর্বেই দুর্দান্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। সময় সময় বৃদ্ধ আলীবর্দিও এই উদ্ধত বলীবর্দকে সামলাইতে পারিতেন না। যাহা হউক, যে অপরাধের গৌরবে অন্যান্য বাদশাহ-সুবাদারগণ শিরে তাজ ধারণ করিতেন, সেই অপরাধে নিতান্ত তরুণ বয়সে সিরাজকে শির দিতে হইল।

অতঃপর যুবক ক্লাইভের (১৭২৫-৭৪) কনিষ্ঠ অঙ্গুলি ধরিয়া বৃদ্ধ মীরজাফর বাংলার মসনদে আরোহণ করিলেন। নেশাখোর ঘৃণ্য জীব মীরজাফরকে তাঁহার জীবিতকালেই লোকে 'ক্লাইভের বুড়া গাধা' (Jack ass of Clive)

১০ Jean Law—*Memoire sur l' Empire Mogul* (হিল সাহেবের *Bengal in 1756-57*, Vol. III-তে ফরাসী হইতে অনূদিত)

বলিত! এই ঘৃণ্য ব্যক্তির মৃত্যুও হইয়াছিল ঘৃণ্য কুষ্ঠ ব্যাধিতে, গলিত কুষ্ঠে আক্রান্ত হইয়া বিশ্বাসঘাতক মীরজাফর পশুর মতোই মারা পড়িয়াছিলেন।

১৭৫৭ খ্রীঃ অব্দের ২৩শে জুন অপরাহ্ণে বাংলার স্বাধীন নবাববংশের পরাজয় হইল, ২রা জুলাই রাত্রে সিরাজ নিহত হইলেন। তারপর ইংরাজ যথার্থ ভক্ষক হইয়া বসিবার পূর্বে অঙ্গুলিসংকেতে নবাব নির্বাচন করিয়া তাঁহার হাত ধরিয়া সিংহাসনে বসাইয়াছে, আবার প্রয়োজন ফুরাইলে তাঁহার কান ধরিয়া নামাইয়াও দিয়াছে।

বাংলায় মধ্যযুগের অবসান হইল, মুসলমান শাসন শেষ হইল, স্বাধীন রাজবংশের বিনাশ হইল। আরম্ভ হইল নূতন ইতিহাস, নূতন জীবন, নূতন ঐতিহ্য। ক্লাইভের আক্রমণের পূর্ব হইতেই বাংলার মুসলমান শাসন ভাঙিয়া পড়িয়াছিল—চরিত্র, নীতি, মনুষ্যত্ব সবই ধূলায় গড়াগড়ি যাইতেছিল। তারপর বিদেশী সংস্কৃতির রূঢ় আঘাতে বাঙালীর, গোটা ভারতবর্ষেরই নির্মম জাগরণ হইল—পাশ্চাত্ত্য শিক্ষাদীক্ষা, জ্ঞানবিজ্ঞান ও নীতি-আদর্শ মধ্যযুগীয় ক্ষয়িষ্ণু জাতিকে আধুনিক জীবন-সমুদ্রের উপকূলে নিক্ষেপ করিল। সাহিত্য, সমাজ, ধর্ম, ঐতিহ্য—প্রত্যেকটি ক্ষেত্রে নবজীবন-জিজ্ঞাসা শুরু হইল। ঐতিহাসিকের এ মন্তব্য অতিশয় যুক্তিসঙ্গত—"In June, 1757, we crossed the frontier and entered into a great new world to which a strange destiny had led Bengal."[১১]

২

স মা জ ও সং স্কৃ তি

অর্থনৈতিক অবস্থা ॥

প্রথম উপচ্ছেদে আমরা রাজনৈতিক কাহিনীর বৃত্তবিবর্তন সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি, কিন্তু উহা তো শাসক বংশের জয়পরাজয়ের কাহিনী মাত্র। উহার সঙ্গে জনজীবনের—জনসাধারণের বহির্জীবন ও অন্তর্জীবনের কোন যোগাযোগ ছিল কিনা আলোচনা করিয়া দেখা যাক। অষ্টাদশ

১১ HOB, Vol. II p. 409

শতাব্দীর প্রথমার্ধের রাজনৈতিক ইতিহাস শাঠ্য-ষড়যন্ত্র ও নীচতায় পূর্ণ। জীবন ও সাহিত্যেও সেই উত্তাপ কখনও কখনও সঞ্চারিত হইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। এই অর্ধশতাব্দীতে বাঙালীর অর্থনৈতিক জীবন শোষণের ফলে বিশীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে, বিদেশী বণিক ও মুসলমান সুবাদার, দেওয়ান ও তাহাদের প্রসাদলোভী পরগাছার দল বাংলাকে নিঃসার করিয়া ফেলিয়াছে। আলীবর্দির আমল হইতে দেশের উপরে যুদ্ধবিগ্রহের অজস্র বন্যা বহিয়া গিয়াছে, বর্গীরা দেশ লুঠিয়া শ্মশান করিয়া দিয়াছে, বাংলা হইতে বহু ধনবত্ন স্বর্ণ-রৌপ্য মুদ্রা দিল্লীতে রাজস্ব, নজরানা, আবওয়াব প্রভৃতি নানা খাতে প্রেরিত হইয়াছে। বিলাসী, উচ্ছৃঙ্খল, দুর্নীতিপরায়ণ অভিজাত মুসলমান সমাজের হানিকর ঘৃণ্য আদর্শ জনসাধারণের চরিত্রবল হরণ করিয়াছে—সাহিত্যেও শুধু পুরাতনের বিশীর্ণ অনুকরণ চলিয়াছে। এই অর্ধ শতাব্দীতে যেন মৃত্যুর অন্ধকার গাঢতর হইয়া ঘেরিয়া ধরিয়াছে, আর সেই অন্ধকারে নির্নিমেষ সর্পচক্ষুর মতো ভারতচন্দ্রের আদিরসের ফেনতরঙ্গ জলিতেছে। বিলাসিতা ও বিভ্রান্তি, উজ্জ্বলতা ও বিবর্ণতা, ঐশ্বর্য ও দারিদ্র্য, বিদগ্ধ নাগরিকতা ও স্থূল ইতরতা—সমস্ত পরস্পরবিরোধী ব্যাপার আলো-অন্ধকারের মতো এই অর্ধশতাব্দীতে বাঙালীর মনে শঙ্কাসংশয়কেই ঘনীভূত করিয়া তুলিতেছিল।

মুর্শিদকুলি খাঁ হইতে আলীবর্দির শাসনকাল পর্যন্ত—শাসন ও রাজস্ব-বিভাগে মোটামুটি নিয়মানুগত্য ও শৃঙ্খলা বজায় ছিল। সেনাবাহিনীর সংখ্যা বাড়িয়াছিল, সেনাবিভাগ সুগঠিত হইয়াছিল। ভারতের নানাস্থান হইতে বলিষ্ঠ ব্যক্তিরা বাংলার নবাবের সেনাবাহিনীতে ভর্তি হইত, ফরাসী সৈন্যেরাও তন্‌খার বিনিময়ে নবাবের পক্ষ অবলম্বন করিয়া লড়াই করিত। রাজস্ব ও অর্থনৈতিক ব্যাপারে মুর্শিদকুলি খাঁ খুব বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে কর্নওয়ালিশ যে চিরস্থায়ী জমিদারী প্রথা কায়েম করেন, তাহার গঠনরীতি ও আদর্শও তিনি মুর্শিদের রাজস্ব ব্যবস্থা ও শাসনসংস্কার হইতেই গ্রহণ করিয়াছিলেন—যদিও মুর্শিদকুলির বিচক্ষণতার তুলনায় কর্নওয়ালিশের ব্যবস্থা নানা ত্রুটিপূর্ণ প্রমাণিত হইয়াছে।

মুর্শিদকুলি খাঁর পূর্বে সুবাদার মীরজুমলা বাংলার রাজস্ব সংগ্রহের যে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, কিছুকাল সে ব্যবস্থা মোটামুটি ভালোই চলিয়াছিল।

তারপর তাহাতে নানা গলদ প্রবেশ করিল। বিশেষতঃ জায়গীর প্রথার ফলে জায়গীরদার ও জমিদারেরা নবাব সরকারে কোন রাজস্ব দিত না, নিয়মিত সৈন্য-সাহায্যও করিত না। মুর্শিদকুলি দেওয়ানী লাভের পর রাজস্বের বিলিব্যবস্থা করিতে গিয়া জায়গীরদারী প্রথার কুফল প্রত্যক্ষ করেন। তখন তিনি জমিদারদের যাবতীয় জমি 'খাল্‌সা' জমি অর্থাৎ রাষ্ট্রের জমি বলিয়া ঘোষণা করিলেন। তৎপরিবর্তে জমিদারদের উড়িষ্যার অনুর্বর অঞ্চল দেওয়া হইল। ফলে জমির বড়ো অংশের রাজস্ব রাজকোষে জমা পড়িতে লাগিল, মাঝখান হইতে কোন জমিদার তাহার উপর ভাগ বসাইতে পারিলেন না। উপরন্তু মুর্শিদ সুষ্ঠুভাবে রাজস্ব সংগ্রহের জন্য ইজারাদার নিয়োগ করিলেন। তাহারা মোটা টাকা জমা রাখিয়া রাজস্ব সংগ্রহ করিত —এবং ইহার জন্য নিয়মিত বেতন পাইত। ইহারা আবার কৃষকদের অগ্রিম দাদন ('তাকাভি') ঋণস্বরূপ দিয়া জমিদারদের কৃষকের উপর প্রভাব আরও কমাইয়া দিল। মুর্শিদকুলি এবং তাঁহার জামাতা জমিদারদের নিকট প্রাপ্য রাজস্ব আদায়ের জন্য কোন কোন সময় নির্মম অত্যাচার করিতেন। জমিদার হিন্দু হইলে তাঁহাকে সপরিবারে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিতে বাধ্য করাও হইত। তাঁহার জামাতা সৈয়দ রাজি খাঁ একটা গর্ত খুঁড়িয়া তাহা মলমূত্রে পূর্ণ করিয়া রাখিতেন—হিন্দুর মনে আঘাত দিবার জন্য রঙ্গ করিয়া তাহার নাম দেওয়া হইয়াছিল 'বৈকুণ্ঠ'। যে হিন্দু জমিদার যথাসময়ে রাজস্ব দিতে পারিতেন না তাঁহাকে ঐ 'বৈকুণ্ঠে' ডুবাইয়া রাখা হইত।

রাজস্ব সংগ্রহ ও বিলিব্যবস্থা সম্পর্কে মুর্শিদকুলি মুসলমান কর্মচারীদের বিশ্বাস করিতেন না, ইজারাদারদের পদে এবং দেওয়ানী বিভাগে তিনি বাছিয়া বাছিয়া হিন্দু কর্মচারী নিয়োগ করিতেন। পরবর্তী কালে আলীবর্দিও এই নীতি অনুসরণ করিয়াছিলেন। কারণ মুসলমান কর্মচারীরা অনেক সময় আদায়ী রাজস্বের হিসাব দিতে পারিত না, কেহ-বা ইহার অনেকটা লোভে পড়িয়া হজম করিয়া ফেলিত। যাহা হউক জমিদার বংশের উপর ইজারাদারদের জোরজুলুমের ফলে অনেক পুরাতন সম্ভ্রান্ত সামন্তবংশ লুপ্ত হইয়া গেল, এবং ইজারাদারগণ বিত্ত সঞ্চয় করিয়া সেই সমস্ত জমিদারী কিনিয়া রাতারাতি 'হঠাৎ নবাব' হইয়া বসিল। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় হইতেই অভিজাত ভূস্বামীদের দ্রুত অপসরণ এবং তাঁহাদের শূন্য স্থানে বিত্তবান অথচ

শিক্ষাদীক্ষাহীন ইজারাদারেরা জমিদার হইয়া বসিল। পরবর্তী কালে জমিদার নামক যে সমস্ত রক্তশোষকের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাহাদের অধিকাংশই এই ইজারাদারদের বংশধর। নাটোর, দিঘাপতিয়া, নড়াইল, তাহিরপুর, পুঁটিয়া, ঘোড়াঘাট, মুক্তগাছা প্রভৃতির জমিদারগণ মূলতঃ ইজারাদার বা অন্য বিভাগের রাজকর্মচারী ছিলেন। প্রচুর বিত্ত সঞ্চয় করিয়া এবং মুর্শিদকুলি খাঁয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করিয়া ইঁহারা জমিদার হইয়া বসিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণ, বৈদ্য, কায়স্থ—এমন কি, মোদক সম্প্রদায়েরও কেহ কেহ জমিদারী ক্রয় করিয়াছিলেন। ইঁহারা সগর্বে 'রাজা' উপাধি ধারণ করিতেন, সুবাদারের নিকট হইতেও 'রায়-ই-রায়ান' (মুসলমানি 'খান-ই-খানান-'এর অনুকরণে) উপাধি লাভ করিতেন। উচ্চ বংশের যে সমস্ত হিন্দু কর্মচারী রাজস্ব বা সেনা বিভাগের দায়িত্বপূর্ণ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তাঁহারা পদ বা বৃত্তি হিসাবে সুবাদারের নিকট বখশি, সরকার, কানুনগো, শাহানা (সানা), চাকলাদার, তরফদার, মুন্সি, লস্কর প্রভৃতি উপাধি লাভ করিতেন এবং কৌলিক উপাধি ত্যাগ করিয়া নবাব-সুবাদার প্রদত্ত এই সমস্ত মুসলমানি উপাধি ব্যবহার করিতেন। এখনও তাঁহাদের বংশধরগণ এই উপাধি ব্যবহার করিয়া থাকেন।

মুর্শিদকুলি খাঁ বাংলাকে তেরটি প্রধান বিভাগে (চাকলা) এবং তেরটি উপবিভাগে বিভক্ত করিয়া জমিদারদের উপর প্রত্যেক উপবিভাগের রাজস্ব আদায়ের ভার দিয়াছিলেন। ধূর্ত দেওয়ান-সুবাদার কোন কোন ক্ষেত্রে অনাবাদী জমিকে আবাদী বলিয়া ধরিয়া উচ্চ হারে রাজস্ব ধরিতেন। মুর্শিদের পূর্বে বাংলার আদায়ী রাজস্বের মোট পরিমাণ ছিল এক কোটি ত্রিশ লক্ষ টাকা। সুবাদার নানাভাবে রাজস্ব বৃদ্ধি করিবার ফলে ইহার পরিমাণ দাঁড়াইল প্রায় দেড় কোটি টাকা—ইহাই 'জমা কামিল' বা মোট নির্ধারিত রাজস্ব। এই 'জমা কামিল' আদায়ের জন্য তিনি যে-কোন পন্থা গ্রহণে ইতস্ততঃ করিতেন না, কিন্তু প্রাপ্যের অতিরিক্ত দাবি করাও তাঁহার স্বভাব-বিরুদ্ধ ছিল। ফলে মুর্শিদকুলি খাঁ ও আলীবর্দির সময়ে নির্ধারিত রাজস্ব সংগ্রহের ব্যাপারে প্রজাদের উপর ততটা উৎপীড়ন হইত না। কিন্তু মুর্শিদ-কুলির জামাতা সুজাউদ্দিন সুবাদার হইয়া এই নিয়ম ততটা মানিয়া চলিতেন না। তিনি প্রতি বৎসর দিল্লীতে রাজস্ব বাবদ এককোটি পঁচিশ লক্ষ টাকা

পাঠাইতেন।[১২] কিন্তু তাঁহার সময়ে 'জমা কামিলে'র মোট পরিমাণ ছিল ১,৪২,৪৫,৫৬১ টাকা। ইহা হইতে একক্রোটি পঁচিশ লাখ দিল্লী চলিয়া গেলে তাঁহার সংসারযাত্রা ও নবাবীলীলা চলে কি করিয়া? তাই তিনি জমিদারের উপর নানা বাবদে অতিরিক্ত কর ('আবওয়াব') ধরিতেন। নজরানা, মোকররি, জর মাথুট, মাথুট পিলখানা, ফৌজদারি আবওয়াব প্রভৃতি বিভিন্ন খাতে ১৯,১৪,০৯৫ টাকা অতিরিক্ত রাজস্বরূপে সংগৃহীত হইত—ইহার সবটাই সুবাদার হজম করিয়া ফেলিতেন। কিন্তু সমস্ত চাপ পড়িত প্রজাদের উপর—জমিদারেরা প্রজাদের উপর দিয়া অতিরিক্ত 'আবওয়াবের' রথ চালাইয়া দিতেন—সুতরাং প্রজাদের অবস্থা সহজেই কল্পনা করিতে পারা যায়।

আলীবর্দি বর্গীর হাঙ্গামার সময় যুদ্ধব্যয় নির্বাহের জন্য জমিদারদের উপর ২২,২৫,৫৫৪ টাকা 'আবওয়াব' ধরিয়াছিলেন। ইংরাজ বণিকদেরও ভয় দেখাইয়া তিনি যুদ্ধ ব্যয় বাবদ সাড়ে তিনলাখ টাকা আদায় করেন। অন্যান্য বিদেশী বণিকদেরও তিনি রেহাই দেন নাই, তাহাদের নিকট হইতেও তিনি প্রায় পৌনে এক লাখ টাকা আদায় করিয়াছিলেন। অবশ্য এইজন্য তাঁহাকে দোষ দেওয়া যায় না। কারণ দেশের সাধারণ শত্রু বর্গী বিতাড়নের জন্য সকলেরই নবাবকে সাহায্য দান করা প্রয়োজন হইয়াছিল। অবশ্য তিনি জমিদারদের উপর উচ্চ হারে আবওয়াব ধরিলে হিন্দু জমিদারেরা নাকি তলে তলে তাঁহার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[১৩]

১২. বারো বৎসর সুজাউদ্দিন বাংলার সুবাদারী করিয়াছিলেন। তাহা হইলে তাঁহার শাসনকালে বাংলা হইতে মোট ১৪,৬২,৭৮,৫৩৮ টাকা দিল্লীর তোশাখানায় প্রেরিত হইয়া ছিল—দেশ কীভাবে নিঃস্ব হইতে বসিয়াছিল, ইহাই তাহার একটা স্থূল হিসাব।

১৩. ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে কর্নেল স্কট তাঁহার এক বন্ধুকে লেখেন, "Jentue (i. e. Hindoo) Rajahas and inhabitants were much disaffected to the Moor (i. e. Muhammedan) Government and secretly wished for a change and oppertunity of throwing off their tyrannical yoke." (Hill's *Bengal in 1556-57*, Vol. III. p. 328) সুতারং হিন্দু রাজ-কর্মচারী ও ভূস্বামীরা মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বোধ হয় গোপনে গোপনে একটু-আধটু ষড়যন্ত্রের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইংরাজেরা যে এই সময় সম্পন্ন হিন্দুর নিকট গোপনে নানা সাহায্য লাভ করিত তাহার প্রমাণ আছে। সিরাজ-বিতাড়িত ইংরাজ দুঃস্থ অবস্থায় ফলতায় নঙর ফেলিয়া অপেক্ষা করিতেছিল, তখন কলিকাতার রাজা

সপ্তদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে বাংলা দেশের অভ্যন্তরে ও উপকূলে বিদেশী বণিকদের বাণিজ্যাদি পুরাদমেই চলিতেছিল। প্রথম দিকে দিনেমার কোম্পানী চুঁচুড়া, কাশিমবাজার ও পাটনায় কুঠি স্থাপন করিয়া বেশ ফলাও কারবার ফাঁদিয়াছিল। ফরাসী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে নানা বিশৃঙ্খলার মধ্যে পড়িয়াছিল, কিন্তু অল্পকালের মধ্যেই দিল্লীর বাদশাহকে ৪০,০০০ টাকা এবং বাংলার সুবাদারকে ১০,০০০ টাকা দিয়া মাত্র ২½% শুল্কের বিনিময়ে চুটাইয়া বাণিজ্য করিতে লাগিল। অস্ট্রিয়ান অসটেণ্ড কোম্পানীও এই শতাব্দীর প্রথমভাগে দুই একস্থলে অস্ট্রিয়ান পতাকা তুলিয়া বেশ বাণিজ্য চালাইতেছিল। ঈর্ষাতুর ইংরাজ ও দিনেমার বণিকগণ হুগলীর ফৌজদারের সঙ্গে ষড়যন্ত্র করিয়া বেশ কিছু রৌপ্যচক্রের বিনিময়ে অসটেণ্ড কোম্পানীকে বাংলা হইতে বিতাড়িত করিয়া (১৭৩৩) নিজেরা মহানন্দে কারবার চালাইতে লাগিল। সুজাউদ্দিনের সময়ে ইংরাজ, ফরাসী, দিনেমার, জার্মান—এমন কি পোল্যাণ্ড ও সুইডেনের ব্যবসায়ীরাও বাংলা দেশে বাণিজ্য চালাইত। তবে ইংরাজ ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বাড়বাড়ন্ত একটু বেশীই হইয়াছিল। সুজাউদ্দিন সমস্ত বিদেশী বণিককেই নিজ কব্জার মধ্যে রাখিয়াছিলেন—যদিও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা গোপনে গোপনে নিজেদের নৌকায় কোম্পানীর নিশান তুলিয়া কোম্পানীর বকলমে নিজেরা বাণিজ্য চালাইত এবং নবাব সরকারের শুল্ক ফাঁকি

নবকৃষ্ণ বাহাদুর গোপনে তাঁহাদিগকে খাদ্যসামগ্রী যোগাইয়াছিলেন। সিরাজ কলিকাতা আক্রমণ করিলে নবাব চক্ষুর অন্তরালে বিপন্ন ইংরাজদের অর্থ ও খাদ্যাদি দিয়া সাহায্য করিয়াছিলেন কলিকাতার ধনকুবের গঙ্গারাম ঠাকুর ও নকুড়চন্দ্র সরকার। সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রকারী ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্মচারীরা যে সমস্ত হিন্দুর সঙ্গে গোপনে গোপনে সলা-পরামর্শ করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে গোবিন্দরাম, রঘুমিত্র, শোভারাম বসাক, শুকদেব মল্লিক, দয়ারাম বসু, হরিকৃষ্ণ ঠাকুর, দুর্গারাম দত্ত, চৈতন্য দাস, দুর্লভচরণ বসাক, চূড়ামণি বিশ্বাস, রাজারাম পালিত, নীলমণি চৌধুরী প্রভৃতি ভূস্বামী ও বণিকের নাম উল্লেখযোগ্য। পরবর্তী যুগেও দেখা যায়, সিতাব রায়, কল্যাণ সিংহ, মহারাজ বেণীবাহাদুর, রায় সাধুরাম—প্রভৃতি ধনী-ভূস্বামীরা মীরকাশিমের বিরুদ্ধে গোপনে গোপনে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে সাহায্য করিয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য: ডঃ কালীকিঙ্কর দত্ত প্রণীত *Studies in the History of Bengal Subah*. Vol. I.

দিত।[১৪] এই ব্যাপার লইয়া প্রত্যেক সুবাদার-দেওয়ান-ফৌজদারের সঙ্গেই ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিরোধ বাধিত।

এই সময়ে সাধারণ লোকের অবস্থা কেমন ছিল তাহা দেখা যাক। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বেই দেশীয় ব্যক্তিদের বাণিজ্যকেন্দ্রে ইংরাজ বণিকের প্রাধান্য স্থাপিত হইয়াছিল। পলাশীর যুদ্ধের অব্যবহিত পরে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী বাংলার যাবতীয় তন্তুজ দ্রব্য বাঙালী বণিকের হাত হইতে কাড়িয়া লইয়া নিজেরাই অন্যান্য প্রদেশে ও ভারতের বাহিরে রপ্তানি করিতে আরম্ভ করিল এবং কোম্পানী ধনস্ফীত হইতে লাগিল। সেই সময়ে দিল্লীর মুঘল বাদশাহ হৃতগৌরব হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাহার ফলে প্রদেশে প্রদেশে শুল্কের হারের অনেক তারতম্য হইত—তখন অর্থনৈতিক বিশৃঙ্খলাকে নিয়মানুগ করিবার মতো দেশে কোন শক্তিও ছিল না। কাজেই অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাঙালী বণিকের অবস্থা শোচনীয় হইয়া পড়িল। তখন সাধারণ লোকে টাকায় দশ-বারো সেরের অধিক চাউল সংগ্রহ করিতে পারিত না।[১৫]

১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কলিকাতায় জিনিসপত্রের একটা নির্দিষ্ট দাম বাঁধিয়া দিয়াছিল, যাহার ফলে সে সময়ে এই অঞ্চলে টাকায় ১মণ ৩২ সের মোটা চাউল মিলিত। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামার প্রতিক্রিয়ার ফলে এই নিয়ম ভাঙিয়া পড়িল। ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দে অতিবৃষ্টির ফলে বহু ধান চাউল হাজিয়া গেল, ফলে দারুণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিল—তাহার সঙ্গে আবার যোগ দিল বর্গীর উৎপাত। ফলে বাংলার অর্থনৈতিক কাঠামো সেই যে ভাঙিয়া পড়িল, পরবর্তী তিনশত বৎসরের মধ্যেও সে ভাঙা আর্থিক অবস্থা আর জোড়া লাগিল না। ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার একজন কুলি সারাদিন অমানুষিক পরিশ্রম করিয়া মাত্র দশ পয়সা উপার্জন

১৪. Verelest তাঁহার *View of Bengal*-এ এবিষয়ে স্পষ্টই বলিয়াছেন, "A trade was carried on without payment of duties, in the prosecution of which infinite oppresions were committed. English agents and gomostahs, not contented with injuring the people, trampled on the authority of Government, binding and punishing the Nabab's officers wherever they presumed to interfare." (ডঃ কালীকিঙ্কর দত্তের *Alivardi and His Times* হইতে উদ্ধৃত।)

১৫. ঐ

করিত। তখন কলিকাতায় এক মণ মোট চাউলের দাম ছিল দেড় টাকা। অবশ্য যে-সমস্ত দেশীয় লোক ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শ্বেতাঙ্গ কর্মচারীর বাড়ীতে চাকুরী করিত তাহাদের মাসিক বেতন একটু বেশী ছিল। সাহেবের খানসামারা অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে মাসে পাঁচটাকা মাহিনা পাইত। নাপিতে দাড়ি কামাইবার পারিশ্রমিক পাইত এক পয়সা। কলিকাতা শহরে বহু দিন কড়িতে লেনদেন চলিয়াছিল। কড়ির হিসাবে অনেক সময় গোলমাল হইত, গরীব মানুষেই তাহাতে সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হইত। অথচ সপ্তদশ, অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলার উৎপন্ন তন্তুজাত দ্রব্য, লোহা ঢালাই, কামান বন্দুকের কারখানা (বীরভূমে লোহা ঢালাইয়ের কারখানা ছিল) প্রভৃতি ছিল। শুনা যায়, তখন দেশে কৃত্রিম বরফও তৈয়ারি হইতে। কিন্তু বর্গীর হাঙ্গামা ও ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর স্বার্থপর নীতির ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে বাঙালীর শিল্পবাণিজ্য, কল কারখানা সব লোপ পাইয়া গিয়াছিল।[১৬]

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আর্থিক দুর্গতির চিত্র সমসাময়িক বাংলা সাহিত্য অল্পস্বল্প মিলিতেছে। রামেশ্বরের 'শিবায়নে' জামাইয়ের সঙ্গে সদ্য-বিবাহিতা কন্যাকে বিদায় দিবার সময় শাশুড়ী জামাতাকে অনুরোধ করিয়াছেন —"আঁঠু ঢাকি বস্ত্র দিহ পেট ভরি ভাত"। গ্রাসাচ্ছাদনের নিম্নতম অধিকারও মধ্যবিত্ত সমাজে ক্রমে ক্রমে হারাইয়া যাইতেছিল। ভারতচন্দ্রের হরি হোড়ের দারিদ্র্যের বর্ণনা কথার কথা নহে, বা প্রথাপালনের গতানুগতিকতাও নহে। রায়গুণাকরের ঈশ্বরী পাটুনী অন্নদার কাছে শুধু পুত্রদের জন্য দুধভাত প্রার্থনা করিয়াছিল, সোনাদানা রাজৈশ্বর্য নহে—"আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে"। রামানন্দ ঘোষ নিজের ব্যর্থ জীবনের নিদারুণ দারিদ্র্যের কথাও সক্ষোভে বর্ণনা করিয়াছেন :

> ধনীতে বাঞ্ছয়ে ধন জলে বাঞ্ছে জল।
> নাহি মিলে কাঙ্গালের কড়ার সম্বল॥
>
> ক্ষুধায় না মেলে অন্ন পিয়াসে না পানী।
> মিথ্যা ধন্ধে গেল মোর দিবস-রজনী॥

এ সমস্ত উক্তি একযুগের নিঃসার অর্থনৈতিক অবস্থার কথাই স্মরণ করাইয়া

১৬. Dr. K. K. Datta—*Studies in the History of Bengal Subah*, vol. I

দিতেছে। এই যুগে প্রাপ্ত চিঠি পত্রাদিতেও[১৭] জনসাধারণের নিদারুণ দারিদ্র্যের মসীলাঞ্ছিত চিত্র ফুটিয়া উঠিয়াছে। শুধু প্রাণধারণের জন্য কেহ কেহ ধনীর নিকট সপরিবারে আত্মবিক্রয় করিতেছে, দুই-চারি টাকার বিনিময়ে স্ত্রীপুত্র বেচিয়া দিতেছে—এসমস্ত ঘটনা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধেই শুরু হইয়া গিয়াছিল।

সমাজ ও সংস্কৃতি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর বাঙালী সমাজের মধ্যে বিশেষ কোন নূতনত্ব বা বৈচিত্র্য দৃষ্টিগোচর হইতেছে না। ইতিপূর্বে অর্থনৈতিক তথ্য আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, মুঘলশাসনের শেষভাগে বাংলার স্বাধীন নবাবী আমলে অর্থনৈতিক শোষণের ফলে বাংলার সাধারণ সমাজ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়াছিল। হিন্দু ও মুসলমান—উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যেই এই ব্যাপার দেখা দিল। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় হইতেই বাংলার পুরাতন জমিদার বংশ ও সামন্তশ্রেণীর বিলোপ হইতে লাগিল, এবং ইজারাদার ও আমিনগণ জমিদার হইয়া বসিল। প্রাচীন ভূস্বামী বংশ একদা সমাজের কেন্দ্র স্থলে বিরাজ করিত। ইহারা গোব্রাহ্মণের সেবা করিয়া এবং মোটামুটি বর্ণাশ্রম সমাজের শ্রেণীবিন্যাসের সংরক্ষক হইয়া শিক্ষা সংস্কৃতিরও কর্ণধার হইয়াছিলেন। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে তাঁহারা অকস্মাৎ গৌরবচ্যুত হইলে দেশের সামাজিক ভারকেন্দ্রও ভাঙিয়া পড়িল। অবশ্য তখনও বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, ত্রিপুরা প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্তগণ নিজ নিজ আঞ্চলিক প্রাধান্য অনেকটা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহারা বাংলা সাহিত্য ও সংস্কৃতি পোষণে যথাসম্ভব সাহায্য করিয়াছিলেন। কৃষ্ণনগর ও কুচবিহাররাজ এ বিষয়ে বিশেষ গৌরব দাবি করিতে পারেন। কারণ তাঁহাদের সভায় ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত ও কবি-সাহিত্যিকের বিশেষ গৌরব ছিল।[১৭ক] সংস্কৃত

১৭. বাংলা পত্রসঙ্কলন—ডঃ সুরেন্দ্রনাথ সেন সম্পাদিত

১৭ক. দ্বিজ ভবানী রামায়ণ অনুবাদের জন্য নোয়াখালির জমিদারের নিকট দৈনিক দশ টাকা হিসাবে পারিশ্রমিক পাইতেন ('দিনে দিনে দশমুদ্রা দান')। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রও নদীয়ার স্মার্তপণ্ডিত, নৈয়ায়িক ও জ্যোতিষশাস্ত্রবিদ পণ্ডিতদের খুব সম্মান করিতেন। টোল-চতুষ্পাঠীর ব্যয় নির্বাহের জন্যও তিনি বিশেষ বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। (*Calcutta Review*, 1872)

ও বাংলা গ্রন্থ রচনার সঙ্গে তাঁহাদের নামও ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে। কিন্তু অপেক্ষাকৃত অল্প প্রতিপত্তিশালী জমিদারগণ (যাঁহারা পূর্বে নবাব সরকারে কর্ম করিতেন) এ বিষয়ে একেবারেই উদাসীন ছিলেন। ফলে সামাজিক বন্ধন ও সংস্কৃতির স্বাভাবিক বিকাশ যে বিশেষ ভাবে খর্ব হইয়া পড়িয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই।

হিন্দু সমাজে একটা নূতন পরিবর্তন এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। মুর্শিদকুলি খাঁয়ের সময় হইতে রাজসরকারে, বিশেষতঃ রাজস্ববিভাগে হিন্দুকর্মচারীর সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। আলীবর্দিও শাসনব্যাপারে কোনও প্রকার ধর্মীয় গোঁড়ামির প্রশ্রয় দিতেন না—যদিও তাঁহারা নিষ্ঠাবান মুসলমান ছিলেন। তাঁহাদের কেহ কেহ হিন্দুর উৎসবেও যোগ দিতে কুণ্ঠিত হইতেন না, বিশেষতঃ দোললীলার সময় মুসলমান নবাব ও ওমরাহের দল হারেমে আবীর-গুলাল লইয়া এবং পিচকারিতে রঙিন গুলাবজল ভরিয়া আওরত-বাহিনীর সঙ্গে রঙ ও রসের যুদ্ধে মাতিয়া উঠিতেন। শুনা যায় সাহামৎ জঙ্গ ও সৌলৎ জঙ্গ মুর্শিদাবাদের মতিঝিলের বাগানে সাতদিন ধরিয়া হোলি খেলিতেন। সিরাজও আলিনগরের (কলিকাতা) সন্ধির পর মুর্শিদাবাদে ফিরিয়া হোলি উৎসবে সানন্দে যোগ দিয়াছিলেন। মীরজাফরও পাটনায় থাকার সময় হোলিতে যোগ দিতেন। কুষ্ঠব্যাধির আক্রমণে মীরজাফর যখন মৃত্যুর পথে চলিয়াছিলেন তখন মহারাজ নন্দকুমার কিরীটেশ্বরী দেবীর (বরনগর) চরণামৃত পান করাইয়া রোগীকে চাঙ্গা করিয়া তুলিবার চেষ্টা করেন—তবে এ মুষ্টিযোগ বিশেষ কাজ দেয় নাই।

হিন্দুরাও মুসলমান পীর-ফকিরকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিত, সত্যপীরকে সত্যনারায়ণ বলিয়া শীর্নি দিত। কোরানকেও হিন্দুরা নিজেদের ধর্মগ্রন্থের মতো শ্রদ্ধা করিত। ক্ষমানন্দের মনসামঙ্গলের কোন কোন পুঁথিতে আছে যে, লোহার বাসরঘরে লখিন্দরকে সর্পাঘাত হইতে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দুর ধর্মগ্রন্থের সঙ্গে একখানি কোরানও রক্ষিত হইয়াছিল। সমসের গাজীর পুঁথিতে আছে, হিন্দুর দেবী তাঁহাকে স্বপ্নে প্রত্যাদেশ দিয়াছিলেন। গাজীও দেবীকে ব্রাহ্মণের দ্বারা হিন্দুর রীতি অনুসারে ভক্তিভরে পূজা করিয়াছিলেন।

সে যুগের মুসলমান অভিজাত সমাজে হিন্দুর জ্যোতিষ শাস্ত্রের বিশেষ

প্রভাব ছিল। সরফরাজ ও আলীবর্দি যুদ্ধযাত্রা বা কোন শুভকার্যের পূর্বে হিন্দু জ্যোতিষীকে আনাইয়া ভবিষ্যৎ গণাইয়া লইতেন, মীরকাসিম নিজেও হিন্দু পণ্ডিত রাখিয়া জ্যোতিষবিদ্যা শিখিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর অনেক মুসলমান কবি ইসলামি কাব্য রচনার প্রারম্ভে হিন্দুর দেবদেবীরও বন্দনা গাহিয়াছেন। তেমনি আবার মহরম উৎসবে হিন্দুরাও যোগ দিত। ভারতের অন্যান্য প্রদেশেও কোন কোন ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের সামাজিক ও ধর্মীয় উদারতা লক্ষ্য করা যায়। দৌলত রাও সিন্ধিয়া মহরম উৎসবে মুসলমান প্রজাদের মতো সবুজ পোষাক পরিধান করিয়া ঐ উৎসবে নিষ্ঠা সহকারে যোগ দিতেন।[১৮] দিল্লী দরবারের আনুকূল্যে দুর্গোৎসব হইত—এরূপ জনশ্রুতিও প্রচলিত আছে।[১৯] হ্যামিল্টন বুকানন উনবিংশ শতাব্দীতেও দেখিয়াছিলেন যে, ভাগলপুর অঞ্চলে হিন্দুমুসলমানে মিলিয়া মহরম উৎসব করিত।[২০]

এই সময়ে ধীরে ধীরে কলিকাতা জাঁকিয়া উঠিতেছিল। ঢাকা হইতে রাজধানী মুর্শিদাবাদে স্থানান্তরিত হইলে শাসনকেন্দ্র, সভাজীবী নাগরিকতা ও ব্যবসাবাণিজ্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে এই অঞ্চলেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। ক্রমে হুগলী-চুঁচুড়া-শ্রীরামপুর হইতে ভাগীরথীর দুই তীর ধরিয়া সুতানুটী-কলিকাতা-গোবিন্দপুর পর্যন্ত অঞ্চল ধীরে ধীরে ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রে পরিণত হইল, সভ্যতা-সংস্কৃতিও এইদিকে সরিয়া আসিতে লাগিল। মুসলমান আমীর-ওমরাহ, পদস্থ হিন্দু রাজকর্মচারী ও বণিক —সকলেরই দৃষ্টি গাঙ্গেয় ভূমিখণ্ডের দিকে আকৃষ্ট হইল—উপরন্তু পুরাতন জমিদার বংশ অনেক ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে নিষ্কর জমি দান করিয়া বাঙালী হিন্দু সংস্কৃতিকেও এই অঞ্চলে সুদৃঢ় করিয়া তুলিয়াছিল। ফলে পশ্চিমবঙ্গে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়া হইতেই ব্যবসাবাণিজ্য ও শিক্ষা-দীক্ষা-সাহিত্যের প্রাধান্য স্থাপিত হইল। সেই প্রাধান্যের মধ্যমণি হইল জলজঙ্গল পরিবেষ্টিত সুতানুটী-গোবিন্দপুর-কলিকাতা নামক তিন খানি তুচ্ছ গ্রাম।

সপ্তদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেই কলিকাতা নগরী অতি দ্রুতবেগে

১৮. Dr. S. N. Sen—*Administrative System of the Marathas*, p. 401

১৯. *Bengal Past and Present*, 1932 (আবদুল আলীর প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)

২০. K. K. Datta—*Alivardi and His Times*, p. 259, 260

নাগরিক জীবনকে গ্রহণ করিয়া ক্রমেই প্রাধান্য লাভ করিতেছিল। মুর্শিদাবাদ হুগলী প্রভৃতি অঞ্চল শাসনকেন্দ্র ও বাণিজ্যকেন্দ্র হইলেও মুসলমান সুবাদার-ফৌজদার-দেওয়ানের খামখেয়াল ও লোভ-লালসা হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিন্দু-মুসলমান-আরমানি বণিকের দল স্ত্রী-পুত্রাদি সহ ইংরাজের নিরাপদ আশ্রয়ে আসিয়া বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হইল। ১৭১৭ খ্রীঃ অব্দে বাদশাহ ফারুক-শায়ার ইংরাজ বণিককে সামান্য শুল্কের বিনিময়ে এদেশে নির্ভয়ে বাণিজ্য করিবার অধিকার দিলে ইংরাজের ব্যবসাবাণিজ্য দ্রুতবেগে বাড়িতে লাগিল। ইতিমধ্যে ইংরাজ বণিক কলিকাতার দক্ষিণে ৩৮টা গ্রাম ইজারা লইতে চাহিলে বাংলার নবাবের বাধাদানের ফলে তাহা আর সম্ভব হইল না। ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতা মাদ্রাজের আওতা হইতে মুক্তি পাইয়া স্বাধীন ভাবে বিকাশের সুযোগ পাইল, ক্রমে ক্রমে কলিকাতার লোকসংখ্যাও বাড়িতে লাগিল। ১৭০৪ খ্রীঃ অব্দে কলিকাতার লোকসংখ্যা ছিল ১৫,০০০ ; কিন্তু অর্ধ শতাব্দীর মধ্যে (১৭৫০) ইহা এক লক্ষে পরিণত হইল।

বহুজনের যাতায়াতের ফলে হুগলী যেমন বন্দর হিসাবে ব্যবসার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, তেমনি ইহা সিয়া সম্প্রদায়ের কেন্দ্ররূপেও পরিচিত হইয়াছিল। ইরান হইতে সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত মুসলমান বণিক, শিল্পী, হেকিম এবং শিল্পী-সাহিত্যিকেরা বাংলা দেশকে আশ্রয়স্থল মনে করিয়া দলে দলে এখানে আসিয়া বসবাস করিতে লাগিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতেই বাংলায় ইরানি সিয়া মুসলমানের যাতায়াত বাড়িয়া গিয়াছিল। কারণ ইরানে আফগান আধিপত্যের ফলে সিয়াগণ বাধ্য হইয়াই নিরাপদ বাসস্থানের আশায় মুর্শিদাবাদ ও হুগলী অঞ্চলে স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন। কারণ তখন বাংলার মসনদে সিয়াবংশই আসীন। সিয়াসম্প্রদায়ভুক্ত প্রসিদ্ধ ফারসী ঐতিহাসিক আবুল হাসান গুলিস্তানি ১৭৫৬ খ্রীঃ অব্দের দিকে আশ্রয়প্রার্থীরূপে বাংলায় আসিয়া বসবাস করিয়াছিলেন। এইরূপে পশ্চিমবঙ্গে সিয়া আভিজাত্য বেশ দৃঢ়মূল হইয়াছিল।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে হিন্দু ও মুসলমান সমাজে শিক্ষাদীক্ষা কী অবস্থায় ছিল তাহা আলোচনা করা যাইতে পারে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন জমিদার বংশের স্থলে ইজারাদারগণ জমিদার বনিয়া গেলেও তখন

দেশের মধ্যে প্রাচীন ঐতিহ্যবিশিষ্ট কিছু কিছু সামন্তশ্রেণীর ভূস্বামিসম্প্রদায় ছিল। কৃষ্ণনগর, কুচবিহার, বর্ধমান প্রভৃতি অঞ্চলের সামন্ত ও জমিদারগণ টোলচতুষ্পাঠীর ব্যয়ভার বহন করিতেন, ব্রাহ্মণপণ্ডিতকে বৃত্তি ও নিষ্কর জমি দিয়া মোটামুটি প্রাথমিক ও উচ্চ সংস্কৃত শিক্ষার ধারা বজায় রাখিতে পারিয়াছিলেন। বিশেষতঃ কৃষ্ণনগরাধিপ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় বহু পণ্ডিত ও কবি শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। নৈয়ায়িক ও অন্যান্য শাস্ত্রাধিকারীরা মহারাজের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিতেন। ফলে কৃষ্ণনগরের চারিপাশে সংস্কৃত স্মৃতি-মীমাংসা-ন্যায়শাস্ত্র চর্চার নানা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর হইতে মনে হয়, পণ্ডিত ও শিক্ষিত সমাজে ব্যাকরণ, ভট্টিকাব্য, রঘুবংশ, কুমারসম্ভব, অলঙ্কার শাস্ত্র এবং ষড়দর্শনের কোন কোন শাখার (বিশেষতঃ বেদান্ত) বেশ চর্চা ছিল। শুনা যায় মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র আশীজন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিতকে প্রতিপালন করিতেন, তিনি নিজেও ন্যায়শাস্ত্রে বেশ অভিজ্ঞ ছিলেন। তাঁহার সভাপণ্ডিত প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, গোপাল ন্যায়ালঙ্কার, রামানন্দ বাচস্পতি, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, বীরেশ্বর ন্যায়পঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিতদের সঙ্গে তিনি আলোচনায় অংশ গ্রহণ করিতেন। বিখ্যাত জ্যোতিষবিশারদ রামরুদ্র বিদ্যানিধি তাঁহার রাজসভায় অবস্থান করিয়া 'সারসংগ্রহ' রচনা করেন।[২১]

মুঘলযুগে রাজকার্যাদি সমস্তই ফারসী ভাষায় চলিত বলিয়া হিন্দু রাজকর্মচারী ও কর্মপ্রার্থীরা বেশ মনোযোগ দিয়া ফারসী ভাষা শিখিতেন—বিশেষতঃ কায়স্থ সম্প্রদায়। ভারতচন্দ্র রামচন্দ্র মুন্সীর নিকট ফারসী ভাষা শিখিয়াছিলেন ভবিষ্যতে রাজকর্মচারী হইবার জন্য। তিনি হিন্দীভাষাও ভালো জানিতেন। নরসিংহ বসু নামক অষ্টাদশ শতাব্দীর এক কবি উত্তমরূপে ফারসী ভাষা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেববাহাদুর প্রথম জীবনে হেস্টিংসকে ফারসী শিখাইতেন। আলিবর্দির আমলে তাঁহার অনেক হিন্দু কর্মচারী ফারসীনবিশ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাঁহার এক কর্মচারী কিরীটচাঁদ ফারসী ব্যাকরণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন—রাজা রামনারায়ণ ফারসীতে কবিতা রচনা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন।

আলীবর্দির সময়ে সরকারীভাবে মুসলমান সমাজের জন্য প্রাথমিক ও

২১. ক্ষিতীশবংশাবলী চরিত, পৃ. ৪৯

উচ্চতর শিক্ষার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল। আজিমাবাদ (পাটনা) কিছু পূর্ব হইতেই ফারসী শিক্ষা ও ইসলামি তমদ্দুনের কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল। বাংলা দেশেও শিক্ষিত ও অভিজাত মুসলমান সমাজে ফারসী কিস্‌সা-সাহিত্য, হেকিমী ও জ্যোতির্বিদ্যার বেশ চলন ছিল। মসজিদ বা ইমামবাড়ায় সরকারী ব্যয়ে ইসলামি শাস্ত্রজ্ঞ মুসলমান উলেমা প্রতিপালিত হইতেন, প্রাথমিক শিক্ষার জন্য মক্তবও প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। কিন্তু সুশাসক আলিবর্দির সময়েও বিশাল হিন্দুসমাজের শিক্ষার জন্য রাজকোষ হইতে এক কপর্দকও ব্যয় করা হয় নাই। হিন্দু জমিদারগণ হিন্দুসমাজের শিক্ষার জন্য টোলচতুষ্পাঠীতে যে সাহায্য করিতেন তাহাই ছিল হিন্দুসমাজের শিক্ষাব একমাত্র উপায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি কলিকাতা অঞ্চলে ইংরাজ বণিকদের সংস্পর্শে আসিয়া বাঙালীরা. বিশেষতঃ বাঙালী হিন্দুরা কাজকর্ম চালাইবার জন্য অল্পস্বল্প ইংরাজী শিখিবার চেষ্টা করিতেছিল। ১৭৫৪ খ্রীঃ অব্দে মেপল্ লফ্‌ট্ (Maple Loft) নামক এক মিসনারী সাহেবের ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকে লিখিত এক আবেদনপত্র হইতে দেখা যাইতেছে, এই সময়ে কলিকাতার স্থানীয় দেশীয় ব্যক্তিদের কেহ কেহ ইংরাজী শিখিতে আরম্ভ করিয়াছিল। দ্বিতীয় শাহ্ আলম ১৭৬৬ খ্রীঃ অব্দে ইৎসামুদ্দিন নামক নিজ পক্ষীয় এক উকিলকে পার্লামেন্টে তাঁহার হইয়া ওকালতি করিবাব জন্য বিলাত পাঠাইয়াছিলেন। ইৎসামুদ্দিন নিশ্চয়ই বেশ ভালো কবিয়া ইংরাজী ভাষা শিখিয়াছিলেন। তাহা না হইলে শাহ্ আলম তাঁহাকে বিলাত পাঠাইবেন কেন?

তখন বাংলা দেশে কোন কোন ক্ষেত্রে দাসব্যবসায়ের প্রচলন ছিল। ১৭২৯-৩০ খ্রীঃ অব্দের দিকে হাটেবাজারে দশ-এগাবো বৎসরের বালিকা রীতিমতো ক্রয়বিক্রয় হইত। দারুণ দারিদ্র্যের জন্য অনেকে শুধু খোরপোষের বিনিময়ে সপরিবারে আত্মবিক্রয় করিত, তাহা আমরা পূর্বে দেখিয়াছি। এইরূপ ক্রয়বিক্রয় হিন্দুসমাজেও প্রচলিত ছিল এবং উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকেও এরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পূর্ববঙ্গে আবার তৈজসপত্রাদির মতো দাসদাসীও হস্তান্তরিত হইত। কলিকাতায় ৫০০৲ টাকায় কাফ্রী দাস কিনিতে পাওয়া যাইত। এইরূপ ক্রয়বিক্রয়ের ব্যাপারে বিদেশী

বণিকেরাই বেশী তৎপর ছিল। তাহারা দাসদাসীর প্রতি অমানুষিক অত্যাচার করিত। ফলে অনেক ক্রীতদাস নির্যাতন সহ্য করিতে না পারিয়া পলাইয়া যাইত। শ্বেতাঙ্গ প্রভু পলাতক ক্রীতদাসকে ধরিতে পারিলে যে কিরূপ নিগ্রহ করিত তাহা সহজেই অনুমেয়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর এই পটভূমিকায় বাংলা সাহিত্যের কিরূপ বিকাশ হইয়াছিল তাহা পরবর্তী অধ্যায় আলোচনা করিয়া দেখা যাক।

দ্বিতীয় অধ্যায়

পুরাতন ধারার অনুবৃত্তি

মঙ্গলকাব্য, অনুবাদ সাহিত্য, বৈষ্ণব সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতে মধ্যভাগ পর্যন্ত প্রায় অর্ধশতাব্দী ধরিয়া বাংলাদেশের নগর-জনপদের উপর দিয়া কিরূপ অরাজকতা ও কুশাসনের ঘূর্ণিবায়ু বহিয়া গিয়াছিল তাহা আমরা পূর্ব অধ্যায়ে আলোচনা করিয়াছি। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে মুসলমান রাজশক্তির অবসান হইবার পর পাশ্চাত্ত্য শাসন এদেশে বদ্ধমূল হইবার পূর্ব পর্যন্ত জাতীয় জীবনে বিশেষ কোনরূপ পরিবর্তন দেখা যায় নাই। পর্যুসিত জীবনের ক্লিন্ন তণ্ডুলকণা খুঁটিয়া লইবার জন্য যেন ভিখারীসঙ্ঘের কাড়াকাড়ি পড়িয়া গিয়াছিল। অর্থনৈতিক রক্তহীনতা, শাঠ্য-ষড়যন্ত্রের পূতিগন্ধ এবং চারিত্রভ্রষ্টতার ধূমাঙ্কিত কালিমা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের বাঙালী জীবন ও সমাজকে মসীলাঞ্ছিত বিবর্ণতায় দুর্নিরীক্ষ্য করিয়া তুলিয়াছিল। সেই হীনতার পঙ্কগ্লানি এই অর্ধশতাব্দীর সাহিত্যেও সঞ্চারিত হইয়াছিল—তাহা এই যুগের ভূরি-পরিমাণ পুঁথিপত্রের সন্ধান লইলেই দেখা যাইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতী, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ ও এশিয়াটিক সোসাইটিতে সংরক্ষিত পুঁথিসমূহের মধ্যে অনেকগুলিই অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত, কোন কোনখানি আবার প্রাচীন পুঁথির অর্বাচীন নকল। প্রায় সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়াই পুঁথির প্রতাপ প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। কিন্তু শতাব্দী শেষে প্রত্যূষ দিগন্তে আলোক-রেখার মতো কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া মুদ্রাযন্ত্রের আবির্ভাব হইল, হরিদ্রাভ তুলোট কাগজ আর তালপত্রে সেহাই কালির ভ্রমরকৃষ্ণ অক্ষরপংক্তির আয়ুষ্কাল শেষ হইয়া আসিল, ছাপাখানা হইতে কালিঝুলি মাখিয়া ইস্তাহার, বিজ্ঞাপন, আইনের তর্জমা, ইংরেজী ব্যাকরণ-অভিধান-শব্দকোষ প্রভৃতি নিত্যপ্রয়োজনীয় ব্যাপার রাশি রাশি প্রকাশিত হইতে লাগিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতেও হাতেলেখা পুঁথির রেওয়াজ লোপ পায় নাই—পুরাতন সাহিত্য-ধারা তখনও গ্রামে গ্রামান্তরে, চণ্ডীমণ্ডপে, দেবমন্দিরে, গোশালায় মুখ লুকাইয়া কিছুদিন আত্মরক্ষা করিয়াছিল। এই প্রসঙ্গে ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল

মহাশয়ের পুঁথি-সংক্রান্ত মন্তব্য উল্লেখযোগ্য। তাঁহার মতে, "দেশের লোকে দেশের সাহিত্য, হাতেলেখা পুঁথিপত্রাদির কথা ভুলিতে লাগিল। ভুলিতে লাগিল বিশেষ করিয়া দেশের আলোকপ্রাপ্ত উচ্চতর সম্প্রদায়ের সকলে। পুঁথি খুলিতে লাগিল মাত্র বাড়ির ইংরেজি-না-জানা মেয়েরা আর নিম্নবর্ণের লোকেরা। পাঁচালীর বদনামে দেশের কাব্য, সঙ্গীত, চিকিৎসা, জ্যোতিষ গ্রন্থরাজি একেবারে উপেক্ষিত হইয়া পড়িল পাশ্চাত্য-সংস্কৃতিমুগ্ধ শিক্ষিত ব্যক্তিদের নিকট।"[১]

ডঃ মণ্ডলের এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, পুঁথিসাহিত্য আধুনিক শিক্ষিতমহলে অপ্রচলিত হইবার কারণ, ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বাংলাদেশে, বিশেষতঃ শহরে নগরে যে-ধরনের শিক্ষা-সংস্কৃতি-সাহিত্য প্রাধান্য পাইতেছিল, তাহাতে পুরাতন ধরনের পুঁথি-আশ্রয়ী কাব্যাদি পাঠক সমাজে আদরণীয় হওয়া সম্ভব ছিল না। মধ্যযুগের বিপুল-কলেবর পুঁথিসাহিত্য যদি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও বাঙালীর কাব্যপ্রচেষ্টার দিক নির্ণয় করিত, তাহা হইলে, যে বাংলা সাহিত্য লইয়া আমরা বিশ্বসভায় গৌরব করি, তাহার আবির্ভাবে বহু বিলম্ব হইয়া যাইত। ঐতিহাসিক কারণেই মধ্যযুগের সমাপ্তি হইয়াছে, তাহার সঙ্গে ঐ যুগের সংস্কারও বিলুপ্ত বা নিষ্প্রভ হইয়া গিয়াছে। এখনও যে মনসা-চণ্ডী, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত সত্যপীর-কালুরায়-দক্ষিণরায়ের পাঁচালী নূতন করিয়া রচিত হয় না, তাহার কারণ আধুনিকতার ভাবপ্রবাহে মধ্যযুগীয় সংস্কার ভাসিয়া গিয়াছে— তাহাতে কিছু কিছু ক্ষতিও হইয়াছে। জাতির মধ্যযুগীয় জীবন ও মানস নির্ণয়ের অনেক উপাদানের বিনাশ দেশের ইতিহাসকে খণ্ডিত করিয়াছে। অবশ্য এখনও গ্রামাঞ্চলে প্রাচীনপন্থী সমাজে পুরাতন কাব্যধারা যৎকিঞ্চিৎ অনুশীলিত হয়। সুপ্রসিদ্ধ 'বঙ্গীয় শব্দকোষ' সঙ্কলক পণ্ডিত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ও ১৩০৩ সালে পুরাতন পুঁথির আদর্শে 'সত্যনারায়ণ লীলা' রচনা করিয়াছিলেন।[২]

১. বিশ্বভারতী প্রকাশিত 'পুঁথি পরিচয়', ১ম খণ্ড পৃ. ১০

২. দ্রষ্টব্য: পুঁথি পরিচয়, ১ম, পরিশিষ্ট, পৃ ২০৯। এই কাব্যে হরিচরণ পুরাতন ধরনের ভণিতাও দিয়াছিলেন। যথা—

শ্রীহরির পাদপদ্ম হৃৎপদ্মে ধরি।
সত্যনারায়ণ লীলা রচে দ্বিজ হরি।

যাহা হউক এদেশে ইংরাজী শাসন, শিক্ষা, বিচারকার্য দৃঢ়মূল হইল, কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া আধুনিক নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইল, জলা-বুজাইয়া, ঝোপজঙ্গল সাফ করিয়া ইংরাজ নির্মাণ করিল নবসভ্যতার পাদপীঠ কলিকাতা নগরী। প্রাসাদশীর্ষে বৈশ্যসভ্যতার মাণিক ধারণ করিয়া এই কলিতীর্থ নব অভিনয়ের জন্য রঙ্গসজ্জা প্রস্তুত করিতে লাগিল। অন্ধকার মুখ লুকাইল, গ্যাসের বাতি জলিয়া নৈশ কলিকাতার পথঘাট নিষ্প্রভ আলোকে ভরিয়া দিল—মুদ্রণের যুগ আরম্ভ হইল, সাধারণ মানুষের জ্ঞানান্ধকার ক্রমে ক্রমে অপসারিত হইতে লাগিল। বস্তুতঃ বাংলাদেশে মুদ্রাযন্ত্রই নব-সংস্কৃতির দ্বার মোচন করিয়া দিল। ইংরাজ আগমনের ফলে মধ্যযুগীয় জীবন ও আদর্শ ভাঙিয়াছে বটে, তেমনি আবার অপর দিকে বৃহৎ জীবনের ঐশ্বর্যও নানা বাধা-বিপত্তির মধ্য দিয়া সমগ্র জাতিকেও লাভবান করিয়াছে। অবশ্য মুদ্রণযুগেও যে প্রচুর পুঁথি নকল হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। তাহার কিছু পূর্বে অষ্টাদশ শতাব্দীতে প্রাচীন পুঁথির অসংখ্য নকলের সঙ্গে কিছু কিছু মৌলিক কাব্যও রচিত হইয়াছিল। অবশ্য রামেশ্বর, ঘনরাম, ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কয়েকজন শাক্ত পদকার, বাউল কবি এবং পূর্ববঙ্গীয় পালা-গায়কদের কিছু কিছু রচনা বাদ দিলে এই যুগে মৌলিকতা ও সাহিত্য-গুণান্বিত রচনা অতি অল্পই পাওয়া যায়। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে দুই চারিজন কবি পরিমিত ক্ষেত্রে যৎকিঞ্চিৎ প্রতিভাচিহ্ন রাখিয়া গিয়াছেন। কিন্তু দ্বিতীয়ার্ধে সেরূপ কোন দৃষ্টান্ত পাঠকসমাজে উপস্থাপিত করা যায় না। রাত্রি প্রভাতের পূর্বেই অন্ধকার গাঢ়তম ; ঊনবিংশ শতাব্দীর অব্যবহিত পূর্ববর্তী অর্ধশতাব্দীই বন্ধ্যাতম। বর্তমান প্রসঙ্গে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের সাহিত্য বিশেষভাবে এবং দ্বিতীয়ার্ধ সম্বন্ধে সাধারণভাবে যৎকিঞ্চিৎ আলোচনা করিব।

১

ম ঙ্গ ল কা ব্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে রচিত মঙ্গলকাব্যের[৩] গুণগত উৎকর্ষ যেরূপই হউক না কেন, সংখ্যার দিক দিয়াই এই শাখাটি যে নিতান্ত ক্ষীণকায় ছিল তাহা

৩ মঙ্গলকাব্যের ধারা ও প্রকরণ সম্বন্ধে 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত'-এর দ্বিতীয় খণ্ডে সবিস্তারে আলোচনা করা হইয়াছে।

মনে হয় না। অষ্টাদশ শতাব্দীতে চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, কালিকা, বাশুলী, শিব প্রভৃতি লৌকিক, অর্ধপৌরাণিক ও পৌরাণিক দেবদেবীকে কেন্দ্র করিয়া বিভিন্ন উপধর্মসম্প্রদায় নিজ নিজ শ্রেণী ও কুলধর্ম রক্ষার্থ পূর্ববর্তী ধারাকেই অনুসরণ করিয়া বিলীয়মান মধ্যযুগের সংস্কার কথঞ্চিৎ রক্ষা করিয়াছিল, কেহ কেহ সমাজে প্রাধান্যও বজায় রাখিয়াছিলেন। অবশ্য তখন

জীবনের স্রোত জাহ্নবী সম
বহু দূরে গেছে সরিয়া;
এ শুধু ঊষর মরুভূধূসব
মরুরূপে আছে পড়িয়া।

তাই দুই একজন কবির কিঞ্চিৎ প্রতিভা ও কৃতিত্ব বাদ দিলে এই সমস্ত মঙ্গলকাব্য বাংলা সাহিত্যের অনাবশ্যক ভার বৃদ্ধি কবিয়াছে, ইহাতে পুঁথির তালিকা-লেখকের শ্রমবৃদ্ধি ব্যতীত আর কোন লাভ হয় নাই। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যগুলির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তন্মধ্যে প্রয়োজন ও গুরুত্ব বিবেচনায় ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে একটু বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা যাইতেছে।

মনসামঙ্গল কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে, এমন কি উনবিংশ শতাব্দীতেও মনসামঙ্গলেব একাধিক নূতন কাব্য পাওয়া গিয়াছে, যাহাব কাব্যমূল্য নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্য এখানে তাহার উল্লেখ প্রয়োজন। জীবনকৃষ্ণ মৈত্র, রসিক মিত্র (দ্বিজ রসিক), রামজীবন বিদ্যা-ভূষণ, বাণেশ্বর রায়, দ্বিজ কালীপ্রসন্ন, দ্বিজ কবিচন্দ্র, রাধানাথ প্রভৃতি কয়েকজন কবি অষ্টাদশ শতাব্দীতে (রাধানাথ উনবিংশ শতাব্দীব কবি) মনসামঙ্গলের বহুপরিচিত পথে যাত্রা করিয়া বিগত শতাব্দীর জের টানিয়া চলিয়াছিলেন। চরিত্র, কাহিনী ও রচনারীতিতে ইহাদের মৌলিকতা ও বৈশিষ্ট্য কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাষ্ট্র ও সমাজজীবন যে ক্রমেই ভাঙনের মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছিল, তাহা এই দীনমূর্তি মনসামঙ্গল কাব্যগুলি হইতেই বুঝা যাইবে। মনে হইতেছে, দেবী মনসার অনুচরগুলি নির্বিষ ডুণ্ডুভে পরিণত হইয়াছে। এই কবিদের মধ্যে জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের কাব্য কথঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য।

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র ॥ কবি জীবন মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বার্ধে একখানি সুদীর্ঘ মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ কাব্য রচনা করিয়া এই ধারাটিকে উত্তরবঙ্গের জনসমাজে আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে কিঞ্চিৎ জনপ্রিয় করিয়াছিলেন। অবশ্য এ বিষয়ে তাঁহার কৃতিত্ব বহুস্থলে তাঁহার পূর্বসূরী জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গলের দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে।

জীবনকৃষ্ণের পুরাকাব্যের দুই একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি তাঁহার কুলপরিচয় ও ব্যক্তিগত কথা, স্থানীয় জমিদারের নাম এবং প্রহেলিকার ভাষায় সন-তারিখের উল্লেখ করিয়াছেন—যাহা হইতে তাঁহার সময় এবং কাব্য-রচনার কাল নির্ণয়ে বিশেষ অসুবিধা হয় না। রংপুর সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত জীবন মৈত্রের একখানি পুরা পুঁথিতে[৪] তিনি এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন:

(১) মহারাজা রামকান্ত ভুবনে বিক্ষাত।
তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ॥
তাঁহার রাজ্যেতে থাকি ভিক্ষা করি খাই।
ভিক্ষুকের কম্মদোষ নিন্দয় গোসাঞি॥
শ্রীবংসিবদন মৈত্র জ্ঞান মহাশয়।
চৌধুরী অনন্তরাম তাহার তনয়॥
অনন্তনন্দন কবি শ্রীমৈত্র জীবন।
লাড়ি পাড়ায় বাস বারিন্দ্র ব্রাহ্মণ॥

(২) সর্বাগ্রজ দুর্গারাম তস্যানুজ আত্মারাম
সর্ব্বেশ্বর প্রাণকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ।
শ্রীকবিভূষণ নাম বাস লাহিড়িপাড়া গ্রাম
জীবনমৈত্র চতুর্থের কনিষ্ঠ॥[৫]

(৩) মহারাজ রামকান্ত ভুবন বিখ্যাত।
তাঁহার জামাতা বটে রাজা রঘুনাথ॥
তাঁহার দম্পতী বটে তারা ঠাকুরাণী।
আপনি পৃথিবীশ্বর তাহার জননী॥
সতী অতি পুণ্যবতী শ্রীরাণী ভবানী।
মহারাণীর নিজার্থে ভুবনে বাখানি॥

---

৪. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা, ১৩১৫, ২য় সংখ্যা, পৃ. ৬৬

৫. সারদানাথ খাঁ সম্পাদিত জীবন মৈত্রের 'বিষহরী পদ্মাপুরাণ' হইতে উদ্ধৃত।

তাঁহার রাজ্যেতে বাস চাকলা ভাতুরিয়া।
পরগণে প্রতাপবাজু তরফ সাত সিমানিয়া॥

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে কবির ব্যক্তিগত জীবন ও কাল সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে পৌঁছাইতে অসুবিধা হয় না। বগুড়া জেলার অন্তর্গত করতোয়া নদীতীরে ভাতুরিয়া চাকলা, প্রতাপবাজু পরগণা এবং সাত সিমানিয়া তরফের অন্তর্ভুক্ত বারেন্দ্র ব্রাহ্মণ-প্রধান লাহিড়ীপাড়া গ্রামে কবি জীবন মৈত্রের জন্ম হয়। নাটোরের রাণী ভবানীর পুত্র রাজা রামকৃষ্ণের জমিদারিতে কায়ক্লেশে কবির জীবিকা নির্বাহ হইত। অথচ একদা তাঁহার পূর্বপুরুষগণ অভিজাত-বংশের সম্মানিত ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার পিতামহ দ্বিজবংশীবদনও সত্য-নারায়ণের পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। কবির পিতার নাম চৌধুরী অনন্তরাম—'চৌধুরী' বোধহয় নবাবদত্ত খেতাব। ইহাতেই প্রমাণ হয়, তাঁহাদের বংশ সম্পন্ন গৃহস্থরূপেই পরিচিত ছিলেন। কিন্তু পরে জীবন মৈত্রের সময়ে বোধহয় এই বংশের গৌরব তিরোহিত হয়, আর্থিক অবস্থাও শোচনীয় হইয়া পড়ে। তাই তিনি কাব্যের প্রারম্ভে আত্মকথায় বলিয়াছেন, "ভিক্ষা করি খাই"। কবি নিজেও জীবিকার্জনে কিছু উদাসীন ছিলেন। এই জন্য কেহ কেহ তাঁহাকে "পাগলা জীবন" বলিত।[৬] মাঝে মাঝে তিনি বোধ হয় সহধর্মিণীর দ্বারা তর্জিত হইতেন। কারণ আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে কবি বলিয়াছেন :

তত্ত্ব দিল পুরদারা সকল বুদ্ধি হৈল হারা
পুঁথি বান্ধি হাটে চলি যাই।

কবিকে লইয়া তাঁহারা পাঁচ ভাই—দুর্গারাম, আত্মারাম, সর্বেশ্বর, প্রাণকৃষ্ণ এবং কবি জীবনকৃষ্ণ। কবি বোধহয় 'কবিভূষণ' উপাধিও পাইয়াছিলেন।

আত্মপরিচয়ে রাণী ভবানীর উল্লেখ হইতে মনে হয় কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জন্মগ্রহণ করেন। রংপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকার লেখক[৭] অনুমান করিয়াছিলেন—এই কাব্য পলাশীর যুদ্ধের নয়-দশ বৎসর পূর্বে রচিত হয় (১৭৪৭-৪৮)। কাব্যের মধ্যে একাধিক স্থলে কবি প্রহেলিকার ভাষায় কাব্যরচনাকাল উল্লেখ করিয়াছেন :

৬. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩০৬

৭. র-সা-প-প, ১৩১৫, ২য়

(১) মহীপৃষ্ঠে শশী দিয়া বাণবিন্দু সমর্পিয়া
বুঝহ সনের পরিমাণ।

(২) অম্বুজের পৃষ্ঠে রস ঋতু রিপু দান।
এই শকে শ্রীজীবন মৈত্র কবি গান॥

(৩) নিরনিধি সুতপৃষ্ঠে মহি আরোপিয়া।
বিরোচত সুতের সুত তাহাতে স্থান পায়া।
কোকনদ বন্ধুভার পৃষ্ঠে অধিষ্ঠান।
এই সনে শ্রীমৈত্র জীবন রচে গান॥

দ্বিতীয়-তৃতীয় উদ্ধৃতির অর্থ উদ্ধার দুরূহ হইলেও প্রথম উদ্ধৃতি হইতে ১১৫১ বাংলা সন বা ১৭৪৪ খ্রীঃ অঃ পাওয়া যাইতেছে। সুতরাং সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে আবির্ভূত কবি জীবনকৃষ্ণ মৈত্র অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগে পদ্মাপুরাণ বা মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

আকারে-প্রকারে মৈত্রের কাব্য বেশ স্থূলায়তন—যথারীতি স্বর্গ ও মর্ত্যের কাহিনী ইহাতে অনুসৃত হইয়াছে। কাহিনী গতানুগতিক হইলেও কোন কোন স্থলে ঈষৎ নূতনত্ব আছে। যেমন কবির কাব্যে বেহুলার পিতার নাম বাহো সদাগর, মাতা—মেনকা, ভ্রাতা—শঙ্খধর। কোন কোন স্থলে বেহুলাকে বেললি বলা হইয়াছে। তবে ইহা লিপিকার প্রমাদও হইতে পারে। কাহিনীটি সংস্কৃতপ্রধান ভাষায় স্বচ্ছন্দগতিতে রচিত হইয়াছে, ভাষার তৎসমপ্রধান ভঙ্গিমা বিশেষ উৎকট হয় নাই। চরিত্র নির্মাণে কবি এমন কোন বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। অবশ্য করুণরসের বর্ণনায় কবির রচনাশক্তি প্রশংসার যোগ্য। লখিন্দরের মৃত্যুতে মাতার বিলাপ স্বাভাবিক ও হৃদয়স্পর্শী হইয়াছে:

হাথের প্রহারে শোনা কপাট ঘুচাএ।
বেকুল হইআ শোনা মেড় মধ্যে জাএ॥
দুই হস্ত ধরিয়া পুত্রের লইআ কোলে।
বশন তিতিলো মাএর নএানের জলে॥
পুত্রো মুখে মুখ থুইয়া কান্দে অভাগিনি।
হেলাএ হারাইলাম বাছা কপাত অভাগিনি॥
মরণ শময় বাছা না দেখিলাম তোমা।
কাহাকো দেখিআ আমি চিত্তে দিবো খেমা॥

ওটো বাছা লখিন্দর চৈতর্ণ করো গাও।
চান্দমুখ চাইআ কান্দে তোমার অভাগিনি মাও॥
না জানিঞা বিবা দিলাম তোমা বধিবারে।
এতো দিনে য়ভাগিনি জায় গঙ্গাতিরে॥
লোহার শরির য়ামার বজ্রের সমান।
তে কারণে ফাটিয়া না হইলো থান ২॥
বুকেত পাথর দিআ থাকিব কিবা নিআ।
রাত্রি দিনে ঝুরিবে মোর য়ভাগিনির হিআ॥
না রহিব ঘরে আমি চাপাবতি পুরি।
সুখে রার্জ্য করুক য়গন চান্দো অধিকারি॥
(কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৬১১৩)

কবির রচনাভঙ্গীতে ঈষৎ সংস্কৃতপ্রাধান্য থাকিলেও ইহাকে বিশেষ কৃত্রিম বলিয়া মনে হয় না। ব্রাহ্মণকবি মাঝে মাঝে অনাবশ্যক পাণ্ডিত্য প্রকাশের চেষ্টা করিলেও তাহা লালা জয়নারায়ণের 'হরিলীলা'র মতো উৎকট আকার ধারণ করে নাই।[৮] আরও দুই-এক স্থলে জীবন মৈত্র আন্তরিক রচনাভঙ্গীর পরিচয় দিয়াছেন—যেমন স্বামী হারাইয়া বেহুলার বিলাপ। কেহ কেহ বলেন যে, কবির কাব্যের কোন কোন স্থলে আদিরসের উগ্রতা পরিলক্ষিত হয়, রুচিবিকারও সমর্থনযোগ্য নহে।[৯] কারণস্বরূপ আলোচকগণ মনে করেন, জীবন মৈত্র সংস্কৃত পুরাণের দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন বলিয়া নির্জলা কামচর্চায় আমোদ বোধ করিয়াছেন। এ অভিযোগ কিন্তু যুক্তিযুক্ত নহে। তাঁহার কাব্যে কিছু কিছু আদিরসের আপত্তিকর বর্ণনা আছে, কিন্তু তাহার জন্য সংস্কৃত পুরাণ দায়ী নহে। জীবনকৃষ্ণ অনেক স্থলে উত্তরবঙ্গের আর এক মনসামঙ্গল-কবি জগজ্জীবন ঘোষালের রচনা বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন।[১০] জগজ্জীবন যেমন তন্ত্রবিভূতির কিছু কিছু অংশ পরিপাক করিয়াছিলেন, তেমনি পরবর্তী কবি জীবনকৃষ্ণও জগজ্জীবনের কাব্যের কিছু কিছু অংশ নিজ রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার তথাকথিত অশ্লীলতা জগজ্জীবনের প্রভাব-প্রসূত। এ বিষয়ে জগজ্জীবন কোনও প্রকার সঙ্কোচ বোধ

৮. পরে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩৭

১০. ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল, পৃ. ১/০

করেন নাই, শ্লীলতা-অশ্লীলতাবোধ ত্যাগ করিয়া অশুচিবর্ণনায় মত্ত হইয়াছেন।[১১] জীবনকৃষ্ণের আদিরসের প্রতি অধিকতর আকর্ষণের একটা কারণ—জগজ্জীবনের প্রভাব। তিনি যে কী পরিমাণে জগজ্জীবনের রচনা আত্মসাৎ করিয়াছিলেন, নিম্নে উভয় কবির রচনাংশ উদ্ধৃত করিয়া তাহার প্রমাণ দেওয়া যাইতেছে :

জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল

(১) বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কোলে আসি বৈস সিয়া
ছাড় পাশা কিসের ধামালী।
দেখিঞা তুমার ঠান মদনে হানিল বাণ
প্রাণ রাখ বানিয়ার বালী॥
কুন বিধি বিচক্ষণ একান্ত করিঞা মন
তোর রূপ নিরমিল বসি।
আমি কত জন্ম ভরি কঠোর তপস্যা করি
তোমা হেন পাইনু রূপসী॥

(২) ভাসাইঞা পুত্রখানি অসার সংসার গুণি
শোকে সাধু কান্দে উচ্চ স্বরে।
বঞ্চিল দারুণ বিধি সাগরে ভাসাল নিধি
কেমতে থাকিব একেশ্বরে॥
ধিক মোর ধনজন প্রাণ ধরি অকারণ
অকারণ গৃহেতে বসতি।
একে একে সাত জন মৈল মোর পুত্রগণ
অন্তকালে আমার কি গতি॥[১২]

জীবনকৃষ্ণ মৈত্রের পদ্মাপুরাণ

(১) বালা বোলে প্রাণপ্রিয়া কোলে রাসি বোশাসিআ
তেজো পাশা কিঁসের ধামালি।
দেখিয়া তোমার ঠাম মদনে হানিল বাণ
প্রাণ রাখো শাহের ঝিআরি॥

১১ তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে জগজ্জীবন প্রসঙ্গ আলোচনা করা হইয়াছে।

১২ ডঃ আশুতোষ দাস সম্পাদিত—জগজ্জীবন ঘোষালের মনসামঙ্গল।

কৈল বিধি বিচক্ষণ একত্র করিয়া যোন
তোর রূপ নিরমাইল বিধি।
আমি কত জন্মো ধরি কঠুর তবিস্তা করি
তোমা পাইলাম রূপবতি॥
(২) ভাসে পুত্রবধূখানি য়শার শংশার শুনি
শোকে সাধু কান্দে উচা স্বরে।
আমার বঞ্চিত বিধি সাগরে ভাসাইলাম নিধি
কি লইয়া বঞ্চিব নিজ ঘরে॥
ব্রেণা মোর ধনজন প্রাণ মোর য়করুণ
যকারেণ মোর গৃহেতে বসতি।
শপ্ত পুত্র কার মরে কার প্রাণে কতো ধরে
অন্তিমকালে মোর কার হএ গতি॥[১৩]

এইরূপ আরও অনেক স্থলে বারেন্দ্র জীবন মৈত্র রাঢ়ী জগজ্জীবন ঘোষালের হস্তে নির্দ্বিধায় তাম্রকূট সেবন করিয়াছেন। এরূপ ব্যাপারে জগজ্জীবনও লিপ্ত ছিলেন—তন্ত্রবিভূতি তাঁহার উত্তমর্ণ। আবার তিনি জীবন মৈত্রকে অধমর্ণত্বের পাশে বন্ধন করিয়াছেন। সে যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর মনসামঙ্গলের কয়েকজন কবির মধ্যে একমাত্র জীবন মৈত্র মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন—কাব্যটিও তুচ্ছ করিবার মতো নহে।

মনসামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে একমাত্র জীবন মৈত্র ভিন্ন অন্য কোন মনসামঙ্গলের কবি কাব্য রচনায় বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাই এখানে শুধু তাঁহাদের সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করিয়াই এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করা যাইতেছে।

বর্ধমান জেলার দ্বিজরসিক বা রসিক মিশ্রের মনসামঙ্গলের খানকয়েক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে তিনখানি পুঁথি (পুঁথি, সংখ্যা—১৯৭০, ২০৭১, ২৫১০) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিশালায় আছে। কবি কাব্যের প্রারম্ভে নিজ বংশপরিচয় দিয়াছেন, পিতা (প্রসাদ), পিতামহ (মহেশ), প্রপিতামহ (কালিদাস) প্রভৃতি পূর্বপুরুষদের নাম উল্লেখ করিতে ভুলেন নাই। কবি বোধ হয় 'শ্রীকবিবল্লভ' নামেও পরিচিত ছিলেন। কারণ ভণিতায় তিনি এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন:

১৩. কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৬১১৩

আখড়া শালেন্তে থানা।
শ্রীকবিবল্লভ বানা।

কবি দুই এক স্থলে নিজের কাব্যকে 'জগতীমঙ্গল'ও বলিয়াছেন। আরও দুই একজন কবি (যেমন দ্বিজ কবিচন্দ্র) এই শব্দটি মনসামঙ্গল বুঝাইতে ব্যবহার করিয়াছেন। দ্বিজ রসিকের এই কাব্য বিশেষ কোন কাব্যগুণযুক্ত নহে, কেবল বিষ-ঝাড়ানোর মন্ত্রটি মোটামুটি বৈচিত্র্যপূর্ণ।

চট্টগ্রামের রামজীবন বিদ্যাভূষণ অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[১৪] কবি পাণ্ডিত্যের অধিকারী হইলেও কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। তাঁহার ভণিতায় সূর্যমঙ্গল নামে আর একখানি কাব্য পাওয়া গিয়াছে। সীমাবদ্ধ অঞ্চলে তাঁহার মনসামঙ্গল 'বিদ্যাভূষণী' মনসামঙ্গল নামে পরিচিত হইলেও চট্টগ্রামের বাঁশখালি গ্রামের (কবির জন্মভূমি) বাহিরে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। কেহ কেহ এই কাব্যের রচনারীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন। তবে কাব্য হিসাবে ইহার এমন কোন বৈশিষ্ট্য নাই।

এই শতাব্দীর গোড়ার দিকে বাণেশ্বর নামক এক কবি আর একখানি মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ইহার মাত্র একখানি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি কাব্য রচনার কাল এইভাবে নির্দেশ করিয়াছেন:

মনসামঙ্গল ভাষে　　প্রথম বৈশাখ মাসে
শকাব্দ ষোলশ একচল্লিশে।
ভাবিয়া ভবানীহর　　ভণে দ্বিজ বাণেশ্বর
মনসার মঙ্গল প্রকাশে।

১৪. মনসামঙ্গলের রচনার নির্দেশ:

শর কর ঋতু বিধু শক নিয়োজিত।
মনসামঙ্গল রামজীবন রচিত।

অর্থাৎ ১৬২৫ শকাব্দ বা ১৭০৩-৪ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচিত হয়। তাঁহার সূর্যমঙ্গলে এইভাবে রচনাকাল উল্লিখিত হইয়াছে:

ইন্দু রাম ধাতু বিধু শক নিয়োজিত।
শ্রীরামজিবণ ভণে আদিত্ত চরিৎ। (সা. প. প. ১৩১৩।১)

অর্থাৎ ১৬৩১ শকাব্দ বা ১৭০৯-১০ খ্রীঃ অব্দে 'আদিত্য চরিত্র' বা সূর্যমঙ্গল কাব্য রচিত হয়। সুতরাং কবিকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে স্থাপন করা যায়।

অর্থাৎ ১৬৪১ শকাব্দে (১৭১৯ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। কবি সবিস্তারে নিজ বংশতালিকা দিয়াছেন বটে, কিন্তু ঠিক কোন্ অঞ্চলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহার কোন উল্লেখ নাই। তাঁহার নিবাস ছিল চম্পকপুরীতে, জন্ম হইয়াছিল রাইপুরে। এই দুই গ্রাম কোন্ অঞ্চলে অবস্থিত তাহা বুঝা যাইতেছে না। কবির ভাষা কলিকাতার নাগরিক ভাষার মতো বেশ মার্জিত—কাব্য হইতে শুধু এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে। ইহার মধ্যে বেহুলার চরিত্র অনেকটা স্বাভাবিকভাবেই উপস্থাপিত হইয়াছে। উচ্চ আদর্শবাদ অপেক্ষা মর্ত্যজীবনের স্পর্শ অধিকতর লক্ষণীয় বলিয়া এই কাব্যের কিঞ্চিৎ মূল্য আছে।[১৫]

সুসঙ্গের রাজা রাজসিংহ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে এবং জগমোহন মিত্র ১৮৪৪ খ্রীঃ অব্দে মনসামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। আধুনিক কালে ইংরাজী শিক্ষা সভ্যতা নাগরিক জীবনে বিপুল প্রভাব বিস্তার করিলেও গ্রামে গ্রামান্তরে সে তরঙ্গাভিঘাত পৌঁছাইতে বিলম্ব হইয়াছিল। তাই দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে, এমন কি ঊনবিংশ শতাব্দীতেও কেহ কেহ পুরাতন যুগের রীতি অনুসরণ করিয়া মনসামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কিন্তু নূতন আদর্শ-ঐতিহ্যের বন্যাধারায় এই সমস্ত বিগতগৌরব মঙ্গলকাব্য দিগন্তে ভাসিয়া গিয়াছে। ইহাদের প্রতি এখন আমাদের শুধু প্রত্নতাত্ত্বিক কৌতূহল ভিন্ন আর কোন আকর্ষণ নাই।

চণ্ডী-দুর্গা-ভবানীমঙ্গল ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে পুরাতন চণ্ডীমঙ্গল কাব্যধারার অন্তর্গত কালকেতু ও ধনপতির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়া ক্ষুদ্রকায় মধ্যমশ্রেণীর চণ্ডীমঙ্গল বা অভয়ামঙ্গল কাব্য রচিত হইয়াছিল। দুই একজন আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণ হইতে চণ্ডী ও অসুরবিজয় কাহিনীকে সংক্ষেপে রচনা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত রচনার কাব্যগৌরব নিতান্তই তুচ্ছ। সাহিত্যের ইতিহাস বিবর্তনে এগুলি শুধু পাদটীকা হিসাবে গণ্য হইবার যোগ্য। এইজন্য এখানে ইহাদের সামান্য পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

যে সমস্ত কবি পুরাতন চণ্ডীমঙ্গলের কালকেতু-ধনপতির উপাখ্যান অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে মুক্তারাম সেন, কৃষ্ণজীবন, লালা

১৫. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৩১১—১২

জয়নারায়ণ, হরিশ্চন্দ্র বসু, মুকুন্দ মিশ্র, ভবানীশঙ্কর দাস, হরিরাম প্রভৃতি কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা প্রয়োজন। ইঁহারা প্রায় সকলেই কবিকঙ্কণের রচনায় হাত পাকাইয়াছেন। কেহ কেহ নামধামে ঈষৎ নূতনত্ব অবলম্বন করিলেও কাহিনীগ্রন্থনে কবিকঙ্কণের পথ ছাড়িয়া ভিন্ন পথে যাইতে সাহস করেন নাই। মনসামঙ্গলের কবিরা বাঁধা ছকের অনুসরণ করিলেও কোন একজন কবির কাব্য অন্য কবিদের এতটা প্রভাবিত বা নিয়ন্ত্রিত করে নাই। কিন্তু প্রথম শ্রেণীর প্রতিভাধর মুকুন্দরাম প্রতিভা ও কাব্যকলার গুণে সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর চণ্ডীমঙ্গলের যাবতীয় কবির উপর অখণ্ড প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এখানে এইরূপ কয়েকজন কবির পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

মুক্তারাম সেন॥ মুন্সী আবদুল করীম সাহিত্যবিশারদ ১৩২৪ সনে চট্টগ্রামের কবি মুক্তারাম সেনের 'সারদামঙ্গল' বা 'অষ্টমঙ্গলার চতুষ্প্রহরী পাঁচালী' বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশ করেন। পুঁথিটি বিশেষ প্রাচীন নহে, ১১৭৪ মঘী সন অর্থাৎ বাংলা ১২৭৮ সনের (১৮৭২ খ্রীঃ অঃ) অনুলিখন। মুক্তারাম গ্রন্থ মধ্যে বিস্তারিতভাবে যে আত্মপরিচয় দিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, তিনি চট্টগ্রামের আনোয়ারা গ্রামে জন্মগ্রহণ করিলেও তাঁহার পূর্বপুরুষের আদি নিবাস যশোহরের কালিয়া গ্রাম। তাঁহার পূর্বজ কেহ চট্টগ্রামের চন্দ্রনাথ তীর্থ দর্শন করিতে আসিয়া এখানেই বসবাস করিয়াছিলেন। কুলধর্ম মতে তাঁহারা তান্ত্রিক বংশের সন্তান। তিনি নিজেও তান্ত্রিক সাধনাদি করিতেন। কবি তাঁহার পূর্বপুরুষ যাদব রায় হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। যাদব রায় ১৬১৮ খ্রীঃ অব্দে বর্তমান ছিলেন। প্রতি তিন পুরুষে এক শত বৎসরের হিসাব মতে কবি মুক্তারামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে পাওয়া যাইতে পারে।[১৬] কবি এইভাবে 'সারদামঙ্গলে'র রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছেন :

গ্রহ ঋতু কাল শশী শক শুভ জানি।
মুক্তারাম সেনে ভণে ভাবিয়া ভবানী॥

অর্থাৎ ১৬১৯ শক বা ১৭৪৭ খ্রীঃ অব্দে এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে মাঝে মাঝে হরিলাল নামক আরও একটি ভণিতা পাওয়া যায়। যেমন :

১৬. আবদুল করীম সাহেব অনুমান করিয়াছেন, ১৭০৮ খ্রীঃ অব্দে কবির জন্ম হয়। ইহা তাঁহার অনুমান মাত্র।

শ্যামা অঙ্গে শোভে ফাগু রকত মিশালে।
তছু পদধূলি মাগে যেন হরিলালে॥

মনে হয় এই হরিলাল কোন গায়েন বা লিপিকার হইবেন। সুকৌশলে ইনি মুক্তারামের কাব্যে নিজ নাম অনুপ্রবিষ্ট করাইয়াছেন।

'সারদামঙ্গলে'র কাহিনী মুকুন্দরামের অনুরূপ দুই খণ্ডে বিভক্ত হইলেও আকারে প্রকারে ব্রতকথার মতো অতি সংক্ষিপ্ত। কবির কাব্যে এমন কোন কাব্যবৈশিষ্ট্য নাই যাহার জন্য তিনি প্রশংসা দাবি করিতে পারেন। মুকুন্দরামের কাহিনীর দ্বারা তিনি প্রভাবিত হইলেও কবিত্বের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না।[১৭] কবি কাব্যের প্রারম্ভেই পরিচ্ছন্ন ভাষায় আদ্যাশক্তির বন্দনা করিয়াছেন ঃ

তুমি আদ্যা নারায়ণী নারায়ণ পরায়ণী
তুযা অংশে পঞ্চ অবতীর্ণ।
গৌরী জহ্নুসুতা সতী রাধা লক্ষ্মী সরস্বতী
সৃষ্টি কর্ম্ম দেখিমাত্র ভিন্ন॥

কবি প্রথমে দেবীকর্তৃক মঙ্গলাসুর বধের বর্ণনা দিয়াছেন, তারপর কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের আখ্যান বর্ণনা করিয়াছেন। ঘটনা সন্নিবেশ অনেকটা দ্বিজমাধব (মাধব আচার্য) মঙ্গলচণ্ডীর অনুরূপ।[১৮] এমন কি কবি মাধবের আদর্শে অনেক বিষ্ণুপদ রচনা করিয়া কাব্যমধ্যে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। ধনপতির বাণিজ্যযাত্রার সময়ে মথুরায় কৃষ্ণযাত্রার অনুরূপ পদ ব্যবহার করিয়া কবি রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন ঃ

মধুপুরী জাএ বাধার বন্ধু হে।
না জানি কপালে কিবা আছে॥
পাইয়া যুবতী নব মধু হে।
অলি হইয়া রহে কালা কাছে॥

শাক্তকাব্য লিখিলেও কবি অনেক স্থলে বৈষ্ণব ভক্তের আবেগ ব্যক্ত করিয়াছেন।

১৭. এ বিষয়ে সম্পাদক করীম সাহেবের মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত, "সারদামঙ্গল মাধবাচার্য ও কবিকঙ্কণের গ্রন্থের পরবর্তী কালের রচনা। উক্ত কবিদ্বয়ের গ্রন্থগুলি যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহাদের চক্ষে ইহার সৌন্দর্য প্রতিভাত হইবে কিনা সন্দেহ।"

১৮. লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র ২য় খণ্ড দ্রষ্টব্য।

ভবানীশঙ্কর দাসের মঙ্গলচণ্ডীর পাঞ্চালিকা ॥ চট্টগ্রামের অধিবাসী রামচন্দ্র দত্ত এই কাব্যের পুঁথি সংগ্রহ ও সম্পাদনা করিয়াছিলেন, ১৩২৩ সনে তাহা বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। ইহাও চণ্ডীমঙ্গলের অনুরূপ কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী অবলম্বনে রচিত। কাব্যের প্রারম্ভে কবি ঈষৎ বিস্তারিত আকারেই আত্মপরিচয় দিয়াছেন। কবির পূর্বপুরুষ বোধহয় পূর্বে রাঢ়ের অধিবাসী ছিলেন ("মোর আদিপুরুষ জন্মিল রাঢ়া গ্রাম")। আত্রেয় গোত্রীয় নরদাসের কুলীন কায়স্থ বংশে কবির জন্ম হয়। যদুনন্দন কৃত কুলজী গ্রন্থে ('ঢাকুর') এই কুলীন বংশের বিস্তারিত পরিচয় আছে। কিন্তু তাঁহার পূর্বপুরুষগণ রাঢ়ী কৌলীন্য ত্যাগ করিয়া বারেন্দ্র সমাজভুক্ত হইয়াছিলেন। কেহ-বা 'বঙ্গে' অর্থাৎ পূর্ববঙ্গে গিয়া স্থায়িভাবে বসবাস করিতে থাকেন।[১৯] 'ঢাকুর' কুলজী গ্রন্থ হইতে কবিকে বারেন্দ্রসমাজের কুলীন নরদাসের বংশধর বলিয়া মনে হইতেছে। এই নরদাসের বংশধর কৃষ্ণ হৃদানন্দ চট্টগ্রামের দেবগ্রামে বসতি স্থাপন করেন। ইঁহার বংশধর মধুসূদন সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া চক্রশালা গ্রামে (আধুনিক পটিয়াবাজারের অন্তর্গত) বসবাস করেন। ইঁহার পুত্র শ্রীমন্ত, শ্রীমন্তের পুত্র নয়ন রায়। কবি ভবানীশঙ্কর এই নয়ন রায়ের পুত্র। তিনি কোথাও 'শঙ্কর' ("শঙ্কর আত্মার নাম তাহান নন্দন", "ভণে দাস শ্রীশঙ্কর"), কোথাও ভবানীশঙ্কর ("দীনহীন ভবানী শঙ্কর দাসে ভণে") ভণিতা দিয়াছেন তবে শেষোক্ত ভণিতাই অধিকাংশ স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে। কবির বংশধারা এখনও বর্তমান আছে।

শুনা যায় "কবি নিজ বাটীর সম্মুখবর্তী দীঘির জলের উপর টঙ্গী প্রস্তুত করতঃ শুচি ও সংযতভাবে তাহাতে বসিয়া এই 'জাগরণ' রচনা করিয়াছিলেন।"[২০] সম্পাদক রাজচন্দ্র দত্ত প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তী নামক এক অশীতিপর বৃদ্ধের নিকট এই পুঁথি সংগ্রহ করেন। প্রাণকৃষ্ণ চক্রবর্তীর মতে পুঁথিখানি নাকি কবির স্বহস্তলিখিত। এই কাব্যের আর দ্বিতীয় কোন

---

১৯. 'ঢাকুর' গ্রন্থে এইরূপ উল্লেখ আছে—

কেহবা বঙ্গেতে গেলা কেহবা বারেন্দ্রে রৈলা
তার কার্য রহিল প্রধান॥

২০. ঐ, ভূমিকা, পৃ. ২

নকল পাওয়া যায় নাই। স্থানীয় সমাজে এই কাব্য 'জাগরণ' বা 'শঙ্কর বিশ্বাসের জাগরণ' নামেই অধিক পরিচিত।[২১] কিন্তু কবি কাব্যের কোথাও এই শব্দ ব্যবহার করেন নাই, বরং সর্বত্র "ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে"—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। এইজন্য বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে যখন এই কাব্য প্রকাশিত হয় তখন পরিষৎ সম্পাদক ইহাকে 'জাগরণ' নামে অভিহিত না করিয়া 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' নামে প্রকাশ করেন।[২২] পুঁথির শেষে কালজ্ঞাপক এইরূপ উল্লেখ আছে:

ধাতা বিন্দু সাগরেন্দু শকাদিত্য সনে।
ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে॥

ইহা হইতে ১৭০১ শকাব্দ (১৭৭৯-৮০ খ্রীঃ অঃ) নির্ধারিত হইয়াছে (ধাতা অর্থাৎ বিধাতা=১, বিন্দু=০, সাগর=৭, ইন্দু=১)। কিন্তু বিধাতা যদি চতুর্মুখ ব্রহ্মার নির্দেশক হয়, তাহা হইলে ইহা হইবে ১৭০৪ শকাব্দ (১৭৮২ খ্রীঃ অঃ)। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ ইংরাজ আমলেই এই কাব্য রচিত হয়, ইহাতে কোন সন্দেহ নাই। কাব্যের পরিচ্ছন্ন তৎসম শব্দবহুল বাগ্‌বিন্যাসও সেই কথা প্রমাণ করিতেছে।

পূর্বেই আমরা বলিয়াছি যে, ভবানীশঙ্কর ইহাতে কালকেতু ও ধনপতি সদাগরের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রথম দিকে কবি সামান্য কথায় দেবী ভাগবতের কাহিনী বলিয়া লইয়াছেন। তার পর দক্ষের গৃহে সতীরূপে আদ্যাশক্তির জন্ম, সতীর দেহত্যাগ, পার্বতীরূপে হিমালয় গৃহে পুনর্জন্ম, হরপার্বতীর বিবাহ, গণেশ-কার্তিকের জন্ম, অসুরযুদ্ধে দিগ্‌বসনা কালিকার আবির্ভাব—পরে মর্ত্যে কলিঙ্গনগরে পূজা লইতে দেবীর আবির্ভাব এবং যথারীতি কালকেতু-ধনপতির আখ্যানের পর পালা শেষ হইয়াছে। যদিও

২১. ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৩

২২. পরিষৎ সম্পাদক এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "পুঁথির মধ্যে কিন্তু ইহার নাম 'জাগরণ' বলিয়া কোন স্থলেই উল্লিখিত হয় নাই, পুঁথির শেষে এই গ্রন্থের নাম 'মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা' লেখা আছে। গ্রন্থমধ্যে যে সকল ভণিতা আছে, তাহাতেও ইহার যে পাঞ্চালিকা নাম ছিল তাহা বুঝা যায়; যথা—"ভবানীশঙ্কর দাসে পাঞ্চালিকা ভণে"। সুতরাং এই সকল বিষয় বিবেচনা করিয়া গ্রন্থের নাম 'জাগরণ' বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেও ইহা যে গ্রন্থের কবি-প্রদত্ত নাম নহে, এই ধারণাই আমাদের বদ্ধমূল হওয়ায় ইহার নাম মঙ্গলচণ্ডী পাঞ্চালিকা প্রদত্ত হইয়াছে।" সম্পাদকের এই মন্তব্য সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত।

কবি আখ্যানকাব্য লিখিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার রচনাভঙ্গিমা ও মনোভাব ভক্ত গীতিকবির অনুরূপ—বিশেষতঃ তাঁহার শাক্ত ভক্তের মনটি উক্ত কাব্যের কতিপয় 'ঘোষা', 'মালসী', ও লাচাড়ী ছন্দে চমৎকার ফুটিয়াছে। বলিতে কি প্রত্যেক বর্ণনার প্রারম্ভে কবি দীর্ঘ ছন্দে দেবী বন্দনা করিয়াছেন, কোথাও গান সংযোজনা করিয়াছেন, যাহার ফলে মূল কাহিনী কিঞ্চিৎ মন্থর হইয়া গিয়াছে। কখনও তিনি চণ্ডিকার কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন :

তারিণি ত্রাণ কর।
সংসারেতে আহ্মি বড় পাপী নর॥

কখনও মহাদেবের নিকট মিনতি জানাইয়াছেন ; "মোরে কৃপা কর শম্ভুনাথ", কখনও-বা 'দেহি এই বর, মৃত্যু হোক মোর কালী জপিয়া বদনে"—এইরূপ আবেদন জানাইয়াছেন। কোথাও কোথাও উদারমতি কবি রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদও রচনা করিয়াছেন। কৃষ্ণের বাঁশী শুনিয়া রাধার ব্যাকুলতা :

দূতী কি হবে উপাএ।
বাঁশী রবে রাধা বলি ডাকে শ্যামরাএ॥

কিংবা রাধার অভিমানোক্তি :

প্রাণনাথ আহ্মি জানি তব সব মর্ম্ম।
কেন তোরে বোলি হরি জগৎ-ঈশ্বর করি
কিছু নাহি বুঝ ধর্ম্মাধর্ম্ম॥
* * * *
মোহন বাঁশীর স্বরে আর না ডাকিয় মোরে
আর না আসিয় মোর ঘরে।
আপনে বরুহ যথা আহ্মিহ না জাবো তথা
ভণে দাস ভবানীশঙ্করে॥

কবি কোন কোন স্থলে সীতারামের উল্লেখ করিয়াছেন :

রাম নাম জপ একবার।
ভাবি দেখিলাম স্বাস্তে বর্ত্তমান বা কালান্তে
দুষ্কৃতির বন্ধু নাই আর॥

একস্থলে গৌরাঙ্গবন্দনায় কবি বলিয়াছেন :

দেখ রে গৌরাঙ্গ নাচে করে করতালি দিয়া।
খেনে খেনে ঢলি পড়ে রাম নাম বলিয়া॥

তবে "দুর্গানামাক্ষরদ্বয় বদ নিরবধি"—এই উক্তিই প্রতি পদে ও পয়ার-লাচাড়ীতে পাওয়া যায়। কবির দুই একস্থলের বর্ণনা বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে। বালক শ্রীমন্ত সমবয়সীদের মারিয়া ধরিয়া খেদাইয়া দিলে তাহারা খুল্লনার কাছে গিয়া অভিযোগ করিতেছে :

কান্দে শিশু মাএর গোচরে।
মহাদুষ্ট শ্রীয়মন্ত হএ বড বলবন্ত
প্রহারিছে আক্ষারা সভারে॥
বিস্তর কাকুতি করি আক্ষারা সভারা ধরি
প্রিয় বাক্যে লৈয়া যায় দূরে।
বসিএ একত্র হৈয়া নানা খেলা খেলাইয়া
শেষে প্রহার করে কলেবরে॥
ধাই যদি জাই ডরে দ্রুত গিয়া করে ধরে
বাটে পতন করে আছাড়িয়া।
নাহি পারি তার সঙ্গে বেদনা পাইয়া অঙ্গে
গৃহে আসি কান্দিয়া কান্দিয়া॥

কবির রচনাভঙ্গিমা অষ্টাদশ শতকের শেষভাগের মতো একটু গুরুগম্ভীর, কিছু কৃত্রিম এবং সমাস সন্ধির ভারে পীড়িত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার রচনাকে 'বিকট' বলিবার পক্ষেও যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।[২৩] রচনার কোন কোন স্থান বেশ প্রসাদগুণ বিশিষ্ট বলিয়াই বোধ হয়। 'ঘোষা'র অন্তর্ভুক্ত রাধার রূপ বর্ণনাবিষয়ক এই ছত্রগুলি নিতান্ত মন্দ নহে :

বোল হে বড়াই কে চলিছে যমুনাকূলে।
কাহার সুন্দরী নারী গোপীগণ সঙ্গে করি
চলিয়াছে মনকুতুহলে॥
বক্তে নিন্দিয়াছে ইন্দু কপালে সিন্দুরবিন্দু
কটি মাঝে পূর্ণ কুম্ভ সাজে।

২৩. ডঃ সুকুমার সেন এইরূপ মন্তব্য করিয়াছেন, "বিষম সংস্কৃত পদের ব্যবহার এবং তদ্ভব পদের সঙ্গে তৎসম শব্দের সন্ধি ভবানীশঙ্করের রচনাকে বিকট করিয়াছে" (বা. সা. ইতি. ১ম, অপরার্ধ, পৃ, ৪২৬)। 'সপুঙ্গবং মাধব সব কর অবধান', 'বন্দনাম্বিকারাজ্বি এতে লোটাই বিশেষ' প্রভৃতি ছত্রগুলি কিছু উৎকট হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু এইরূপ কিছু কিছু আতিশয্য বাদ দিলে ভবানীশঙ্করের রচনা বেশ মার্জিত বলিয়াই বোধ হইবে।

হেরিতে ওরূপ খানি হরি নিল মোর প্রাণী
জিজ্ঞাসা না কৈলুম মুই লাজে ॥

কালিকার রণবেশ বর্ণনাও বীররসের অনুকূল হইয়াছে ঃ

চতুর্ভুজ ত্রিনয়নী করাল বদনখানি
প্রকাশিত দন্ত কৈলা রসনা বিস্তারিয়া ॥
বস্ত্রে হৈলা বিবর্জিত বেশ কৈলেন বিপরীত
চতুর্ভিতে নারী সৈন্য মিলিল আসিয়া ॥

অবশ্য ভবানীশঙ্করের পূর্বেই ভারতচন্দ্র আসিয়া মার্জিত বাগবিন্যাসের যে রীতি বাঁধিয়া দিয়াছিলেন তাহার প্রভাব যে সুদূর চট্টগ্রামে পৌঁছায় নাই তাহা বলা যায় না। তবে শব্দকুশলী ভারতচন্দ্র যেমন তৎসম ও তদ্ভব শব্দকে শিল্পকৌশলের দ্বারা মিলাইয়া দিয়া চমৎকার ধ্বনিঝঙ্কার সৃষ্টি করিয়াছিলেন, নিকৃষ্ট প্রতিভার কবি ভবানীশঙ্কর তাহাতে ততটা কৃতকার্য হন নাই।

কবি মুকুন্দের (দ্বিজ মুকুন্দ) বাসুলীমঙ্গল॥ কিছুকাল পূর্বে 'বাসুলীমঙ্গল' শীর্ষক চণ্ডীমঙ্গল ধবনের একখানি নূতন কাব্য আবিষ্কৃত হইয়াছে —রচয়িতাব নাম মুকুন্দ বা দ্বিজ মুকুন্দ, কোথাও কোথাও 'কবিচন্দ্র মুকুন্দ' এইরূপ ভণিতাও পাওয়া যায়। চকদীঘির অধিবাসী অদ্বৈতনাথ সিংহ বর্ধমান জেলাব বায়না থানার অন্তর্গত একটি গ্রাম হইতে 'বাসুলীমঙ্গলের' একখানি পুরাতন পুঁথি সংগ্রহ কবেন। এই কাব্যে কোথাও কোথাও দেবী বাসুলী বিশালাক্ষী ও বিশাল লোচনী নামেও অভিহিত হইয়াছেন।[২৪] কবিও এই কাব্যকে 'বিশাললোচনীর গীত' আখ্যা দিয়াছেন। কিছুকাল পূর্বে কাব্যটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে শ্রীযুক্ত সুবলচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শুভেন্দুসুন্দর সিংহের সম্পাদনায় প্রকাশিত হইয়াছে।

২৪. রামেশ্বরও শিবায়নে পার্বতীকে বিশাললোচনী বলিয়াছেন :

বালকে বারণ করে বিশাললোচনী।
কৈল নাই কোন্দল কোপিবে শূলপাণি ॥

(যোগিলাল হালদার সম্পাদিত রামেশ্বর প্রণীত
'শিব সঙ্কীর্তন পালা', পৃ. ১০০)

একস্থানে কবি দেবীকে বাসুলীও বলিয়াছেন :

বসাইল বৃষধ্বজে বিচিত্র আসনে।
বাসুলি বাতাস করে বিচিত্র ব্যজনে ॥ (ঐ, পৃ. ১০২)

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে 'মুকুন্দ'-নামাশ্রিত অনেকগুলি কবির নাম পাওয়া যায়। তন্মধ্যে স্বনামধন্য কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম চক্রবর্তী সর্বজন-পরিচিত। দ্বিজ মুকুন্দ নামক আর এক কবি 'জগন্নাথ বিজয়' শীর্ষক এক কাব্যে (সাহিত্য পরিষদ পুঁথি—২৮৩) জগন্নাথ মহিমা বর্ণনা করিয়াছেন। ইনি দ্বিজ মুকুন্দ ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। কিন্তু 'বাসুলীমঙ্গলে'র কবিচন্দ্র উপাধিক দ্বিজ মুকুন্দ স্বতন্ত্র কবি। কাব্যমধ্যে কবি সংক্ষেপে নিজ পরিচয় দিয়াছেন :

বিপ্রকুলে জন্ম পিতামহ দেবরাজ।
পিতা বিকর্তন মিশ্র বিদিত সমাজ॥
শ্রীযুক্ত মুকুন্দ হীরাবতীর নন্দন।
পাঁচালী প্রবন্ধ করে ত্রিপুরাস্মরণ॥

অন্য বর্ণনা হইতেও বুঝা যায় যে, কবিচন্দ্র উপাধিক মুকুন্দমিশ্রের পিতামহের নাম দেবরাজ, পিতা ও মাতা যথাক্রমে বিকর্তন ও হীরাবতী, খুল্লতাতের নাম গদাধর। কবির তিনপুত্র—রমানাথ, চন্দ্রশেখর ও সনাতন।

প্রাপ্ত মাত্র একখানি পুঁথিতে নকলের তারিখ হইতেছে শকাব্দ ১৬৫৭ কার্তিক—"স্বাক্ষর মিদং শ্রীকিশোরদাস মিশ্রস্য মোকাম সাং আখড়িয়া পরগণে মঙ্গলঘাট আমল শ্রীযুক্ত মহারাজা কীর্তিচন্দ্র রায় মহাশয় সন ১১৪২ সাল তারিখ ৩০ কার্তিক।" কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-১৭৪০ খ্রীঃ অঃ। সুতরাং পুঁথিটি দুইশত বৎসরের প্রাচীন। পুঁথিতে রচনাকালজ্ঞাপক একটি পয়ারও আছে :

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে।
বাসুলী মঙ্গল গীত হইল সেই হইতে॥

ইহা হইতে ১৪২৯ শক বা ১৫০৭ খ্রীঃ অঃ পাওয়া যায়।[২৫] কবিকঙ্কণের চণ্ডীমঙ্গলের মুদ্রিত সংস্করণে কাব্যরচনাকাল হিসাবে এইরূপ উল্লেখ আছে :

শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতা।
কত দিনে দিলা গীত হরের বণিতা॥

---

২৫. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩৬০, ২য়) শ্রীত্রিদিবনাথ রায় 'বাসুলী মঙ্গল' প্রবন্ধে 'রথ' কে 'চরণ' ধরিয়া ২ স্থির করিয়াছেন। কিন্তু 'রথ' বোধহয় 'রস' হইবে। লিপিকার প্রমাদে এরূপ হওয়াই স্বাভাবিক। তাহা হইলে এই তারিখ হইবে—'শাকে রস রস বেদ শশাঙ্ক গণিতে"—১৪৯৯ শক বা ১৫৭৭ খ্রীঃ অঃ। কিন্তু এই তারিখও গ্রহণযোগ্য নহে, কারণ কবি এত প্রাচীন হইতে পারেন না। আধুনিক ভাষাই তাহার প্রমাণ।

মনে হয় দ্বিজমুকুন্দ এই শ্লোকের প্রভাবে নিজ কাব্যের রচনাকাল নির্দেশ করিয়াছিলেন। সম্পাদক সুবলচন্দ্র মনে করেন যে, বাসুলীমঙ্গল চণ্ডীমঙ্গলের পূর্ববর্তী রচনা। কিন্তু ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য সেরূপ অনুমানের পক্ষপাতী নহেন। কারণ দ্বিজমুকুন্দ কবিকঙ্কণের পূর্ববর্তী হইলে চণ্ডীমঙ্গলের কবি নিশ্চয় নিজ কাব্যে পূর্বসূরীর উল্লেখ করিতেন। কারণ কবিকঙ্কণ চণ্ডীমঙ্গলের আদিকবি মাণিকদত্তকে অভিবাদন করিয়া কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, দ্বিজমুকুন্দ তাঁহার পূর্ববর্তী হইলে কবিকঙ্কণ তাঁহার নামও উল্লেখ করিতেন। উপরন্তু প্রাপ্ত কাব্যের ভাষা বড জোর দুইশত বৎসরের পুরাতন হইতে পারে। পুথিটির নকলের তারিখ হইতে ১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ পাওয়া যাইতেছে—কবিও বোধহয় এই সময়ের অধিক পূর্ববর্তী হইবেন না।

কাব্যের প্রথমে মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে, তারপর বণিক ধূসদত্তের কাহিনী আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু কালকেতুর কাহিনী কবি বর্ণনা করেন নাই। আমাদের অনুমান, অপেক্ষাকৃত পরবর্তী কালের এই কবি মুকুন্দরামের আদর্শে ধনপতির কাহিনীর অনুকরণে ধূসদত্তের কাহিনী ফাঁদিয়াছেন। ধূসদত্ত নামটিও কবিকঙ্কণের কাব্যে আছে। কবি কিছু নূতনত্বের আশায় মুকুন্দরাম প্রদত্ত নামগুলি শুধু বদলাইয়া লইয়াছেন। বণিক ধূসদত্তের দ্বিতীয়া স্ত্রী রুক্মিণী, প্রথমা স্ত্রী সত্যবতী। স্বামী বাণিজ্যে গেলে সত্যবতী সতীন রুক্মিণীর প্রতি নির্যাতন আরম্ভ করে। ধূসদত্তের 'মায়াদহের পুলিনে' দেবী দর্শন, বর্ধমানের অধীশ্বর সুরথের নিকট তাহার গল্প, রাজাকে সেই দৃশ্য দেখাইতে না পারায় কারাবাস ইত্যাদি ঘটনা অবিকল মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের ধনপতির কাহিনীর অনুরূপ। শুধু ধনপতির স্থলে ধূসদত্ত, লহনার স্থলে সত্যবতী, খুল্লনার স্থলে রুক্মিণী, শ্রীমন্তের স্থলে গুণদত্ত এবং সিংহলের স্থলে বর্ধমান ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সামান্য নামধাম বাদ দিলে দ্বিজমুকুন্দ মুকুন্দরামের কাহিনীরই নকল করিয়াছেন। এমন কি বাঙাল মাঝিদের বিলাপের বর্ণনাও কবিচন্দ্র মুকুন্দ কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের রচনা হইতে বেমালুম আত্মসাৎ করিয়াছেন। যথা—

কাঁদেয়ে বাঙ্গাল ভাই বাফই বাফই।
কুখেনে আসিয়া প্রাণ বিদেশে হারাই॥

* * *

আর বাঙ্গাল বলে মুঞি হইনু অনাথ।
সর্ব্বধন গেল মোর হুকুতার পাত॥
হলদি হকুতা পাত্তা হিন্দল হিঞ্চই।
মজিল সকল মন কেমতে কুলাই॥

এ বর্ণনা পুরাপুরি কবিকঙ্কণের নকল। কবি কৌশলী 'কুম্ভীলক'; তাই পাত্র-পাত্রীর নামধাম বদলাইয়া পাঠকের চোখে ধূলি নিক্ষেপ করিতে চাহিয়াছিলেন। এই কাব্যের ভাষা আধুনিক ধরনের হইলেও কাব্যগুণবর্জিত। কাব্যটি জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারে নাই, জনপ্রিয় হইলে ইহার দ্বিতীয় পুঁথি মিলিত।

কয়েকজন অপ্রধান কবি॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর আরও কয়েকজন স্বল্প-প্রতিভাধর কবি মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গল ও পৌরাণিক চণ্ডিকার কাহিনী অবলম্বনে দুই একখানি অকিঞ্চিৎকর চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। এখানে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে। কৃষ্ণজীবন, লালা জয়নারায়ণ সেন, হরিরাম, অকিঞ্চন চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের বিশেষ কোন প্রতিভা না থাকিলেও ইতিহাসের ক্রম রক্ষার জন্য এখানে শুধু তাঁহাদের নাম উল্লেখ করা যাইতেছে।

কবি কৃষ্ণজীবনের 'অভয়ামঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা বলিয়া মনে হয়।[২৬] কোন কোন স্থলে কবি এই কাব্যকে 'অম্বিকামঙ্গল' বলিয়াছেন। নাটোরের ভূস্বামী প্রসিদ্ধ কালীভক্ত রাজা রামকৃষ্ণের সভায় অবস্থান করিয়া কবি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী রচনা করেন। বিষয়বস্তু মুকুন্দরামের অনুরূপ—কিন্তু ভাষা ও অন্যান্য ব্যাপারে মুকুন্দরামের বিশেষ কোন প্রভাব দৃষ্টিগোচর হয় না। আধুনিক কালের কবি বলিয়া তাঁহার ভাষা মার্জিত ও পরিচ্ছন্ন। তাঁহার অর্ধনারীশ্বরের বর্ণনাটি প্রশংসার যোগ্য:

অর্দ্ধেক বাহন সিংহ অর্দ্ধেক বৃষভ।
দক্ষিণ করেতে সিঙ্গা সঙ্খ বাম করে॥
ধুতুরা কুসুম কর্ণে কনক কুণ্ডল।
পরিধান পট্টবাস আর বাঘাম্বর॥

২৬. রঙ্গপুর সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩১৪, ১ম (কালীকান্ত বিশ্বাস—প্রাচীন বাঙ্গালা পুথির বিবরণ)

[illegible]

দক্ষিণ লোচনে তারা বামে ইন্দুবর ॥

লালা জয়নারায়ণ সেন বিক্রমপুরে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁহার অগ্রজ রামগতি ও অনুজ রাজনারায়ণও কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। জয়নারায়ণ এই ভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

গৌড়রাজ্য পুর্বভাগে বিক্রমপুরেতে।
রচিলাম এই গ্রন্থ ধর্মপ্রসঙ্গেতে ॥

১৬৯৪ শকে (১৭৭২ খ্রীঃ অঃ) কবির 'হরিলীলা' রচিত হয়, তাহার কিছু পরে তিনি চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে তিনি মুকুন্দরামের কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন, কেবল মাধব ও সুলোচনার গল্পটি নূতন সংযোজিত।[27] অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর এই কাব্য রচিত হয় বলিয়া ইহার ভাষা বেশ মার্জিত ও তির্যক। যথা—মদনকর্তৃক মহাদেবকে কামশরে বিদ্ধ করিবার প্রয়াস :

একবার নাহি পারে পুনশ্চ সন্ধান করে
স্মর নিজ শরে চুম্ব দিয়া।
ছোঁয়ায়ে রতির বুকে ধনুকে পুনশ্চ তাকে
ছুড়িলেক সাবধান হৈয়া ॥
নিরখে শঙ্কর পানে করিয়া জনলোকনে
দেখে যেন রজত অচল।
তেজ শত সূর্যপ্রায় শতচন্দ্র সম তায়
রত্নবেদি পরে ঝলমল ॥

অবশ্য কবির চণ্ডীমঙ্গল অপেক্ষা 'হরিলীলা' অধিকতর জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল।[28]

দ্বিজ গঙ্গানারায়ণের[29] 'ভবানীমঙ্গল' অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি রচিত হইয়াছিল। পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্র রচিত 'গৌরীমঙ্গলে' (১৮০৬-৭) এই কবির[30] উল্লেখ আছে।[31] সুতরাং কবির কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর

---

২৭. সা-প-প, ১৩০৭, ৩য় সংখ্যা (আনন্দনাথ রায়—কবি লালা জয়নারায়ণ)
২৮. পরে সত্যনারায়ণ সম্পর্কে কবির এই কাব্যপরিচয় দ্রষ্টব্য।
২৯. প্রবাসী, ১৩১৭, কার্তিক (শিবরতন মিত্র—গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল)
৩০. সা-প-প, ১৩০৩ (রামেন্দ্রসুন্দরের প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য)
৩১. গঙ্গানারায়ণ রচে ভবানী মঙ্গল।
কিরীটী মঙ্গল আদি হইল সকল ॥ ('গৌরী মঙ্গল')

মাঝামাঝি বা শেষভাগে রচিত হওয়াই সম্ভব। কবির পূর্বপুরুষগণের বাস ছিল বর্ধমান জেলার মোটরী গ্রামে। কবির পিতা তিতুরায় সেই গ্রাম ত্যাগ করিয়া শ্বশুরালয় বীরভূমের হস্তিকান্দায় বসবাস করেন। তাঁহার দুই পুত্র, গঙ্গানারায়ণ ও রামদুলাল। গঙ্গানারায়ণ ধর্মমতে শাক্ত ছিলেন। এখনও সেই গ্রামে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত অন্নপূর্ণা মূর্তি পূজা হয়। কবি সংস্কৃত ভাষায়ও যে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, তাঁহা তাঁহার তৎসম শব্দবহুল প্রগাঢ় রচনা হইতে বুঝা যায়। ইহাতে শিবদুর্গার পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ভাষা অতিশয় মার্জিত, কিন্তু ভারতচন্দ্রের মতো ততটা সরস নহে। যথা:

অভিলাষ করে দাস শুন মা শঙ্করী।
রচিব তোমার লীলা মনে বাঞ্ছা করি॥
পুরাণসম্মত কথা রচিল ভাষাতে।
অষ্ট দিবসের গান ছন্দ নানা মতে॥

ইহাতে চণ্ডীমঙ্গলের ধারা অনুসৃত হয় নাই, পুরাণের গল্পের সঙ্গে গৌরীর পিত্রালয়ে বাস ও পরে স্বামীসহ কৈলাসে বসবাস ইত্যাদি ঘটনা বর্ণিত হইয়াছে। কবি দুর্গামঙ্গল জাতীয় কাব্য লিখিলেও ইহাতে বহুস্থলে বৈষ্ণব মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের মতো তাঁহার ধর্মমত বেশ উদার, অবশ্য তাঁহার রচনায় কোথাও আদিরসের তপ্ত স্পর্শ নাই। কিন্তু রচনার উৎকর্ষে তিনি যে উচ্চ স্থানের অধিকারী নহেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

অকিঞ্চন চক্রবর্তী নামক আর এক কবি মুকুন্দরামের ধারা অনুসরণ করিয়া যে চণ্ডীমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, সম্প্রতি ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য তাঁহার পরিচয় সংগ্রহ করিয়াছেন।[৩২] ষোল পালায় বিভক্ত এই দীর্ঘ কাব্যে যথারীতি কালকেতু ও ধনপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। ইহার উপাধি ছিল কবীন্দ্র। কারণ ভণিতার একাধিক স্থলে কবি 'কবীন্দ্র চক্রবর্তী', 'কবীন্দ্র ব্রাহ্মণ'—এইরূপ উক্তি করিয়াছেন। তিনি বর্ধমানের রাজা তেজচন্দ্রের (১৭৭০-১৮৩২) সময়ে ঐ অঞ্চলে বাস করিতেন, কাব্যে তাহার

৩২. ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য—বাংলা মঙ্গল কাব্যের ইতিহাস, পৃ. ৪৫৮

উল্লেখ করিয়াছেন।[৩৩] ইহা হইতে মনে হয়, কবি অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। কাব্যটি পুরাপুরি কবিকঙ্কণের অনুকরণে রচিত হইয়াছে। দুই এক স্থলে কবি ঈষৎ মৌলিকতা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহার গুণগত উৎকর্ষ এমন কিছু প্রশংসনীয় ব্যাপার নহে। ভাষার মধ্যে চেষ্টাকৃত অলঙ্কার প্রয়োগ কৌশল সহজেই লক্ষ্য করা যাইবে :

> পুলোমজা পুরন্দরে প্রবোধিয়া দুর্গা।
> অবিলম্বে অবনী আইলা অপবর্গা॥
> বিশ্বমাতা বীরবরে বলেন মধুর।
> কান্তা সহ কালকেতু চল স্বর্গপুর॥
> বিমানে বসিলা বীর বনিতা লইয়া।
> গায় যমালয়ে পথে জয় জয় দিয়া॥

এখানে কৃত্রিম অনুপ্রাস মন্দ জমে নাই। কিন্তু কাব্যরসের দিক দিয়া কবি বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিতে পারেন নাই।

দেবীভাগবত অবলম্বনে দ্বিজ শিবচরণের 'গৌরীমঙ্গল', হরিশ্চন্দ্র বসুর 'চণ্ডীবিজয়'[৩৪], জগন্নাথের 'দুর্গাপুরাণ', পাকুড়ের রাজা পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরী-মঙ্গল' ইত্যাদি কাব্যে প্রতিভার বিশেষ কোন চিহ্ন নাই। সুতরাং এখানে পুঁথির তালিকা বাড়াইবার প্রয়োজন বোধ করিতেছি না। অনেকগুলি ছোট ছোট পুঁথিতে ব্রতকথার ঢঙে খুল্লনা-ধনপতির কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে —যেমন দ্বিজ রঘুনাথের 'মঙ্গলচণ্ডীর পাঁচালী', মদনদত্তের 'মঙ্গলচণ্ডীর কথা', দ্বিজ কৃষ্ণচন্দ্রের 'মঙ্গলচণ্ডীর গীত'। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য নহে। এখানে শুধু ইহাদের উল্লেখমাত্র করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

---

৩৩. ভূপতি তিলকচন্দ্র বর্ধমানে যেন ইন্দ্র
তেজচন্দ্র তাঁহার নন্দন।
নিবাস তাঁহার দেশে চণ্ডিকামঙ্গল ভাষে
কবীন্দ্র ব্রাহ্মণে অকিঞ্চন॥

৩৪. এই কাব্য সমাপ্ত হয় "পঞ্চভূৎ রীতুচন্দ্র শকের বিশেষ"—অর্থাৎ ১৬৫৫ শক বা ১৭৩৩ খ্রীঃ অব্দে। ইহাতে দেবী ভাগবতের অতিরিক্ত অনেক বিষয় আছে। দ্রষ্টব্য—সা. সা. প. প., ১৩১৫, ২য় সংখ্যা

শিবায়ন কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের সংখ্যা নিতান্তই স্বল্পতম। তন্মধ্যে রামেশ্বর চক্রবর্তীর (ভট্টাচার্য) 'শিব সঙ্কীর্তন' নানা কারণে জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। সপ্তদশ শতাব্দীর রামকৃষ্ণের শিবায়ন কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট—যদিও রামেশ্বরের মতো রামকৃষ্ণ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই। বাংলার লোকজীবনে বৃষভধ্বজ শিবপ্রমথেশ অপেক্ষা গঞ্জিকাধুস্তূরসেবী, পরস্ত্রীলোলুপ কৃষক-শিব অধিকতর প্রাধান্য লাভ করিয়াছেন—যাঁহাকে কেহ কেহ অস্ট্রিক-সংস্কৃতিজাত কৃষিদেবতার প্রতীক বলিয়া মনে করেন। পরে আর্য ও আর্যেতর সংস্কৃতির সমন্বয়ের সময় পৌরাণিক মহেশ্বর ও কুচনীরূপমুগ্ধ বৃদ্ধ শিব এক হইয়া গেলেন। ব্রাহ্মণ্য ও অব্রাহ্মণ্য, পৌরাণিক ও লৌকিক, ভারতীয় ও বাঙালী শিবের সমন্বয়ী রূপের পরিচয় পাইতে হইলে বাংলার স্বল্পসংখ্যক শিবায়ন কাব্যেই তাহার পূর্ণ চিত্র পাওয়া যাইবে। অবশ্য মঙ্গলকাব্যের অন্যান্য শাখার মতো এই শাখাটি ততটা প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই। অথচ অদ্যাপি লোকজীবনে, নানা ব্রতকৃত্যে, শিবের গাজনে এই আর্যেতর শিবের বিশেষ প্রভাব দেখিতে পাওয়া যায়। মঙ্গলকাব্যগুলির সঙ্গে শিবায়ন কাব্যের কতকগুলি মৌলিক প্রভেদ আছে। মঙ্গলকাব্যে দেবখণ্ড ও নরখণ্ড—দুইটি বিভাগ থাকে, কিন্তু শিবায়নে কৈলাসবাসী শিবের ঘরগৃহস্থালী বর্ণিত হইয়াছে—কোন ভক্ত কর্তৃক তাঁহার পূজা প্রচারের বিশেষ কোন কাহিনী নাই। বরং 'মৃগলুব্ধ' ধরনের ব্রতকথাজাতীয় আখ্যানে মঙ্গল-কাব্যের দেবদেবীর মতো শিবের পূজা প্রচারের কথা আছে। উপরন্তু চণ্ডী ও মনসামঙ্গলের গোড়ার দিকে দেবখণ্ডে শিবের লৌকিক কাহিনী সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। সেইজন্য বাংলার শিবসাহিত্য প্রবলভাবে বিশেষ প্রাধান্য অর্জন করিতে পারে নাই—ইহার সাহিত্যিক উৎকর্ষও এমন কিছু বিস্ময়কর নহে। যাহা হউক এখানে রামেশ্বর এবং শিবকাব্যের আরও কয়েকজন কবির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রামেশ্বর ভট্টাচার্য (চক্রবর্তী)॥ শিবায়ন শাখার সর্বাধিক জনপ্রিয় কবি রামেশ্বর ভট্টাচার্য ভারতচন্দ্রের অর্ধশতাব্দী পূর্বে এবং কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের দেড়শত বৎসর পরে আবির্ভূত হইয়াছিলেন এবং উক্ত দুইজন

প্রথম শ্রেণীর কবির ছায়ায় পড়িয়া প্রতিভা সত্বেও যথোচিত গৌরব লাভ করিতে পারেন নাই। পাণ্ডিত্য, শাস্ত্রজ্ঞান, বাস্তবতা, দৈনন্দিন জীবন-চিত্রাঙ্কন, হাস্যপরিহাস, কাব্যকলার সচেতন অনুশীলন, ভুয়োদর্শন—ইত্যাদি বিষয় বিচার করিলে তাঁহাকে প্রায় মুকুন্দরাম ও ভারতচন্দ্রের সমকক্ষ কবি বলিতে হইবে। অবশ্য একথা ঠিক যে, "ভবভাব্য ভদ্রকাব্য"[৩৫] প্রণেতা রামেশ্বর মুকুন্দরামের মতো প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন না। বিশেষতঃ সুবিস্তৃত পটভূমিকায় জীবনসৃষ্টির দুর্লভ শক্তি তাঁহার ততটা ছিল না। রচনাবৈদগ্ধ্যেও তিনি ভারতচন্দ্র অপেক্ষা নিম্নাসনের অধিকারী। তবু তাঁহার প্রতিভার উপযুক্ত সম্মান তিনি লাভ করিতে পারেন নাই। অথচ অষ্টাদশ শতাব্দীর মূল প্রেরণা তাঁহার 'শিবসঙ্কীর্তনে' প্রকৃষ্টরূপেই পাওয়া যাইবে। দেবতাকে মানবীকরণ, ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতের প্রভাবে দৈনন্দিন দুর্ভর জীবনের বাস্তব চিত্র, রঙ্গরস ও আদিরসের প্রতি আকর্ষণ ইত্যাদি অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈশিষ্ট্যগুলি তাঁহার রচনায় বিশেষভাবে ধরা পড়িয়াছে। কিন্তু তাঁহার প্রতিভা কোন দিক দিয়াই মধ্যম শ্রেণী অতিক্রম করিতে পারে নাই বলিয়া তিনি মুকুন্দরাম-ভারতচন্দ্রের ন্যায় দেশব্যাপী যশ লাভ করিতে পারেন নাই।

প্রথমে তাঁহার জীবনী সম্বন্ধে দুইচারি কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এ বিষয়ে শিবসঙ্কীর্তনের সম্পাদকগণ কিছু কিছু তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, কবি নিজেও কিছু কিছু তথ্য দিয়াছেন। তিনি যে জমিদার বংশের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বংশকাহিনী ও সমসাময়িক ইতিহাস হইতেও কবি সম্বন্ধে অল্পবিস্তর তথ্য পাওয়া যায়। উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে (বাংলা ১২৯৩ সন) রামেশ্বরের শিবায়নের 'বঙ্গবাসী' সংস্করণের সম্পাদক ঈশানচন্দ্র বসু, আধুনিক সম্পাদক অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগিলাল হালদার (কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় সংস্করণ, শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন, ১৯৫৭) এবং ডঃ শ্রীযুক্ত পঞ্চানন চক্রবর্তী (সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত সংস্করণ) তাঁহাদের

৩৫. চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর॥

কবি তাঁহার কাব্যের বহুস্থলে এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। রামেশ্বর বোধহয় গ্রাম্য অশ্লীল শিব কাহিনীকে মার্জিত ও পরিশুদ্ধ করিয়া ভদ্রকাব্য রচনা করিতে চাহিয়াছিলেন।

সম্পাদকীয় ভূমিকায় রামেশ্বর সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দিয়াছেন, তাহা হইতে কবিজীবনী সম্বন্ধে মোটামুটি সমস্ত কথাই জানা যায়। তন্মধ্যে ডঃ চক্রবর্তী সংগৃহীত তথ্য-উপাদানই অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

রামেশ্বর কাব্যমধ্যে নিজ গ্রামের নাম উল্লেখ করিয়াছেন, "সাকিম বরদাবাটী যদুপুর গ্রাম"। মেদিনীপুর জেলার ঘাঁটালের অন্তর্গত বরদা পরগণার অন্তর্ভুক্ত যদুপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়। এই গ্রাম এখনও আছে, কবির বাস্তুভিটার আলোকচিত্রও ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত সংস্করণে মুদ্রিত হইয়াছে। উক্ত গ্রামের অধিবাসীরা সম্প্রতি কবির স্মৃতিরক্ষাকল্পে নানা চেষ্টা করিতেছেন। ঐ গ্রামে এক বটবৃক্ষতলে প্রতি বৈশাখী পূর্ণিমায় এখনও অষ্টপ্রহরব্যাপী হরিসঙ্কীর্তন অনুষ্ঠিত হয়। কারণ গ্রামবাসীরা মনে করেন, কবি নাকি এই তিথিতে দেহত্যাগ করিয়াছিলেন। কবির ভিটার অদূরে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা শম্ভুরামের বংশধারা এখনও বর্তমান আছে। কিন্তু রামেশ্বরের কোন বংশধর নাই, সম্ভবতঃ তিনি নিঃসন্তান ছিলেন। কবির পিতামহ গোবিন্দ চক্রবর্তী বেদজ্ঞ পণ্ডিত ছিলেন। আসলে তাঁহারা শাণ্ডিল্য গোত্রোদ্ভূত বন্দ্যোপাধ্যায়-উপাধিক ব্রাহ্মণ। কিন্তু কবির প্রপিতামহ হইতে তাঁহারা 'চক্রবর্তী' উপাধি গ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা লক্ষ্মণ পাণ্ডিত্য ও যজন-যাজন ক্রিয়ার জন্য ভট্টাচার্য পদবী গ্রহণ করেন। কবির মাতার নাম রূপবতী। কবির দুই পত্নী—সুমিত্রা ও পরমেশ্বরী। তাঁহার জীবনের প্রথম দিকের ঘটনা কবি লিপিবদ্ধ করেন নাই। কিন্তু ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী মেদিনীপুর সাহিত্য পরিষদের সম্পাদক শ্রীরাধারমণ চক্রবর্তীর নিকট এই সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন।[৩৬] রাধারমণবাবুর নিকট রক্ষিত একখানি পুরাতন রোজনামচা হইতে ডঃ চক্রবর্তী অনুমান করেন যে, কবি রামেশ্বর ১৬৭৭ খ্রীঃ অব্দে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কবি নিজ গ্রাম যদুপুর ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ের জমিদারদের সভায় পুরাণপাঠক রূপে বাস করিয়াছিলেন। কেন তিনি নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া কর্ণগড়ে বসবাস করেন, কবি নিজেই তাহা জানাইয়াছেন :

৩৬. ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত ও সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'রামেশ্বর রচনাবলী', পৃ. ৫৬

পূর্ব্ব বাস যদুপুরে হেমৎ সিংহ ভাঙ্গে যারে
রাজা রামসিংহ কৈল প্রীত।
স্থাপিয়া কৌশিকীতটে বসিয়া পুরাণ পাঠে
রচাইল মধুর সঙ্গীত॥

রামেশ্বর শিবায়নের নানা স্থানে রাজা রামসিংহ ও তাঁহার পুত্র যশোমন্ত সিংহের প্রতি শ্রদ্ধা প্রকাশ করিয়াছেন :

রাজা রামসিংহ সুত যশোমন্ত নরনাথ
তস্য পোষ্য দ্বিজ রামেশ্বর॥

এই উল্লেখ হইতে মনে হয় হেমৎ সিংহ নামক কোন জমিদার বা সামন্ত কবির ঘরদুয়ার ভাঙিয়া দিলে তাঁহাকে রামসিংহ আশ্রয় দিয়াছিলেন। হেমৎ সিংহ ও রামসিংহের নাম মেদিনীপুরের ইতিহাসে নিতান্ত অপরিচিত নহে। স্থানীয় গ্রামে এই বিষয়ে নানা উপকথা প্রচলিত আছে। এখনও গ্রামবৃদ্ধগণ সেই কাহিনী আলোচনা করিয়া থাকেন। ডঃ চক্রবর্তী তাঁহাদের সঙ্গে সাক্ষাৎ ও আলাপ-আলোচনা করিয়া সেই সমস্ত কিংবদন্তী সংগ্রহ করিয়াছেন। ইহার গল্পের অংশ বাদ দিলে মোটামুটি ঘটনাটা দাঁড়ায় এইরূপ : মুঘল আমলে বর্ধমান-মেদিনীপুর-হুগলী অঞ্চল শোভাসিংহ নামক এক দুর্দান্ত জমিদারের হস্তগত হয়। এই জমিদাব বর্ধমান অধিকার করিয়া বর্ধমানের অনূঢ়া রাজ-কুমারীর উপর অনুচিত বল প্রয়োগ করিতে গিয়া তাহার দ্বারা নিহত হইলে তাঁহার কনিষ্ঠ ভ্রাতা হেমন্ত (হেমৎ, হিম্মৎ) সিংহ ভ্রাতার স্থানে প্রতিষ্ঠিত হন। ইঁহার সঙ্গে কবির কোন কারণে মনোমালিন্য হইলে উদ্ধত জমিদার কবিকে ভিটাচ্যুত করিয়া স্বগ্রাম হইতে বিতাড়িত করেন। অত্যাচারিত কবি তখন (সম্ভবতঃ ১৬৯৭-৯৮ খ্রীঃ অঃ) মেদিনীপুরের কর্ণগড়ের সামন্ত রামসিংহের আশ্রয়ে গিয়া তাঁহার সভায় পুরাণপাঠকের পদ লাভ করেন। রামসিংহ কবিপ্রতিভার পুরস্কার স্বরূপ[৩৭] রামেশ্বরকে নিকটবর্তী অযোধ্যানগর গ্রামে বসতবাটী নির্মাণ

৩৭. কেহ কেহ মনে করেন রামেশ্বরের উপাধি ছিল 'কবিকেশরী' (দ্রষ্টব্য : ডঃ চক্রবর্তীর সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ৫ ও ৩৩০)। কবির সত্যপীরের একখানি পুঁথিতে এইরূপ উক্তি আছে :

উদ্দেশে অষ্টাঙ্গে দ্বিজ করিল প্রণাম।
কহে কবিকেশরী কেশরকোণি রাম॥

অবশ্য কবি যদি 'কবিকেশরী' উপাধি লাভ করিতেন, তাহা হইলে ভারতচন্দ্রের 'রায়গুণাকর' উপাধির মতো কাব্যের নানা স্থলে তাহা ব্যবহার করিতেন। ইহা কবির সাধারণ বিশেষণ বলিয়াই মনে হইতেছে।

করাইয়া দিয়াছিলেন। কর্ণগড়ে আশ্রয় পাইয়া কবি নিশ্চিন্ত হইয়া কাব্য-রচনায় মনোনিবেশ করেন এবং অবকাশ মতো কিছু কিছু তীর্থদর্শন করেন। কবি এক সাধক ব্রাহ্মণ চন্দ্রচূড় চক্রবর্তীর নিকট তন্ত্রমতে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রামসিংহের পুত্র যুবরাজ যশোমন্ত সিংহের সঙ্গে কবির আন্তরিক প্রীতি ছিল। ১৭১১-১২ খ্রীঃ অব্দে রামসিংহের মৃত্যুর পর পুত্র যশোমন্ত সিংহ জমিদারী পাইয়া সুহৃৎ-কবি রামেশ্বরকে নিজের সভাকবির পদ দিয়াছিলেন। এইজন্য কাব্যের নানা স্থলে কবি রামসিংহ ও যশোমন্ত সিংহের স্তুতিবাদ করিয়াছেন। মনে হয় কবি যশোমন্ত সিংহের সময় অর্থাৎ ১৭১১-১২ খ্রীঃ অব্দের পরে 'শিবসঙ্কীর্তন' সমাপ্ত করেন। স্থানীয় অভিজাত বংশের সঙ্গে কবির বেশ ঘনিষ্ঠতা ছিল। কর্ণগড় রাজ্যের সেনাপতি পরমানন্দ কবির বিশেষ বন্ধু ছিলেন। তাঁহারা দুই জনেই বোধ হয় শাক্ত সাধনার পক্ষপাতী ছিলেন। কবির গুরুবংশের যে বোজনামচা রক্ষিত হইয়াছে, তদনুসারে ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী ১৭৪৪ খ্রীঃ অব্দকেই কবিব তিরোধান কাল বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন।[৩৮] এখনও কর্ণগড়ের মন্দিরপ্রাঙ্গণে কবি-সমাধির ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়।

কবির সম্বন্ধে আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামের মতো রাজনৈতিক বা ব্যক্তিগত কারণে কবিকে নিগ্রহ ভোগ করিতে হইয়াছিল, যদিও সে নিগ্রহ মুকুন্দরামের মতো কাব্যরসে পরিণত হইতে পারে নাই। বিদ্যাপতির মতো তিনি রাজবংশের আনুকূল্য লাভ করিলেও নাগরিক মনোভাব অর্জন করিতে পারেন নাই, ভারতচন্দ্রের মতো রাজসমীপে বাস করিয়াও সভাজীবী সাহিত্যের তীক্ষ্ণতা, বৈদগ্ধ্য ও উজ্জ্বলতা সৃষ্টি করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, সাধারণতঃ দুইখানি কাব্যের রচনাকার হিসাবে তাঁহার নাম উল্লিখিত হইয়া থাকে—(১) শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন এবং (২) সত্যপীরের ব্রতকথা। দুইখানি কাব্যই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী বহু সন্ধান করিয়া রামেশ্বর ভণিতাযুক্ত আরও কিছু কিছু রচনার সন্ধান পাইয়াছেন: (৩) শীতলামঙ্গল (মগপূজা পালা) এবং (৪) সত্যনারায়ণের ব্রতকথা (আখোটী পালা)। কিন্তু শিবসঙ্কীর্তন ও সত্যপীরের ব্রতকথাই অধিকতর প্রামাণিক বলিয়া আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে

৩৮. ঐ, ভূমিকা, পৃ. ৬৩

শুধু এই দুইখানি কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইব। প্রথমে সত্যপীরের ব্রতকথার বিষয়ে আলোচনা করা যাইতেছে। মনে হয়, স্বগ্রামে বাস করিবার সময় কবি সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) ব্রতকথা রচনা করেন। তার পর রামসিংহ-যশোমন্তসিংহের পৃষ্ঠপোষকতায় শিবায়ন গান রচনা করেন।

রামেশ্বরের সত্যপীরের ব্রতকথা একদা কিছু জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ বটতলা হইতে ইহার একাধিক মুদ্রণ হইয়াছিল। অক্ষয়চন্দ্র সরকার সম্পাদিত 'প্রাচীন কাব্য সংগ্রহে'ও ইহা মুদ্রিত হইয়াছিল (১৮৭৫)। পরে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় 'সত্যপীরের কথা' (১৯২৯) প্রকাশিত হয়। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'রামেশ্বর রচনাবলী'তে উহা পুনরায় গৃহীত হইয়াছে। ডঃ চক্রবর্তী তিনখানি পুরা পুঁথি (একখানি ১২২৮, আর একখানি ১২৫৯ সালের নকল, অপর পুঁথি সনতারিখ বর্জিত) এবং একখানি খণ্ডিত পুঁথি (সনতারিখ নাই) অবলম্বনে সত্যপীর-কাহিনী সম্পাদনা করিয়াছেন। অবশ্য তিনি মুদ্রিত গ্রন্থেরও সাহায্য লইয়াছেন। তন্মধ্যে ১৮৮৬ খ্রীঃ অব্দে প্রকাশিত ঈশানচন্দ্র বসু প্রকাশিত 'সত্যনারায়ণ ব্রতকথা'[৩৯], ১৩৩০ সালে বটতলা হইতে মাণিকচন্দ্র দে সংগৃহীত 'সত্যনারায়ণের কথা', ১৩৩৬ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নগেন্দ্রনাথ গুপ্তের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'সত্যপীরের কথা' এবং কাঁথি নীহার প্রেস হইতে প্রকাশিত 'রামেশ্বরের সত্যনারায়ণের পাঁচালী' ('আখোটী পালা') অবলম্বনে ডঃ চক্রবর্তী 'সত্যপীরের ব্রতকথা' সম্পাদনা করিয়াছেন। পুঁথি এবং মুদ্রিত কাব্যের আখ্যান প্রায় একরূপ, মাঝে মাঝে ভাষাভঙ্গিমায় অল্পস্বল্প পার্থক্য আছে। কিন্তু কাঁথি নীহার প্রেস প্রকাশিত 'আখোটী পালার'

৩৯. ভূমিকায় সম্পাদক বলিয়াছেন, "১৭৯৭ শকে খ্যাতনামা শ্রীযুক্ত অক্ষয়চন্দ্র সরকার মহাশয়ের প্রকাশিত প্রাচীন কাব্য সংগ্রহের মধ্যে ৺রামেশ্বরকৃত সত্যনারায়ণের পালা মুদ্রিত হইয়াছিল। আমি ১১১২, ১১৮৮ ও ১২৩৯—এই তিন সালের হস্তলিখিত তিনখানি পুঁথির পাঠ বিচার করিয়া উহার পাঠ নির্বাচন করিয়া দিয়াছিলাম এবং কঠিন অংশের অর্থ ব্যাখ্যা করিয়া দিয়াছিলাম। সেই সটীক সত্যনারায়ণ সহকৃত "প্রাচীন কাব্য সংগ্রহ" পুনশ্চ প্রকাশিত হইয়াছে। এদেশে সত্যনারায়ণের পূজার সময় রামেশ্বরের রচিত সত্যনারায়ণের কথা পাঠ হয়। অতএব সাধারণের ইহাতে প্রয়োজন আছে। যথার্থ রামেশ্বর বিরচিত সত্যনারায়ণের গ্রন্থ অল্পমূল্যে সকলে পাইতে পারেন। এই উদ্দেশ্যে মূলমাত্র এই রামেশ্বরী সত্যনারায়ণকথা প্রকাশিত হইল।"

বর্ণনা ও কাহিনী সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরনের—যদিও ভণিতায় এই প্রকার উল্লেখ আছে—"দ্বিজ রামেশ্বর গায় বলে কৃত্তিবাস।" অন্য স্থলেও "দ্বিজ রামেশ্বর বলে", "দ্বিজ রামেশ্বর গায়", "দ্বিজ রামেশ্বর ভাবে" প্রভৃতি ভণিতা আছে। মনে হয়—ইনি অন্য কোন অর্বাচীন কবি হইবেন, ইঁহার রচনার ধারা বৈশিষ্ট্যবর্জিত ও গতানুগতিক।

পশ্চিমবঙ্গে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের ধর্মমত একত্র করিয়া যে মিশ্র দেবতার উদ্ভব হয়, তিনি সত্যপীর—হিন্দুর ঘরে ইনি অধিকাংশ স্থলে নারায়ণ বা সত্যনারায়ণ রূপে পূজিত হন। ইনি লৌকিক এবং অর্বাচীন কালের দেবতা হইলেও দুইখানি সংস্কৃত পুরাণে (স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ড এবং বৃহদ্ধর্মপুরাণের উত্তরখণ্ড) এই কাহিনীর উল্লেখ আছে এবং মুসলমান পীর-প্রভাবিত সত্যনারায়ণের পূজাও ছদ্মনামে প্রচারিত হইয়াছে। বলা বাহুল্য দুই-এক শতাব্দী পূর্বে এই সমস্ত অর্বাচীন কাহিনী উর্দু-ফারসী জবান ছাড়িয়া সংস্কৃত ভাষার খোলস ধারণ করিয়া হিন্দুর গৃহে স্থান পাইয়াছে।[৪০]

রামেশ্বরের সত্যপীর কাহিনীও অর্বাচীন পুরাণের গল্পের উপর ভিত্তি করিয়া রচিত হইয়াছে।[৪১] বোধ হয় এই উপকাহিনীর জড পশ্চিমবঙ্গের হিন্দু-মুসলমান জনসমাজেই নিহিত ছিল[৪২], তাহাই অর্বাচীন কালে সংস্কৃত পুরাণে প্রক্ষিপ্ত হয়।

রামেশ্বর কাব্যের প্রথমে সর্বদেবদেবী বন্দনা ও চৈতন্যাদির স্তুতির পর[৪৩] এইভাবে সত্যপীরের বন্দনা করিয়াছেন :

জয় জয় সত্যপীর সনাতন দণ্ডীর
দেবদেব জগতের নাথ

৪০. সত্যনারায়ণ সত্যপীর প্রসঙ্গে পরে আলোচিত হইয়াছে।

৪১. "রামেশ্বরের সত্যপীরের পাঁচালীকে স্কন্দপুরাণের রেবা ও বৃহদ্ধর্ম পুরাণের উত্তর খণ্ডের অনুবাদ বলিলেই চলে। স্কন্দপুরাণের বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ এখানে ফকিররূপে চিত্রিত হইয়াছেন।" ডঃ চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ, ৩৬

৪২. ডঃ সুকুমার সেন—বাং. সা. ইতি, ১ম, অপরার্ধ, পৃ. ৪৫০

৪৩. কবি বন্দনাংশে শ্রীচৈতন্য, অদ্বৈত, নিত্যানন্দ, বীরভদ্র, রূপসনাতন, রামানন্দ, সারঙ্গ গোঁসাই (?), সার্বভৌম প্রভৃতি ভক্তদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। কবি যে ব্যক্তিগত ধর্মমতে বৈষ্ণব ছিলেন, ইহা তাহার অন্যতম প্রমাণ।

কে জানে তোমার তত্ত্ব তুমি রজঃ তুমি সত্ত্ব
তোমার চরণে প্রণিপাত ॥

তারপর কবি আখ্যান আরম্ভ করিয়াছেন। "দিল্লীর দক্ষিণ দেশ মথুরেশপুর" —সেই মথুরেশপুরে বিষ্ণুশর্মা নামে এক দরিদ্র ধর্মভীরু ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ব্রাহ্মণ ছিলেন কৃষ্ণের পরম ভক্ত। তাঁহার দুঃখ কষ্ট ঘুচাইবার জন্য শ্রীকৃষ্ণ ফকিরের (সত্যপীর) বেশে ব্রাহ্মণীর নিকট উপস্থিত হইয়া উর্দু-ফারসী জবানে বাতচিত করিতে লাগিলেন এবং ব্রাহ্মণকে সত্যপীরের পূজা ও শীর্ণি দিতে বলিলেন। কিন্তু ব্রাহ্মণ হইয়া তিনি যবনের আচার কি করিয়া গ্রহণ করিবেন? তিনি চিন্তিত হইলে পীরবেশী কৃষ্ণ নিজ পরিচয় দিয়া বলিলেন:

বিধি মোর বড় ভাই মহেশ অনুজ।
শঙ্খ চক্র গদাপদ্ম ধারী চতুর্ভুজ ॥
কংস কেশী মথনে কেশব মোর নাম।
মক্কায় রহিম আমি অযোধ্যার রাম ॥
* * *
ফকির হইয়া আমি তোমার কারণ।
কলিতে সম্প্রতি আমি সত্যনারায়ণ ॥

তাঁহার নির্দেশে ব্রাহ্মণ শীর্ণি (সিন্নি) দিয়া সত্যপীরের পূজা করিলেন, মর্ত্যে পীরের পূজা প্রচার লাভ করিল, ব্রাহ্মণের দুঃখ ঘুচিল। ব্রাহ্মণ পীরপূজা-পদ্ধতি লিখিয়া দিলে লোকে তাহা নকল করিয়া বাড়ী লইয়া গেল এবং সেই নির্দেশ অনুসারে সত্যপীরের পূজা-শীর্ণি দিয়া উপাসনাস্থলে পীরমাহাত্ম্যকথা পাঠ করিতে লাগিল।[৪৪] ইহাই রামেশ্বরের সত্যপীর কাহিনীর প্রথম আখ্যান। দ্বিতীয় আখ্যানে সদানন্দ নামে এক বণিকের গল্প বর্ণিত হইয়াছে।

নিঃসন্তান বণিক সদানন্দ সত্যপীরের শীর্ণি মানিয়া চন্দ্রকলা নাম্নী এক কন্যা লাভ করিল। পরে চন্দ্রকলা বয়ঃপ্রাপ্তা হইলে সাধু কন্যার বিবাহ দিয়া জামাতাকে সঙ্গে লইয়া দক্ষিণে বাণিজ্য করিতে গেল। ইতিমধ্যে সে পীরের শীর্ণি দিতে ভুলিয়া গিয়াছিল। এইজন্য তাহাকে জামাতাসহ

৪৪. পূজার পদ্ধতি ভাষা রচ্যা দিল তবে।
নকল লিখায়্যা লোক লয়্যা গেল সভে ॥
(অতঃপর রামেশ্বরের সমস্ত উদ্ধৃতি ডঃ চক্রবর্তীর সম্পাদিত গ্রন্থ হইতে গৃহীত হইবে।)

রাজকারাগারে বিলক্ষণ কষ্ট পাইতে হইল। এদিকে চন্দ্রকলা বহুদিন পিতা ও স্বামীর সংবাদ না পাইয়া সত্যপীরের পূজানুষ্ঠান করিল। তখন পীর নিদ্রিত রাজাকে স্বপ্নে ভয় দেখাইলেন। ফলে বণিক ও জামাতা সসম্মানে মুক্তি পাইল, অনুতপ্ত রাজা বহু খেসারত দিলেন। মুক্তি পাইয়া জামাতা ও প্রচুর ধনবত্নসহ বণিক দেশে ফিরিল। কিন্তু এ সমস্ত যে সত্যপীরের কৃপাতেই হইয়াছে, সে কথা বণিক জানিতে পারিল না। ছদ্মবেশী পীর বণিককে পরীক্ষা করিবার জন্য তাহার নিকট কিছু যাচ্ঞা করিতে আসিলেন, কিন্তু ধূর্ত বণিক তাঁহাকেও বঞ্চনা কবিতে চাহিল। তখন পীর বণিককে কিঞ্চিৎ শাস্তি দিয়া তাহাকে আক্কেল দিলেন, বণিক পীবের শীর্ণি মানিয়া রেহাই পাইল। এদিকে চন্দ্রকলা স্বামী ও পিতার সংবাদ পাইয়া অতি ব্যস্ততার জন্য পীরের শীর্ণির অবমাননা করিয়া অতি দ্রুত ঘাটে আসিয়া পৌঁছাইল। কন্যার অপরাধে সাধুর নৌকা ঘাটে ভিড়িয়াও ডুবিয়া গেল। তখন চন্দ্রকলা নিজ অপরাধ বুঝিতে পারিল, পীবেব শীর্ণি ভক্তিভবে আহার করিলে নিমজ্জিত তরী ধনরত্নসহ আবার ভাসিয়া উঠিল, সুখে ঐশ্বর্যে বণিক সদানন্দের সংসার ভরিয়া উঠিল।

এই অকিঞ্চিৎকর কাহিনীটি সাহিত্যাংশে কোনও দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে, অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেব হুবহু অনুকরণমাত্র। আধা-মঙ্গলকাব্য, আধা-পাঁচালী ধরনের বিশেষত্ববর্জিত এই কাহিনীব জন্য রামেশ্বরকে ধন্য ধন্য' করিবার প্রয়োজন নাই। ইহার কাহিনী চবিত্র কিছুই মনের মধ্যে রেখাপাত করে না। পূজা ও শীর্ণি লাভের জন্য সত্যপীরের অশোভন ব্যগ্রতা ভদ্রেতর ও স্ত্রীসমাজেই আসর জমাইয়াছিল। হিন্দু-মুসলমান ধর্ম্মমতের সমন্বয়ের গৌরব কেহ কেহ রামেশ্বরের উপর আরোপ করিয়া বলিয়াছেন, "ধর্ম এক, সম্প্রদায় বিস্তর,—ঈশ্বর এক, তাঁহার নাম নানা। রাম ও রহিম এক, রামেশ্বর এই কথা কয়েকবার মধুরভাবে লিখিয়াছেন।"[৪৫] কেহ-বা বলেন যে, কবি ব্যক্তিগত ধর্মমতে কালীমন্ত্রের উপাসক হইলেও, "তিনি ধর্মের সমন্বয়বাদিরূপে অনায়াস উদারতায় মুসলমানদের দেবতাকেও হিন্দুর দেবতার সঙ্গে এক করিয়াছেন। কারণ তাঁহার মধ্যে ধর্মান্ধতাবশতঃ ভেদবুদ্ধি ছিল

৪৫. সত্যপীরকথা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, ভূমিকা, পৃ. ।৶৹

না।"[৪৬] কিন্তু ধর্মীয় ঔদার্য অপেক্ষা বরং এইরূপ সিদ্ধান্ত করা অধিকতর যুক্তি-সঙ্গত যে, মুসলমান শাসনের চণ্ডনীতি হইতে আত্মরক্ষা করিবার জন্য হিন্দুরা এইরূপ একটি মিশ্র দেবতার উদ্ভাবন করিয়া প্রবল মুসলমানের হস্তক্ষেপ হইতে কোনও প্রকারে নিজ নিজ ধর্ম বাঁচাইতে চাহিয়াছিলেন। আর তাহা ছাড়া সত্যপীরের উদ্ভাবয়িতা রামেশ্বর নহেন, সুতরাং তাঁহাকে এই কাব্যের জন্য উচ্চ প্রশংসা করা যায় না। তাঁহার সমকালে এবং পরেও বহু ব্যক্তি সত্যপীর-সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন, বটতলা হইতে বর্তমান শতাব্দীতেও এইরূপ অসংখ্য পুস্তিকা প্রকাশিত হইয়াছে, এখনও হইতেছে।[৪৭] রামেশ্বর পীরমাহাত্ম্য-কাব্য ও শিবসঙ্কীর্তন রচনা করিলেও কৌলিক ধর্মমতে শাক্তই ছিলেন—কিন্তু বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি তাঁহার অধিক আনুগত্য দেখা যায়। শিবসঙ্কীর্তন ও সত্যপীরের ব্রতকথায় কবির বৈষ্ণবধর্মানুকূল অজস্র পংক্তি পাওয়া যায়।

রামেশ্বরের শিবায়নে যে আলঙ্কারিক মণ্ডনকলা লক্ষ্য করা যায় সত্যপীর ব্রতকথায় কিন্তু তাহার বিশেষ চিহ্ন নাই। ইহা প্রথম রচনা বলিয়াই বোধ হয় তাঁহার রচনাভঙ্গিমা সঙ্কোচ কাটাইয়া উঠিতে পারে নাই। মাঝে মাঝে সত্যপীরের উর্দু-ফারসী-হিন্দী মিশ্রিত জবান কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সৃষ্টি করিয়াছে বটে, কিন্তু এ বৈশিষ্ট্যও তাঁহার এক শতাব্দী পূর্ববর্তী কবি কৃষ্ণরাম দাসের মঙ্গলকাব্যে দেখা গিয়াছিল। অনেক সময় ওজঃ ও বীররস সঞ্চারের জন্য কৃষ্ণরাম গ্রাম্য শব্দের সঙ্গে উর্দু-ফারসী শব্দের মিশ্রণ করিয়াছিলেন, কখনও কখনও নিতান্ত অশ্লীল বদ জোবানও ব্যবহার করিয়াছিলেন। কিন্তু রামেশ্বরের সত্যপীর মুসলমানী শব্দ ব্যবহার করিলেও কুরুচিপূর্ণ ভাষার ধার দিয়াও যান নাই। কোন এক সমালোচক কবির সত্যপীর কাহিনীর বিশেষ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছেন, "এই কবি অসামান্য ভাষা ও শব্দকুশলী। সংস্কৃত জানিতেন, তাহার উপর ফারসী ও উর্দু ভাষায় অসীম ক্ষমতা।···আগাগোড়া ভাষা চোস্ত, জমাট, ধারালো, ফেনাইবার ফাঁপাইবার চেষ্টা কোথাও নাই।"[৪৮] একথা অবশ্য ঠিক যে, এই পণ্ডিত-কবি সংস্কৃত ভাষায় অভিজ্ঞ

৪৬. ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর গ্রন্থ, পৃ. ৬৪

৪৭ অষ্টাদশ হইতে বিংশ শতাব্দীর মধ্যে অন্ততঃ পঞ্চাশ জন কবি সত্যনারায়ণের পাঁচালী লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের কাব্য ধোপে টিকিয়া গিয়াছে।

৪৮. সত্যপীরকথা—নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সম্পাদিত, (ক. বি.) পৃ ।৶৹

ছিলেন, উত্তর ভারতীয় আদর্শের প্রভাবে হিন্দী-উর্দু-ফারসী ভাষাতেও কিছু রপ্ত হইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার ভাষাভঙ্গিমায় 'চোস্ত, জমাট, ধারালো' প্রভৃতি যে সমস্ত বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তাহা ভারতচন্দ্রেই অধিকতর যুক্তিসঙ্গত হইত। যাহা হউক বিশেষত্বহীন সত্যপীর কাহিনীতে কবির পূর্ণ-প্রতিভার যে কোনরূপ ছায়া পড়ে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভণিতায় রামেশ্বরের নাম না থাকিলে আমরা ইহা যে-কোন তৃতীয় শ্রেণীর কবির রচনা বলিয়া ধরিয়া লইতাম।

রামেশ্বরেব শ্রেষ্ঠকাব্য শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন। এই কাব্যের কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, ছাপার যুগে ইহার একাধিক সংস্করণ হইয়াছে, কিন্তু অধিকাংশ পুরাতন ছাপা গ্রন্থে পুঁথির বিশুদ্ধি রক্ষিত হয় নাই।[৪৯] অক্ষয়চন্দ্র সরকার, ঈশানচন্দ্র বসু, নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত এবং আধুনিক কালে ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী অনেকটা সতর্ক হইয়া পুঁথি সম্পাদনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে ডঃ চক্রবর্তীর সংস্করণ অধিকতর নির্ভরযোগ্য।

বামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন সাত পালা ও জাগরণ-আরম্ভ পালায় সমাপ্ত—প্রত্যেক দিন ও রাত্রিতে এক পালা গীত হওয়াই রীতি। তন্মধ্যে প্রথম হইতে তৃতীয় পালার কিয়দংশে পুরাণাশ্রিত কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। প্রথম পালায় পুরাণানুসারী সৃষ্টি, দেবতাদির উৎপত্তি কথন, দ্বিতীয় পালায় দক্ষযজ্ঞ নাশ ও সতীর দেহত্যাগ, দক্ষের ছাগমুণ্ডের কাহিনী, তৃতীয় পালায় হিমালয় গৃহে গৌরীর জন্ম, হিমালয় গৃহে শিবের আগমন, মহাদেবের ধ্যানভঙ্গের অপরাধে মদনভস্ম ও রতিবিলাপ, গৌরীর তপস্যা, গৌরী ও ছদ্মবেশী শিবের বাক্যপ্রবন্ধ, শিবের বিবাহ প্রভৃতি বর্ণিত হইয়াছে। এই পর্যন্ত পৌরাণিক কাহিনীর ধারা ঘনিষ্ঠভাবে অনুসৃত হইয়াছে। পদ্মপুরাণ, স্কন্দপুরাণ, নন্দিকেশ্বর পুরাণ, লিঙ্গপুরাণ, কালিদাসেব কুমারসম্ভব প্রভৃতি পৌবাণিক ও ক্ল্যাসিক সাহিত্য হইতে কবি পৌরাণিক কাহিনীর উপাদান সংগ্রহ

৪৯. অধ্যাপক শ্রীযুক্ত যোগিলাল হালদার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোগে রামেশ্বরের শিবসঙ্কীর্তন বা শিবায়ন সম্পাদনা করিয়াছেন। তিনি কুচবিহার রাজ-লাইব্রেরীতে রক্ষিত একখানি পুঁথির আধুনিক নকলের উপর অধিক নির্ভর করিয়াছেন, মূলপুঁথি চাক্ষুষ করেন নাই। এইরূপ পরোক্ষ রীতি প্রাচীন কাব্যসম্পাদনের আদর্শ রীতি নহে। তিনি তৎপর হইয়া মূল পুঁথি ও তাহার নকলের পাঠ তুলনা করিলে সম্পাদনার কার্য আরও সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন করিতে পারিতেন।

করিয়াছেন। হরপার্বতীর বিবাহের পর হইতে পৌরাণিক কাহিনী অল্পে অল্পে অপসৃত হইয়াছে এবং কৃষিপ্রধান জীবন হইতে উত্থিত লৌকিক শিবের কাহিনী জাঁকাইয়া বসিয়াছে। কবি পৌরাণিক অংশে গতানুগতিক পন্থা অনুসরণ করিয়াছেন—চতুষ্পাঠীতে পড়িয়া তিনি সংস্কৃত ভাষায় কৃতবিদ্য হইয়াছিলেন, শিবসঙ্কীর্তনের পৌরাণিক অংশে তাহার পরিচয় রহিয়াছে। কিন্তু পুরাণের ঘনিষ্ঠ অনুকরণের জন্য কবি এই অংশে বিশেষ কোন মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই।[৫০] বরং পরবর্তী কবি ভারতচন্দ্র 'অন্নদামঙ্গলে'র পৌরাণিক অংশে ঘটনাসন্নিবেশে পৌরাণিক কাহিনী অনুসরণ করিলেও কবিত্ব ও মৌলিকত্বের পরিচয় দিয়া নিজ প্রতিভার শ্রেষ্ঠত্বই প্রমাণ করিয়াছেন। হইতে পারে রায়গুণাকর মুকুন্দরাম ও রামেশ্বরের নিকট কোন কোন দিক দিয়া ঋণী, কিন্তু কবিত্ববিচারে অধমর্ণ যে উত্তমর্ণদিগকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

তৃতীয় পালার মাঝামাঝি হইতে রামেশ্বর লৌকিক কাহিনী অনুসরণ করিয়াছেন। বরবেশী শিবকে দেখিয়া মেনকার বিলাপ, শিবের মোহনমূর্তি ধারণ, হরগৌরীর বিবাহ—এই স্থানে তৃতীয় পালা সমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ পালায় শিবের গার্হস্থ্য জীবনের লৌকিক কাহিনীর চিত্র বর্ণিত হইয়াছে। মহাদেবের ভিক্ষা-উপজীবিকা, হরগৌরীর কলহ, ঝুলি হইতে শিবের ধনরত্ন বাহির করা, হরগৌরীর নানা তত্ত্বকথা আলোচনা, রামনাম মাহাত্ম্য ও হরিনাম মাহাত্ম্য ঘোষণা—এই স্থলে চতুর্থ পালা পরিসমাপ্ত হইয়াছে। চতুর্থ পালায় মূলঘটনাবহির্ভূত ভক্তি ও তত্ত্বকথা অধিক স্থান অধিকার করিয়াছে। পঞ্চম ও ষষ্ঠ পালায় যথাক্রমে কৃষ্ণের রুক্মিণীহরণ ও বিবাহ এবং বাণরাজার কন্যা উষার সঙ্গে কৃষ্ণের পৌত্র অনিরুদ্ধের গোপন মিলন এবং সেই প্রসঙ্গে হরিহরের যুদ্ধ, এবং সপ্তম পালায় শিবরাত্রির আখ্যান বর্ণিত হইয়াছে। কিন্তু যথার্থ লৌকিক কাহিনী ষষ্ঠ, সপ্তম ও জাগরণ পালায় সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। ষষ্ঠ পালায় মহাদেবের কৈলাস ত্যাগ ও কৃষিকার্য গ্রহণ এবং সপ্তম পালায় বাগদিনীবেশিনী মহামায়ার সঙ্গে শিবের মৎস্য ধরা, শিবকে ছলনা করিয়া দেবীর কৈলাসে প্রস্থান এবং শিবেরও কৈলাস

৫০. "পুরাণখণ্ডে তাঁহার কাব্যের বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই, কেবল পুরাতনের পুনরাবৃত্তি।" —ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ১১২

যাত্রা—এই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। জাগরণ পালায় নারদের প্ররোচনায় পার্বতীর স্বামীর নিকট শাঁখা পরিবার বাসনা, শিবের অসামর্থ্য জানিয়া দেবীর সাভিমানে পিত্রালয়ে গমন, শিবেরও কৈলাস যাত্রা। জাগরণ পালায় গৌরীকে শাখা পরাইয়া বৃদ্ধ মহাদেবের পত্নীর মানভঞ্জনের চেষ্টা, অতঃপর হরপার্বতীর পুনর্মিলনে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাই লৌকিক কাহিনীর ধারা। পৌরাণিক অংশে কবি যে পুরাণকথার নকল করিয়াছেন, তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। রামেশ্বরের এই কাব্যে যদি কোন কৃতিত্ব থাকে, তবে তাহা মহাদেবের গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায়। মহাদেবের কৃষিকার্য, বাগদিনীবেশিনী দেবী কর্তৃক মহাদেবের ছলনা এবং গৌরীর শঙ্খপরিধান—এই অংশেই কবির মৌলিকতা বিশেষভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। এই লৌকিক কাহিনীগুলি কোন প্রামাণিক পুরাণে পাওয়া যায় নাই। কেবল নন্দিকেশ্বরপুরাণে (অর্বাচীন পুরাণ) কিঞ্চিৎ পরিমাণে শিবের কৃষিকার্যের বর্ণনা পাওয়া যায়। এই সম্বন্ধে কিছু কিছু সংস্কৃত উদ্ভট শ্লোকও দুষ্প্রাপ্য নহে। এখানে এইরূপ একটি শ্লোকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :—

রামাদ্ যাচয় মেদিনীং ধনপতেঃ বীজং বলাল্লাঙ্গলং
প্রেতেশান্মহিষং তবাস্তি বৃষভঃ ফালং ত্রিশূলং এব।
শক্তাহং তব চান্নদানকরণে স্কন্দোঽস্তি গোরক্ষণে
খিন্নাহং হর ভিক্ষয়া কুরু কৃষিং গৌরীবচঃ পাতু বঃ॥

অর্থ : গৌরী শিবকে বলিতেছেন, "রামের নিকট হইতে তুমি কিছু ভূমি মাগিয়া লও, ধনপতি কুবেরের নিকট হইতে বীজ আর বলরামের নিকট হইতে লাঙ্গল, প্রেতরাজ যমের নিকট হইতে চাহিয়া লও মহিষ, তোমার নিজেরই তো বৃষ রহিয়াছে—আর তোমার ত্রিশূল তো ফাল, আমি নিজে তোমাকে (মাঠে) অন্ন দিয়া আসিতে পারিব। স্কন্দ গোরক্ষণে শক্ত; হে হর, ভিক্ষায় আমি খিন্ন, তুমি এইবার কৃষি কর।"[৫১]

প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থাদিতেও কৃষক শিবের উল্লেখ নিতান্ত দুষ্প্রাপ্য নহে। বৈদিকযুগ মূলতঃ কৃষিযুগ বলিয়া অনেক বৈদিক দেবদেবীই কৃষিদেবতার প্রতীক, কিন্তু প্রাচীন ভারতে রজতগিরিনিভ শিবকে ক্ষেত্রপালরূপে চিত্রিত

৫১. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে হরগৌরীর প্রেম (বিশ্বভারতী পত্রিকা ১৩শ বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা)

করা হয় নাই। পরবর্তী কালের অর্বাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে ভোলামহেশ্বরকে গার্হস্থ্য সমস্যায় বিব্রত দরিদ্র ব্রাহ্মণরূপেই চিত্রিত করা হইয়াছে—এবং দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য হরগৌরী কৃষিকার্য অবলম্বনের কথা চিন্তা করিতেছেন—এইরূপ বর্ণনা প্রাদেশিক সাহিত্যেও প্রচুর পাওয়া যায়। বিদ্যাপতি শিবগীতিকায় বাংলা দেশের শিবায়নে বর্ণিত কৃষক শিবের অনুরূপ শিবচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। সেখানেও দরিদ্র শিবকে 'কিরিষ' অর্থাৎ কৃষিকার্যে মন দিতে বলা হইয়াছে। খট্বাঙ্গ কাটিয়া লাঙ্গল, শূল ভাঙিয়া ফাল নির্মাণ করিয়া তাহাতে বৃষকে জুড়িয়া দিতে ভক্ত শিবকে অনুরোধ করিতেছেন।[৫২] অসমিয়া ওড়িয়া প্রভৃতি প্রাদেশিক ভাষাতেও কৃষক শিবের বর্ণনা লোকসাহিত্যের অঙ্গস্বরূপ এখনও বাঁচিয়া আছে।[৫৩] ধর্মমঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত শূন্যপুরাণে শিবের চাষবাসের যে বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে, তাহার উৎসও একই প্রকার। যাহা হউক আমাদের অনুমান, কৃষিপ্রধান—বিশেষতঃ ধান্য-প্রধান পূর্ব-ভারতে নিষাদযুগ হইতে (অস্ট্রিক) ধান্যক্ষেত্রের দেবতারূপে ক্ষেত্রপাল ধরনের কোন কৃষিদেবতার পূজা তদানীন্তন আর্যেতর কৃষকসমাজে প্রচলিত ছিল। এইজন্য মধ্যযুগীয় লৌকিক বাংলা সাহিত্যের একটা বড়ো অংশে ধান্যের এত বিচিত্র বর্ণনা দেখিতে পাওয়া যায়।[৫৪]

৫২. বেরি বেরি অরে সিব মো তোয় বোলো
কিরিষ করিঅ মন লাই।
* * * *
খটগ কাটি হরে হর জে বঁধাওল
তিসুল তোড়িঅ করু ফারে।
বসহা ধুরন্ধর হর লএ জোতিঅ
পাটএ সুরসরি ধারে।

(হে শিব, আমি তোমাকে বার বার বলি, মন দিয়া কৃষিকার্য কর।...হে হর, খট্বাঙ্গ কাটিয়া হল বাঁধাও, ত্রিশূল ভাঙিয়া তাহার ফাল তৈয়ার কর। হে হর, তোমার ধুরন্ধর বৃষকে লইয়া জুড়িয়া দাও। গঙ্গার ধারায় ক্ষেতের পাট কর।)

৫৩. ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ১৭৭ ৭৮

৫৪. মধ্যযুগীয় কোন কোন বাংলা কাব্যে সবিস্তারে বিভিন্ন প্রকার ধান্যের তালিকা ও গুণবর্ণনা পাওয়া যায়। ধর্মপূজাবিধান, শূন্যপুরাণ, কৃষ্ণরাম দাসের কমলামঙ্গল, ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, দয়ারাম দাসের বিনন্দ রাখালের পালা, কিঙ্করের লক্ষ্মীসরস্বতীর ঝগড়া পালা প্রভৃতিতে নানাপ্রকার ধান্যের নাম আছে। রামেশ্বরের শিবায়নে উল্লিখিত বহুপ্রকার ধান্যের

পৌরাণিক কাহিনী ও চরিত্র বিন্যাসে কবিপ্রতিভার যে বিশেষ কোন কৃতিত্বের পরিচয় ফুটে নাই তাহা পাঠকেরা স্বীকার করিবেন। এখানে কবি ভয়ে ভয়ে পূর্বতন আদর্শ অনুসরণ করিয়া চলিয়াছিলেন—স্বাধীনভাবে যথেচ্ছা বিচরণ করিতে পারেন নাই। কিন্তু হরপার্বতীর ঘর-গৃহস্থালী, দারিদ্র্য, কলহ, শিবের কৃষিকর্ম, মৎস্যধরা এবং শিব কর্তৃক পার্বতীকে শঙ্খ পরানোর বৃত্তান্তে তাঁহার গ্রন্থনৈপুণ্য ও চরিত্রবিন্যাস অধিকতর সহজ ও সরস হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার অনেক পূর্ব হইতেই হরপার্বতী সংক্রান্ত এই প্রকার লোককান্ত গালগল্প সমগ্র পূর্বভারতের কৃষক ও সাধারণ সমাজে প্রচলিত ছিল—যাহার জড় অতি প্রাচীন প্রাগৈতিহাসিক অস্ট্রিক কৌমযুগে নিহিত ছিল বলিয়া মনে হয়। অস্ট্রিকজাতি অর্থাৎ নিযাদজাতি খুব সম্ভব কৃষি ও মৎস্যজীবী জীবনের আদিম স্তরে বাস করিত, সেই দূরপ্রস্থিত জীবনধারার ক্ষীণ প্রতিধ্বনি পূর্বভারতের লৌকিক শিবকাহিনীর মধ্যে শুনিতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশে শিবের কৃষিকার্য, বাগদিনীবেশিনী দুর্গার সঙ্গে কাদাজলে নামিয়া মৎস্য ধরার বৃত্তান্ত এবং দুর্গার শঙ্খ পরিধানের তিনটি গল্প পৃথক পুঁথির আকারেও জনপ্রিয় হইয়াছিল; শুধু রামেশ্বর ভণিতায় তিন পালার বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। মনে হয়, কবি পৌরাণিক কাহিনীর দ্বারা গ্রন্থের কলেবর পূর্ণ করিলেও লোকসমাজে উপরোক্ত লৌকিক কাহিনীর অধিকতর জনপ্রিয়তা ছিল।

কাব্যের লৌকিক অংশ হরপার্বতীর দারিদ্র্যের বাস্তব চিত্রসহ আরম্ভ হইয়াছে। দারিদ্র্য দূরীকরণের জন্য পার্বতীর স-ঝঙ্কার উপদেশে শিবকর্তৃক

মধ্যে এখানে কয়েকটির নাম প্রদত্ত হইতেছে:—কালাকান্দু, কালাজিরা, কানীফুল, কর্ণিকা, কালিন্দী, কটকী, কুসুমশালী, কনকচূর, দুধরাজ, দুর্গাভোগ, কৃষ্ণশালী, কুঙরভোগ, কলমীলতা, কনকলতা, খেজুরথুপী, খয়েরশালী, গঙ্গাজল, গয়াবালি, গোপালভোগ, গৌরীকাজল, গন্ধমালতী, গুয়াথুপী, গুলাপকর, চামরশালী, চন্দনশালী, ছত্রশালী, জলাশালী, জগন্নাথভোগ, জামাঝিলাড়ু, জলারাঙ্গী, ঝিঙ্গাশালী, বলাইভোগ, নন্দনশালী, পাতসাভোগ, পায়রারস, তিনসাগরী, বাঁকশালী, বাঁকচূর, ইত্যাদি। ভারতচন্দ্রও আমু, বোরো, আমন তিন প্রধান শ্রেণীর ধান্যবর্ণনার পর মেঘভাসা, কালাসনা, কালিন্দী, ছায়াচুর, গুয়াশালী, হরিলেবু, গুয়াথুবী, বাঁশফুল, কাঁটারাঙ্গি, কপিলভোগ, শিবজটা, গঙ্গাজল প্রভৃতি ধান্যের বিস্তৃত তালিকা দিয়াছেন; কবি এই বর্ণনায় শুধু "রাঢ়ের সরু চালুর" উল্লেখ করিয়াছেন। বরেন্দ্র ও বঙ্গের ধান্যের তালিকা ধরিলে এই বর্ণনা কত দীর্ঘ হইত তাহা সহজেই অনুমেয়।

ইন্দ্রের নিকট চাষবাসের উপযুক্ত জমির পাট্টা গ্রহণ, কুবেরের নিকট বীজ ধান কর্জ, তারপর ভৃত্য ভীমসহ শিবের ধান্য রোপণ—এই সমস্ত বর্ণনায় কবি যে বাস্তবজ্ঞান ও সহানুভূতির পরিচয় দিয়াছেন, তাহার নিপুণ পর্যবেক্ষণ শক্তি বিশেষভাবে প্রশংসা করিতে হইবে। পরে কোন্দল-বিশারদ নারদ ঋষির মিথ্যা প্রজল্পে পার্বতী কর্তৃক মহাদেবকে কৃষিক্ষেত্র হইতে কৈলাসে ফিরাইয়া আনার জন্য সম্ভব অসম্ভব চেষ্টাও খুব কৌতুকজনক হইয়াছে। পার্বতী কৃষিকার্যে নিরত মহাদেবকে উত্যক্ত করিয়া কৈলাসে ফিরাইয়া আনিবার জন্য ডাঁশ মশা প্রেরণ করিলেন। এই মশা—

স্বল্প বটে শরীর সামর্থ্যে নহে ক্রটি।
হাতী পারা জন্তুকে হারাতে পারে দুটি॥

কৃষিক্ষেত্রে চন্দ্রচূড় এক হাঁটু কাদার মধ্যে দাঁড়াইয়া চাষের তদারক করিতেছেন, এমন সময় মশার দল তাঁহাকে ঘিরিয়া ধরিল। তখন "চমকিয়া চন্দ্রচূড় চালাইলা চড"। তাহার পরের বর্ণনা বাস্তবতা ও কৌতুকরসের দিক হইতে চমৎকার হইয়াছে।

ঠুস ঠাস ঠুই ঠাই ঠাকুরের করে।
দশ পাঁচ উড্যা যায় দুই চারি মরে॥

কবি হালকা চালে 'মশার কীর্তনে'ও বেশ মুন্সিয়ানার পরিচয় দিয়াছেন :

চাপড়ের চটচাট হাল্যার হুটপাট
সট সট নাড়িছে পুচ্ছ।
এই রূপ মর্দন মশার কর্দম
একহাত হৈল উচ্চ॥

মহাদেবকে ফিরাইয়া আনিবার সমস্ত চেষ্টা ব্যর্থ হইলে পার্বতী বাগদিনী বেশ ধরিয়া মহাদেবের ধানক্ষেতে উপস্থিত হইলেন। ডাঁশ, মশা, মাছি, জোঁক পাঠাইয়া মহামায়া যাহা করিতে পারেন নাই, শুধু বাগদিনী বেশ ধরিয়া—

কামিনী কটাক্ষ শরে
অস্থির করিলা ভূতনাথে।

প্রথম প্রথম শিবের সন্দেহ হইল, তিনি ভৃত্য ভীমকে একবার বলিলেন, আমার কেমন সন্দেহ হইতেছে—"মোর মনে হেন লয় কদাচিত হবে তোর মামী।" ভৃত্য ভাগিনা প্রতিবাদ করিয়া বলিল, তা' কি করিয়া হইবে? তাহার মামী তো গৌরাঙ্গী, আর এ যে কালো বাগদিনী। আরও পার্থক্য আছে,

"মামীর বয়েস বাড়া, মামী ঢেঙ্গা এ যে গেঁড়া"। বাক্যচ্ছলে মহামায়া নিজ পরিচয় দিলেও শিব বাগদিনীকে 'সাঁগা' করিতে ব্যগ্রতা প্রকাশ করিলেন, এমন কি খোদ মহামায়াকেও ছাড়িয়া দিবেন কবুল করিলেন। শেষে বাগদিনী-মোহে মহেশ্বর হাঁটুজলে নামিয়া জল সেঁচিয়া মাছ ধরিতে লাগিলেন :

ধরেন পাবদা-পুঁঠি পাঙ্গাস পাঠীন।
চিতল চিঙ্গড়ী চেলা চাঁদকুড়্যা মীন ॥
ধানছলি ধবাচি ধরিল ডানিকোনা।
মৌরলা টেঙ্গরা ভোলা খলিস নয়না ॥
ভেটেঙ্গরাকে ধরিল ভেচক্ষ্যা দিল ছেড়্যা।
সোলশাল রোহিত মৃগাল ধরে তাড়্যা ॥

অতঃপর রোহিত, কাল্বাস, কাতলা, কমঠ, ভেটকী, ইলিস, মাগুর, ফলই, গড়ই, কই, পাঁকাল, চেঙ—এমন কি কাঁকড়া-শামুক-গুগলিতেও মহামায়া হাঁড়ি ভরিয়া ফেলিলেন। শিব বাগদিনীর নির্দেশ মতো কাদাজল ঘাঁটিয়া মাছ ধরিলেন এবং মনোমত অভিলাষ জানাইলেন—"অতঃপর আলিঙ্গনে অনুকূলা হও"। ইতিপূর্বে দেবী সুকৌশলে "শিবের মাণিক্য অঙ্গুরী লক্ষ নৃপতির ধন" হস্তগত করিয়াছিলেন। তখন শিবকে বাসর নির্মাণ করিতে বলিয়া ছদ্মবেশিনী দেবী কৈলাসে ফিরিয়া গিয়া নিজ মূর্তি ধরিলেন। এদিকে বাসর সাজাইয়া শিব অপেক্ষা করিতে করিতে হতাশ হইয়া পড়িলেন, তারপর ভয়ে ভয়ে বুড়া বৃষে চড়িয়া কৈলাসধামে পৌছাইলেন। গৌরী সক্রোধে ছেলেদের হুকুম দিলেন :

তোর বাপ বাগদি হয়্যাছে ছাড়্যা মোকে।
তার ঠাঞি যাস নাঞি ছুঁস নাই তাকে ॥

প্রচণ্ড দাবড়ি দিয়া দুর্গা মহেশ্বরকে ঘরে প্রবেশ করিতে নিষেধ করিলেন :

বাগতির লাজ নাঞি ঘরে ঢুকে মোর।
ছেল্যাপুল্যা ছুঁইলে ছুতুক হবে ঘোর ॥
ভালো যদি চাও তো এখান হৈত্যে যাকু।
যেখানে রাখিয়া আল্য বাগদিনী মাগু ॥[৫৫]

৫৫. মহাদেব বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে পার্বতীর গাত্র স্পর্শ করিয়া মান ভাঙাইতে আসিলে দেবীর নিকট বেশ ভালো রকমের 'অর্ধচন্দ্র' লাভ করিয়াছিলেন :

বাগদিনী-প্রেমমুগ্ধ মহাদেব যখন দেখিলেন, তাঁহার প্রদত্ত অঙ্গুরীয় দেবী বাহির করিয়া দিয়া আসল কথা ফাঁস করিয়া দিয়াছেন, তখন হর মনে মনে জিভ কাটিয়া বলিলেন, "কেন আইলাম হেথা!" হরপার্বতীর মধ্যে তৎক্ষণাৎ একটা হুলস্থূল অনর্থ বাধিয়া যাইত, কিন্তু নারদের মধ্যস্থতায় স্বামী স্ত্রীর মধ্যে তখনকার মতো সন্ধি স্থাপিত হইল।

ইহার পর শঙ্খ পরিধান পালা আরম্ভ। নারদের প্ররোচনায় দেবী মহাদেবের কাছে শঙ্খ পরিতে চাহিলেন। ইতিপূর্বে দেবী নারদের সামনে মহাদেবকে বাগদিনী প্রসঙ্গে যথেষ্ট 'হেনস্থা' করিয়াছিলেন, মহাদেবও তাহার জন্য ক্ষুণ্ণ হইয়াছিলেন। দেবীর শাঁখা পরিবার বাসনায় মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া ব্যঙ্গের স্বরে বলিলেন,

> ভিখারীর ভার্যা হৈয়া ভূষণের সাধ।
> কেন অকিঞ্চন সনে কর বিসম্বাদ॥
> বাপ বটে বড় লোক বল গিয়া তারে।
> জঞ্জাল ঘুচুক যাহ জনকের ঘরে॥

এইরূপ কথার খোঁটা কোন্ স্ত্রীই-বা সহ্য করিতে পারে? সক্ষোভে পার্বতী সন্তানাদিসহ পিত্রালয়ে যাত্রা করিলেন। ব্যাপার এত দূর গড়াইবে তাহা পশুপতি বুঝিতে পারেন নাই। নানা অনুরোধ-উপরোধ করিয়াও তিনি ক্ষুব্ধ দেবীকে নিবৃত্ত করিতে পারিলেন না, তখন "আড় হয়্যা পশুপতি পড়িলেন পথে।" কিন্তু মহাদেবকে ঠেলিয়া ফেলিয়া ক্রুদ্ধা চণ্ডিকা হিমালয় ভবনে যাত্রা করিলেন, "পাথারে ফেলিয়া গেল পর্বতের ঝি।" মহাদেব নানা বাধা সৃষ্টি করিয়া দেবীকে পিত্রালয়ে যাইতে নিবৃত্ত করিতে চাহিলেন, কিন্তু দেবী ইন্দ্রের রথ আনাইয়া তাহাতে চড়িয়া বাপের বাড়ী পৌঁছাইলেন, হিমগৃহে আনন্দের শারদোৎসব শুরু হইল। এদিকে "শক্তিহীন শিব যেন জীবহীন দেহ।" তিনি যোগবলে একজোড়া বাইশঙ্খ সৃষ্টি করিয়া শাঁখারীর ছদ্মবেশে হিমালয়ে শ্বশুরালয়ে উপস্থিত হইলেন, তারপর নানা ছলাকলা কলকৌশলে শাঁখারী শিব পার্বতীর হাতে শাঁখা পরাইলেন, অতঃপর হর ছদ্মবেশ ত্যাগ করিলেন, দেবদম্পতীর

> গোসা ছিল গৌরীর গুমান গেল ভর‍্যা।
> ঘর হৈতে ঘুচাইল ঘাড় ধাক্কা মার‍্যা॥
> পূর্ব দুঃখে পার্বতী পেলিল পূর্ণ কাম।
> উচ্চ পিড়া হৈতে পড়্যা বুড়া বলে রাম॥

পুনর্মিলন হইল, হিমাচলে আনন্দের স্রোত বহিল। অবশ্য বাসরে পুনর্মিলনের সময় পার্বতী বাগদিনী বেশ ধরিয়াই মহাদেবের তৃপ্তি সাধন করিলেন। অতঃপর হরপার্বতী ও সন্তানেরা বিজয়া দশমীর পর কৈলাসে ফিরিয়া গেলেন। শস্য পাকিলে ভৃত্য ভীম "দু মণে দা লইয়া হাথে" ধান কাটিতে লাগিল। সর্বশেষে কবি বিবিধ ধান্যের তালিকা দিয়া গীত সমাপ্ত করিয়াছেন।

এই লৌকিক কাহিনীতে দরিদ্র শিবের গার্হস্থ্য জীবন, দাম্পত্য কলহ, চাষবাস, মাছধরা প্রভৃতি বর্ণনায় পুরাপুরি বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গি রক্ষিত হইয়াছে। বিশেষতঃ শিবের কৃষিকার্য ও ধান্যরোপণের কাহিনীতে ব্রাহ্মণকবির কৃষিকর্ম বিষয়ে নিপুণ অভিজ্ঞতা ও আন্তরিক আকর্ষণ সূচিত হইয়াছে। শিব কর্তৃক ইন্দ্রের নিকট জমির পাট্টা গ্রহণ এবং কুবেরের নিকট বীজধান কর্জ করার বৃত্তান্তে একযুগের সাধারণ বাঙালী কৃষাণের জীবনচিত্র পরিস্ফুট হইয়াছে। কোন এক লেখক বলিয়াছেন, "এ দেবাদিদেব মহেশ্বর এবং জগন্মাতা পার্বতীর কৈলাসজীবন নয়, এ অতীত বাংলার কোন শিবদাস ভট্টাচার্য এবং তস্য ভার্যা পার্বতী ঠাকুরাণীর জীবন কাহিনী।"[৫৬] শিবের ঘরগৃহস্থালীর বর্ণনা কতকটা সেইরূপই বটে। কবি যে শিবকে কৃষক-শিবে পরিণত করিয়াছেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। কৃষি সম্বন্ধে কবির যাবতীয় অভিজ্ঞতা শিবের ধান্য রোপণের কাহিনীতে নিঃশেষিত হইয়াছে। যাহা হউক হরপার্বতীর চরিত্র যে লৌকিকতার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারে নাই তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দেবী যে ভাষায় মহাদেবের সঙ্গে কলহ করিয়াছেন, বাগদিনী-বেশ ধারণ করিয়া অনুচিত ছলনায় মাতিয়াছেন, ভীমের প্রতি কটুবাক্য প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ঈশ্বরী-মহিমা আদৌ রক্ষিত হয় নাই। তাঁহার মান-অভিমান, দারিদ্র্যের সংসার, পুত্রকন্যাদের জন্য চিন্তা, নিষ্কর্মা স্বামীর ভিক্ষুক বৃত্তি ও চারিত্রত্রুটি তাঁহাকে চিন্তাভারপীড়িত সাধারণ গৃহিণীতে পরিণত করিয়াছে। মহাদেবের লাম্পট্য দোষ[৫৭] গণমানসেরই

৫৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ২৬

৫৭. কুচনীপাড়ায় গিয়া শিবের কুচনী যুবতীদের লইয়া মত্ত হইবার বর্ণনায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'শিব সঙ্কীর্তন' বা শিবায়নের সম্পাদক অধ্যাপক যোগিলাল হালদার অশ্লীলতা দেখিতে পান নাই, "শিবের হরিগুণগানে কোঁচিনীদের যোগদানে অশ্লীলতার গন্ধ কোথাও আছে বলিয়া মনে হয় না।" শ্রীযুক্ত হালদারের এই মন্তব্য বিশেষ যুক্তিযুক্ত বলিয়া

উপযুক্ত হইয়াছে। কৃষ্ণের গোপীলীলার ছায়াতলে মহাদেবের কুচনীবিলাস পরিকল্পিত হইয়াছে।[৫৮] কিন্তু ইহা হইতে গ্রাম্য মনের অভব্যতা দূর হইতে পারে নাই—যদিও কবি 'ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর' বলিয়া অনুপ্রাসের রঙ্গে মাতিয়াছেন। রামকৃষ্ণ ও ভারতচন্দ্র শিবচরিত্র লইয়া যথাক্রমে 'শিবায়ন' ও 'অন্নদামঙ্গল' রচনা করিয়াছিলেন। রামকৃষ্ণ লৌকিক কাহিনীকে সঙ্কুচিত করিয়া পুরাণসাহিত্য অবলম্বনে শিবচরিত্রের সংযম রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ভারতচন্দ্র কোচনীপ্রসঙ্গ ও বাগদিনী লীলা এড়াইয়া গিয়াছেন। তিনিও অবশ্য শিবচরিত্রের মহিমা রক্ষা করার প্রয়োজন বোধ করেন নাই, কিন্তু রচনাব উৎকর্ষে তিনি রামেশ্বরকে বহু দূরে অতিক্রম করিয়া গিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ শিবায়ন সাহিত্যকে লক্ষ্য করিয়াই বলিয়াছিলেন, "বাংলা দেশের গ্রাম্য কুটীরের প্রাত্যহিক দৈন্য ও ক্ষুদ্রতা সমস্তই প্রতিবিম্বিত। তাহাতে কৈলাস ও হিমালয় আমাদের পানাপুকুরের ঘাটের সম্মুখে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাদের শিখররাজি আমাদের আমবাগানের মাথা ছাড়াইয়া উঠিতে পারে নাই" ('লোকসাহিত্য')। বাস্তবিক রামেশ্বরের শিবায়ন পণ্ডিত ব্যক্তির রচনা হইলেও হরপার্বতীর লৌকিক লীলায় গ্রাম্য ধুলোট উৎসব ও গম্ভীরা গাজনের রঙ্গরস উতরোল হইয়া উঠিয়াছে। অষ্টাদশ

মনে হইতেছে না। শিবায়নে কোচপল্লীতে গিয়া শিবের অনুচিত রঙ্গরসের কথাই বর্ণিত হইয়াছে। সেখানে উন্নতযৌবনা কোচরমণীদের লইয়া শিবের বিহারকে কবি স্বয়ং বলিয়াছেন :

কোঁচিনী সকল হৈল কুসুম-উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় মধু করে পান॥

এ বর্ণনায় স্পষ্টই আদিরসের ইঙ্গিত রহিয়াছে। তাহা ছাড়া গ্রন্থের মধ্যে অনেক স্থলে অনাবৃতভাবে কোচনী প্রসঙ্গের উল্লেখ আছে। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও এই অমার্জিত কাহিনী প্রবেশ করিয়াছে। বাগদিনীবেশী দেবীকে দেখিয়া হরের কামোন্মত্ততা গ্রাম্য মনেরই উপযুক্ত হইয়াছে। শঙ্খপরা উপাখ্যানের অন্তে হর-পার্বতীর বাসর বর্ণনায় কবি আদিরসকে অনেকটা সংযত করিয়াছেন বটে, কিন্তু বৃদ্ধ হর এবং প্রায়-প্রৌঢ়া দুর্গার বাসর বর্ণনা কবি নেপথ্যে সারিলেই সুরুচি ও সঙ্গতিবোধের পরিচয় দিতেন।

৫৮. কৃষিকার্যে ব্যস্ত মহাদেব দেবীকে ভুলিয়া থাকিলে দেবী দুঃখ করিয়া জয়াকে বলিয়াছেন :

শঙ্কর মাধব হল্য মহী মধুপুরী।
কৈলাস হৈল ব্রজ আমি রাধা প্যারি॥

শতাব্দীর পঙ্কশেষ জীবন-প্রবাহের ধূসর মন্থরতা দেবদম্পতীকে এমনভাবে ঢাকিয়া ফেলিয়াছে যে, কবির বাস্তব জ্ঞান ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার মুন্সিয়ানা প্রশংসিত হইলেও তাঁহার চরিত্রপরিকল্পনা যে নিতান্তই সামান্য ব্যাপার তাহা অস্বীকার করিয়া লাভ নাই। কেহ কেহ এই কাব্যকে "a national poem of the medieval Bengal"[৫৯] বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, কেহ-বা রামেশ্বরকে 'কৃষকের কবি'[৬০] বলিয়াছেন। কেহ কেহ মনে করেন, অষ্টাদশ শতাব্দীর আর কোন বাঙালী কবি এতটা 'fellow-feeling' এবং 'humanism' দেখাইতে পারেন নাই।[৬১] কোন সমালোচক এই কাব্যে চমৎকার কৌতুকরসের পরিচয় পাইয়াছেন।[৬২] আবার কেহ-বা অন্য দৃষ্টিকোণ হইতে বিচার করিয়া বলিয়াছেন. "রামেশ্বর কোন গভীর ভাব উদ্রেক করিতে চেষ্টা করেন নাই।"[৬৩] এই সমস্ত মন্তব্যের দ্বারা প্রমাণিত হইতেছে, এই কবিকে অবহেলায় ফেলিয়া রাখিবার উপায় নাই। তাঁহার প্রভাব যে নানা মনে বিচিত্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি করিয়াছে তাহা এই সমস্ত মন্তব্য হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে। সাধারণ ধরনের গ্রামীণ মনের উপযোগী এই পাঁচালীকে জাতীয় কাব্য আখ্যা দেওয়া যুক্তিসঙ্গত নহে। বোধ হয় কৃত্তিবাসী রামায়ণ ও কাশীদাসী মহাভারত ছাড়া আর কোন কাব্যকেই মধ্যযুগের একমাত্র প্রতিনিধি বলিয়া মানিয়া লওয়া যায় না। ইহাতে কবির সহানুভূতি দরিদ্র শিবের ঘরগৃহস্থালীর প্রতি অধিকতর আকৃষ্ট হইয়াছে। তাই বলিয়া ইহাতে কোনও প্রকার মানবতাবাদ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহাও মনে হয় না। কৌতুকরস অবশ্য ইহাতে আছে। ভৃত্য ভীমের প্রতি বাগদিনীবেশী দুর্গা যেরূপ কটুকাটব্য করিয়াছেন তাহাতে কিঞ্চিৎ বীররসেরও সঞ্চার হইয়াছে। দেবী যেখানে রণরঙ্গিণী মূর্তি ধরিয়া বাগদিনী-সংস্পর্শের অপরাধে খোদ মহাদেবকে ঘর হইতে ভাগাইয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন, তখন উগ্রচণ্ডা দেবীর অভিযোগবাক্যে বেশ উত্তাপ সঞ্চারিত হইয়াছিল—

৫৯. Dr. Asutosh Bhattacharya—Early Bengali Saiva Poetry, p. 37

৬০. ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত রামেশ্বর রচনাবলী, পৃ. ১৭০

৬১. Dr. Asutosh Bhattacharya—Ibid

৬২. কবিশেখর কালিদাস রায়—প্রাচীন বঙ্গ সাহিত্য, ১ম, ২য় ভাগ

৬৩. দীনেশচন্দ্র সেন—বঙ্গভাষা ও সাহিত্য

কিন্তু অনেক স্থলেই ঘটনা জমাট বাঁধিতে পারে নাই, চরিত্রগুলিও যাত্রা-ভিনয়ের চরিত্রে পর্যবসিত হইয়াছে। নারদ, ভীম প্রভৃতি চরিত্রাঙ্কনেও তিনি লোকচেতনার ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই। যে কৌতুকরস মাটির কাছাকাছি বিরাজ করে, যাহার সঙ্গে নির্ভেজাল গ্রাম্যমনের অধিকতর সম্পর্ক, কবি তাহাতে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—এইস্থলে তাঁহার সঙ্গে ভারতচন্দ্রের প্রধান পার্থক্য। ভারতচন্দ্রের রঙ্গরসে মার্জিত নাগরিকতার চাকচিক্য বেশী, রামেশ্বরের হাস্যকৌতুক গ্রাম্য কৃষাণজীবনেরই সরিক। তাঁহাকে কৃষকের কবি বলা না গেলেও (কারণ সাধারণ কৃষকে তাঁহার কাব্য বুঝিবে না), এই কাব্য রচনাকালে তাঁহার মানসনয়নে যে রাঢ়ের কৃষকপল্লীর বাস্তবচিত্র ভাসিতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কয়েকস্থলে অবশ্য কবি প্রায় ভারত-চন্দ্রের মতোই কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। সপুত্র মহাদেবের ভোজন এবং দুর্গার পরিবেশনের বর্ণনাটি চমৎকার ফুটিয়াছে:

তিন ব্যক্তি ভোক্তা একা অন্ন দেন সতী।
দুটি সুতে সপ্তমুখ পঞ্চমুখ পতি॥
তিন জনে একুনে বদন হইল বার।
গুটি গুটি দুটি হাতে যত দিতে পার॥
তিন জনে বার মুখে পাঁচ হাতে খায়।
এই দিতে এই নাঞি হাঁড়ি পানে চায়॥
*　　*　　*
কার্ত্তিক-গণেশ বলে অন্ন আন মা।
হৈমবতী বলে বাছা ধৈর্য ধরি খা॥

মহাদেব দুই পুত্রের সঙ্গে সলা করিয়া সব অন্ন চাঁছিয়া পুঁছিয়া খাইয়া গৌরীকে বেকায়দায় ফেলিতে চাহিলে দেবীর মহিমায় সকলের ক্ষুধাই শান্ত হইয়া গেল। দেবী পুনরায় অন্ন পরিবেশন করিতে আসিলে "শার্দূলঝম্পনে সভে আগুলিল পাতে"। সকলের ভোজনের শেষে দেবী অন্ন গ্রহণ করিলেন। এক যুগের সাধারণ গৃহস্থের প্রসন্ন জীবনচিত্রটি এই ভোজন বর্ণনায় চমৎকার ফুটিয়াছে। তাঁহার বর্ণনার অনেকস্থলে সাধারণ বাঙালীর দৈনন্দিন জীবন বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে। অনেকে ভারতচন্দ্রের ঈশ্বরী পাটুনীর উক্তিটির ("আমার সন্তান যেন থাকে দুধেভাতে") বিশেষ প্রশংসা করিয়া থাকেন। কিন্তু রামেশ্বরের এই ধরনের কোন কোন উক্তি ভারতচন্দ্র অপেক্ষা

ন্যূন নহে তাহাও স্বীকার করিতে হইবে। বিবাহের পর কন্যা বিদায়ের প্রাক্কালে শাশুড়ী জামাতাকে বলিতেছেন :

কুলীনের পোকে আর কি বলিব আমি।
বাছার অশেষ দোষ ক্ষমা কর তুমি॥
আঁটু ঢাক্যা বস্ত্র দিয় পেট ভরা ভাত।
প্রীত কর‍্য যেমন জানকী রঘুনাথ॥

'আঁটু ঢাকা বস্ত্র' ও 'পেট ভরা ভাত' কুলীন কন্যার ইহা অপেক্ষা আর কিছুই চাহিবার ছিল না। এক যুগের সম্পন্ন গৃহস্থের চিত্রটিও এখানে দু' একটি রেখার আঁচড়ে যেভাবে পরিস্ফুট হইয়াছে, কোন সামাজিক ইতিহাসের দুই অধ্যায়েও তাহা ততটা সার্থক হইতে পারিত না।

এবার রামেশ্বরের রচনারীতি সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা প্রয়োজন। বহুকাল পূর্বে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় রামেশ্বরের রচনাবৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে বলিয়াছিলেন, "রামেশ্বরের কবিতা তেজস্বী জাঙ্গল লতার ন্যায়।"[৬৪] কিন্তু কবি যেরূপ তৎসম শব্দসঙ্কুল ও অনুপ্রাসকণ্টকিত গুরুভার বাক্‌রীতি ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার ভাষাকে 'জাঙ্গল লতা' বলা চলে না। অবশ্য তিনি গ্রাম্যশব্দও প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। তাঁহার কিছু কিছু বাক্য-বিন্যাস বিশেষ প্রশংসনীয়। যেমন—

(১) দিনে হও ব্রহ্মচারী রাত্রে গলাকাটা।
(২) হাঁড়ির মুখের মত মিলি গেল সরা।
(৩) তোমার তুলনা তুমি তুল্য নাস্তি আর।
(৪) পুঁজি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল।
(৫) বিষয়ীর বচনে বিশ্বাস বিধি নয়।
(৬) জলহীন যেন মীন শিবহীন শিবা।
(৭) হাপুতির পুত্র যেন নির্ধনের ধন।
(৮) মরণ অধিক দুঃখ মাগ্যের বাথান।
(৯) পুরস্ত্রীর প্রগল্‌ভতা বিবাহেতে বাড়ে।
(১০) দারিদ্র্য দোষের পর দোষ নাই আর।
(১১) অনর্থের বীজ অর্থ মত্ততার ঘর।
(১২) নামের নিমিত্তে লোকে নানা কর্ম করে।

এই উক্তিগুলি অতিশয় মূল্যবান প্রাজ্ঞ উক্তি বলিয়া গৃহীত হইবার যোগ্য—

৬৪. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়—বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রস্তাব

অবশ্য ভারতচন্দ্র এই জাতীয় উক্তিতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। কিন্তু রামেশ্বরের অনুপ্রাসগুলি বিশেষ উল্লেখ দাবি করিতে পারে। বাস্তবিক, "তাঁহার কাব্যে এমন অল্প পংক্তি আছে যেখানে অনুপ্রাস নাই।"[৬৫] দুই এক স্থলে অনুপ্রাস ব্যবহার বিশেষ বুদ্ধিকৌশলের পরিচায়ক। যথা—

(১) খঞ্জনগঞ্জন আঁখি অঞ্জন রঞ্জিত।
কটাক্ষে কন্দর্প কত কোটি মুরছিত।
(২) উজ্জ্বল থাকুক চির কজ্জল সিন্দুর।
(৩) চন্দ্রচূড় চরণ চিন্তিয়া নিরন্তর।
ভবভাব্য ভদ্রকাব্য ভণে রামেশ্বর।
(৪) রুক্মিণী সে রুক্মনাথে শঙ্খ দিতে বলে।
(৫) মটরের মর্দনে মুসুর গেল উড্যা।
(৬) কর্জ কর কাত্যায়ণী কুবেরের কাছে।

কিংবা,

শাঁখারি সুন্দর কহ শাঁখারি সুন্দর।
কি নাম তোমার কহ কোন গাঁয়ে ঘর।

প্রভৃতি উক্তি সুখপাঠ্য হইয়াছে। কিন্তু অনুপ্রাস অম্ল-স্বাদের মতো, অতিরিক্ত অনুপ্রাস ব্যবহার কাব্যগুণবর্ধক না হইয়া ক্ষতিকারক হইয়া থাকে। রামেশ্বরের অনুপ্রাস কোন কোন স্থলে হানিকর মুদ্রাদোষে পরিণত হইয়াছে। যত্রতত্র যে-কোন প্রসঙ্গে তিনি রাশি রাশি অনুপ্রাস ব্যবহার করিয়া কাব্য-সৌন্দর্যের মূলে কুঠারাঘাত করিয়াছেন। যেমন:

(১) ঠাকুরাণীর ঠেকিতে ঠাকুর ঠেক্যা হন।
(২) ভাড়া করা্যা ভড়ক করিয়া ভাল মতে।
(৩) কান্তের লাগিয়া কাঁন্তা কাকুর্বাদ করে।
(৪) হাদাইলা দুটী ছেল্যা হারাইয়া হরে।
(৫) ঘণ্টা গেলে গণ্টা যাত্য ঘসিবার নয়।

এই সমস্ত প্রয়োগে কবি শুধু অনুপ্রাসের প্রতি অতি-ভক্তিবশতঃ কৃত্রিম শব্দালঙ্কার লইয়া অনাবশ্যক মাতামাতি করিয়াছেন। অনুপ্রাসের বহর আর একটু অল্প হইলে কাব্যের অলঙ্কার-সৌন্দর্য আরও বৃদ্ধি পাইত। বঙ্কিমচন্দ্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের অনুপ্রাস প্রয়োগ সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "অনুপ্রাস-

৬৫. ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তী সম্পাদিত পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ১১২

যমকের বাহুল্য বড় কষ্টকর। রাখিয়া ঢাকিয়া পরিমিতভাবে ব্যবহার করিতে পারিলে বড় মিঠে, বাঙ্গালাতেও তাই।......ঈশ্বর গুপ্তের এক-একটি অনুপ্রাস বড় মিঠে......এইরূপ শব্দ ব্যবহারে তিনি অদ্বিতীয়।" রামেশ্বরের অনেক অনুপ্রাস প্রয়োগ সেরূপ নহে, বহুস্থলে তাহা কৃত্রিম শব্দবাহুল্যমাত্র। যাহা হউক, কবি এই কাব্যে প্রচুর বিদ্যাবুদ্ধি, অলঙ্কার কৌশল ও সাংসারিক অভিজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন—অবশ্য স্থানে স্থানে গ্রাম্য অশ্লীলতার আশ্রয় গ্রহণ করিতেও কবি পিছপাও হন নাই। বরবেশী শিবকে দেখিয়া শাশুড়ীগণের নিজ নিজ জামাতার নিন্দা একটু নূতন বটে, কারণ মঙ্গলকাব্যে রমণীগণের পতিনিন্দা আমাদের এক প্রকার 'গা-সওয়া' হইয়া গিয়াছিল। রামেশ্বরের বর্ণনায় শাশুড়ীগণ জামাতাদের যেভাবে নিন্দা করিয়াছেন, তাহার ভাষা ও বক্তব্যের বিষয়ে রুচির মুখ রক্ষা হয় নাই বটে, কিন্তু গতানুগতিক বর্ণনায় যে কিঞ্চিৎ বৈচিত্র্য সঞ্চারিত হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

পরিশেষে কবির উদার অসাম্প্রদায়িক ধর্মমতের উল্লেখ করিয়া রামেশ্বর-প্রসঙ্গের উপসংহার করিতেছি। পণ্ডিত ও পুরাণপাঠক রামেশ্বর হিন্দুধর্মের এক উদার অসাম্প্রদায়িক মনের অধিকারী ছিলেন। কবি শিব-শক্তির বিষয়ে কাব্য রচনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কবির অধিকতর নিষ্ঠা ছিল বৈষ্ণবধর্মের প্রতি।[৬৬] কবি কাব্যের নানা স্থানে নিজের বৈষ্ণব ধর্মানুরক্তি প্রকাশ্যেই ঘোষণা করিয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকছত্র উল্লিখিত হইতেছে ঃ

(১) তোমার মহিমা হর মনোবাক্য অগোচর
হরিভক্তি দেও রামেশ্বরে।

(২) শুদ্ধভাবে হরিনাম সদা যেই স্মরে।
বন্দ তার পাদপদ্ম মস্তক উপরে॥
হরিনাম শৈবশাক্ত বৈষ্ণবের পর।
বিচারিয়া বলিল বৈষ্ণব রামেশ্বর॥

(৩) সর্বশাস্ত্রে সর্বকাজে কাল নিরূপণ।
বিষ্ণু নাম লৈতে সর্বকাল বিলক্ষণ॥
কোন কার্যে কোন কথা কহিবার বেলা।
বিষ্ণু নাম নিতে কেহ কর্য্য নাই হেলা॥

৬৬. ডঃ চক্রবর্তী কবির ধর্মমত সম্বন্ধে যে তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন, তাহাতে দেখা যাইতেছে, কবি তন্ত্রও অনুশীলন করিয়াছিলেন।

স্বয়ং মহাদেবের মুখ দিয়াও কবি হরিনাম-মাহাত্ম্য প্রচার করাইয়াছেন। কাব্যের কয়েকস্থলে কবি সপারিষদ চৈতন্যদেবেরও পুনঃ পুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত উল্লেখ হইতে কবিকে ধর্মমতে বৈষ্ণব বলিয়াই মনে হইতেছে —যদিও পঞ্চোপাসক সাধারণ হিন্দুর মতো তিনি শৈব ও শাক্তধর্মের প্রতিও যথোচিত শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের ধর্মসংক্রান্ত মতবাদ কতকটা এইরূপ হইলেও যথার্থ নিষ্ঠা বলিতে যাহা বুঝায় তাহা রামেশ্বরের যতটা ছিল ভারতচন্দ্রের ঠিক ততটা ছিল না। রামেশ্বর ভূস্বামী-সম্প্রদায়ের সান্নিধ্যে ছিলেন, ভারতচন্দ্রের অভিজ্ঞতাও এইরূপ। কিন্তু রায়গুণাকরের মধ্যে নাগরিক মনোবৃত্তি অধিক, রামেশ্বরের মধ্যে তাহার বিপরীত—গ্রামীণ সংস্কারই প্রধান হইয়াছে। রামেশ্বর দেবদেবীর জীবন লইয়া কিছু কিছু রঙ্গকৌতুক করিলেও তাঁহাদের প্রতি কবির বিশ্বাস শিথিল হয় নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের মনে দেববিশ্বাস ও নিষ্ঠার গভীরতা কিঞ্চিৎ হ্রাস পাইয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের কবি রামেশ্বর কবিপ্রতিভায় নিতান্ত খর্ব ছিলেন না—তাঁহার 'শিবসঙ্কীর্তনই' তাহার প্রমাণ। পৌরাণিক ও লৌকিক কাহিনীকে মিলাইয়া, উজ্জ্বলতম অনুপ্রাসের সঙ্গে সরল গ্রাম্য বর্ণনার খাদ মিশাইয়া গ্রামীণ জীবন ও সংস্কারের পটভূমিকায় কবি রামেশ্বর যাহা রচনা করিয়াছেন, একযুগের জীবন্ত সমাজ-চিত্র বলিয়া তাহা সাহিত্যের ইতিহাসে স্থায়ী আসন লাভ করিবে।

শিবায়নের অন্যান্য কবি॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর শিবসঙ্কীর্তনের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি রামেশ্বরের সংক্ষিপ্ত কাব্যপরিচয় দেওয়া হইল। কিন্তু এই শতাব্দী এবং তাহার পরবর্তী শতাব্দীতেও শিবদুর্গা বিষয়ক কিছু কিছু পৌরাণিক ও পৌরাণিক-লৌকিক মিশ্রকাব্যকাহিনী পাওয়া গিয়াছে—সেগুলির অধিকাংশই ব্রতকথা ধরনের সংক্ষিপ্ত এবং কাব্যরসবর্জিত অক্ষম রচনা। রামেশ্বরের আদর্শে এবং ভারতচন্দ্রের ছায়াতলে বসিয়া অনেক নিকৃষ্ট প্রতিভার কবি শিবদুর্গা কাহিনী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু বিশেষ কোন প্রতিভা ছিল না বলিয়া এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা কদাচিৎ পুঁথির মোড়ক ত্যাগ করিয়া ছাপার বেশ ধারণ করিতে পারিয়াছে।

দ্বিজ কালিদাস, দ্বিজ মণিরাম, দ্বিজ রামচন্দ্র, লক্ষ্মণ, প্রাণচন্দ্র, দ্বিজ ভগীরথ, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচার্য—ইঁহাদের কেহ কেহ অষ্টাদশ শতাব্দীতে, কেহ বা হাল আমলেও শিবদুর্গার কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। দ্বিজ কালিদাস 'কালিকাবিলাস' নামে যে কাব্য রচনা করেন, তাহা শিবায়ন শ্রেণীরই কাব্য—যদিও পৌরাণিক অংশ ইহার অধিকাংশ স্থান অধিকার করিয়া আছে। কবির কাব্যে ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদের প্রভাব আছে দেখিয়া ইঁহাকে কেহ কেহ অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের কবি বলিয়া মনে করেন।[৬৭] অবশ্য ভাষা এত চাঁছাছোলা যে, কবিকে ঊনবিংশ শতাব্দীতেও স্থাপন করা যায়। দ্বিজ কালিদাস সংস্কৃত পুরাণ ও কালিদাসের 'কুমারসম্ভব' ভালোই আয়ত্ত করিয়াছিলেন। কালিকাপুরাণ ও মার্কণ্ডেয় চণ্ডীর অনেকাংশ তিনি প্রায় ভাষান্তরের মতো গ্রহণ করিয়াছেন। শুম্ভদৈত্য নিধনের পর তিনি কালিদাসের কুমারসম্ভবের আদর্শে হরপার্বতীর কাহিনী শুরু করিয়াছেন এবং যথারীতি কুরুচিপূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করিয়া গিয়াছেন। কবি যদিও সংস্কৃত কাব্যপুরাণে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন, এবং ভাষাতেও মার্জিতভাব অনেকটা রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু শিব ও কুচনী পালায় গ্রাম্য বর্বর মনের পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। এই অংশে তাঁহার স্থূল, অশিষ্ট ও অভব্য কল্পনা অনেকদূর গড়াইয়াছে—শিবায়নের অন্যান্য কবি এতটা আগাইতে পারেন নাই। এই অংশে দেখা যাইতেছে, কুচনী যুবতীরা শিবের সঙ্গে নির্জলা ও নির্লজ্জ কামোৎসবে মত্ত হইয়াছে। কেহ তাঁহাকে পুষ্পপল্লবে সাজাইল, কেহ তাম্বুল যোগাইল, কেহ মৌতাতের জোগাড় করিল ("গাঁজা ভাঙ্গ হরে করে সমর্পণ"), বেদবতী বলিয়া আর এক রসিকা কুচনী "বাঘাম্বর ধরে হরে ঘরে লয়ে গেল", এবং শিব—

> মদনে মাতিয়া বুড়া সুরার্ণবে ভাসে।
> হেসে হেসে কেসে বসে কুচনীর পাশে।

এখানেই কবি রাশ টানিতে পারিলেন না। ইহার ফল হইল সাংঘাতিক :

> হেনমতে রঙ্গভঙ্গ হয় গোপনেতে।
> অপরেতে গর্ভিণী হইল অনেকেতে।

বেদবতীর গর্ভে শিবের যে অবৈধ সন্তানের জন্ম হইল, তাহার নাম

৬৭. ডঃ পঞ্চানন চক্রবর্তীর উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩১৭

পঞ্চানন্দ। ইনি এখনও রাঢ়ের কোন কোন অঞ্চলে শিব বলিয়াই পূজা পাইয়া আসিতেছেন।

আর যত পুত্র হৈল কুচনী গর্ভেতে।
গঙ্গার রক্ষক হইল সকলেতে॥

শিবের এই কুচনীবিলাস ও কুচনী নারীতে সন্তান সৃষ্টির কাহিনী রুচি, শ্লীলতা ও ঔচিত্যের দিক হইতে অতিশয় গর্হিত হইয়াছে। ব্রাহ্মণ কবির এই ঘৃণ্য ও অশুচি মনোভাব একযুগের অবক্ষয়ী সমাজচিত্রকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

নিত্যানন্দ চক্রবর্তীর 'শিবের মৎস্য ধরার পালা' শীর্ষক আর একটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে—বলাই বাহুল্য রামেশ্বরের প্রভাবে শিবায়নের মৎস্য-ধরা ও শঙ্খপরা পালা পৃথক ভাবেও অনেক কবি রচনা করিয়াছিলেন। কারণ গ্রাম্য কৃষকসমাজে এই দুই পালার বিশেষ জনপ্রিয়তা ছিল। নিত্যানন্দ চক্রবর্তী নামক রাঢ়ের এক কবি শীতলামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন; 'শিবের মৎস্যধরা পালা' তাঁহার রচিত হওয়াই সম্ভব। কবির বাসস্থান কাশীজোড়া গ্রাম রামেশ্বরের গ্রাম কর্ণগড়ের নিকটবর্তী, তাই বোধহয় তিনি রামেশ্বরের আদর্শে এই পালা রচনা করিয়াছিলেন। তাঁহার শীতলামঙ্গলের রচনাকাল অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ, সুতরাং কবির এই কাব্যও ঐ সময়ের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। তবে তিনি শিবায়নের অন্যান্য পালা রচনা করিয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। বর্ণনায় রামেশ্বরের প্রভাব প্রায় প্রতি ছত্রেই লক্ষ্য করা যায়—বিশেষত্ববর্জিত এই পালাগানের বিস্তারিত পরিচয় দানের প্রয়োজন নাই। 'বিশ্বকোষে' দ্বিজ ভগীরথের দুইশত বৎসর প্রাচীন কাব্যের উল্লেখ আছে। এই পুঁথি সম্বন্ধেও বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবির পুঁথি যদি অষ্টাদশ শতাব্দীর হয়, তবে তিনি হয়তো তাহার পূর্ববর্তীও হইতে পারেন। এই সম্পর্কে 'বিশ্বকোষে' বলা হইয়াছে, "গ্রন্থখানিতে তেমন কবিত্ব বা লালিত্যের পরিচয় না থাকিলেও সরল কবিতায় শিবের গুণকীর্তন করা হইয়াছে।" অনুমান ইহাও লৌকিক শিবের কাহিনী।

দ্বিজ মণিরামের 'বৈদ্যনাথ মঙ্গলে' দেওঘরের (বিহার) বৈদ্যনাথ শিবের মহিমা প্রচারিত হইয়াছে—বৈদ্যনাথ-শিবের মহিমা সাধক ও ভক্তের রোগ মুক্তিতেই প্রকাশ পাইয়াছে। এই মিশ্রধরনের কাব্যে বৈদ্যনাথ-শিবসংক্রান্ত অনেকগুলি কাহিনী থাকিলেও বাংলার লৌকিক শিবকাহিনীর সঙ্গে ইহার

বিশেষ কোন যোগাযোগ নাই। লৌকিক দেবদেবীক কেন্দ্র করিয়া এই-রূপ বহু পাঁচালীধরনের স্থানীয় কাব্যকাহিনী রচিত হইয়াছে, যাহার সঙ্গে সাহিত্যের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই। তবে 'বৈদ্যনাথমঙ্গল' যে একদা কিছু জনপ্রিয় হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে, কারণ এই কাব্যের একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। শ্রীহট্ট হইতে অধিকাংশ পুঁথি পাওয়া গিয়াছে বলিয়া কেহ কেহ কবিকে শ্রীহট্টবাসী বলিতে চাহেন। তবে পশ্চিমবঙ্গের প্রান্তীয় অঞ্চলের দেবকাহিনী শ্রীহট্টে কি করিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিল তাহাও একপ্রকার বিস্ময়কর ব্যাপার। যাহা হউক কবির ভাষা দৃষ্টে মনে হয় কবি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর কোন এক সময়ে বর্তমান ছিলেন।

উনবিংশ শতাব্দীতেও দুই-একজন কবি (দ্বিজ রামচন্দ্র, রাজা পৃথ্বীচন্দ্র ত্রিবেদী, প্যারীলাল মুখোপাধ্যায়, হরিচরণ আচার্য) শিবকাহিনী লিখিয়া-ছিলেন। পৃথ্বীচন্দ্র ছিলেন পাকুড়ের বিখ্যাত ভূস্বামী—ইঁহারা অবাঙালি হইলেও[৬৮] বাংলাদেশকেই মাতৃভূমি এবং বাংলা ভাষাকে মাতৃভাষা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭২৮ শকে (১৮০৬)[৬৯] কবি শিবমহিমাবিষয়ক 'গৌরীমঙ্গল' কাব্য রচনা করেন।[৭০] এই বিরাট কাব্যে পৌরাণিক, কাল্পনিক, লৌকিক—নানাধরনের শিবকাহিনী সংগৃহীত ও গ্রথিত হইয়াছে। ইহাতে পাঁচটি খণ্ড থাকিলেও মোটামুটি দুইভাগই প্রাধান্য পাইয়াছে—একটিতে পৌরাণিক ও লৌকিক ধরনের শিবকাহিনী আছে, আর একটিতে হরগৌরীর পরমভক্ত রাজা জীমূতবাহন মদ্রসেন নামক এক দুরাচার রাজাকে

৬৮. কবিরা ছিলেন কনৌজিয়া ত্রিবেদী ব্রাহ্মণ।' কবি আত্মপরিচয় দিতে গিয়া বলিয়াছেন :

গৌড় দেশ মধ্যে বাস গঙ্গার দক্ষিণে।
কান্যকুব্জ বিপ্র হই ত্রিবেদী আখ্যানে॥
পিতৃপূর্ব স্থান নদী সরযূ উত্তরে।
এদেশে পৈতৃক বাস আমাড়ি নগরে॥

৬৯. কবি এই ভাবে গ্রন্থ রচনার কাল নির্দেশ করিয়াছেন :

সত্তেরশ আটাইশ শকে রচিলাম এ পুস্তকে
বারশত ত্রয়োদশ সন।

৭০. ১৩০৪ সালে সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় রামেন্দ্রসুন্দর এই কবি সম্পর্কে সবিস্তারে আলোচনা করিয়াছিলেন।

বিনষ্ট করিয়া পৃথিবীর ভার মোচন করেন এবং দেবীর কৃপায় সশরীরে স্বর্গযাত্রা করেন। ইহাতেও "কটিতে বসনমাত্র গাত্র নগ্নবেশ" এবং "তুঙ্গস্তনী নিতম্বিনী" কোচরমণীদের সঙ্গে শিবের বিহার বর্ণিত হইয়াছে। দু'একস্থলে রাধাকৃষ্ণ লীলা বর্ণনায় কবি বেশ সুন্দর ছন্দেরও ব্যবহার করিয়াছেন। যথা:

শুনলো শ্রীমতী কহিয়ে ভারতী
কেন কর এত মান।
ছাড়িয়া কি হরি থাকিবে পাশরি
ধরিতে নারিবে প্রাণ॥
নাগরের দোষ ক্ষমা কর রোষ
মান কর রাই দূরে।
আপন শরীরে যদি দোষ করে
ছাড়িতে কে পারে তারে॥

পৃথ্বীচন্দ্রের এই কাব্যে আর একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। কবি ইহাতে সংক্ষেপে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পরিচয় এবং কবিদের নাম উল্লেখ করিয়াছেন। এই তালিকায় কৃত্তিবাস, কবিকঙ্কণ মুকুন্দরাম[৭১] কবিচন্দ্র (গোবিন্দমঙ্গল), চৈতন্যমঙ্গল, অন্নদামঙ্গল (ভারতচন্দ্র), শিবরাম গোস্বামীর ভক্তিলতা, কাশীরামদাসের অষ্টাদশ পর্বভাষা, নিত্যানন্দের মহাভারত, দ্বিজ রঘুনাথদেবের চণ্ডীমঙ্গল পাঁচালী, গঙ্গানারায়ণের ভবানীমঙ্গল প্রভৃতি কবির কাব্যের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। অবশ্য এই তালিকা কোন দিক দিয়াই পূর্ণ নহে, তথাপি উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে সাধারণ সমাজে কোন্ কোন্ পুরাতন ধরনের কাব্যের প্রচার ছিল, তাহা ইহা হইতে বুঝা যাইবে।

দ্বিজ রামচন্দ্রের 'হরপার্বতীমঙ্গল' ১৮৪০ খ্রীঃ অব্দের কাছাকাছি গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হয়—সুতরাং পুঁথি-সাহিত্যের ইতিহাসে এই কাব্যের আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। শুধু এইটুকু প্রণিধানযোগ্য যে, উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের দিকে যখন কলিকাতাকে কেন্দ্র করিয়া ছাপাখানার বান ডাকিয়াছিল, নানা সাময়িকপত্রে আধুনিকতার নানা ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠিতেছিল, তখনও কেহ কেহ এইরূপ পুরাতন আদর্শকে কোনও প্রকারে

৭১. তিনি কিন্তু মনসামঙ্গলের কোন কবির নাম করেন নাই—শুধু বলিয়াছেন, "মনসামঙ্গল ভাষা হইল প্রকাশ"।

আঁকড়াইয়া ধরিয়া নবীনের তরঙ্গাঘাত সামলাইতেছিলেন। দ্বিজ রামচন্দ্র সেই ধরনের কবি। তিনি কলিকাতার নিকটেই বাস করিতেন—আধুনিকতার জোয়ার নিশ্চয়ই প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন—তথাপি পুরাতন আদর্শকেই কাব্য রচনায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সংস্কৃতের কালিদাস এবং বাংলার মুকুন্দরাম, রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের রত্নভাণ্ডারে হস্তপ্রসারণ করিয়া তিনিও পৌরাণিক ও লৌকিক শিবের কাহিনী সংমিশ্রিত করিয়া 'হরপার্বতী-মঙ্গল' রচনা করেন। ভাষায় তাঁহার কিঞ্চিৎ দক্ষতা ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না—ভারতচন্দ্রের অনুকরণে তিনি বিশেষ পটু ছিলেন। যথা ঃ

তোমার রূপে সুধা কূপে
বন করেছে আলো।
ভস্ম মাথায় সে বুড়াটায়
সাজবে না তো ভালো॥

অথবা,

বাজিল রে রণডঙ্কা।
দগড় দগড় ডিম বাজয়ে টিমি টিমি
ঘোর ঘোষণ ঝঙ্কা॥

কিংবা

ঢলু ঢলু ঢলু নয়ন ভঙ্গা।
কুলু কুলু কুলু মস্তকে গঙ্গা॥
ধ্বক ধ্বক ধ্বক ললাটে বহ্নি।
শশধর ঊর্ধ্বে উদয় অহ্নি॥

এই ছন্দকৌশল ভারতচন্দ্রের অনুকরণ হইলেও সুখপাঠ্য হইয়াছে।

মধ্যযুগে মনসা ও চণ্ডীমঙ্গলের প্রারম্ভভাগে এবং অভ্যন্তরেও শিবায়ন কাহিনীর অনেকটা অনুপ্রবিষ্ট হইয়াছে। কবিগণ মনসা ও চণ্ডীর মাহাত্ম্য রচনা করিতে বসিলেও ভোলা-মহেশ্বরকে ভুলিতে পারেন নাই। সহদেব চক্রবর্তী ধর্মপুরাণের অনুরূপ 'অনিলপুরাণ' রচনা করিলেও গ্রামীণ শিব-কাহিনীকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়াছেন। রমাই পণ্ডিতের শূন্যপুরাণেও শিবের লৌকিক প্রসঙ্গ অনেকটা স্থান জুড়িয়া আছে।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর শিবায়ন কাব্যের পরিচয় প্রসঙ্গে দেখা গেল, পৌরাণিক ও লৌকিক শিবকে কেন্দ্র করিয়া অপেক্ষাকৃত অর্বাচীনকালে অনেকগুলি কাব্য ও ব্রত-পাঁচালী রচিত হইলেও, একমাত্র রামেশ্বরকে

ছাড়িয়া দিলে আর কাহারও মধ্যে উল্লেখযোগ্য কোন প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায় না। পৌরাণিক অংশে তাঁহাদের কৃতিত্ব নাই বলিলেই চলে; শিবপুরাণ, দেবীভাগবত, কালিদাসের কুমারসম্ভবের ঘটনাবস্তুতেই ইঁহারা দাগা বুলাইয়াছেন। কিন্তু লৌকিক অংশে, বিশেষতঃ শিবের দারিদ্র্যবিড়ম্বিত দাম্পত্য জীবন, চাষপালা ও শঙ্খপরা পালায় কবিগণ কলকণ্ঠ হইয়া উঠিয়াছেন এবং অনেক সময়েই শ্লীলতা শালীনতার সীমা লঙ্ঘন করিয়া গিয়াছেন—শিবকাহিনীর বর্ণিত বিষয় এবং তদানীন্তন সামাজিক আবহাওয়াই তাহার প্রধান কারণ। সংস্কৃতে রচিত শিবপুরাণগুলিতেও রুচির শুচিতা সর্বত্র রক্ষিত হয় নাই। কোন কোন সময়ে পবিত্র দেবভাষায় অপবিত্র ব্যাপার বর্ণনায় ব্রাহ্মণ কবিদের কিছুমাত্র সঙ্কোচ লক্ষিত হয় না। যাহা হউক দরিদ্র বাঙালীর সংসারযাত্রার জীবন্ত চিত্র শিবায়ন কাব্যগুলির পটভূমিকাস্বরূপ হইয়াছে—এইটুকুব জন্যই কাব্যগুলির কথঞ্চিৎ মূল্য।

ধর্মমঙ্গল কাব্য ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে অন্ততঃ দশজন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া রাঢ়ে ধর্মপূজা প্রচারে সহায়তা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কেহ ব্রাহ্মণ, কেহ মাহিষ্য, কেহ বা অন্য কোন সম্প্রদায়ভুক্ত। এই শতাব্দীতে ধর্মঠাকুর আর ডোমপণ্ডিতের দেবতা নহেন, উচ্চশ্রেণীভুক্ত ব্রাহ্মণগণও দেবতার স্বপ্নাদেশ-ক্রমে কাব্যকাহিনী লিখিয়া ধন্য হইয়াছেন। ঘনরাম চক্রবর্তী ও মাণিক গাঙ্গুলী—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দুইজন কবি ধর্মঠাকুরের কাহিনী ও মহিমা বর্ণনায় কথঞ্চিৎ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, জনসাধারণের মধ্যে এই কাব্যদুইটি বেশ প্রচারলাভও করিয়াছিল। ঘনরাম সর্বপ্রথম মুদ্রণসৌভাগ্য লাভ করিবার জন্য পশ্চিমবঙ্গে বর্তমান যুগে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছেন—যদিও সপ্তদশ শতাব্দীর রূপরাম তাঁহার কাব্যে অধিকতর প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন। ধর্ম-মঙ্গলের আরও কয়েকজন কবি (রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যা, নরসিংহ বসু, প্রভুরাম, হৃদয়রাম সাউ, কবিচন্দ্র নিধিরাম, রামকান্ত, সহদেব চক্রবর্তী প্রভৃতি) অষ্টাদশ শতাব্দীতে আবির্ভূত হইয়া যে কয়খানা ধর্মমঙ্গলের সংখ্যাবৃদ্ধি করিয়াছিলেন, গুণগত উৎকর্ষে তাহার মান বিশেষ উচ্চ নহে। এই কাব্যে প্রচুর যুদ্ধবিগ্রহ, রোমান্স ও অ্যাডভেঞ্চার থাকিলেও প্রথম শ্রেণীর কবিপ্রতিভার অভাবে এই

শাখাটি একেবারে মাটি হইয়া গিয়াছে। সকলেই স্বপ্নাদেশের গতানুগতিক ছড়া ফাঁদিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হইয়াছেন, একই রীতিতে আত্মকথা বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন, লাউসেনের গল্প বলিয়াছেন। ক্লান্তিকর গতানুগতিক বর্ণনা প্রায় সমস্ত কাব্যেই লবণহীন বিস্বাদ ব্যঞ্জন সৃষ্টি করিয়াছে। ফলে নিদ্রাকর্ষক একঘেয়ে বর্ণনায় কাব্য গুরুতর কলেবর লাভ করিয়া পাঠকের শিরে গুরুভারের মতো জাঁকিয়া বসিয়াছে। যাহা হউক, এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

ঘনরাম চক্রবর্তী॥ অষ্টাদশ শতাব্দীর শক্তিশালী কবি ঘনরাম চক্রবর্তী ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি বলিয়া পরিচিত। রূপরাম পূর্ব শতাব্দীতে ধর্মমঙ্গলের কবিরূপে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিলেও ঘনরামই উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে কলিকাতার ছাপাখানায় মুদ্রিত হইয়া শিক্ষিত সমাজে প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। আধুনিক যুগের বাঙালীসমাজ তাঁহার কাব্য হইতেই ধর্মমঙ্গলকাব্যের নূতনত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন। এই শাখার অন্যান্য শক্তিশালী কবি অপেক্ষা ঘনরাম অধিকতর ভাগ্যবান, কারণ ধর্মমঙ্গলের কবিদের মধ্যে তিনিই সর্বপ্রথম মার্জিতরুচির নাগরিক সমাজে পরিচিত হন। রামেশ্বর, ঘনরাম ও ভারতচন্দ্র—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই তিনজন মঙ্গলকাব্যেব কবি এই শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যকে তুচ্ছতাব অগৌরব হইতে কথঞ্চিৎ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন।

ঘনরাম চক্রবর্তী তাঁহার ধর্মমঙ্গলে যৎসামান্য আত্মপরিচয় দিয়াছেন। যেখানে ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবি আত্মজীবনী বর্ণনা প্রসঙ্গে সুদীর্ঘ নীরস বর্ণনায় মত্ত হইয়াছেন, সেখানে ঘনরামের নিজের সম্পর্কে স্বল্পভাষিতা কিছু বিস্ময়কর বটে। অবশ্য তাঁহার আত্মকথা-সংবলিত একটি পুঁথি কোন এক ধর্মমঙ্গল গায়কের নিকট পাওয়া গিয়াছে। ডঃ সুকুমার সেন নাড়গাঁ নিবাসী অমূল্যচরণ পণ্ডিত নামক ধর্মমঙ্গলের এক গায়েনের নিকট "ঘনরামের আত্ম-কাহিনীর মর্মাংশ" পাইয়াছেন।[৭২] সেই 'মর্মাংশে' দেখা যাইতেছে, ঘনরাম ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবিদের মতো মস্ত বড়ো এক আত্মকাহিনী ফাঁদিয়া-ছিলেন। এই আত্মকাহিনী হাস্যকর ও অসঙ্গতিপূর্ণ—অপ্রাসঙ্গিকতায় অর্থ-

৭২. ডঃ সুকুমার সেন, বা. সা. ইতি,—১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১৮১

হীন। এই 'মর্মাংশ' অনুসারে, ঘনরাম এক ব্রাহ্মণের বাড়ীতে টোলে পড়াশুনা করিতেন। একদিন ব্রাহ্মণের জন্য পূজার ফুল তুলিতে গিয়া তাঁহার পায়ে বেগুনের কাঁটা ফুটিয়া যায়, পায়ে হাত দিয়া কাঁটা বাহির করিয়া ফেলিলে হাতে পা ঠেকিয়া যাইবে, সুতরাং কিশোর ঘনরাম কি করিয়া নিজ পা হইতে কাঁটা বাহির করিবেন? তাই পায়ে কাঁটা লইয়াই তিনি ফুল তুলিয়া আনিলেন। এদিকে ব্রাহ্মণঠাকুর পূজা করিতে গিয়া দেখেন বিগ্রহের পায়ের তলাতেও সেই কাঁটা ফুটিয়া রহিয়াছে। ব্রাহ্মণের ইষ্টদেবতা পড়ুয়া ঘনরামকেই কৃপা করিয়া তাঁহার ব্যথার অংশ গ্রহণ করিয়াছেন জানিয়া ব্রাহ্মণঠাকুর বিগ্রহের প্রতি অভিমানে ঘর ছাড়িয়া পুরীধামে যাত্রা করিলেন। পথে গাছতলায় ঘুমাইয়া পড়িয়া তিনি স্বপ্ন দেখিলেন, একটি ছেলে ও একটি মেয়ে তাঁহাকে পুরীর পথ জিজ্ঞাসা করিতেছে—ব্রাহ্মণ নিদ্রিতাবস্থায় তাহাদের পথ দেখাইয়া দিলেন। কিছুক্ষণ পরে আর একটি ছেলে আসিয়া ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার দাদা-বৌদিদিকে সেই পথে তিনি যাইতে দেখিয়াছেন কিনা। ব্রাহ্মণ তাহার প্রশ্নের জবাব দিলেন। পরে গাছ হইতে এক হনুমান লাফাইয়া পড়িল। যখন সে জানিতে পারিল, ব্রাহ্মণও পুরীধামের যাত্রী, তখন সে ব্রাহ্মণের গালে চড় কষাইয়া দিয়া বলিল যে, আগে যে দুইজন চলিয়া গেল, তাহারা রামসীতা, আর শেষের জন লক্ষ্মণ—ব্রাহ্মণ তাঁহাদের চিনিতেই পারেন নাই। হনুমান বলিল, রাম-সীতা-লক্ষ্মণকে চিনিতে পারিলে না, তুমি আবার পুরী যাইবে? তখন লজ্জিত ব্রাহ্মণ ঘরে ফিরিয়া ইষ্টদেবতার পূজায় মন দিলেন এবং ছাত্র ঘনরামকে রামায়ণ লিখিতে বলিলেন। ঘনরাম গুরুর আদেশানুসারে খানিকটা রামায়ণ লিখিয়া ফেলিলেন। পরদিন প্রভাতে উঠিয়া দেখেন, রাম-বন্দনার স্থলে ধর্মের বন্দনা লেখা রহিয়াছে। তিনি তাহা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া পুনরায় রামবন্দনা লিখিলেন। তখন রাত্রে স্বয়ং রামচন্দ্র কবিকে স্বপ্ন দিলেন যে, রামায়ণ তো অনেকেই লিখিয়াছেন, কবি যেন ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন। অতঃপর শ্রীরামচন্দ্র কর্তৃক স্বপ্নাদিষ্ট হইয়া রামভক্ত ঘনরাম ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় সংগৃহীত ঘনরামের আত্মকাহিনী বিষয়ক উল্লিখিত অংশটির যাথার্থ্য ও প্রামাণিকতা সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

কারণ উক্ত বিবরণীতে ভট্টাচার্যের কাহিনীর সঙ্গে ঘনরামের ব্যক্তিগত জীবনের যোগাযোগ নাই বলিলেই চলে, এই কাহিনীতে ভট্টাচার্যের আখ্যানই প্রধান। কাহিনীটির ধরনধারণ দেখিয়া মনে হইতেছে, ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের কোন এক গায়েন ধর্মমঙ্গলের অন্য কবিদের আত্মকথার অনুকরণে এই অংশ বানাইয়া লইয়াছেন; কিন্তু কাঁচা হাতের ছাপ ঢাকিতে পারেন নাই। এই ধরনের অসঙ্গতিপূর্ণ রচনা কদাপি ঘনরামের পরিপক্ক লেখনী হইতে বাহির হইতে পারে না। আরও নানা কারণে ডঃ সেন সংগৃহীত এই আত্মকাহিনীর যাথার্থ্য বিষয়ে আমাদের সন্দেহ হইতেছে। ডঃ সেন মাত্র একজন ঘনরাম-ধর্মমঙ্গলের গায়েনের নিকট এই বর্ণনা পাইয়াছিলেন। তিনি তাঁহার গ্রন্থে সেই বর্ণনা হইতে কোন দৃষ্টান্ত-উদাহরণ উল্লেখ করেন নাই। করিলে উহা যথার্থই ঘনরামের রচনা কিনা তাহা বিচারের সুযোগ পাওয়া যাইত। এই রচনাটুকু যে গায়েন মহাশয়ের শ্রীহস্তের কারসাজি নহে, তাহাই বা কে বলিল? এরূপ অনৃতাচার বাংলা পুঁথিতে তো বিরল নহে। উপরন্তু ঘনরামের কোন পুঁথিতেই এইরূপ আত্মবিবরণী পাওয়া যায় না।[৭৩] কিন্তু ডঃ সেন অনুমান করেন, ঘনরামের মূল পুঁথিতে নাকি এইরূপ আত্মপরিচয় ছিল। গ্রন্থ ছাপিবার সময় প্রকাশকগণ সেই অংশটুকু বাদ দিয়াছেন। কারণ "আধুনিক মনোবৃত্তিসম্পন্ন ইংরেজী শিক্ষিতের কাছে অলৌকিক রসাশ্রিত কাহিনী উপহাসের বিষয় হইবে মনে করিয়াই"[৭৪] নাকি প্রথম প্রকাশকেরা এই অংশটুকু বাদ দিয়াছিলেন। ডঃ সেনের এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত নহে। কারণ গোটা ধর্মমঙ্গল কাব্যই আদ্যন্ত অলৌকিক রসাশ্রিত—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোন্ কাব্যই বা নহে? সেখানে উচ্চশিক্ষিত সম্প্রদায়ের অপ্রীতিকর মনে হইতে পারে অনুমান করিয়া ঘনরামের প্রকাশক বাছিয়া বাছিয়া শুধু ঘনরামের আত্মকাহিনীটুকুই বা বাদ

---

৭৩. ডঃ শ্রীপীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে নানা পুঁথি ও ছাপা গ্রন্থ অবলম্বনে ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের যে বৃহৎ সংস্করণ সম্পাদনা করিয়াছেন, তাহাতেও দেখা যাইতেছে, তিনি বাইশ-তেইশ খানি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত গ্রন্থের পাঠ নির্ণয় করিয়াছেন বটে, কিন্তু কোন পুঁথিতেই ঘনরামের আত্মকাহিনী পান নাই। তাঁহার মন্তব্য: "ঘনরামের কাব্যে আত্মপরিচয় পাওয়া যায় না। যে কয়টি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে সেগুলিতেও নাই, বা মুদ্রিত গ্রন্থে নাই।" (পৃ. ৷৴০)

৭৪. ডঃ সেন—বা. সা. ইতি. ১ম, অপরার্ধ, পৃ. ১৮০

দিবেন কেন?[৭৫] কোন পুঁথিতে ঘনরামের আত্মকাহিনী নাই, মুদ্রিত গ্রন্থেও নাই। ডঃ সেন একজন আধুনিক গায়েনের নিকট হইতে প্রাপ্ত অলীক জল্পনাকে ঘনরামের আত্মকথার মর্যাদা দিতে চাহিয়াছেন। এইজন্য ইহাকে ঘনরামের যথার্থ আত্মকাহিনী বলিয়া গ্রহণ করা আপাতত সম্ভব নহে।

ঘনরাম কাব্যের মধ্যে নিজের সম্পর্কে যে সমস্ত তথ্য দিয়াছেন তাহা হইতে তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনের কাহিনী মোটামুটি উদ্ধার করা যায়। বর্ধমান জেলায় দামোদর নদের তীরে কইয়ড় পরগণার কুকুড়া-কৃষ্ণপুর গ্রামে কবির জন্ম হয়।[৭৬] কবি বোধহয় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা উপকৃত হইয়াছিলেন, কারণ তিনি অনেকস্থলে কীর্তিচন্দ্রের প্রশংসা করিয়াছেন। তবে তিনি কীর্তিচন্দ্রের সভাকবি ছিলেন বলিয়া মনে হয় না। তাহা হইলে তিনি কাব্যে তাঁহার উল্লেখ করিতেন।[৭৭] কবির পিতার নাম গৌরীকান্ত, মাতা—সীতা,[৭৮] পিতামহের নাম ধনঞ্জয়। তাঁহার চারিপুত্রের নাম—

৭৫. ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র ঘনরামের কাব্যসম্পাদনা কালে ডঃ সেন সংগৃহীত তথ্যকেই বিনা প্রমাণে গ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। নিঃসংশয় হইবার জন্য তাঁহার আরও প্রমাণতথ্য সংগ্রহ করা উচিত ছিল।

৭৬. "কইয়ড় পরগণা বাটী কৃষ্ণপুর গ্রাম।"

৭৭. অখিলে বিখ্যাত কীর্তি মহারাজ চক্রবর্তী
কীর্তিচন্দ্র নরেন্দ্র প্রধান।
চিন্তি তাঁর রাজোন্নতি কৃষ্ণপুর নিবসতি
দ্বিজ ঘনরাম রস গান।

৭৮. তাঁহার মাতার নাম সম্পর্কেও ডঃ সেনের মত গ্রহণযোগ্য নহে। তাঁহার মতে "ঘনরামের মাতার নাম সীতা নয়, মহাদেবী।...সীতা নাম তখন চলিত না, কেন না সীতার মতো দুঃখিনী হইবে ইহা তখন কোন মাতাপিতা ভাবিতে পারিত না" (বা. সা. ইতি ১ম, অপরার্ধ, পাদটীকা, পৃ. ১৭৯)। ডঃ সেনের এ মন্তব্য মানিতে পারা যায় না। সে যুগে কেহ কন্যার নাম সীতা রাখিত না, ইহার সবচেয়ে প্রতিকূল দৃষ্টান্ত—অদ্বৈত গৃহিণীর নাম ছিল সীতাদেবী। আর তা' ছাড়া ঘনরাম কাব্যে মাতার নাম সীতাই বলিয়াছেন। যথা—

কোকসারী অবতংসে কুশধ্বজ রাজবংশে
দ্বিজ গঙ্গাহরি পুণ্যবান।
তাঁহার দুহিতা সীতা সত্যবতী পতিব্রতা
তাঁর সুত ঘনরাম গান।

(শ্রীমহাপাত্রের সংস্করণ, পৃ. ৫৯৬)

রামরাম, রামগোপাল, রামগোবিন্দ, রামকৃষ্ণ।[৭৯] বহুস্থলে ভণিতায় তিনি রামভক্তির পরিচয় দিয়াছেন। যথা:

(১) আশীর্বাদ কর যেন রাঘবে রয় মতি।

(২) ঘনরাম ভণে যার নাম রঘুবীর।

(৩) প্রভু যার কৌশল্যানন্দন কৃপাবান।

(৪) দুষ্পার সংসার ঘোর বিস্তার সাগর।
নিস্তার পাইবে সুখে ভজ রঘুবর॥

গ্রন্থমধ্যেও কবি নানাস্থানে রামায়ণ-কাহিনীর নানা প্রসঙ্গ উল্লেখ করিয়াছেন।[৮০] অবশ্য ভাগবত হইতেও তিনি অনেক দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন। কিন্তু তরুণ বীর লাউসেনের সঙ্গে তিনি বীরকিশোর শ্রীরামচন্দ্রের অধিকতর সাদৃশ্য দেখিতে পাইয়াছেন। যাহা হউক, তিনি যে রামভক্ত ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। নানা দেবদেবীর সঙ্গে কবি চৈতন্যদেবকেও ভক্তিশ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। গুরুর পদবন্দনা করিয়া কবি কাব্যরচনায় অগ্রসর হইয়াছেন—বোধহয় গুরুর নির্দেশেই তিনি ধর্ম-মঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন।[৮১]

অতঃপর ডঃ সেন বোধহয় স্বীকার করিবেন যে, ঘনরামের মাতার নাম 'সীতা'—মহাদেবী নহে। মহাদেবী, সত্যবতী, পতিব্রতা—এ সমস্ত ভক্তিমান পুত্র কর্তৃক সংযোজিত মাতার বিশেষণ। মাতার নাম মহাদেবী হইলে কবি এখানে নিশ্চয় তাহার উল্লেখ করিতেন।

৭৯. মাতা ও পিতার উল্লেখ:

মাতা যার মহাদেবী সতী সাধ্বী সীতা।
কবি কান্ত শান্ত দান্ত গৌরীকান্ত পিতা॥

কবির পিতামহের উল্লেখ—

চক্রবর্তী ধনঞ্জয় তাঁহার তনয়দ্বয়
কবিবর শঙ্কর প্রধান।
তদনুজ গৌরীকান্ত কাব্যসিন্ধু শান্ত দান্ত
তত্তনুজ ঘনরাম গান॥

৮০. ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র সম্পাদিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গলের পৃ. ৪৶০—৪।/০ দ্রষ্টব্য।

৮১. কবি কোথাও নিজ গুরুর নাম করেন নাই। একস্থানে কবি এইভাবে ভণিতা দিয়াছেন—"শ্রীরামদাসের দাস দ্বিজ ঘনরাম"। ইহাতে ডঃ সেন অনুমান করিয়াছেন, "ঘনরামের গুরুর নাম শ্রীরামদাস ছিল" (বা. সা. ইতি.—১ম, অপরার্ধ, পৃ. ১৮০)। কিন্তু উক্ত ভণিতা হইতে রামভক্ত ঘনরামের গুরুর নাম পাওয়া যায় না। 'শ্রীরামদাসের দাস'—ইহা ঘনরামের রামভক্তিবাচক বিশেষণ মাত্র।

কবির গুরু বোধহয় কবিকে 'কবিরত্ন' উপাধি দিয়াছিলেন। কারণ কবি বলিয়াছেন :

নিজ গুণে করি যত্ন নাম দিলা কবিরত্ন
কৃপাময় করুণা আধান।

সন তারিখ উল্লেখ করিয়া কবি কাব্যসমাপন করিয়াছেন :

সঙ্গীত আরম্ভ কাল নাইক স্মরণ।
শুন সবে যে কালে হইল সমাপন॥
শক লিখে রামগুণ রসসুধাকর।
মার্গকাদ্য অংশে হংস ভার্গব বাসর॥
সুলক্ষ বলক্ষ পক্ষ তৃতীয়াখ্য তিথি।
যামসংখ্য দিনে সাঙ্গ সঙ্গীতের পুথি॥

ইহা হইতে পুরাতন পঞ্জিকার হিসাব অনুসারে ১৬৩৩ শকাব্দ (১৭১১খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যায়। ঐ সনের ১লা অগ্রহায়ণ এই কাব্য সমাপ্ত হয়।[৮২] কিন্তু বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে এই কাব্য ১৭১১ খ্রীঃ অব্দের ৮ই অগ্রহায়ণ সমাপ্ত হয়।[৮৩] সামান্য তারিখের গোলমাল থাকিলেও ঘনরাম যে এই কাব্য ১৭১১ খ্রীঃ অব্দের শেষে সমাপ্ত করেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ঘনরাম নানা পুরাণ-উপপুরাণ ও কাব্য কাহিনী হইতে গল্প উপমা প্রভৃতি সংগ্রহ করিয়া ইহার আয়তন পরিপুষ্ট করিয়াছেন। তাঁহার পূর্বে রাঢ়ে অন্ততঃ দুই শত বৎসর ধরিয়া একাধিক কবি ধর্মমঙ্গল আখ্যান লিখিয়াছিলেন। অনেক দিন ধরিয়া ধর্মমঙ্গলের দুইটি কাহিনী (হরিশ্চন্দ্র ও লাউসেন) জনসমাজে ও লোকসাহিত্যে পরিচিত ছিল। ঘনরাম সেই দুইটি কাহিনীকে সবিস্তারে বর্ণনা করিয়া পাঁচালী কাব্যকে প্রায় মহাকাব্যোচিত বিশালতা দিতে চাহিয়াছেন। চব্বিশ পালায় বিভক্ত এই বিরাট কাব্য মহাকাব্যেরই উপযুক্ত। সংক্ষেপে কাহিনীর ধারাটি এইরূপ :

(১) স্থাপনা পালা (দেবদেবী বন্দনা, অম্বুবতী অপ্সরীর তালভঙ্গ, ধর্মপূজা প্রচারে মর্ত্যধামে রঞ্জাবতীরূপে জন্ম), (২) ঢেকুর পালা (ইছাই

৮২. প্রবাসী, ভাদ্র, ১৩৩৬

৮৩. বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্টের শ্রীধর্মপুরাণের ভূমিকা পৃ. ।৶০

ঘোষের কাহিনী), (৩) কর্ণসেনের সঙ্গে রঞ্জাবতীর বিবাহ, (৪) হরিশ্চন্দ্র পালায় হরিশ্চন্দ্র ও লুইচন্দ্রের কাহিনী, (৫) রঞ্জাবতীর শালে ভর দিয়া ধর্মঠাকুরের নিকট পুত্রবর লাভ, (৬) লাউসেনের জন্ম, (৭) আখড়া পালায় দেবী চণ্ডিকা কর্তৃক লাউসেনকে পরীক্ষা, (৮) ফলানির্মাণ পালায় দেবী-প্রদত্ত অস্ত্রের দ্বারা ফলা নির্মাণ, (৯) গৌড়যাত্রা পালায় লাউসেন ও কর্পূরের গৌড়যাত্রা, (১০) কামদল পালায় লাউসেন কর্তৃক কামদল বাঘ বধ, (১১) জামতি পালায় অসতী নারীদের কবল হইতে লাউসেনের আত্মরক্ষা, (১২) গোলাহাট পালায় গণিকা সুরিক্ষার কবল হইতে লাউসেনের উদ্ধার, (১৩) হস্তীবধ পালায় লাউসেন কর্তৃক হস্তী বধ, (১৪) কাঙুর যাত্রা পালায় লাউসেনের কামরূপ যাত্রা, (১৫) কামরূপ যুদ্ধ পালায় লাউসেনের কামরূপ রাজার সঙ্গে যুদ্ধ এবং রাজকন্যা কলিঙ্গার সঙ্গে বিবাহ, (১৬) কানাড়া স্বয়ম্বর পালায় রাজা হরিপালের কন্যা কানাড়ার সঙ্গে লাউসেনের বিবাহ, (১৭) কানাড়া বিবাহ পালায় লাউসেন কর্তৃক লোহার গণ্ডার দ্বিখণ্ডিতকরণ, (১৮) মায়ামুণ্ড পালায় মহামদের কুটিল চক্রান্তে লাউসেন-পত্নীদিগকে বিভ্রান্ত করার কাহিনী, (১৯) ইছাই বধ পালায় লাউসেন কর্তৃক ইছাই ঘোষ নিধন, (২০) অঘোর বাদল পালায় গৌড়ে প্রবল ঝড়-বৃষ্টি, (২১) পশ্চিমে উদয় পালায় লাউসেন কর্তৃক পশ্চিমে সূর্যোদয় দেখাইবার আয়োজন, (২২) মহামদ কর্তৃক লাউসেনের রাজধানী আক্রমণ করিতে আসিয়া যথাযোগ্য শাস্তি পাইয়া পলায়ন, (২৩) পশ্চিমে উদয় পালায় কঠোর সাধনার দ্বারা লাউসেনের অসাধ্যসাধন, (২৪) স্বর্গারোহণ পালায় লাউসেনের স্বর্গারোহণ এবং মহামদের উচিত শাস্তি লাভ —এইস্থানে কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে।

এই বিরাট কাব্যে (ছাপার অক্ষরে প্রায় বাইশ হাজার পংক্তি) ধর্মের সেবিকা রঞ্জাবতী (শাপভ্রষ্ট অপ্সরা অম্বুবতী), তাঁহার পুত্র ধর্মঠাকুরের অনুগৃহীত লাউসেন, লাউসেনের বীরত্বব্যঞ্জক নানা কাহিনী এবং ধর্মের কৃপায় অসাধ্য সাধন—প্রভৃতি ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। প্রসঙ্গক্রমে কবি রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত হইতে নানা গল্পকাহিনী পুরাণের ছাঁচেই গ্রহণ করিয়াছেন। কাহিনীটি বিশ্লেষণ করিলে মাতা ও পুত্র উভয়েরই প্রাধান্য এবং ধর্মপূজা প্রবর্তনে উভয়েরই কৃতিত্ব লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের

অন্যান্য কবিদের মতো ঘনরামের কাব্যে ধর্মের পূজা প্রচার অপেক্ষা রঞ্জার কৃচ্ছ্রসাধন এবং লাউসেনের অদ্ভুত বীরত্বকাহিনী অধিকতর গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করিয়াছে। ঐতিহাসিক নামধামের সঙ্গে অল্পস্বল্প ঐক্য সাদৃশ্য রাখিয়া এবং ধর্মমঙ্গলের পুরাতন ধারার অনুসরণ করিয়া ঘনরাম এই কাব্যে সত্যই বীররসাত্মক মহাকাব্যের বিশাল সৌধ রচনার চেষ্টা করিয়াছেন। রঞ্জার বাৎসল্য-ব্যাকুলতা, লাউসেনের অদ্ভুত বাহুবল, মহামদের প্রচণ্ড বৈরিতা, গৌড়েশ্বরের দোলাচল মনোবৃত্তি, ধর্মের কৃপায় লাউসেনের অলৌকিক অনৈসর্গিক কৃতিত্ব প্রদর্শন—এ সমস্ত কাহিনীই কবি বেশ দীর্ঘ আকারেই বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে দুই-তিনটি বর্ণনা বাংলা সাহিত্যে একটু অদ্ভুত বটে। তন্মধ্যে নারীর বীরত্ব বর্ণনায় কবি বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন—অথচ প্রচণ্ড বীরত্ব নারীদের কোমলতা, লাবণ্য ও প্রেমানুরাগ আচ্ছন্ন করে নাই। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে এই ধরনের বীরাঙ্গনা চরিত্র সৃষ্টি ধর্মমঙ্গল কাব্যগুলিরই একটা বিচিত্র বৈশিষ্ট্য। ঘনরাম ইহাতে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। আর একটি বর্ণনায় কবি লাউসেনের বীর্যের সঙ্গে চরিত্র সংযমও উজ্জ্বলবর্ণে চিহ্নিত করিয়াছেন। আখড়া ধরে দেবী যে-ভাবে নব-কিশোর লাউসেনকে ছলিতে গিয়াছিলেন, তাহাতে মুনিঋষিরও পদস্খলন হইতে পারিত। লাউসেন সে পরীক্ষায় অবলীলাক্রমে উত্তীর্ণ হইয়াছে। রঙ্গিণী নটীরা রূপের ফাঁদ পাতিয়া তাহাকে ধরিতে গিয়া ব্যর্থ হইয়াছে। অবশ্য চারিত্রিক বিশুদ্ধি বজায় রাখিতে গিয়া নায়ককে বহু দুঃখ কষ্ট ভোগ করিতে হইয়াছে, কিন্তু তবু তিনি চরিত্রকে কোথাও অবনমিত হইতে দেন নাই। লাউসেনের বাহুবল অপেক্ষা তাঁহার চারিত্রবল ও নৈতিক শুদ্ধাচার অধিকতর প্রশংসা দাবি করিতে পারে। রমণীর মাতৃত্ব, স্ত্রীর পাতিব্রত্য, বীরাঙ্গনার বীরমূর্তি, দেবতার প্রতি ভক্তের একান্ত আত্মসমর্পণ, ক্রূর খলের নষ্টামি,—এ সমস্ত বর্ণনাও কবির রচনাশক্তিকে সুপ্রমাণিত করিয়াছে। ইহার ঘটনাবস্তু, চরিত্রবিন্যাস, মহদাদর্শ, সমুন্নতি, অদ্ভুত অনৈসর্গিকের সঙ্গে বাস্তবের সন্ধি প্রভৃতি বর্ণনায় কবি যেরূপ বিস্তৃত পট ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার রচনাশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে—রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্র উভয়ের তুলনায় ঘনরাম কাহিনীর বিশালতা ও চরিত্রবৈচিত্র্যে অধিকতর কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এইজন্য পাঁচালী ঢঙে রচিত

বিরাট কাব্যকে কেহ কেহ মহাকাব্য আখ্যা দিতে চাহেন।[৮৪] ধর্মমঙ্গল, আর পাঁচটা মঙ্গলকাব্যের মতোই অদ্ভুত উদ্ভট বীররসাত্মক কাহিনীপূর্ণ বটে, কিন্তু তাহা কোন দিক দিয়াই মহাকাব্যের সমুন্নতি লাভ করে নাই। ঘনরাম এই বিশাল কাহিনীতে সম্ভব-অসম্ভব—কোন কিছুরই সীমা রক্ষা করেন নাই। তিনি যুদ্ধবিগ্রহের কত অদ্ভুত বর্ণনা দিয়াছেন, দেবতা-মানবের নানা বিস্ময়কর কাহিনী ফাঁদিয়াছেন, কিন্তু মহাকাব্য রচনার মতো প্রতিভা. মানসিক অবস্থা ও সামাজিক পটভূমিকার অভাব ছিল বলিয়া ঘনরামের এই কাব্য বৃহদায়তন পাঁচালী হইয়াছে, ঘনপিনদ্ধ মহাকাব্য হইতে পারে নাই। বরং রামায়ণ-মহাভারত পাঁচালী জাতীয় রচনা হইলেও তাহা বাঙালীর চিত্তকে বিশালতার দিগন্তে লইয়া গিয়াছে—ঘনরামেব ধর্মমঙ্গল কোন দিক দিয়াই সমগ্র বাঙালীর কাব্য হয় নাই। অবশ্য তাঁহার কাব্যে আদিম মহাকাব্যের (Primitive epic) বীজ নিহিত থাকিলেও তাহা মহাকাব্যের মহীরুহে পরিণত হয় নাই। ঘনরাম বাহ্যিক বিস্তারের দিকে যতটা আকৃষ্ট হইয়াছিলেন, আভ্যন্তরীণ কল্পনা-সমুন্নতির প্রতি ততটা গুরুত্ব দিতে পারেন নাই। Heroic-tales-এর অনুরূপ ইহাতে অনেক খণ্ড খণ্ড কাহিনী থাকিলেও কবি-

৮৪. ডঃ সুকুমার সেন ধর্মমঙ্গল কাব্য সম্পর্কে বলিযাছেন, "প্রাচীন বাঙ্গালা সাহিত্যে মহাকাব্য (Epic) বলিয়া যদি কিছু থাকে তবে তাহা ধর্মমঙ্গল" (রূপরামেব ধর্মমঙ্গল, ১ম সংস্করণ, ভূমিকা, পৃ. ১/০)। এই মন্তব্যের প্রতিধ্বনি করিয়া ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র ঘনরামের ধর্মমঙ্গলকে মহাকাব্য বলিতে চাহেন। তাঁহার মতে, ' সর্বযুগের, সর্বকালেব, সকল শ্রেণীর মানুষেব আশা-আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কাহিনী মহাকাব্যে রূপায়িত হয়।···ঘনরামের ধর্মমঙ্গলে এই লক্ষণগুলি দেখিতে পাওয়া যায়। অবশ্য সমগ্রভাবে ধর্মমঙ্গল কাহিনীতেই মহাকাব্যের কাঠামো আছে। ঘনরাম সেই প্রচলিত কাহিনীকে অবলম্বন করিয়াছেন, কিন্তু পৌরাণিক কাঠামোর মধ্যে কাহিনীকে অগ্রসর করিয়া বিশিষ্ট শিল্পরীতির মাধ্যমে কাহিনীকে তিনি মহাকাব্যের পর্যায়ে আনিতে চেষ্টা করিয়াছেন।" (ডঃ পীযূষকান্তি সম্পাদিত ঘনরামের ধর্মমঙ্গল পৃ ৩৸০—৩৸/০) ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের প্রথম পর্বে ধর্মমঙ্গল অধ্যায়ে ধর্মমঙ্গল কাব্যকে কেন মহাকাব্য বলা যায় না, সে সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি, এখানে তাহার পুনরাবৃত্তি নিষ্প্রয়োজন। তবে ডঃ পীযূষকান্তি মহাপাত্র মহাকাব্যের লক্ষণ হিসাবে যাহা নির্দেশ করিয়াছেন, ("সর্বযুগের, সর্বকালের, সকল শ্রেণীর মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষা ও আদর্শের কাহিনী") তাহার কোনটাই ধর্মমঙ্গলে পাওয়া যায় না। ধর্মমঙ্গলের মধ্যযুগীয় গালগল্প সর্বকালের মানুষের আশা আকাঙ্ক্ষার কাহিনী—এইরূপ গৌরবে ধর্মমঙ্গলকে ভূষিত করা যায় না।

দৃষ্টির সেই সমগ্র বোধ ছিল না, যাহার দ্বারা সামান্য ব্যাপারও অসামান্য হইয়া উঠিতে পারে। এইজন্য মধ্যযুগীয় এই পাঁচালীকারকে মহাকবির আসনে বসাইয়া গৌরবের ফুলচন্দন দিবার প্রয়োজন নাই। তাই বলিয়া ঘনরামের প্রতিভাকে তুচ্ছ করাও যুক্তিসঙ্গত নহে। ঘটনাবিন্যাসে তাঁহার কৃতিত্ব অল্প নহে। বাস্তব অভিজ্ঞতা, সাংসারিক জ্ঞান, মানব চরিত্র প্রভৃতি ব্যাপারে তাঁহার বিশেষ কৌতূহল ছিল তাহা অস্বীকার করা যায় না। দুই এক স্থলে আদিরস লইয়া তিনি অনাবশ্যক বাড়াবাড়ি করিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা বাদ দিলে তাঁহার "রচনার বিশেষ গুণ প্রসন্নতা ও ভদ্ররুচি"[৮৫] সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিবে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিদের মতো অনুপ্রাসে তাঁহার বিশেষ আকর্ষণ ছিল, কিন্তু রামেশ্বরের মতো তিনি অনুপ্রাসের ভোজবাজিতে মত্ত হন নাই। মৃদু হাস্যকৌতুক, করুণরস ও বীররসের বর্ণনায় তিনি যে সমসাময়িক অনেক কবি অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সহজ, সরল, অবারিত-গতি অজস্র পয়ার ত্রিপদীতে তিনি যেভাবে কাহিনীটিকে অগ্রবর্তী করিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে প্রশংসাই করিতে হইবে। কিন্তু ভারতচন্দ্রের লিপিকুশলতা তাঁহার ছিল না, মুকুন্দরামের মতো প্রসন্ন জীবন-চিত্র তিনি ততটা ফুটাইতে পারেন নাই, রামেশ্বরের মতো প্রতিদিনের বাস্তব জীবনকেও তিনি কাব্যে জীবন্ত করিতে পারেন নাই। তাঁহার সুদীর্ঘ বর্ণনা বহু স্থলেই ক্লান্তিকর, প্রাণহীন মনে হয়। তাঁহার কাব্যের পরিধি আর একটু সঙ্কুচিত হইলে হয়তো ইহা পরীক্ষার্থীর পাস-বৈতরণীর খেয়া-নৌকা না হইয়া আধুনিক পাঠকেরও রসের ভোজে আহূত হইতে পারিত।

ঘনরাম 'সত্যনারায়ণ সিন্ধু' নামে সত্যনারায়ণের একখানি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।[৮৬] কিন্তু কোন দিক দিয়াই ইহা উল্লেখযোগ্য নহে।

মাণিকরাম গাঙ্গুলি ॥ মাণিকরাম গাঙ্গুলি ধর্মমঙ্গলের আর একজন সুপরিচিত কবি—যদিও তাঁহার আবির্ভাবকাল ও গ্রন্থ রচনার সন-তারিখ লইয়া রীতিমতো বাগ্‌বিতণ্ডা চলিতেছে। তাঁহার কাব্যে গ্রন্থ রচনার সন-

৮৫. বা. সা. ইতি—১ম (অপরার্ধ), পৃ. ১৮২

৮৬. প্রফুল্লচন্দ্র ভট্টাচার্য ও কালীপদ সিংহ সম্পাদিত, বর্ধমান সাহিত্য সভা প্রকাশিত।

তারিখ নির্দেশক কয়েক ছত্র থাকিলেও লিপিকার প্রমাদে তাহা এমন 'হযবরল' রূপ ধারণ করিয়াছে যে, তাহা হইতে নিশ্চিতরূপে কোন সন-তারিখের হদিশ পাওয়া যায় না। বাংলা ১৩১২ সালে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী ও দীনেশচন্দ্র সেনের সম্পাদনায় সাহিত্য পরিষদ হইতে মাণিক গাঙ্গুলির 'শ্রীধর্মমঙ্গল' সর্বপ্রথম মুদ্রিত হইয়া প্রকাশিত হয়। উহাতে কোন সম্পাদকীয় ভূমিকা ছিল না, গ্রন্থকার ও গ্রন্থরচনাকাল সম্বন্ধেও কোনও আলোচনা ছিল না। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'র ভূমিকায় মাণিক গাঙ্গুলির কাব্যের পুঁথি সম্বন্ধে কিছু তথ্য দিয়াছিলেন। সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'শ্রীধর্মমঙ্গলে' কাব্য রচনাকাল-জ্ঞাপক যে সন-তারিখ ছিল, তাহা লইয়া আধুনিক যুগে নানা বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছে। পরে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি এই বিষয়ে কিছু কিছু নির্ভরযোগ্য আলোচনা কবিয়াছিলেন।

সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত কাব্যটি মাত্র একখানি পুঁথি অবলম্বনে মুদ্রিত হইয়াছিল, এখন আবার সে পুঁথিখানিরও সন্ধান পাওয়া যাইতেছে না।[৮৭] ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বর্ধমান সাহিত্যসভার জন্য যে পুঁথি সংগ্রহ করেন, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল সেই পুঁথির অবিকল মুদ্রণ। সাহিত্য পরিষদ সংস্করণে স্বর্গারোহণ পালায় কাব্য রচনার সঙ্কেতস্বরূপ এই কয় ছত্র পাওয়া যায়ঃ

সাকেরি ও সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিন্ধু সহ যুগ দক্ষে যোগ্যতার সনে॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বারি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত॥

বলা বাহুল্য এই কয় ছত্র হইতে সন-তারিখ সম্বন্ধে কোন হদিশ পাওয়া যায় না। লিপিকার নকল করিবার সময় গোলমাল করিয়া ফেলিয়াছিলেন বলিয়া ইহার 'মাথামুণ্ডু' বুঝা যায় না! যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি কবির বর্তমান বংশধরের নিকট কাব্যে যে নকল পাইয়াছিলেন, তাহাতে কালনির্দেশক এই কয় ছত্র আছেঃ

শাকে রীত্ত (তু) সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সির্ধ সহ জোগ দক্ষে যোগ তার সনে॥

৮৭. ব. সা. প. প. ১৩১৩

বারে হল্য মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
সর্ব্বরি সরাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল্য গীত ॥

ইহা হইতে কিয়ৎপরিমাণে রচনাকাল নির্ধারণ করা যায়। ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সংগৃহীত সাহিত্যসভার পুঁথিতে শ্লোকটি এইভাবে পাওয়া যাইতেছে :

শাকে ঋতু সঙ্গে বেদ সমুদ্র দক্ষিণে।
সিদ্ধ স [হ যুগ প] ক্ষে যোগ তার সনে ॥
বারে হল মহীপুত্র তিথি অব্যাহিত।
শর্ব্বরী সবাগ্নি দণ্ডে সাঙ্গ হল গীত ॥

এই সঙ্কেতের সরলার্থ নির্ধারণ করা কিঞ্চিৎ দুরূহ। দীনেশচন্দ্র ইহা হইতে এইভাবে সন-তারিখ বাহির করিয়াছেন—

ঋতু—৬ বেদ—৪, সমুদ্র—৭ = ৬৪৭
সিদ্ধি—৪, যুগ—২, পক্ষ—২ = ৮২২

১৪৬৯ শকাব্দ[৮৮]

অর্থাৎ ১৪৬৯ শকাব্দে (১৫৪৭ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। কিন্তু কাব্যের ভাষা এত আধুনিক ও অর্বাচীনত্বের লক্ষণযুক্ত যে, মাণিকরামকে ষোড়শ শতাব্দীতে আবির্ভূত বলিয়া মনে হয় না। তাই যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি পঞ্জিকা ও জ্যোতিষ গণনার দ্বারা উক্ত চারি ছত্র হইতে ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ পাইয়াছেন। তিনি কবির বংশধরদের নিকট কবির বংশপরিচয় সংগ্রহ করিয়া দেখিলেন যে, গদাধর গাঙ্গুলির পুত্র মাণিকরাম—তাঁহার চারি পুত্র। গদাধর গাঙ্গুলির আর এক ভ্রাতার পুত্র গঙ্গাধর। তাঁহার পুত্র অক্ষয়, তাঁহার পুত্র শ্রীরামপদ। ১৩১৫ সালেও শ্রীরামপদ জীবিত ছিলেন।[৮৯] তখন তাঁহার বয়স হইয়াছিল প্রায় পঞ্চাশ। শ্রীরামপদ গদাধর গাঙ্গুলি হইতে অধস্তন চতুর্থ পুরুষ। সাধারণতঃ প্রতি তিনপুরুষে একশত বৎসর ধরা হইয়া থাকে। তাহা হইলে এই হিসাবমতে মাণিকরামকে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পাওয়া যাইবে। যোগেশচন্দ্রের সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ করেন প্রসিদ্ধ গণিতজ্ঞ বিভূতিভূষণ দত্ত।[৯০] তিনি উক্ত চারি ছত্র হইতে

৮৮. কিন্তু 'যুগ' বলিতে দীনেশচন্দ্র '২' ধরিলেন কেন ? যুগকে '৪' ধরিলে ইহা হইতে ১৪৮৯ শক (১৫৬৭ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া যাইবে। ডঃ আশুতোষ ভট্টাচার্য মহাশয়ও (বাংলা মঙ্গলকাব্যের ইতিহাস পৃ. ৬১৩) এইভাবে সন নির্দেশ করিয়াছেন।

৮৯. ব. সা. প. প. ১৩১৫

৯০. ব. সা. প. প. ১৩৩৫

১৪৮৯ শক (১৫৬৭ খ্রীঃ অঃ) অথবা ১৫২৯ শক (১৬০৭ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছিলেন। তখন যোগেশচন্দ্র পুনরায় সতর্কতার সহিত গণনা করিয়া উহা হইতে ১৭০৩ শকাব্দ পাইলেন।[৯১] তাঁহার মতে ১৭০৩ শকে (১৭৮১ খ্রীঃ অঃ) ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ মঙ্গলবার মাণিকরাম গ্রন্থ শেষ করেন।[৯২] বিদ্যানিধি মহাশয় সিদ্ধকে ২৪ ধরিয়াছেন, কিন্তু মধ্যযুগে চৌরাশি সিদ্ধার কথা সুবিদিত ছিল। সুতরাং ২৪-এর স্থলে ৮৪ ধরাই যুক্তিসঙ্গত। তাহা হইলে এই সন হইবে ১৭০৯ শক বা ১৭৮৭ খ্রীঃ অব্দ। কবি যে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তমান ছিলেন, তাহার আর একটি প্রমাণ—কাব্যে বিষ্ণুপুরের মদনমোহনের উল্লেখ :

বিষ্ণুপুরের বন্দিব শ্রীমদনমোহনে।
পূর্ব্বেতে আছিলা প্রভু বিপ্রের সদনে।

১৬৯৪ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে বিষ্ণুপুরে মদনমোহনের বিগ্রহ স্থাপিত হইয়াছিল। সুতরাং কবির কাব্য নিশ্চয়ই সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী রচনা। কবি আর একস্থলে ময়ূরভট্ট ও রূপরামের বন্দনা করিয়াছেন :

বন্দিয়া ময়ূরভট্ট আদি রূপরাম।
দ্বিজ শ্রীমাণিক ভণে ধর্ম্ম গুণগান।

রূপরামের ধর্মমঙ্গল ১৬৪৯-৫০ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত হয়। সুতরাং মাণিক গাঙ্গুলি সপ্তদশ শতাব্দীর পরবর্তী হইবেন, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। উপরন্তু তাঁহার ভাষা ও ছন্দ যেরূপ চাঁছাছোলা, তাহাতে তাঁহার কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের রচনা বলিয়া মনে হয়।[৯৩] তখন পুরাতন বাংলা সাহিত্যে ভাঁটার টান শুরু হইয়া গিয়াছে। অবশ্য সেই যুগে, এমন কি পরবর্তী শতাব্দীতেও মাণিকরামের মতো কোন কোন কবি পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়া চলিয়াছিলেন।

---

৯১. ঋতু—৬, বেদ—৪, সমুদ্র—৭ = ৬৪৭
সিদ্ধ—২৪, যুগ—৪, পক্ষ—২ = ২৪২৪
৩০৭১

অর্থাৎ ১৭০৩ শক বা ১৭৮১ খ্রীঃ অব্দ।

৯২. প্রবাসী, পৌষ, ১৩৩৬

৯৩. কবি ইংরেজী stable-এর সঙ্কুচিত রূপ 'তবল' শব্দও ব্যবহার করিয়াছেন। দ্রষ্টব্য ডঃ বিজিত ও ডঃ সুনন্দা দত্ত সম্পাদিত মাণিক গাঙ্গুলির ধর্মমঙ্গল, পৃ. ১৶৹

মাণিক গাঙ্গুলি খুব ফলাও করিয়া নিজের কথা বর্ণনা করিয়াছেন—ধর্মমঙ্গলের অন্যান্য কবির মতো অর্বাচীন কালের এই কবিও অদ্ভুত ও অনৈসর্গিক কল্পনার আশ্রয় লইয়াছিলেন। "মণিকরামের আত্মকাহিনী বৈচিত্র্যহীন নয়" বটে[৯৪] কিন্তু একই প্রকার *motif* আমদানির ফলে সেই বৈচিত্র্য প্রায়ই পর্যুসিত হইয়া পড়িয়াছে। সালঙ্কারে নিজের কথা ফুলাইয়া ফাঁপাইয়া তোলা ধর্মমঙ্গলের কবিদের ফ্যাসান হইয়া গিয়াছিল। ফলে তাহা হইতে কবিজীবনের বস্তুগত যাথার্থ্য অপেক্ষা বানানো আজগবি কথা গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে। যাহা হউক তাঁহার আত্মকথা এবং গ্রন্থের অন্যান্য উল্লেখ হইতে দেখা যাইতেছে, মাণিকরামের পিতামহের নাম অনন্তরাম, পিতা গদাধর, মাতার নাম কাত্যায়নী, পত্নী শৈব্যা। কবি সর্বজ্যেষ্ঠ, তাঁহার পাঁচটি ছোট ভাই ছিল। তাহার চতুর্থ ভাই ধর্মঠাকুরের নির্দেশে জ্যেষ্ঠের কাব্যের গায়েন হইয়াছিলেন। স্বপ্নে যখন ব্রাহ্মণ কবি শুনিলেন যে, তাঁহাকে নীচ জাতির দেবতা ধর্মঠাকুরের মাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য লিখিতে হইবে, এবং তাঁহার অনুজকে সেই কাব্যের গায়েন হইতে হইবে, তখন তিনি একটু ভীত ও সঙ্কুচিত হইলেন:

এতেক শুনিয়া মোর উড়িল পরাণ।
জাতি যায় তবে প্রভু যদি করে গান॥
অচিরাৎ অখ্যাতি হবেক দেশে দেশে।
স্বপক্ষের সন্তোষে বিপক্ষ পাছে হাসে॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগেও ব্রাহ্মণে ধর্মমঙ্গল রচনা করিলে বা গান করিলে তাঁহার জাতি যাইবার সম্ভাবনা ছিল। অবশ্য—

জগৎ ঈশ্বর কন আমি তোর জাতি।
তোমার অখ্যাতি হলে আমার অখ্যাতি॥

কবি তখন নিশ্চিন্ত মনে ধর্মমঙ্গল রচনায় প্রবৃত্ত হইলেন। কবির কাব্য ঘনরাম অপেক্ষা কিছু হ্রস্ব হইলেও আকারে-আয়তনে নিতান্ত ক্ষীণকায় নহে—ছাপার অক্ষরে ডিমাই সাইজে প্রায় ছয় শত পৃষ্ঠা। ইহাতে কবি সর্বপ্রথমে দিগ্‌বন্দনা অংশে বিভিন্ন গ্রামের নানা নামের লৌকিক দেবদেবীর বন্দনার পর ধর্মমাহাত্ম্য বর্ণনায় অগ্রসর হইয়াছেন। দ্বাদশ দিন ধরিয়া দিবা ও রাত্রিতে এই কাব্য পড়া হইত বলিয়া ইহা বারোমতি বা 'বারমাতি'

৯৪. ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম—অপরার্ধ,) পৃ. ১৯৪

নামেও পরিচিত।[১৫] কবি শ্রীধর্মমঙ্গল ও বার্মাতি—দুইটি শব্দই কাব্যের নাম হিসাবে ব্যবহার করিয়াছেন। বারোটি পালায় কাহিনীর আরম্ভ হইতে পশ্চিমে সূর্যোদয় ও লাউসেনের স্বর্গারোহণ পালা বিভক্ত হইয়াছে। বর্ণনার ধারা গতানুগতিক—ঘনরামের পর তাঁহার এ কাব্য না লিখিলেও চলিত। চরিত্রগুলিও বিশেষ কোন নূতন বৈচিত্র্য দেখাইতে পারে নাই। অবশ্য কবি পুরাণ হইতে বহু উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন, কথায় কথায় রামায়ণ-মহাভারত হইতে দৃষ্টান্ত দিয়া ধর্মঠাকুরের অপৌরাণিক সংস্কার সম্পূর্ণ-রূপে মুছিয়া ফেলিতে চাহিয়াছেন। আর একটা বৈশিষ্ট্য, কবি ইহাতে রাঢ়ের ধর্মোৎসব ও ধর্মপূজা সংক্রান্ত খুঁটিনাটি তথ্য সবিস্তারে বর্ণনা করিয়াছেন। ধর্মমঙ্গল কাব্যের অন্যান্য বৈশিষ্ট্য কবি হুবহু অনুকরণ করিয়াছেন। আদিরসের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি আছে; রঞ্জাবতীর মাতৃহৃদয়ের ব্যথাবেদনা বেশ সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে। কিন্তু কবি সর্বাপেক্ষা অধিক সহৃদয়তা বোধ করিয়াছেন কালু ডোমের দারিদ্র্যপীড়িত জীবন বর্ণনায়। দরিদ্র কালু—

> ম্লান মুখ সদাই শূকর সঙ্গে ফির‍্যা।
> কটিতে কৌপীন তার গণ্ডা দশ গির‍্যা॥
> তৈল বিনা তাম্র কেশ তনু যেন খড়ি।
> কেবল সঙ্কটকষ্ট কপালের ডেড়ি॥

যখন সে বলে: "শাক লাউ সিদ্ধ করে সেও অলবণ"—তখন দারিদ্র্যের এই বর্ণনা পোষাকী অলঙ্কার ছাড়িয়া নিরাভরণ বেশে পাঠকের অন্তর আকর্ষণ করে। চরিত্র হিসাবে কর্পূর চরিত্রটি ব্যক্তিবৈশিষ্ট্যে সমুজ্জ্বল হইয়াছে। বিপদের সময়ে সর্বদা নিরাপদ আশ্রয় খুঁজিয়া, দাদাকে বিপদের মুখে আগাইয়া দিয়া, বিপদ কাটিয়া গেলে সগর্বে বাহিরে আসিয়া সে যেরূপ শূন্যগর্ভ বীরত্বের আস্ফালন করিয়াছে, তাহাতে তাহার 'বীরপনায়' বেশ কৌতুক সৃষ্টি হইয়াছে। ঘনরাম অধিকতর প্রতিভাবান কবি হইলেও মাণিকরামের সাধারণ পাঁচাপাঁচি চরিত্র অধিকতর বাস্তবানুগামী হইয়াছে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। অবশ্য ভাষা-ভঙ্গিমায় তিনি রামেশ্বর, ঘনরাম বা ভারতচন্দ্রের মতো চমকপ্রদ প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই—যদিও

১৫. ইতিপূর্বে ৩য় খণ্ডের ১ম পর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর ধর্মমঙ্গল কাব্য প্রসঙ্গে 'বার্মাতি' শব্দ ব্যাখ্যা করা হইয়াছে।

তিনি ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর অন্ততঃ দুই দশক পরে ধর্মমঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন। মাণিকরাম ছোট ছোট জীবনচিত্র নিপুণতার সঙ্গে ফুটাইয়াছেন বটে, কিন্তু কোন বড়ো ব্যাপক ব্যাপার তভটা কৃতিত্বের সঙ্গে অঙ্কন করিতে পারেন নাই। তিনি 'শীতলামঙ্গল' শীর্ষক একখানি ক্ষুদ্র কাব্য লিখিয়াছিলেন যাহা কোনক্রমেই উল্লেখযোগ্য নহে।

ধর্মমঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি॥ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও আট-নয় জন কবি ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সাহিত্যের দিক দিয়া তাঁহাদের কাব্য-কাহিনীর বিশেষ কোন বৈচিত্র্য নাই। তাঁহারা পূর্বসূরীদের খনিত পথেই যাত্রা করিয়াছিলেন, নূতন কোন বৈশিষ্ট্য সংযোজনার চেষ্টা করেন নাই, সেরূপ সাধ্যও ছিল না। সাহিত্যের ইতিহাস এই সমস্ত অনাবশ্যক তথ্যের দ্বারা ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। শুধু মঙ্গলকাব্যের ধারা রক্ষা করিবার জন্য এখানে এই সমস্ত স্বল্প প্রতিভাধর কবিদের সম্বন্ধে দুই এক কথা বলা যাইতেছে।

দ্বিজ রামচন্দ্র বা রামচন্দ্র বাঁড়ুজ্যার ধর্মমঙ্গল ১০৩৮ মল্লাব্দ বা ১৭৩২ খ্রীস্টাব্দে রচিত হইয়াছিল। কবি অতি স্পষ্টভাবে সন-তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন:

> মল্লভূমে নিবসি মল্লের লিখি শক।
> হাজার আটত্রিশ সালে হইল পুস্তক।[৯৬]

কবি মল্লভূমের রাজা গোপাল সিংহের সময়ে এই কাব্য রচনা করেন। 'সাহিত্যসংহিতা'র ৭ম-৮ম খণ্ডের (১৩১৩-১৪ সাল) পরিশিষ্টে ইহার কিয়দংশ মুদ্রিত হইয়াছিল। তাঁহার কয়েকটি খণ্ডিত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তাই মনে হয় স্থানীয় সমাজে এই কাব্যের কিঞ্চিৎ প্রভাব ছিল।[৯৭] 'সাহিত্য-সংহিতা'য়

৯৬. ব. সা. প. প. ১৩০১

৯৭. সাহিত্য পরিষদ হইতে বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায় সম্পাদিত ময়ূরভট্ট প্রণীত বলিয়া প্রচারিত যে ধর্মপুরাণ প্রকাশ হইয়াছে, তাহা যে ময়ূরভট্ট নামক কোন কবির লেখা নহে, তাহা আমরা প্রথম পর্বে প্রমাণের চেষ্টা করিয়াছি। সম্প্রতি ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল বিশ্বভারতী পুঁথিশালায় রক্ষিত একখানি পুঁথি হইতে প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইহা প্রকৃত পক্ষে দ্বিজ রামচন্দ্রের রচনা—ময়ূরভট্ট নামক কোন প্রাচীন কবির নহে। ডঃ মণ্ডলের মতে রামচন্দ্র দুইখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন—(১) শ্রীধর্মপুরাণ, (২) ধর্মমঙ্গল। প্রথম খানিতে রামাই পণ্ডিতের দ্বারা ধর্মপূজা প্রচারের কাহিনী এবং দ্বিতীয় খানিতে লাউসেনের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। প্রথম খানিই ময়ূরভট্টের নামে মুদ্রিত হইয়াছে।

যেটুকু প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে কবির বর্ণনাভঙ্গি বেশ পরিচ্ছন্ন মনে হইতেছে—ভাষাও তীক্ষ্ণ ও আধুনিক। নানাপ্রকার ছন্দেও কবির বেশ দক্ষতা ছিল। নিম্নে কবির ব্যবহৃত একাবলী ছন্দের একটু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

ধর্মের সেবক আখড়া মালে।
মাল কোথা গেল ডাকিয়া বলে॥
বিপরীত গণি সারেঙ্গ ধল।
সাজন করিছে যেমন কাল॥
বীরধড়া পড়ে আপন বেশে।
মাথা চৌতলা পটুকা কসে॥
রাঙ্গা ধূলা সবে মাখিয়া অঙ্গে।
সাত মাল সাজে সমরে রঙ্গে॥

সহদেব চক্রবর্তী ধর্মঠাকুরের স্বপ্নাদেশের ফলে ১১৪১ সালে (১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ) ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনা করেন।[৯৮] কবি কিন্তু এই কাব্যকে 'অনিল পুরাণ' বলিয়াছেন :

উলটিয়া আদ্যারে কহেন ভগবান।
অনিলপুরাণ দ্বিজ সহদেব গান॥

সহদেব কালুরায় বা কালাচাঁদ নামক কোন স্থানীয় ধর্মঠাকুরের সেবক ছিলেন, গ্রন্থের মধ্যে একাধিক স্থলে তাঁহাকে শ্রদ্ধা নিবেদন করিয়াছেন। হুগলী জেলার বালিগড় পরগণার অন্তর্গত রাধানগর গ্রামে বৈদিক ব্রাহ্মণ-বংশে কবির জন্ম হয়। কবি একস্থলে হেঁয়ালির ভাষায় নিজ কাব্যের রচনা সন নির্দেশ করিয়াছেন :

দ্বিজ সহদেব গান পূর্ব তপ ফলে।
যাহারে করিলে দয়া একচল্লিশ সালে॥
* * *
চৈত্রের চতুর্থ দিনে পূর্ণিমার তিথি।
হেন দিনে যারে দয়া কৈলা যুগপতি॥

একচল্লিশ সালের ৪ঠা চৈত্র কবি দেবতার কৃপা লাভ করিয়া কাব্য রচনায় অগ্রসর হন। এখন দেখা যাক, এই একচল্লিশ সাল যথার্থ কত সন-শতাব্দী হইতে পারে। অম্বিকাচরণ গুপ্ত সহদেবের যে পুঁথি অবলম্বনে ১৩০৪ সালের

৯৮. ব. সা. প. প. ১৩০৪

বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় 'সহদেব চক্রবর্তীর ধর্মমঙ্গল' শীর্ষক প্রবন্ধ রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে ১১৯৩ (১৭৮৭) সন উল্লিখিত ছিল। গুপ্ত মহাশয়ের মতে একচল্লিশ সালের অর্থ—১১৪১ বঙ্গাব্দ, ১৭৩৫ খ্রীঃ অঃ। অর্থাৎ ১৭৩৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে কবি কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। এই সিদ্ধান্ত সত্য হইতে বাধা নাই। এই কাব্যে রঞ্জাবতী-লাউসেনের কোন কাহিনী নাই। মূল কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ: নিরঞ্জনের নিশ্বাসে উলুকের সৃষ্টি, আদ্যার জন্ম, তাঁহার গর্ভে নিরঞ্জনের ঔরসে ব্রহ্মাদির জন্ম, আদ্যার শতবার দেহান্তর গ্রহণ, পরিশেষে মহাদেবের পত্নী হইতে অঙ্গীকার, শিবের দারিদ্র্যের কাহিনী, বাগদিনী পালার পুনরাবৃত্তি, হরপার্বতীর বল্লুকাতীরে গিয়া তত্ত্বকথা আলোচনা—সেখান হইতে নাথসাহিত্যের দিকে কাহিনী চলিয়া পড়িয়াছে। ইহার পর গঙ্গার উপাখ্যান, শিবকর্তৃক গঙ্গাপূজা, এক রাজার ধর্মঠাকুরের নিন্দা, জাজপুর নিবাসী ধর্মঠাকুর-বিরোধী ব্রাহ্মণদের প্রতি যথোচিত শাস্তি-বিধান, হরিশ্চন্দ্র রাজার ধর্মপূজা এবং লুইচন্দ্র প্রসঙ্গের পর কাহিনী সমাপ্ত হইয়াছে। ইহা ধর্মমঙ্গল নহে—ধর্মপুরাণ। তাই ইহাতে ধর্মমঙ্গল কাব্যের সুপরিচিত লাউসেন কাহিনী উল্লিখিত হয় নাই। অবশ্য ইহাকে বিশুদ্ধ ধর্মপুরাণ বলা যায় না—কারণ ইহাতে শিবায়ন ও নাথসাহিত্যের ধারাও অল্লাধিক অনুসৃত হইয়াছে। কবির বর্ণনাভঙ্গিমা পরিচ্ছন্ন, ভাষা মার্জিত, রীতিপদ্ধতি আধুনিক ধরনের—ভাষায় তৎসম শব্দের পরিমিত প্রয়োগ রচনার কোন কোন অংশকে গাম্ভীর্য দান করিয়াছে। যথা:

অতি অনুপম শোভা শোভিত কৈলাস।
ষড় ঋতু বসন্ত সমীর বারো মাস॥
কুসুম দিগন্ত গন্ধা সদা বিকশিত।
অলিগণ গায় শিবদুর্গার চরিত॥

কোন কোন স্থলে তাঁহার শাক্ত মনোভাবও বিশেষ প্রশংসনীয়:

শরণ লইনু জগৎ জননী
ও রাঙ্গা চরণে তোর।
ভবজলধিতে অনুকূল হৈতে
কে কার আছয়ে মোর॥
দুগ্ধকণ্ঠ শিশু যদি দোষ করে
রোষ না করয়ে মায়।

যদি না রুষিবে পড়িয়া কান্দিব
ধরিয়া ও রাঙ্গা পায়॥

দুই-একটি প্রহেলিকা-পদেও কবি বেশ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন :

শিল নোড়াতে কোন্দল বাধিল
সরিষা ধরাধরি করে।
চালের কুমড়া গড়ায়ে পড়িল
পুঁইশাক হাসিয়া মরে॥
এ বড় বচন অদ্ভুত।
আকাট বাঁঝিয়া প্রসব হৈল
ছেলে চায় পায়রার দুধ॥
অনেক যতনে নৌকা বাঁধিনু
কাঁকড়া ধরিল কাছি।
মশার লাথিতে পর্বত ভাঙ্গিল
ক্ষুদ্র পিপীলিকার হাসি॥

প্রসিদ্ধ 'নিরঞ্জনের রুষ্মা'[৯৯] কবির অনিলপুরাণেই স্থান পাইয়াছে। এই কাব্য কাব্যহিসাবে অকিঞ্চিৎকর। কিন্তু ধর্মমঙ্গলের দেবতত্ত্ব ও তাহার সঙ্গে এক যুগের সমাজ-জীবনের সম্পর্কের জন্য ইহার বিশেষ প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করিতে হইবে।

কবি হৃদয়রাম সাউ ১১৫৬ বঙ্গাব্দে (১৭৪৯ খ্রীঃ অঃ) ধর্মমঙ্গল কাব্য সমাপ্ত করেন। পূর্বনিবাস বর্ধমানের খুকল গ্রাম। মাতুলদের সঙ্গে পারিবারিক কলহের ফলে তিনি সে গ্রাম ত্যাগ করিয়া এক পুকুরে ডুবিয়া আত্মহত্যা করিতে যান, তখন ধর্মঠাকুর স্বয়ং আবির্ভূত হইয়া কবিকে নিরস্ত করেন এবং আদেশ দেন—কবি যেন নিদিয়াদহ বিল হইতে ঠাকুরের শিলা-মূর্তি উদ্ধার করিয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। কবি সেই মূর্তি উদ্ধার করিয়া বীরভূমের উচকরণ গ্রামে গিয়া বসতি স্থাপন করেন। সেই গ্রামে এখনও হৃদয়রামের বংশধরদের বসবাস আছে। এই গ্রামে কবি উক্ত ধর্মঠাকুরের শিলামূর্তি প্রতিষ্ঠার পরে ধর্মমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। কবির পিতার নাম গোবিন্দ—তাঁহারা শুঁড়ি সম্প্রদায়ভুক্ত। এখনও অনেক শুঁড়িবাড়ীতে ধর্মের পূজা হইয়া থাকে—ইনি চাঁদরায় নামে পরিচিত।[১০০] কবির রচনা

৯৯. লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত—১ম খণ্ড দ্রষ্টব্য।

১০০. মহারাজকুমার মহিমানিরঞ্জন চক্রবর্তী সম্পাদিত 'বীরভূম বিবরণ', ৩য়, পৃ. ১৯১—৯৩

বেশ পরিচ্ছন্ন; তৎসম শব্দযুক্ত বাক্যবিন্যাস প্রশংসার যোগ্য। যথা—রঞ্জাবতীর রূপ বর্ণনা:

নাক মুখ চক্ষু কান কুন্দে যেন নির্ম্মাণ
কামান জিনিয়া ভুরুখানি।
মুখে বিন্দু বিন্দু ঘাম যেন মুকুতার দাম
অঙ্ক পসি যেন পদ্মমণি।
পদ আদ গজ হস্তী পথে চলে সেই রীতি
তাথে অধিক চলন মাধুরী।
দুই চক্ষু গগনের তারা কেশ চামরের ঝারা
মাঝাখানি জিনিআ কেশরী।

আরও কয়েকজন ধর্মমঙ্গলের কবির পুরা অথবা খণ্ডিত কাব্য পাওয়া গিয়াছে। গোবিন্দরাম বন্দ্যোপাধ্যায় (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ), নরসিংহ বসু (১৭৩৭ খ্রীঃ অব্দে কাব্য রচনা করেন), রামনারায়ণ (শুধু ইছাইবধের পুঁথি), রামকান্ত (১৭৫০ খ্রীঃ অঃ), দ্বিজ ক্ষেত্রনাথ, নিধিরাম গাঙ্গুলি, শঙ্কর চক্রবর্তী প্রভৃতি কবিদের নামেও ধর্মমঙ্গলের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় ধর্মমঙ্গলের কাহিনী ক্লান্তিকর একঘেয়েমিতে বিস্বাদ হইয়া পড়িয়াছে। পরবর্তী কালের স্বল্প প্রতিভাধর কবিদের কাহিনী পূর্বের অপেক্ষাও বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তিতে পরিণত হইয়াছে। রাঢ়ে এবং উত্তর ও দক্ষিণবঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে একদা ধর্মঠাকুরের অতিশয় প্রভাব ছিল, এখনও সে প্রভাব হ্রাস পায় নাই—অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বহু গ্রাম্য কবি ধর্মের অনেক পাঁচালী লিখিয়াছিলেন—যাহার বিশেষ কোন সাহিত্য-গৌরব নাই। এই সমস্ত অপদার্থ রচনার বিস্তারিত পরিচয় নিষ্প্রয়োজন বলিয়া আমরা শুধু এখানে কবিদের নাম উল্লেখ করিয়াই ক্ষান্ত হইলাম।

সত্যনারায়ণ কথা॥

ইতিপূর্বে রামেশ্বরের সত্যপীর পাঁচালী প্রসঙ্গে আমরা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের বিষয়ে কিছু আলোচনা করিয়াছি। খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ শতাব্দীর দিকে হিন্দু-মুসলমানের মিশ্র দেবতা সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের উপাসনা বা শীর্ণি বণ্টন প্রচলিত হয়, অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে সত্যনারায়ণ পাঁচালী রচনার ধুম পড়িয়া যায়। এই মিশ্রদেবতা পরিকল্পনায় হিন্দু-মুসলমান

উভয়েরই ধর্মবিশ্বাস একসূত্রে মিলিত হইয়াছে। মুসলমান শাসনের চণ্ডযুগে হিন্দুগণ ভয়ে ভক্তিতে মুসলমান পীর-ফকির-মুর্শিদের দরগায় যাতায়াত করিত। উপরন্তু সুফী মতবাদ বাঙালী হিন্দুর কাছে নিতান্ত বিধর্ম বলিয়া মনে হয় নাই। পীর-ফকিরের 'কেরামতে'র প্রতি অশিক্ষিত হিন্দু জন-সাধারণের বিস্ময়মুগ্ধ আকর্ষণ ছিল। ফলে ধীরে ধীরে হিন্দুসমাজে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণ নামে এক মিশ্রদেবতার পরিকল্পনা রাঢ়ভূমিতে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে। সাধারণতঃ হিন্দুর বাড়ীতে ইনি সত্যনারায়ণ নামেই পূজা পাইয়া থাকেন—কোথাও বা ইহার নাম সত্যপীর। রামেশ্বরের কাব্যের নাম সত্যপীরের পাঁচালী। মুসলমানের গৃহে ইনি সত্যপীর নামেই গৃহীত হইয়াছেন। হিন্দুরা সত্যনারায়ণ বলিয়া ইহার পূজার্চনা করিলেও শীর্ণি-বণ্টনে পুরাপুরি মুসলমানি রীতি বজায় রাখিয়াছেন। অর্বাচীন সংস্কৃত পুরাণেও সত্যপীরের কাহিনী অনুপ্রবেশ করিয়াছে।[১০১] তবে সেখানে সত্যনারায়ণ নাম গৃহীত হইয়াছে—এবং সত্যপীরের কাহিনীর ফকিরকে হিন্দুপুরাণে বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ করা হইয়াছে। সমগ্র অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দী ধরিয়া অসংখ্য সত্যনারায়ণের পাঁচালী রচিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে মোটামুটি দুইটি কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। ফকিরবেশী সত্যপীর কর্তৃক এক দরিদ্র ব্রাহ্মণের প্রতি কৃপাবর্ষণ ইহার প্রথম কাহিনী। দ্বিতীয় কাহিনীতে চণ্ডীমঙ্গলের অনুকরণে ধনপতির আখ্যানের আদর্শ অনুসৃত হইয়াছে।[১০২] যাঁহারা এই কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন তাঁহাদের অধিকাংশই ছিলেন হিন্দু, দুইচারিজন মুসলমানও[১০৩] সত্যপীরের পাঁচালী রচনায় হস্তক্ষেপ করিয়া-ছিলেন। পূর্বে রামেশ্বরের কথা বলা হইয়াছে। ভারতচন্দ্রও কৈশোরে সত্যনারায়ণের দুইখানি অতি ক্ষুদ্র পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন।[১০৪] ভৈরবচন্দ্র ঘটক, ঘনরাম চক্রবর্তী, ফকিররাম দাস এবং আরও অন্ততঃ চল্লিশজন কবির সত্যনারায়ণের পাঁচালী পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের

১০১. পূর্বে আলোচিত হইয়াছে।

১০২. রামেশ্বরের সত্যপীরের পাঁচালী প্রসঙ্গে ইহা আলোচিত হইয়াছে।

১০৩. দক্ষিণ রাঢ়ের আরিফ ও ফয়জুল্লার ভণিতায় সত্যপীরের কাহিনী পাওয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য: ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই.—১ম (অপরার্ধ)

১০৪. ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

অধিকাংশ কবিই উনবিংশ শতাব্দীতে বর্তমান ছিলেন। এই সমস্ত অকিঞ্চিৎকর অপদার্থ রচনার বিস্তারিত বিবরণ বর্তমান ক্ষেত্রে নিষ্প্রয়োজন। কোন কোন সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে বিশুদ্ধ রূপকথা ধরনের গল্পও পাওয়া যায়। ইহাতে ব্রতকথার অংশ অল্প, আরব্যরজনীর গল্পের অনুরূপ বৈশিষ্ট্যই অধিক। ইহাতে বাদশাহ্, হোসেন এবং উজীর সৈয়দ জামালের কন্যা লালমোনের প্রেমের গল্প, সত্যপীরের কৃপায় নায়ক-নায়িকার নানা বিপদ হইতে উদ্ধার প্রভৃতি অদ্ভুত অলৌকিক কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। দুই-একজন মুসলমান কবি সত্যপীরের কাহিনী বলিতে বসিয়া ধর্মসম্প্রদায়গত মানসিক ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। সেখ ফয়জুল্লা সত্যপীরের বন্দনায় হিন্দুর দেবদেবী এবং চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়াছেন, কোথাও বা তিনি আল্লাহ্ ও ব্রহ্মাবিষ্ণুকে এক করিয়া বলিয়াছেন, "তুমি ব্রহ্মা তুমি বিষ্ণু তুমি নারায়ণ।" কোন কোন হিন্দু কবি সত্যপীরের কাহিনী লিখিতে বসিয়া মুসলমানি কাহিনী মুসলমানী ঢঙেই লিখিতেন। সত্যপীর কাহিনীর অন্যতম কবি কৃষ্ণহরিদাস লিখিয়াছেন :

সত্যপীর বলে হাদি তুমি মোর মুরশিদ।
আমাকে বাতাও তুমি করিয়া মুরিদ॥

আর একস্থানে তিনি বলিতেছেন :

সেই নিরঞ্জনের নাম বিছমিল্লা কয়।
বিষ্ণু আর বিছমিল্লা কিছু ভিন্ন নয়॥

মুসলমান সমাজের কেহ কেহ শুধু মুসলমান সমাজের জন্যই মানিকপীরের গান[১০৫] লিখিয়াছিলেন। এই রচনাগুলির কাব্যগত কিছুমাত্র মূল্য নাই,

১০৫. আরও দুই-একজন কবি (যেমন হৃদয়রাম, শঙ্কর) এইরূপ ইসলামি 'পীর' কাব্য ও গান লিখিয়াছিলেন। যেমন কবি শঙ্করের :

একদিন রাসমানে বসিয়া খোদায়।
দুনিয়ার তামাসা দেখিতে পির জায়॥
রাজা দুর্ব্বাশন আছে দুনিয়া ভিতরে।
ভিক্ষার খাতিরে জান রাজার দুয়ারে॥
জবরিল আসি বলে শুন দেয়ান জি।
কৃষ্ণ পরায়ণ রাজা সেথা যাবে কি॥

(ডঃ পঞ্চানন মণ্ডল সম্পাদিত 'পুঁথি-পরিচয়', ২য়)

অকম লেখকের দুর্বলতম রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে। কিন্তু সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর সত্যপীর-সত্যনারায়ণ পরিকল্পনার মধ্য দিয়া হিন্দু-মুসলমান যে একে অপরের নিকটবর্তী হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল ও ভারতচন্দ্র বৃত্ত

ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দী প্রসঙ্গে আমরা সবিস্তারে বিদ্যাসুন্দর-কালিকা-মঙ্গলের উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ আলোচনা করিয়াছি। উপস্থিত প্রসঙ্গে শুধু উক্ত পর্যায়ের কয়েকজন কবির কাব্যপরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল গোত্রের ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকর শুধু অষ্টাদশ শতাব্দীর নহে, সমগ্র বাংলা সাহিত্যের একজন প্রথম শ্রেণীর কবি। অষ্টাদশ শতাব্দীর মরুধূসর বাংলা কাব্যে যিনি উজ্জ্বল জীবন-রসের পরিচ্ছন্নতা এবং কৌতুকরসের অনাবিল প্রসন্নতার সাহায্যে শাণিত বুদ্ধির চমক সৃষ্টি করিতে পারিয়াছিলেন—সেই রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অন্নদামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়া এই পর্বের অন্তিম সূচনা করেন। আমরা বর্তমান প্রসঙ্গে ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কয়েকজন কবির অন্নদামঙ্গল-কালিকামঙ্গল সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করিব।

রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র ॥

(১) বাঙালী ও ভারতচন্দ্র—মধ্যযুগের অন্তিমপর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতচন্দ্রকে লইয়া বহু দিন ধরিয়া যথেষ্ট আলোচনা-সমালোচনা ও বিচার-বিতর্ক চলিয়াছে। সেই আলোচনায় সাহিত্য-সমালোচকগণ প্রধান অংশ গ্রহণ করিলেও সমাজ ও নীতির দিক হইতেও ভারতচন্দ্রকে লইয়া প্রখর আলোচনা হইয়াছে। ঈশ্বর গুপ্ত হইতে আরম্ভ করিয়া প্রমথ চৌধুরী পর্যন্ত—সকলেই কবির কাব্য, রচনারীতি প্রভৃতি লইয়া যেরূপ তীক্ষ্ণ আলোচনা করিয়াছেন, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের কোন কবিকে সেরূপ পরস্পর-বিরোধী বিশেষণের সম্মুখীন হইতে হয় নাই। বড়ু চণ্ডীদাসের শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কাব্যের প্রামাণিকতা ও রসরুচি লইয়া একদা বিশেষজ্ঞ মহলে প্রচুর কলরব উত্থিত হইলেও প্রাচীন সাহিত্যানুরাগী ব্যতীত সাধারণ পাঠকসমাজে সে

কল্লোল পৌঁছায় নাই। কিন্তু ভারতচন্দ্রের কাব্যের রুচি, রীতি প্রভৃতি লইয়া যে মতামতের ঝড় উঠিয়াছে, তাহাতে অবিশেষজ্ঞ সাধারণ পাঠকও একটা বড়ো ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছেন; পণ্ডিত, রসিক ও ঐতিহ্যবান ব্যক্তিরাও ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গের মধ্যে অবতরণ করিয়াছেন। ভারতচন্দ্রের কাব্য কাহারও কাছে স্বাদু রমণীয় মনে হইয়াছে, কেহ-বা ইহাকে 'অশুভ ফুল' ('fleur de mal')[১০৬] বলিলেও কবির রচনাচাতুর্যে মুগ্ধ না হইয়া পারেন নাই। উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিক হইতেই ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে নানা ধরনের মতামত প্রচলিত ছিল। ক্রমে ক্রমে সেই মতামতের তীব্রতা বাড়িয়াছে,—যুগধর্ম অনুসারে কেহ কবিকে গালি পাড়িয়াছেন, কেহ-বা তাঁহাকে শিরোধার্য করিয়াছেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইংরাজ লেখকগণ, যাঁহারা বাংলা ব্যাকরণ অভিধান সঙ্কলন করিয়াছিলেন, তাঁহারাও বহু স্থলে ভারতচন্দ্র হইতেই দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করিয়াছিলেন।[১০৭] উনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে আধুনিক ইংরাজী শিক্ষার মারফতে খ্রীস্টানী নীতি-আদর্শ শিক্ষিত মহলে প্রবেশ করিবার ফলে অনেকেই ভারতচন্দ্রের প্রতি প্রতিকূলতা প্রকাশ করিয়াছিলেন। প্রাচীন ধারার কবিদের মধ্যে পাকুড়রাজ পৃথ্বীচন্দ্রের 'গৌরীমঙ্গলে' (১৮০৬-৭)[১০৮] এবং দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তি-তরঙ্গিণী'তে (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষে রচিত) ভারতচন্দ্রের সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। আধুনিক ধারায় শিক্ষিত, কিন্তু প্রাচীন কাব্যরসে লালিত মদনমোহন তর্কালঙ্কারও ভারতচন্দ্রের পদাঙ্ক অনুসরণে 'বাসবদত্তা' (১৮৩৬-৩৭) রচনা করেন। গোপাল উড়ের (১৮১৯-৫৯) বিদ্যাসুন্দর যাত্রা উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে এবং শিক্ষিত সমাজের নাসিকা কুঞ্চন সত্ত্বেও গোপালের নামে

১০৬. 'I have no hesitation in admitting that Bharatchandra's masterpiece is a 'fleur de mal' but it is a flower all the same, many petalled and of perfect form."—*The Story of Bengali Literature* (Pramatha Chaudhury)

১০৭. হালহেডের *A Grammar of the Bengal Language* (1778), ফরস্টারের *A Vocabulary in two parts, English and Bengali and Vice-Versa* (1799-1802), লেবেডেফের *The Grammar of the Pure and Mixed East Indian Dialects* (1801) প্রভৃতি কোষগ্রন্থ ও ব্যাকরণে ভারতচন্দ্রের কাব্য হইতে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইয়াছিল।

১০৮. ইতিপূর্বে আলোচিত।

প্রচারিত[১০৯] লঘু ছন্দের গান বাংলার সর্বত্র ছড়াইয়া পড়ে। সুলভ ছাপাখানার যুগে ১৮১৬ সাল হইতে অন্নদামঙ্গল এবং ১৮১৭-১৮ সাল হইতে বিদ্যা-সুন্দর মুদ্রিত হইতে থাকে। অবশ্য আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিতের দল ভারত-চন্দ্রের কাব্যে (বিশেষতঃ 'বিদ্যাসুন্দরে') অশ্লীলতার গন্ধ পাইয়া পরোক্ষে ও প্রত্যক্ষভাবে কবিকে আক্রমণ করিতে লাগিলেন। ১৮৩৩ সালে রাধামোহন সেন ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের ভ্রম সংশোধন করিয়া, কোথাও কবির রচনা সম্বন্ধে তির্যক মন্তব্য করিয়া 'অন্নপূর্ণামঙ্গল' প্রকাশ করেন।[১১০] অবশ্য তিনি ভারতচন্দ্রের রচনারীতি সমালোচনা করিলেও শ্লীল-অশ্লীলতা সম্পর্কে কোন মন্তব্য করেন নাই। কিন্তু ইহার কিছু পরে একদল যেমন ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তেমনি কেহ কেহ তাঁহাকে নীতি-দুর্নীতি, শ্লীল-অশ্লীল ঘটিত প্রশ্নের সম্মুখে দাঁড় করাইয়া বিচারও শুরু করিয়া দিলেন। ১৮৫২ খ্রীঃ অব্দে মহেন্দ্রনাথ রায় 'কুসুমাবলি' শীর্ষক একটি কাব্য-সংগ্রহ প্রকাশ করেন, স্কুল-কলেজের ছাত্রদের জন্যই ইহা সঙ্কলিত হয়।[১১১]

১০৯. গোপাল উড়ের নামে প্রচারিত গানগুলি খুব সম্ভব গোপালের রচিত নহে। তাঁহার সেরূপ বিদ্যাবুদ্ধি ছিল না। তিনি ভিন্ প্রদেশ হইতে (উড়িষ্যার জাজপুর গ্রাম) ১৮৪৪ সালে কলিকাতায় আসিয়া ফল বিক্রয় করিতেন। তিনি সুকণ্ঠ ছিলেন বলিয়া যাত্রার দলে স্থান লাভ করেন, পরে নিজেই দল তৈয়ারি করেন। ভৈরব হালদার নামক কোন এক গীতিকারের দ্বারা তিনি গান লেখাইয়া লইতেন বলিয়া শুনা যায়। প্রায় দশ বছর ধরিয়া গোপাল নিজের দল চালাইয়াছিলেন। দুই চারিটি গান তাঁহার নিজের হইলেও হইতে পারে। দ্রষ্টব্য : এই লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত, ৪র্থ খণ্ড

১১০. ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গল গঙ্গাকিশোর ভট্টাচার্যের দ্বারা ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে প্রথম মুদ্রিত হয়। ইহাতে কিছু কিছু কাঠখোদাই চিত্রও মুদ্রিত হইয়াছিল। বিদ্যাসুন্দর পৃথগ্‌ভাবে প্রথম প্রকাশিত হয় বাংলা ১২২৪ সালে (১৮১৭-১৮)। ইহার পর সস্তা ছাপাখানা হইতে, কদর্য কাগজে স্বল্প মূল্যে পুরা অন্নদামঙ্গল এবং আলাদা করিয়া বিদ্যাসুন্দর বহুবার মুদ্রিত হইয়াছে। বিদ্যাসাগরের সম্পাদনায় অন্নদামঙ্গল (দুইখণ্ড) কৃষ্ণনগর রাজবাটীর পুঁথি অবলম্বনে ফোর্ট্ উইলিয়ম কলেজের ব্যবহারের জন্য মুদ্রিত হয় (১৮৪৭)। ইহাই ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলীর প্রথম প্রামাণিক সংস্করণ।

১১১. "অন্নপূর্ণামঙ্গল গৌড়ীয় ভাষা ভাষিত পুস্তক মহাকবি শ্রীল শ্রীযুত ভারতচন্দ্র রায় গুণাকর কর্তৃক রচিত অনুলিপি হেতুক বহুবিধ অশুদ্ধ সম্প্রতি সংশোধিত হইয়া কলিকাতা নগরে বঙ্গদূত যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল—শকাব্দাঃ ১৭৫৫ ; সম্বত ১৮৯০ ; বাং ১২৪০, ইং ১৮৩৩"—উক্ত কাব্যের আখ্যা পত্র। ইহাতে কবি পদ্যেই মন্তব্য করিয়াছেন—গদ্যে নহে। সে যুগের ইংরাজী সাহিত্য-রসিক কাশীপ্রসাদ ঘোষ রাধামোহন সেনের কবিত্বশক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছিলেন। ১৮৩০ সালের জানুয়ার মাসের '*Literary Gazette*'-এ তিনি 'On Bengali Works and Writers' শীর্ষক একটি প্রবন্ধ লেখেন।

সঙ্কলক ছাত্রোপযোগী করিতে গিয়া ভারতচন্দ্রের সঙ্কলিত অংশ সমূহের আদিরসাত্মক ছত্রগুলি বাতিল করিয়া মন্তব্য করেন যে, এই কবির অশ্লীল রচনা ছাত্রদের উপযোগী নহে, এমন কি "ভদ্রসমীপে উচ্চার্য্য নহে।"[১১২]

ইংরেজীশিক্ষিত মহল ভারতচন্দ্রের উপর কতটা খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন তাহা একটি ঘটনা হইতেই বুঝা যাইবে। ১৮৫২ সালের ৮ই এপ্রিল রাম-বাগানের দত্তবংশীয় ইংরাজীনবিশ হরচন্দ্র দত্ত বীঠন সোসাইটিতে ইংরাজী ভাষায় *Bengali Poetry* শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। তাহাতে তিনি ইংরাজী কাব্যসাহিত্যের তুলনায় বাংলা সাহিত্যের অপকৃষ্টতা প্রমাণ করেন এবং ভারতচন্দ্রের অশ্লীলতার অতিশয় নিন্দা করেন। সভায় অন্যতম আলোচক কৈলাসচন্দ্র বসুও বক্তার বক্তৃতা অনুসরণ করিয়া ভারতচন্দ্রের নিন্দার পর্দা চড়াইয়া দেন।[১১৩] ইহাতে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষুব্ধ হন এবং বীঠন সোসাইটির আর এক অধিবেশনে (১৮৫২ সালের ১৩ই মে) 'বাঙ্গালা কবিতাবিষয়ক প্রবন্ধ' শীর্ষক দীর্ঘ আলোচনায় বাংলা কাব্যের গুণ বর্ণনা করেন এবং ভারতচন্দ্রের পক্ষ সমর্থন করেন। ইংরাজী কাব্য সাহিত্যে সুপণ্ডিত এবং বাংলা সাহিত্যের রসগ্রাহী রঙ্গলাল ভারতচন্দ্রের প্রশংসা করিলেও[১১৪] কবির কাব্যে যে "নির্লজ্জতা প্রতিপাদক আদিরস বর্ণনার আধিক্য দৃষ্ট হয়—" তাহা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। তাঁহার মতে ইংরাজী কাব্যে ভারতচন্দ্রের অপেক্ষাও উৎকট কামচিত্র আছে—সুতরাং যে অপরাধে ইংরাজ কবিদিগকে রেহাই দেওয়া হইতেছে, সেই অপরাধে

১১২. সঙ্কলক ভূমিকায় বলিয়াছেন, "যদিচ ভারত প্রভৃতি প্রাচীন কবিদিগের প্রবন্ধ রচনা বিশেষ মাধুর্য বিশিষ্ট হইয়া অতিমাত্রায় জনকমনীয় হইয়াছে, তথাপি উক্ত পুস্তক কোনরূপেই ছাত্রপুঞ্জের পাঠোপযোগী নহে। যেহেতু স্থানে স্থানে বিবিধ অশ্লীলবাক্য ও কদর্থ ভাবা ব্যবহার হওয়াতে তাহা ভদ্রসমীপে উচ্চার্য নহে।"

১১৩. কৈলাসচন্দ্র বসু এই প্রসঙ্গে তীব্র ভাষায় বলেন, "ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর এমত জঘন্য এবং নির্লজ্জ যে তাহার সহিত ইংরাজদিগের ফেনী হিল নামক অপকৃষ্ট গ্রন্থে (যাহার নামোল্লেখ করিলে ব্রীড়ানম্র মুখ হওয়া যায়) সেই গ্রন্থের তুলনা হইতে পারে।" (রঙ্গলালের 'বাঙ্গালা কবিতা বিষয়ক প্রবন্ধ' হইতে উদ্ধৃত)

১১৪. রঙ্গলালের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ভারতের শব্দ সৌন্দর্য ভাবের মাধুর্য এবং রসের প্রাচুর্য ও প্রাথর্যের কথা অধিক কি বর্ণনা করিব, বাঙ্গালা ভাষায় এরূপ সুমিষ্ট রচনা অদ্যাবধি আর দ্বিতীয় হয় নাই, ভারতের পদ্যপংক্তি পাঠকালীন বোধ হয় যেন মধুকরনিকরের ঝঙ্কার হইতেছে।......"

ভারতচন্দ্রের নিন্দা করা উচিত নহে। রঙ্গলালের এই মন্তব্য হইতে দেখা যাইতেছে, ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে সুলভ ছাপাখানার দৌলতে ভারত-চন্দ্রের অন্নদামঙ্গল, বিশেষতঃ বিদ্যাসুন্দরকাব্য সর্বত্র প্রচার লাভ করিলে ইংরাজী সাহিত্য-সংস্কৃতিতে সদ্য-দীক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালী পাঠক এই জাতীয় কাম-সাহিত্যের প্রতি বিশেষ বিরক্তি বোধ করিয়াছিলেন। অবশ্য রঙ্গলালের মতো কৃতবিদ্য কাব্যরসিক শুধু কবিত্বের দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের গুণগান করিলেও অশ্লীলতার অপরাধ হইতে ভারতচন্দ্রকে পুরাপুরি মুক্তি দিতে পারেন নাই। পুরাতন ধারার শেষ প্রতিভূ ঈশ্বর গুপ্ত কোন কোন দিক দিয়া ভারতচন্দ্রের শিষ্যত্ব করিয়াছেন। তাই তিনি বহু পরিশ্রম করিয়া ভারত-চন্দ্রের জীবনকাহিনী ও কাব্য উদ্ধারের চেষ্টা করেন।[১১৫] গুপ্ত কবি যে ভারতচন্দ্রকে বিশেষ শ্রদ্ধা করিবেন তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে?[১১৬] যিনি ভারতচন্দ্র ও ঈশ্বর গুপ্তের আবহাওয়া হইতে বাংলা কাব্যকে উদ্ধার করিয়া বৃহত্তর পরিবেশে স্থাপন করিয়াছিলেন, সেই মাইকেল মধুসূদন কোন কোন স্থলে ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে বক্রমন্তব্য করিলেও 'চতুর্দশপদী কবিতাবলী'তে ভারতচন্দ্রকে শ্রদ্ধার সঙ্গেই স্মরণ করিয়াছেন। আদিরসের জন্য রায়-গুণাকরের প্রতি মধুসূদনের মন বিষাইয়া যায় নাই।

বিদ্যাসাগর নিজে উদ্যোগী হইয়া কৃষ্ণনগর রাজবাটীর মূল পুঁথি অবলম্বনে 'অন্নদামঙ্গলে'র প্রামাণিক সংস্করণ প্রকাশ করেন (১৮৪৭)। তিনি নিজেও ভারতচন্দ্রের চাঁচা-ছোলা রচনারীতির বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন, প্রায়ই অন্নদামঙ্গলের 'শিবের ভিক্ষা যাত্রা' অংশটি আবৃত্তি করিতেন।[১১৭] বঙ্কিমচন্দ্র ও রাজনারায়ণ—প্রগতিশীল হিন্দুসমাজের দুইজন দিকপাল দুই দিক হইতে ভারতচন্দ্রকে গ্রহণ করিয়াছেন। 'মধ্য-ভিক্টোরীয়' রুচির ছায়াতলে বর্ধিত বঙ্কিমচন্দ্র স্থূল দেহঘটিত বর্ণনাকে ঘৃণা করিতেন।

১১৫. ১২৬২ সালের ১লা জ্যৈষ্ঠ 'সংবাদপ্রভাকরে' ভারতচন্দ্রের জীবনীঘটিত তথ্য প্রকাশিত হয়, পরে ঐ ১২৬২ সালেরই ১লা আষাঢ় ইহা 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' নামে প্রকাশিত হয়।

১১৬. ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে গুপ্তকবির মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "ঐ অন্নদামঙ্গল এবং বিদ্যাসুন্দরের গুণের ব্যাখ্যা আমি কি করিব? তাহার উপমার স্থল নাই বলিলেই হয়, এই ভারতে ভারতের ভারতীর ন্যায় ভারতের ভারতী সমাদৃত ও প্রচলিত হইয়াছে।" ('কবিবর ভারতচন্দ্র রায়-গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত')

১১৭. পুরাতন প্রসঙ্গ—কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

কাজেই তিনি দুই এক স্থলে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে প্রতিকূল মন্তব্য করিয়াছিলেন। ১৮৭১ সালে *The Calcutta Review* পত্রিকায় বঙ্কিমচন্দ্র 'Bengali Literature' শীর্ষক প্রবন্ধে ভারতচন্দ্রের রচনাশক্তি ও হীরামালিনীর চরিত্রের প্রশংসা করিলেও অশ্লীলতার জন্য কবিকে নিন্দাও করিয়াছিলেন।[১১৮] 'কমলাকান্তের দপ্তরে' তিনি বলিয়াছেন, "ভারতচন্দ্র আদিরস পঞ্চমে ধরিয়া জিতিয়া গিয়াছেন—কবিকঙ্কণের ঋষভ স্বর কে শুনে?" কিন্তু তিনিই আবার ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'কে উৎকৃষ্ট গীতিকাব্য বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন (বিবিধ প্রবন্ধ, ১ম)। রাজনারায়ণ বসু ব্রাহ্ম সমাজভুক্ত হইয়াও ভারতচন্দ্রের বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক বক্তৃতা') মূল্যবান, "রায়-গুণাকর যে বঙ্গদেশের একজন অতি শ্রেষ্ঠ কবি, তাহাতে সন্দেহ নাই।" প্রাচীন রুচি ও রীতির পক্ষপাতী পণ্ডিত রামগতি ন্যায়রত্ন বলিয়াছিলেন, "ফলতঃ রায়গুণাকরের রচনার এমনই মোহিনী শক্তি যে, উহাব কোন অংশের কোন দোষ নেত্রগোচব হয় না। যে অংশ পাঠ করিবে, সেই অংশেই যেন মধুবৃষ্টি হইবে। পংক্তিগুলি যেন সমস্থূল মুক্তামালা" ('বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্যবিষয়ক প্রস্তাব')। রমেশচন্দ্র দত্ত চরিত্রসৃষ্টির দিক দিয়া মুকুন্দরামের অধিকতর প্রশংসা করিলেও ভারতচন্দ্রের রচনারীতির মুক্তকণ্ঠে জয়গান গাহিয়াছেন, "Bharatchandra is a complete master of the art of versification and his appropriate phrases and rich descriptions passed into bye words" (*Literature of Bengal*). কিন্তু উনবিংশ শতাব্দীতে ব্রাহ্ম শুচিতার প্রভাব এবং নীতিবাদী ইংরাজী সাহিত্য ও সমালোচনার আদর্শে শিক্ষিত সমাজের অনেকেই ভারতচন্দ্রের গুণপণা স্বীকার করিতে চাহেন নাই। রবীন্দ্রনাথ ভারতচন্দ্রের বিরুদ্ধে প্রত্যক্ষতঃ কোন প্রতিকূল মন্তব্য করেন নাই, বরং গুণাকরের রচনারীতির উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। কাব্যরসিকসমাজের পক্ষ হইতে রবীন্দ্রনাথ যাহা বলিয়াছেন, আমাদের মনে হয়, ভারতচন্দ্র সম্বন্ধে তাহাই সর্বশ্রেষ্ঠ সমালোচনা

১১৮. "His works are disfigured, too, by a disgusting obscenity which unfits them for republication at a time when Bengali readers are not all the rougher sex.'

—"রাজসভাকবি রায়গুণাকরের অন্নদামঙ্গল গান রাজকণ্ঠের মণিমালার মত, যেমন তাহার উজ্জ্বলতা, তেমনি তাহার কারুকার্য।" কিন্তু শিক্ষিত সমাজের কোন কোন অঞ্চলে ভারতচন্দ্রের রুচি ও মনোভঙ্গী শ্রদ্ধার সঙ্গে স্বীকৃতি লাভ করে নাই। দীনেশচন্দ্র সেন 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্যে' ভারতচন্দ্রের বিকৃত-রুচি ও চরিত্রসৃষ্টির অক্ষমতার নিন্দা করিয়াছেন, যদিও রায়গুণাকরের রচনা-শক্তির বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। প্রমথ চৌধুরীই সর্বপ্রথম রসজ্ঞ সমালোচকের দৃষ্টি অনুসারে ভারতচন্দ্রকে শ্রেষ্ঠ শিল্পী প্রমাণের চেষ্টা করেন। তাঁহার *The Story of Bengali Literature* শীর্ষক পুস্তিকায় এবং ১৩৩৫ সনে শান্তিপুর সাহিত্য সম্মিলনীতে প্রদত্ত সভাপতির অভিভাষণে বিশেষ সূক্ষ্ম-দৃষ্টিসহ ভারতচন্দ্রের রচনারীতি, সরসতা, তীক্ষ্ণতা ও নাগরিক মনোভাবের উচ্চ প্রশংসা করা হয়। সে যাহা হউক, গত এক শতাব্দী ধরিয়া ভারতচন্দ্রেব রচনারীতি, রুচি, ধর্মীয় আদর্শ সম্বন্ধে যেরূপ নানাপ্রকার পরস্পর-বিরোধী মত ও মন্তব্য জমা হইয়াছে, তাহাতে কবিকে অবহেলা ভরে দূরে সরাইয়া রাখা যায় না। তাঁহার আদিরসঘটিত অনাবৃত বর্ণনা আধুনিক রুচিকে পীড়িত করিলেও কৃষ্ণনাগরিক ভারতচন্দ্রের বাণীপদ্ধতির মধ্যে যে সূক্ষ্মতা, বাগবৈদগ্ধ্য ও সরস কৌতুক আছে তাহা রুচিবান পাঠকেরও পরম আদরের সামগ্রী। এবার সংক্ষেপে তাঁহার জীবনকথার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(২) ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী ॥ ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী অতি বিচিত্র ও চিত্তাকর্ষী—আধুনিক কালের গল্প-উপন্যাসেও তাহা স্বচ্ছন্দে স্থান পাইতে পারে।[১১৯] কবি নিজে কাব্যমধ্যে আপনার সম্বন্ধে দুই-চারিটি তথ্য দিয়াছেন, যাহা হইতে তাঁহার জীবনের যৎসামান্য ঘটনা জানা যায়। কিন্তু কবি ঈশ্বর গুপ্ত ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর প্রায় একশত বৎসর পরে বহু পরিশ্রম করিয়া কবি সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করেন তাহার জন্য বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে তিনি স্মরণীয় হইয়া থাকিবেন। গুপ্তকবির পূর্বে বিদ্যাসাগর ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের জন্য কৃষ্ণনগর রাজবাটীতে রক্ষিত ভারতচন্দ্রের পুঁথি অবলম্বনে দুইখণ্ডে অন্নদামঙ্গল প্রকাশ করেন (৮৪৭)। কিন্তু তিনিও ভারতচন্দ্রের ব্যক্তিগত জীবনসম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য দিতে

১১৯. বাংলা দেশের খ্যাতনামা কথাসাহিত্যিক (বিমল মিত্র ও নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়) ভারতচন্দ্রের জীবনকথাকে উপন্যাসে গ্রহণ করিয়া এই মন্তব্যের যাথার্থ্যই প্রমাণ করিয়াছেন।

পারেন নাই। ঈশ্বর গুপ্ত প্রায় দশ বৎসর ধরিয়া (১৮৪৬-৫৫) দেবানন্দপুর, মূলাজোড়, কৃষ্ণনগর, এবং গুস্তে গ্রামে বহু অনুসন্ধান করিয়া ভারতচন্দ্রের জীবন সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় তথ্য সংগ্রহ করেন। গুপ্ত কবি ভারতচন্দ্রের পৌত্র মূলাজোড় নিবাসী অতিবৃদ্ধ তারকনাথ রায়ের নিকট ভারতচন্দ্র সম্পর্কিত তথ্য ও অনেক অপ্রকাশিত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৮৫৫ সালের জ্যৈষ্ঠ মাসের 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশ করেন। তাহার একমাস পরেই ঐ সমস্ত তথ্য 'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত' নামে প্রকাশিত হয়। বস্তুতঃ বাঙালীর রচিত ইহাই প্রথম কবিজীবনী। পরে যাঁহারা এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের উপর পুরা নির্ভর করিয়াছেন। ঐতিহাসিকগণ ভুরসুটের রাজবংশ ও কুলজী গ্রন্থাদি হইতে ভারতচন্দ্র সম্পর্কে দুই একটি নূতন তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন বটে, কিন্তু ঈশ্বর গুপ্তের তথ্যগুলিই কবির ব্যক্তিগত জীবনী ও কাব্যের পটভূমিকা স্বরূপ অধিকতর মূল্যবান। এখানে স্বল্প পরিসরের জন্য আমরা ঈশ্বর গুপ্তের সংগৃহীত তথ্য হইতে কবিজীবনীর রূপরেখা আলোচনা করিতেছি।

ভারতচন্দ্রের কাব্যের দুই এক স্থলে যৎসামান্য ব্যক্তিগত পরিচয় পাওয়া যায়। যিনি সবিস্তারে পৃষ্ঠপোষক কৃষ্ণচন্দ্রের কুলজী ঘাঁটিয়াছেন, মহারাজের সভা ও সভাসদদের খুঁটিনাটি বর্ণনা দিয়াছেন, তিনি নিজের সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বলেন নাই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। গ্রন্থমধ্যে তাঁহার এইটুকু পরিচয় পাওয়া যায়ঃ

(১) ভরদ্বাজ অবতংস, ভূপতি রায়ের বংশ
সদাভাবে হতকংস ভুরসুটে বসতি।
নরেন্দ্র রায়ের সুত ভারত ভারতীযুত
ফুলের মুখটি খ্যাত দ্বিজপদে সুমতি॥
দেবের আনন্দধাম দেবানন্দপুর গ্রাম
তাহে অধিকারী রাম রামচন্দ্র মুনসী।
ভারতে নরেন্দ্ররায় দেশে যার যশ গায়
হয়ে মোরে কৃপা দায় পড়াইলা পারসী॥

(২) সভাসদ তাহার ভারতচন্দ্র রায়।
ফুলের মুখটী নৃসিংহের অংশ তায়॥

ভুরিশিটে ভূপতি নরেন্দ্ররায় সুত।
কৃষ্ণচন্দ্র পাশে আজ্ঞার অনুসারে

*   *   *

কৃষ্ণচন্দ্র আমার রবে হয়ে রাজ্যচ্যুত।
রায় গুণাকর নাম দিবেক তাহারে॥

(৩) কৃষ্ণচন্দ্র মহারাজ   সুরেন্দ্র ধরণী মাঝ
কৃষ্ণনগরেতে রাজধানী।
সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে   শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী॥
তাঁর পরিজন নিজ   ফুলের মুখটি দ্বিজ
ভরদ্বাজ ভারত ব্রাহ্মণ।
ভুরিশ্রেষ্ঠ রাজ্যবাসী   নানা কাব্যে অভিলাষী
যে বংশে প্রতাপনারায়ণ॥

এই সমস্ত তথ্য এবং ঈশ্বরগুপ্ত সংগৃহীত উপাদান হইতে ভারতচন্দ্রের জীবনের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লওয়া যাইতে পারে। ধনী ভূস্বামী বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। হাওড়া ও হুগলী জেলার অন্তর্গত ভুরস্থট পরগণার অন্তর্ভুক্ত (প্রাচীন বাংলার সারস্বত তীর্থ ভূরিশ্রেষ্ঠ গ্রাম) পেঁড়ো (পাণ্ডুয়া) গ্রামই তাঁহার জন্মভূমি ও শৈশবের লীলানিকেতন। চতুরানন নামে এক ব্রাহ্মণ খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে ভুরস্থট পরগণায় রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়া নিজ বংশকে রাজবংশ রূপে পরিচায়িত করেন। তাঁহার পুত্র ছিল না, একটি মাত্র কন্যা ছিল। সুতরাং মুখোপাধ্যায়-উপাধিক তাঁহার জামাতার শাখাই ভুরস্থটে প্রাধান্য লাভ করে। এই বংশের রাজা প্রতাপনারায়ণ খুব বিখ্যাত হইয়াছিলেন। উক্ত রাজবংশের দ্বিতীয় শাখা পেঁড়োনিবাসী রাজা কৃষ্ণরায়ের বংশে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। তাঁহার পিতার নাম নরেন্দ্রনারায়ণ রায়।[১২০] ভারতচন্দ্র

১২০. কিছুকাল পূর্বে কোন এক ঔপন্যাসিক লিখিয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রের পিতার নাম রাজেন্দ্র রায়। ইহা লইয়া কোন একটি সাপ্তাহিকে কিছু বাদানুবাদ সৃষ্টি হইয়াছিল। কুমুদনাথ মল্লিক প্রণীত 'নদীয়া কাহিনী'তে (২য় সংস্করণ, পৃ. ২৯৭) ভ্রমক্রমে ভারতচন্দ্রের পিতার নাম রাজেন্দ্রনারায়ণ লিখিত হইয়াছে। উক্ত ঔপন্যাসিক এই গ্রন্থ হইতে ভারতচন্দ্রের পিতার নাম সংক্রান্ত ভুল তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন। 'রাজেন্দ্রনারায়ণ রায়' বোধহয় কুমুদনাথ মল্লিকের অনবধানতাবশতঃ ছাপা হইয়াছিল। নরেন্দ্রনারায়ণ রায়ই তাঁহার প্রকৃত নাম—তাঁহার অন্য কোন নাম জানা যায় না। অন্নদামঙ্গলের যাবতীয় পুঁথিতে 'নৃপতি নরেন্দ্ররায়' বা 'ভূপতি নরেন্দ্ররায়'—এইরূপ উল্লেখ আছে।

সর্বকনিষ্ঠ ছিলেন। কবির সহধর্মিণীর নাম বোধ হয় রাধা,[১২১] কারণ অনেক স্থলে তিনি ভণিতায় নিজের নামের স্থলে 'রাধানাথ' ভণিতা ব্যবহার করিয়াছেন। যথা:

রাধানাথ তব দাস পুরাও মনের আশ
তবে ভণিচন্দ্র খণে ভর গো।

রায়গুণাকর খুব সম্ভব একপত্নীক ছিলেন। কারণ অন্নদামঙ্গলের তৃতীয় খণ্ডে ('মানসিংহ') ভবানন্দের দুই স্ত্রীসম্ভাষণ প্রসঙ্গে কবি নিজের একস্ত্রী বিষয়ে সরস পরিহাস করিয়া বলিয়াছেন:

এ সুখে বঞ্চিত কবি রায় গুণাকর।
দুই নারী বিনা নাহি পতির আদর॥

তাঁহার তিনপুত্র—পরীক্ষিত, রামতনু এবং ভগবান। মধ্যম পুত্র রামতনুর বংশধারা এখনও বর্তমান আছে।[১২২]

কবির পিতা পেঁড়োগ্রামে আভিজাত্যসহ বাস করিতেন। কোন কারণে বর্ধমানরাজ ক্রুদ্ধ হইয়া (ঈশ্বর গুপ্তের মতে বর্ধমানের রাজমাতা বিষ্ণুকুমারী) নরেন্দ্রনারায়ণের রাজ্য ভুরস্থট আক্রমণ করিয়া গ্রাস করেন। অনুমান ১৭২০ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে ভারতচন্দ্রের জন্ম হয়। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার জন্ম এবং ১৬৮২ শকে (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) তাঁহার তিরোধান হয়। এ সম্বন্ধে সুনিশ্চিতভাবে কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। কারণ কবি কাব্যাদির রচনাকাল নির্দেশ করিলেও নিজের জন্মাব্দ সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত দেন নাই। তবে প্রাসঙ্গিক উল্লেখ হইতে তাঁহার জন্মকাল সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া যায়। তাঁহার দ্বিতীয় কাব্য সত্যপীরের পাঁচালীর রচনাকাল—"সনে রুদ্র চৌগুণা"—অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দ (১৭৩৭-৩৮)। ঈশ্বর গুপ্ত ভুল করিয়া ইহাকে ১১৩৪ বঙ্গাব্দ ধরিয়াছিলেন। তিনি লোকমুখে শুনিয়াছিলেন যে, এই কাব্য রচনার সময় কবির বয়স ছিল

১২১. বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ প্রকাশিত এবং সজনীকান্ত দাস সম্পাদিত 'ভারতচন্দ্র গ্রন্থাবলী'তে (পৃ. ২২) রাধানাথ বলিতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকেই নির্দেশ করা হইয়াছে। কিন্তু ডঃ মদনমোহন গোস্বামী ('রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র', পৃ. ২১) নানা তথ্য হইতে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, রাধা ভারতচন্দ্রের পত্নীর নাম। ডঃ গোস্বামীর সিদ্ধান্ত অধিকতর যুক্তিসঙ্গত বলিয়া আমরা আমরা তাঁহার মত গ্রহণ করিলাম।

১২২. ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ১৬

মাত্র পনের বৎসর। কিন্তু এই সময় কবির বয়স পনের হইলে মৃত্যুকালে (১৭৬০) তাঁহার বয়স হইবে উনচল্লিশ বৎসর। সংস্কৃতে রচিত 'নাগাষ্টকে' কবি নিজের বয়স বলিয়াছেন চল্লিশ বৎসর—"বয়শ্চত্বারিংশত্তব সদসি নীতং নৃপ ময়া"। 'নাগাষ্টক'ই তাঁহার শেষ রচনা নহে, ইহার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন বলিয়া অনুমান হয়। তাঁহার চৌদ্দ বৎসর বয়সের সময় বর্ধমানরাজ কীর্তিচন্দ্রের দ্বারা তাঁহার পিতৃরাজ্য নষ্ট হয়, তিনি অল্পবয়সেই মাতুলালয়ে আশ্রয় লইতে বাধ্য হন। কীর্তিচন্দ্রের রাজত্বকাল ১৭০২-৪০ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং কবির জন্ম এই কয় বৎসরের মধ্যেই হইয়াছিল বলিয়া বোধহয়। ১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ অব্দে সত্যনারায়ণের দ্বিতীয় পাঁচালী রচনার সময় কবির বয়স অন্ততঃ পঁচিশ বৎসর হইয়াছিল। কারণ সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় যখন তিনি বিশেষ অভিজ্ঞ হইয়া উঠিয়াছিলেন। তাই অনেকে অনুমান করেন, ১৭০৫-১০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে তাঁহার জন্ম হয়।[১২৩] আর একটা দিক হইতেও প্রায় এই একই সময় পাওয়া যায়। বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র (১৭৪৪-৭০) বর্গীর আক্রমণে ভীত হইয়া মূলাজোড়ের নিকটবর্তী কাউগাছি গ্রামে বাস করিয়াছিলেন। সেই সময় তাঁহার পত্তনিদার রামচন্দ্র নাগ কবির উপর কিছু অত্যাচার করিয়াছিলেন। কবি নাগের অত্যাচার হইতে রক্ষা পাইবার জন্য মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া সংস্কৃতে 'নাগাষ্টক' শীর্ষক একটি অনতিদীর্ঘ কবিতা লিখিয়া রাজসমীপে প্রেরণ করেন। তাই মনে হয়, এই নাগাষ্টক ১৭৪৫-৫০ সালের মধ্যে রচিত হইয়াছিল। উহার একস্থলে কবি বলিয়াছেন, তখন তাঁহার বয়স চল্লিশ। এই সমস্ত তথ্য ও অনুমান মিলাইয়া মনে হয়, রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে (১৭০৫-১০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে) জন্মগ্রহণ করেন।

ধনীর দুলাল ভারতচন্দ্রকে বাল্য বয়স হইতেই নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্যে পড়িতে হইয়াছিল। আমৃত্যু সেই দুর্ভাগ্য মাঝে মাঝে তাঁহার জীবনে ধূমকেতুর মতো উদিত হইত। ভূস্বামী পিতা নিঃস্ব হইয়া পড়িলে বাল্যবয়সেই কবি মাতুলালয় মণ্ডলঘাট পরগণার অধীনে নওয়াপাড়া গ্রামে গিয়া ব্যাকরণ অভিধান পাঠ করিয়া চৌদ্দ পনের বৎসর বয়সেই সংস্কৃত ভাষায় কৃতিত্ব অর্জন

১২৩. সাহিত্য-পরিষৎ-পত্রিকা, ১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা, ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ' দ্রষ্টব্য।

করেন। এই অপরিণত বয়সেই কবি গুরুজনের সম্মতির অপেক্ষা না রাখিয়া মাতুলালয়ের পার্শ্ববর্তী গ্রামে বিবাহ করিয়া বসিলেন। সংস্কৃত শিক্ষার জন্য তাঁহার অগ্রজেরা তাঁহার উপর কিছু বিরূপ হইয়াছিলেন, কারণ তখন অর্থকরী ফারসী শিক্ষাই জীবিকার অবলম্বনস্বরূপ হইয়াছিল—সংস্কৃত শিক্ষা উচ্চ সমাজ হইতে ধীরে ধীরে লোপ পাইতেছিল। সংস্কৃতশিক্ষা, স্বেচ্ছানুরূপ বিবাহ প্রভৃতি কারণে তাঁহার পিতাও তাঁহার উপর কিছু বিরক্ত হইয়া থাকিবেন। ইহাতে ক্ষুণ্ণ হইয়া কবি বাঁশবেড়িয়ার নিকটবর্তী দেবানন্দপুর গ্রামের প্রসিদ্ধ ধনী রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে গিয়া মনোযোগপূর্বক ফারসী শিক্ষা করিলেন। কিশোর কবিকে যে কিরূপ কৃচ্ছ্রতার মধ্যে বিদ্যাভ্যাস করিতে হইত, ঈশ্বর গুপ্ত সে সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "দিবসে একবার মাত্র রন্ধন করিয়া সেই অন্ন দুইবেলা আহার করেন, প্রায় কোন দিবস ব্যঞ্জন পাক করেন নাই। একটা বেগুনপোড়ার অর্ধভাগ এবেলা এবং অর্ধভাগ ওবেলা আহার করিয়া তাহাতেই তৃপ্ত হইয়াছেন।"[১২৪] এইখানেই তিনি মুন্সীর বাটীতে সত্যনারায়ণের পূজা উপলক্ষে সত্যনারায়ণের (সত্যপীর) ব্রতকথা রচনা করেন। কবি ফারসী ভাষায় দক্ষতা অর্জন করিয়া বাড়ী ফিরিলে অগ্রজদের অনুরোধে বিষয়কর্ম তত্ত্বাবধানে বর্ধমানরাজসভায় প্রেরিত হন। অতঃপর তাঁহার পিতা খাজনা দিতে অপরাগ হইলে সেই অপরাধে কবি বর্ধমান রাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হন। সেখানে কিছুদিন কয়েদ থাকিয়া কবি কারাধ্যক্ষের আনুকূল্যে গোপনে পলায়ন করেন এবং বহুকষ্টে মারাঠা-অধিকৃত কটকে গিয়া ঐ অঞ্চলের মারাঠা সুবাদার শিবভট্টের সাহায্যে এক ভৃত্য সহ কিছুদিন নিশ্চিন্ত মনে পুরীধামের শঙ্করাচার্য মঠে অবস্থান করেন। এই স্থানে বৈষ্ণব সাহচর্যে এবং বৈষ্ণব গ্রন্থাদি পাঠ করিয়া কবি বৈষ্ণব বেশবাস ধারণ করেন এবং সকলের নিকট 'মুনি গোঁসাই' (নারদ) নামে পরিচিত হন। পরে কবি একদল বৈষ্ণবের সঙ্গে বৃন্দাবন যাত্রা করিয়া হুগলী জেলার খানাকুল কৃষ্ণনগরে উপস্থিত হন এবং কীর্তনের আসরে বসিয়া মনোহরশাহী কীর্তন শুনিতে থাকেন। সেই গ্রামে তাঁহার শ্যালীপতি বাস করিতেন। তিনি সংবাদ পাইয়া কবিকে পাকড়াও করিয়া লইয়া গেলেন এবং বৈষ্ণব বৈরাগীকে পুনরায় গার্হস্থ্য ধর্মে ফিরাইয়া

১২৪. 'কবিবর ভারতচন্দ্র রায় গুণাকরের জীবনবৃত্তান্ত'।

আনিলেন। কিন্তু কবি পিতৃগৃহে ফিরিয়া যাইতে সম্মত হইলেন না, বধূকেও পিতার নিকট পাঠাইলেন না। অতঃপর ভারতচন্দ্র চন্দ্রননগরের ফরাসী গভর্ণমেণ্টের দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর আশ্রয় প্রার্থনা করিলেন; চৌধুরী মহাশয় কবির বিদ্যাবুদ্ধির পরিচয় পাইয়া আশ্রয় দিলেন। যাহা হউক ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কবির গ্রাসাচ্ছাদনের নিশ্চিন্ত ব্যবস্থা করিবার জন্য নবদ্বীপাধিপতি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করেন। ভারতচন্দ্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হইয়া কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহাকে মাসিক চল্লিশ টাকা বেতনে সভায় স্থান দিলেন। ইতিপূর্বে তিনি কিছু কিছু কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছিলেন। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মুকুন্দরামের আদর্শে চণ্ডীমঙ্গলের ধারা অনুসরণ করিয়া 'অন্নদামঙ্গল' কাব্য রচনার জন্য অনুরোধ করেন।[১২৫] এই কাব্যের জন্য তিনি কবিকে 'রায়গুণাকর' উপাধি দিয়াছিলেন।[১২৬] বিদ্যাসুন্দর ও ভবানন্দ মজুমদারের প্রসঙ্গ বোধ হয় কবি রাজাদেশেই অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন।[১২৭] পরে কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে মূলাজোড় গ্রাম ছয়শত টাকা রাজস্বের বিনিময়ে ইজারা দিলেন এবং বাটী নির্মাণের জন্য কবিকে একশত টাকা দান করিলেন। অতঃপর কবি মূলাজোড়েই স্থায়িভাবে বসবাস করেন এবং মাঝে মাঝে কৃষ্ণনগর ও ফরাসডাঙায় যাতায়াত করিতে থাকেন। এই সময় বর্গীর

১২৫. এই প্রসঙ্গে ঈশ্বর গুপ্ত বলেন, "ভারত বলিলেন, মহারাজ, কিরূপ রচনা করিতে অনুমতি করেন।" রাজা কহিলেন, "মুকুন্দরাম চক্রবর্তী (যিনি কবিকঙ্কণ নামে বিখ্যাত ছিলেন) তিনি যে প্রণালীক্রমে ভাষা কবিতায় চণ্ডী রচিয়াছিলেন, তুমি সেই পদ্ধতিক্রমে অন্নদামঙ্গল পুস্তক প্রস্তুত কর।" (ঈশ্বর গুপ্তের পুস্তিকা)

১২৬. দেবী অন্নপূর্ণা কৃষ্ণচন্দ্রকে স্বপ্নে আদেশ দেন যে, তিনি যেন ভারতচন্দ্রকে রায় গুণাকর উপাধি দেন—অন্নদামঙ্গলের 'গ্রন্থসূচনা'য় কবি সেইরূপ ইঙ্গিত দিয়াছেন। দেবী কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিলেন,

> সভাসদ তোমার ভারতচন্দ্র রায়।
> মহাকবি মহাভক্ত আমার দয়ায়॥
> তুমি তারে রায়গুণাকর নাম দিও।
> রচিতে আমার গীত সাদরে কহিও॥

১২৭. গুপ্তকবির মতে "কৃষ্ণচন্দ্র অন্নদামঙ্গলের রচনা দেখিয়া অনির্বচনীয় সন্তোষ পরবশ হইয়া কহিলেন, "বিদ্যাসুন্দরের উপাখ্যান সংক্ষেপে বর্ণনা করতঃ ইহার সহিত সংযোগ করিতে হইবে।"—ঐ পুস্তিকা

উৎপাতে ভীত হইয়া বর্ধমানরাজ তিলকচন্দ্র ও তাঁহার মাতা মূলাজোড়ের নিকটবর্তী কাউগাছি গ্রামে কিছুকাল বাস করিয়াছিলেন। রাজমাতা কৃষ্ণচন্দ্রকে অনুরোধ করিয়া উক্ত গ্রাম নিজ নামে পত্তনি লইলেন এবং কর্মচারী রামদেব নাগকে পত্তনিদার নিযুক্ত করিলেন। পত্তনিদারের অত্যাচারে ক্ষুব্ধ হইয়া ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট সংস্কৃতে একটি কবিতা ('নাগাষ্টক') লিখিয়া পাঠাইয়া দেন এবং প্রতিকার প্রার্থনা করেন, প্রত্যেক শ্লোকের শেষে লিখিয়া দেন—"সমস্তং মে নাগো গ্রসতি সবিরাগো হরি হরি।" রাজা কবিকে আর একটি গ্রামে (গুস্তে গ্রাম) বাসের ব্যবস্থা করিয়া দেন, কবিও যাইতে প্রস্তুত হন, কিন্তু গ্রামবাসীদের অনুরোধে কবি শেষ পর্যন্ত মূলাজোড়েই থাকিয়া যান। এই গ্রামে এখনও ভারতচন্দ্রের বংশধারা বর্তমান। ঈশ্বর গুপ্তের মতে ১৬৮২ শকে (১৭৬০ খ্রীঃ অঃ) আট-চল্লিশ বৎসর বয়সে বহুমূত্ররোগে কবি ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর লোকান্তরিত হন। কবি দীর্ঘজীবী হইলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের অন্ত্যপর্ব অধিকতর সমৃদ্ধিশালী হইত।

কবিজীবনীর এই সংক্ষিপ্ত পরিচয় হইতে দেখা যাইতেছে, ভারতচন্দ্র বাল্য হইতে পরিণত বয়স পর্যন্ত নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের মধ্য দিয়া অগ্রসর হইয়াছেন। ভূস্বামীর সন্তান প্রথমজীবনেই নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন। কিন্তু অল্প বয়স হইতেই প্রখর বুদ্ধি ও আত্মবিশ্বাস তাঁহাকে দুঃখ-নৈরাশ্যের মধ্যেও সান্ত্বনা দিয়াছে, বিপদ অতিক্রমে সাহায্য করিয়াছে। আদিকবি ক্রৌঞ্চবধকারী নিষাদকে অভিশাপ দিয়াছিলেন—তুই কখনও শাশ্বতী প্রতিষ্ঠা লাভ করিতে পারিবি না। কবি ভারতচন্দ্র যেন কাহার অভিশাপে কোথাও স্থায়ী হইতে পারেন নাই, দীর্ঘদিন যাযাবরের বেশে ঘুরিয়া বেড়াইয়াছেন। তবে অতিশয় প্রখর ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের অধিকারী ছিলেন বলিয়া তিনি কিছুই গ্রাহ্য করেন নাই। পিতা ও অগ্রজ ভ্রাতাদের সঙ্গে তাঁহার সদ্ভাব না থাকিবার কারণ—তাঁহার এই স্বাতন্ত্র্যবোধ। এই স্বাতন্ত্র্য-বোধের বড় প্রমাণ—কাহারও মতামতের অপেক্ষা না করিয়া তিনি অপেক্ষা-কৃত অপরিণত বয়সেই বিবাহ করিয়া বসিলেন। অবশ্য পিতা ও জ্যেষ্ঠদের সঙ্গে সদ্ভাব না থাকিলেও তাঁহাদের জন্যই তিনি বর্ধমানরাজের কারাগারে নিক্ষিপ্ত হইয়াছিলেন। সেখান হইতে পলাইয়া নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর

কবি শ্রীক্ষেত্রে গিয়া মন না রাঙাইয়াও বসন রাঙাইয়া বৈষ্ণব সাজিয়া বসিলেন। ইহার পর শুধু নিরাপদ ও নিশ্চিন্ত আশ্রয়ের জন্ম তাঁহাকে ধনীর দুয়ারে ধর্ণা দিতে হইয়াছে। মাঝে মাঝে ভিটাটুকুও হারাইবার ভয়ে তিনি ব্যাকুল হইয়া পড়িয়াছেন। চল্লিশ টাকার মাসমাহিনার কবিকে রাজা-রাজড়ার মনোরঞ্জন করিতে হইয়াছে—তিনি নিজের জীবনেই বুঝিয়াছেন, "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি ক্ষণেকে চাঁদ।" এই বালির বাঁধ তাঁহার জীবনে একাধিকবার ভাঙিয়াছে। বস্তুতঃ ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত ভারতচন্দ্রের জীবনকাহিনী অমূলক না হইলে (অমূলক নহে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস) রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রকে অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন অসাধারণ ব্যক্তি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে। জীবনের যে-কোন অবস্থাতেই তিনি বুদ্ধিবিচক্ষণতার সঙ্গে অগ্রসর হইয়া দুর্ভাগ্যকে পরাভূত করিবার চেষ্টা করেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর দরবারী আদর্শে তিনি বাস করিয়াছিলেন, কিন্তু ঐশ্বর্য পান নাই, জমিদার-পুত্র হইয়াও জমিদারের উমেদারী এবং গ্রাসাচ্ছাদনের জন্য দাসত্ব করিয়াছেন; সরস্বতীর বরপুত্র হইয়াও তাঁহাকে লক্ষ্মীমন্তদের দ্বারস্থ হইতে হইয়াছে। কিন্তু এই দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াও তাঁহার মুখের হাসি ও চোখের কটাক্ষ নিভিয়া যায় নাই, রঙ্গের উতরোল উল্লাস ও ব্যঙ্গের তির্যকতা তাঁহার সদা-প্রসন্ন মনটিকেই উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে—রচনার মধ্য দিয়া তাঁহার কৌতুকপ্রবণ চাপা হাসি ফুটিয়া উঠিয়াছে—এমন কি কণ্ঠস্বরের ওঠানামা পর্যন্ত যেন কর্ণগোচর হইতেছে। কবিপ্রিয়ার জবানীতে কবি সকৌতুকে নিজের সম্বন্ধে বলিয়াছেন :

> মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
> কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে।

ভাগ্যবঞ্চিত কবি কবিপ্রিয়ার স-ঝঙ্কার বাক্যধারা সহাস্যে গ্রহণ করিতেন বলিয়াই মনে হয়—শুধু তাই নয়, নিজ জীবনের বিরস আবহাওয়াকেও ভারতচন্দ্র সরস করিয়া লইয়া কাব্যে সেই সরসতা সঞ্চার করিয়াছেন।

> ব্যাকরণ অভিধান সাহিত্য নাটক।
> অলঙ্কার সঙ্গীতশাস্ত্রের অধ্যাপক।
> পুরাণ-আগমবেত্তা নাগরী পারসী।

ইহাই ছিল তাঁহার পাণ্ডিত্যের পরিধি। ইচ্ছা করিলে তিনি একজন ভট্টাচার্য

হইয়া টোল খুলিয়া বসিতে পারিতেন, অথবা মুর্শিদাবাদে নবাবসরকারে গিয়া কানে কলম গুঁজিয়া হিসাব-নিকাশ লইয়া ব্যস্ত হইতেও পারিতেন। কিন্তু বাংলা সাহিত্যের সৌভাগ্য যে, তিনি সরস্বতীর সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ মুকুন্দরামও ভারতচন্দ্রের প্রায় দুই শতাব্দী পূর্বে নানারূপ সামাজিক ও রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া সাত-পুরুষের বাস্তুভিটা দামিন্যা ছাড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। কবিকঙ্কণ যদি শুধু দামিন্যায় বসিয়া 'চাষ চষিতেন' তাহা হইলে গ্রামের মাটি সরস হইলেও কবির মনের মাটি বিরস হইয়াই থাকিত। ভারতচন্দ্র ধনীর সেবা করিয়াও ব্যবহারিক জীবনে নিশ্চিন্ত হইতে পারেন নাই, তাহা ঠিক বটে, কিন্তু তাঁহার মনে ব্যক্তিগত জীবনের বিষণ্ণতা ছায়া ফেলিতে পারে নাই, শিল্পীসুলভ নিরাসক্তি তাঁহার কাব্যে রৌদ্রকরোজ্জ্বল হাসি ছড়াইয়াছে।[১২৮] এবার সংক্ষেপে তাঁহার রচনাবলীর পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

(৩) ভারতচন্দ্রের কাব্যপরিচয়॥ প্রত্যূষ-সূর্য দেখিয়া মাধ্যন্দিন সূর্যের প্রখরতা বুঝা যায় না, নবকিশোর ভারতচন্দ্রের প্রথম রচনা হইতে রায়গুণাকর ভারতচন্দ্রের ভাবী স্বরূপও কল্পনা করা যায় না। কবি অতি তরুণ বয়সে পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক গতানুগতিক কাহিনী বর্ণনা করিয়া কয়েক পৃষ্ঠায় সমাপ্ত যে দুইখানি পুস্তিকা লিখিয়াছিলেন, তাহার না আছে কাব্য-সৌন্দর্য, আর না আছে কোন গভীর তত্ত্বকথার ইঙ্গিত। তাঁহার নামে সত্যপীর বা সত্যনারায়ণের পাঁচালী ধরনের দুইখানি অতিক্ষুদ্র পুস্তিকার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। প্রথম পুস্তিকাখানির (কবি ইহাকে 'ব্রতকথা' বলিয়াছেন)[১২৯] কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই, ঈশ্বর গুপ্ত ইহা সংগ্রহ করিয়া

১২৮. এ বিষয়ে প্রমথ চৌধুরী মহাশয়ের মন্তব্য উল্লেখযোগ্য: "রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের সভাসদ হয়েও তাঁর দারিদ্র্য ঘোচেনি, এবং দারিদ্র্য তাঁকে নিরানন্দ করিতে পারেনি, করেছিল শুধু 'প্রমোদের প্রভু'। এ প্রভুত্ব হচ্ছে ব্যবহারিক জীবনের উপর আত্মার প্রভুত্ব। যথার্থ আর্টিস্টের মন সকল দেশেই সংসারনির্লিপ্ত, কস্মিনকালে বিষয়-বাসনায় আবদ্ধ নয়।" (প্রমথ চৌধুরী, প্রবন্ধ সংগ্রহ, ১ম, 'ভারতচন্দ্র")

১২৯. ব্রতকথা সাঙ্গ হলো সবে হরি হরি বলো
দোষ ক্ষম যতেক পণ্ডিত।
কবি ঈশ্বরগুপ্ত বলিয়াছেন—'সত্যপীরের ব্রতকথা'।

'কবিবর ৺ভারতচন্দ্র রায়গুণাকরের জীবনবৃত্তান্তে' প্রকাশ করেন। দ্বিতীয় পালাটির একখানি পুঁথি (১৮২৯ খ্রীঃ অব্দের নকল) বর্ধমান সাহিত্যসভায় (পুঁ—৫৮৬) আছে। এইজন্য মনে হয় এই ক্ষুদ্র পাঁচালী দুইখানি বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করে নাই, করিলে একাধিক পুঁথি মিলিত।

দুইটি পুঁথির মধ্যে একখানি ত্রিপদী আর একখানি চৌপদী ছন্দে রচিত সত্যনারায়ণ বা সত্যপীরের পাঁচালী। প্রথম পুঁথিটি দেবানন্দপুরনিবাসী হীরারাম রায়ের নির্দেশে এবং দ্বিতীয়খানি কবির পৃষ্ঠপোষক ঐ দেবানন্দপুরেরই ভূস্বামী রামচন্দ্র মুন্সীর ইচ্ছাক্রমে রচিত হয়। পুঁথি দুইখানিতে এমন কোন কবিত্ব বা রচনাবৈচিত্র্য নাই যাহার জন্য তরুণ কবিকে শিরোপা দিতে হইবে। এখন দেখা যাক, কোন্ পুঁথিটি আগে রচিত হইয়াছিল। চৌপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটির শেষে কবি এইভাবে সনতারিখের নির্দেশ দিয়াছেন, "ব্রতকথা সাঙ্গ পায় সনে রুদ্র চৌগুণা"। একাদশ রুদ্র (১১) এবং ইহার চৌগুণ (৪৪) অর্থাৎ ১১৪৪ বঙ্গাব্দে কবি ইহা রচনা করেন। অন্যদিকে চৌগুণ (চতুর্গুণ) ৪৩ (চৌ=৪, গুণ=সত্ত্ব, রজঃ তমঃ অর্থাৎ—৩) ধরিলে ইহা ১১৪৩ হইতে পারে। অর্থাৎ কবির নিতান্ত তরুণ বয়সে (১৭৩৭-৩৮ খ্রীঃ অঃ) ইহা রচিত হয়।[১৩০] কিন্তু ত্রিপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটিতে শুধু হীরারাম রায়ের নাম ছাড়া অন্য কোন নির্দেশ নাই—যাহার দ্বারা রচনাকাল, বা কোন্ পুঁথিটি আগে, কোন্‌টি পরে রচিত, তাহা নির্দ্ধারিত করিতে পারা যায়। ঈশ্বর গুপ্তের বিবরণে দেখা যাইতেছে, কবি যখন রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন তখন আশ্রয়দাতার অনুরোধে তিনি "বাসায় গিয়া তদ্দণ্ডেই অতি সরল সাধুভাষার উৎকৃষ্ট কবিতার পুঁতি রচিয়া শীঘ্রই সভাস্থ হইয়া সকলের নিকট তাহা পাঠ করেন" (ঈশ্বর গুপ্ত)। পাঁচালী শুনিয়া সভার সকলে এবং রামচন্দ্র মুন্সী তাঁহাকে যেভাবে প্রশংসা করিতে লাগিলেন, তাহাতে মনে হইতেছে চৌপদী ছন্দে রচিত পাঁচালীটি কবির প্রথম রচনা। দুইখানি পুঁথির মধ্যে কোন্‌খানি প্রথম রচিত হয়, তাহা

১৩০. ঈশ্বর গুপ্তের মতে "এই কবিতা যৎকালে রচনা করেন, তৎকালে ভারতের বয়স পঞ্চদশ বৎসরের অধিক হয় নাই।' আবার আর এক স্থলে বলিয়াছেন, ''যদি বাঙ্গলা সন ধরিয়া ১১৪৪ নির্ণয় করা যায় তাহা হইলে তৎকালে গ্রন্থকর্তার বয়স ১৫ বৎসরের পরিবর্তে ২৫ বৎসর নির্দেশ করিতে হইবে।" (গুপ্তকবি রচিত ভারতচন্দ্রের জীবনী-সংক্রান্ত পুস্তিকা)

লইয়া ঈশ্বর গুপ্ত কিছু গোলে পড়িয়াছিলেন। তাঁহার অনুমান হীরারাম রায়ের নির্দেশে ত্রিপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটি প্রথমে এবং রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশে চৌপদী ছন্দে রচিত পুঁথিটি পরে রচিত হয়। হীরারাম রায় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। ইনি ভুরসুট রাজবংশের আর এক শাখার নায়ক—বর্ধমানরাজের অত্যাচারে স্বাধিকার ভ্রষ্ট হইয়া দেবানন্দপুরেই বাস করিতেছিলেন।[১৩১] কিশোর ভারতচন্দ্র পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া দেবানন্দপুরে আসিয়া সর্বপ্রথম ইঁহার আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। ইঁহারই নির্দেশে কবি ত্রিপদী ছন্দে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। এই সময়ে, মনে হয়, ভারতচন্দ্রের বয়স কৈশোর অতিক্রম করে নাই। ঈশ্বর গুপ্ত মনে করিয়াছিলেন, রামচন্দ্র মুন্সীর নির্দেশেই কবি সর্বপ্রথম সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। আমাদের ধারণা, ইহা ঠিক নহে। হীরারাম রায়ের নির্দেশেই তিনি প্রথমে ত্রিপদী ছন্দে সত্যনারায়ণের ব্রতকথা রচনা করেন। বোধহয় হীরারাম রায়ের মৃত্যুর পর কবি রামচন্দ্র মুন্সীর আশ্রয়ে বাস করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় পুঁথিটি তাঁহারই নির্দেশে কবি চৌপদী ছন্দে রচনা করেন।

দুইটি পালার মধ্যে ত্রিপদীতে রচিত প্রথমটিতে কিঞ্চিৎ কবিত্বের পরিচয় আছে, কিন্তু চৌপদী ছন্দে রচিত দ্বিতীয় পালাটিতে স্বতঃস্ফূর্তির বিশেষ কোন পরিচয় নাই। ইহার ভাষাবিন্যাস ও ছন্দ অত্যন্ত কৃত্রিম বলিয়া মনে হয়। কেহ কেহ মনে করেন, "দুইটি কাব্যের রচনাকালের মধ্যে বিশেষ ব্যবধান নাই। কারণ দুইটির বিষয়বস্তু বর্ণনা প্রায় একই ধরণের।"[১৩২] কিন্তু পালা দুইটির বিষয়বস্তু এক প্রকার হইলেও বর্ণনারীতির মধ্যে পার্থক্য আছে। ত্রিপদীছন্দে রচিত পুঁথির ভাষা ও রচনারীতিতে অধিকতর পরিপক্বতা লক্ষ্য করা যায়—দ্বিতীয় পালায় সেরূপ কোন কৃতিত্ব দেখা যায় না। তবে দ্বিতীয় পালায় কবি নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য দিয়াছেন বলিয়া সেই দিক দিয়া ইহা মূল্যবান, উপরন্তু ইহাতে রচনাকালও উল্লিখিত হইয়াছে।

অর্বাচীন পুরাণে যে সত্যনারায়ণের গল্প (পুরাণে তাহার নাম সত্যদেব) বর্ণিত হইয়াছে,[১৩৩] ভারতচন্দ্রের পূর্বে আরও অনেক কবি ঐ বিষয় লইয়া এবং

১৩১. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩৪৮, ৪র্থ সংখ্যা (ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও ভুরসুট রাজবংশ')

১৩২. ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ১৬৮

১৩৩. স্কন্দপুরাণ, রেবাখণ্ড

নারায়ণ ও পীরকে এক করিয়া হিন্দু-মুসলমানের মিলনসূচক পাঁচালী জাতীয় পীরমাহাত্ম্যকাব্য রচনা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র পূর্বসূরীরই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়াছিলেন[১৩৪] ("বুদ্ধিরূপ কৈল নানাজনা"), বিশেষ কোথাও মৌলিক প্রতিভার পরিচয় দিতে পারেন নাই। পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে রচিত কয়েক পাতড়ার পাঁচালীতে প্রতিভা আবিষ্কার করিতে যাওয়া পণ্ডশ্রম মাত্র। অন্যান্য সত্যনারায়ণের ব্রতকথার মতো ভারতচন্দ্রের পুঁথিতেও তিনটি কাহিনী নামমাত্র উল্লিখিত হইয়াছে[১৩৫]—ব্রাহ্মণ বিষ্ণুশর্মা, এক কাঠুরিয়া এবং এক বণিকের (সদানন্দ) আখ্যান। সত্যপীরের কৃপায় ধনজন ঐশ্বর্য লাভের কাহিনীই পালাগুলির মূল বক্তব্য। প্রথম পালায় কবি বলিয়াছেন যে, দ্বিজ-ক্ষত্রিয়দিগকে হীন এবং মুসলমানদিগকে বলবান করিবার জন্যই কলিযুগে শ্রীহরি সত্যনারায়ণরূপে ধরাধামে অবতীর্ণ হন :

দ্বিজ ক্ষত্রি বৈশ্য শূদ্র কলিযুগে ক্রমে ক্ষুদ্র
যবনে করিতে বলবান।

মুসলমান প্রাধান্যের যুগে হিন্দু কবিকে এইরূপ 'বৈতসীবৃত্তি' অবলম্বন করিয়া হরি ও পীরকে এক করিতে হইয়াছিল ; শুধু তাই নহে, কবি এখানে হিন্দুর তুলনায় মুসলমানকে অধিকতর বলবান করিতে চাহিয়াছেন। যাহা হউক প্রথম রচনার কোন কোন স্থলে ভারতচন্দ্রেব পরবর্তী কালের রচনার পূর্বাভাস পাওয়া যায়। যেমন, নায়িকা চন্দ্রকলার বর্ণনা :

কাদম্বকোদর স্থূলা কাদম্বিনী সুকোমলা
চন্দ্রমুখী চন্দ্রকলা নাম।
হাসে হেরে যার পানে ধৈরজ কি তার প্রাণে
কামিনী কামনা করে কাম। (প্রথম পুঁথি)

১৩৪. রামেশ্বর প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য

১৩৫. স্কন্দপুরাণের রেবাখণ্ডে সত্যদেবের আখ্যান আছে। এই আখ্যানের চারিটি শাখা—(১) সত্যদেবের কৃপাপ্রাপ্ত কাশীপুর গ্রামনিবাসী জনৈক ব্রাহ্মণের (নাম নাই) কাহিনী, (২) কাষ্ঠকেতু নামক এক কাঠুরিয়ার কাহিনী, (৩) এক বণিকের কাহিনী (নাম নাই), (৪) বংশধ্বজ রাজার কাহিনী। বাংলা সত্যনারায়ণের পাঁচালীতে চতুর্থ কাহিনীর কোন উল্লেখ নাই, অধিকাংশ পুঁথিতে ব্রাহ্মণ ও বণিকের কাহিনী আছে। পুঁথির কাহিনী ও স্কন্দপুরাণের কাহিনী প্রায় একপ্রকার। শুধু নামগুলিতে পার্থক্য আছে।

কিংবা পতিবিরহে চন্দ্রকলার বিলাপ :

যৌবনে প্রভুর কাল মদনদহন জ্বাল কোকিল কোকিলা কাল
রাখ পদতলে হে।
যৌবন প্রফুল্ল ফুল কেবল দুঃখের মূল শেষে হয় প্রাণাকুল
ঝাঁপ দিই জলে হে। (দ্বিতীয় পুঁথি)

এখানে অতিতরুণ কবির ঈষৎ অপরিপক্ক রচনার দোষগুণ—দুই-ই প্রকাশ পাইয়াছে। রচনার স্বচ্ছন্দগতি এবং আবেগের কৃত্রিমতা—যাহা রায়-গুণাকরের প্রধান বৈশিষ্ট্য, এখানে তাহার আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে।

উল্লিখিত দুইখানি পাঁচালী জাতীয় অতিক্ষুদ্র কাব্য কবির ফারসী শিক্ষার সময় বা শিক্ষাসমাপ্তির অব্যবহিত পরে রচিত হইয়াছিল। ভাগ্যহত তরুণ কবি তখন পরের আশ্রয়ে বাস করিতেছিলেন। ইহার পর তাঁহার জীবনে নানা বিপর্যয়ের পর তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের আনুকূল্য লাভ করিলেন। কবির যে সত্যকারের প্রতিভা আছে, তাহা ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী কৃষ্ণচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন। মহারাজ গুণীব প্রতিপালক ছিলেন। তাঁহাব আশ্রয়ে আসিয়া ভারতচন্দ্র পৃষ্ঠপোষকের মনোরঞ্জনের জন্য বোধহয় প্রথমে কয়েকটি ছোট ছোট গীতিকবিতা রচনা করেন।[১৩৬] ঈশ্বর গুপ্ত এই সমস্ত কবিতা কবির পৌত্র তারকনাথ রায়ের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। এইরূপ এগারটি কবিতা পাওয়া গিয়াছে: বসন্তবর্ণনা, বর্ষাবর্ণনা, হাওয়া বর্ণনা, কৃষ্ণের উক্তি, রাধিকার উক্তি-উত্তর, বলিরাজার উক্তি, বাসনা বর্ণনা, ধেড়ে ও ভেড়ে, করত্রাফ্‌থ বর্ণনা, হিন্দীভাষায় কবিতা, চৌপদী ছন্দে বাংলা-সংস্কৃত-ফারসী-হিন্দী মিশ্র ভাষায় রচিত কবিতা।[১৩৭] এই কবিতাগুলি সম্পর্কে দুই

১৩৬. ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণচন্দ্র ছোট ছোট কবিতায় খুশি না হইয়া কবিকে কোন দীর্ঘ কাব্য (মুকুন্দরামের চণ্ডীমঙ্গলের আদর্শে) রচনা করিতে অনুরোধ করিয়া বলেন, "ভারত তোমার প্রণীত কবিতায় আমার মনে অত্যন্ত প্রীতি জন্মিয়াছে, কিন্তু আমি এবম্প্রকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পদ্য শুনিতে ইচ্ছা করি না।" ইহাতে মনে হয়, রাজার আশ্রয়ে গিয়া কবি সর্বপ্রথম কতকগুলি বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনা করেন।

১৩৭. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় ভারতচন্দ্রের বংশধরের নিকট হইতে ভারতচন্দ্র ভণিতাযুক্ত 'গঙ্গাষ্টক' শীর্ষক একটি সংস্কৃত কবিতা সংগ্রহ করিয়া ১৯২০ সংবতের 'রহস্যসন্দর্ভে'র ৯ম খণ্ডে প্রকাশ করেন। সেটি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'ভারতচন্দ্রের রচনাবলী'তে গৃহীত হইয়াছে।

একটি কথা বলিয়া লওয়া প্রয়োজন। কারণ কেহ কেহ ইহাতে আধুনিকতার প্রথম পদধ্বনি শুনিতে পাইয়াছেন। এইগুলি সমস্তই যে মহারাজকে শুনাইবার জন্য রচিত হইয়াছিল তাহা মনে হয় না, সবগুলি এক সময়ে রচিতও হয় নাই। কবি বৈচিত্র্যের অনুরোধে বোধহয় বড়ো কাব্য রচনার ফাঁকে ফাঁকে এইরূপ বিচ্ছিন্ন কবিতা রচনা করিয়া থাকিবেন। নিছক দেবদেবীর কথা ছাড়িয়া রঙ্গরসের দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে কবি যে বাস্তবজীবনের ছবি আঁকিয়াছেন তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বসন্ত, বর্ষা, হাওয়া প্রভৃতি ছোট ছোট কবিতায় সর্বপ্রথম বাস্তবদৃষ্টি ফুটিয়াছে—কবি যে মধ্যযুগীয় বাঁধাপথ ছাড়িয়া আপন-খনিত পথে চলিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন তাহার প্রমাণ এই সমস্ত ছোট ছোট কবিতায় পাওয়া যাইবে। অবশ্য কবির মনে এই ধরনের কবিতা রচনার বৈচিত্র্য-পিপাসা জাগিলেও সৃষ্টিপ্রতিভা তখনও জাগে নাই। কাজেই এই বিচ্ছিন্ন পদগুলি অতিশয় কৃত্রিম হইয়া পড়িয়াছে, কোথাও-বা অনুচিত রঙ্গরস ও অবাঞ্ছিত লঘুতা কবিতাগুলিকে একেবারে মাটি করিয়া দিয়াছে। বসন্ত বায়ু সম্বন্ধে কবির উক্তি :

এবে বায়ু সাপাথেকো ভুবন করিলি ভেকো কেবল কামের ডেকো
সঙ্গে লয়ে সামন্ত।
অনঙ্গেরে অঙ্গ দিলি শুষ্ক কাষ্ঠ মুঞ্জরিলি ভারতেরে ভুলাইলি
আ আরে বসন্ত॥

বর্ষার বর্ণনা :

ভুবনে করিল তূর্ণ নদনদী পরিপূর্ণ বিরহিণী বেশ চূর্ণ
ভাবিয়া অভর্সা।
বিদ্যুতের চকমকি ডাহুকের মকমকি কামানল ধকধকি
বড় হৈল বর্ষা॥

রাধার প্রতি কৃষ্ণের অভিযোগ :

বয়স আমার অল্প নাহি জানি রসকল্প তুমি দেখাইয়া তল্প
জাগাইলে যামী।
ননী ছানা খাওয়াইয়া রসরঙ্গ শিখাইয়া অঙ্গভঙ্গী দেখাইয়া
তুমি কৈলা কামী॥

এই সমস্ত বর্ণনায় একটা অমার্জিত অথচ নাগরিক মনোভাব ফুটিয়াছে, যাহাতে চটুলতা, কৌতুকপ্রবণতা ও হালকা মনোভাবের অলসতা প্রকাশ

পাইলেও আন্তরিকতা ফুটে নাই। কবি যেন বাম হাত দিয়া অবহেলা ভরে এই কবিতাগুলি লিখিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যেমন হরিরাম তর্কসিদ্ধান্ত, কৃষ্ণানন্দ বাচস্পতি, রামগোপাল সার্বভৌম, প্রাণনাথ ন্যায়পঞ্চানন, রামবল্লভ বিদ্যাবাগীশ, রুদ্ররাম তর্কবাগীশ, বাণেশ্বর বিদ্যালঙ্কার, জগন্নাথ তর্কপঞ্চানন প্রভৃতি পণ্ডিত, দার্শনিক ও জ্ঞানীগুণীদের দ্বারা পরিবেষ্টিত হইয়া নানারূপ শাস্ত্রালোচনায় মগ্ন থাকিতেন, তেমনি আবার অবসর কালে গোপাল ভাঁড়, 'হাস্যার্ণব' উপাধিক জনৈক ব্রাহ্মণ এবং 'বৈবাহিক' নামে পরিচিত মুক্তারাম মুখোপাধ্যায় প্রভৃতির দ্বারা রঙ্গরহস্য কৌতুকে মশগুল হইতেন।[১৩৮] ভারতচন্দ্রের উল্লিখিত হালকা চালের কবিতায় কৃষ্ণচন্দ্রের অন্তরঙ্গ সভার আরেক রূপের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে। কখনও কখনও তিনি সমস্যা পূরণের জন্য ভারতচন্দ্রকে একটি পংক্তি দিতেন, ভারতচন্দ্র সেই পংক্তিটিকে কবিতার একটি চরণ হিসাবে ব্যবহার করিয়া সমস্যা পূরণ করিতেন। হয়তো মহারাজ লীলাচ্ছলে একটি পংক্তি ("পায় পায় পায়") দিয়া ভারতচন্দ্রকে কবিতা রচনা করিতে বলিলেন। ভারতচন্দ্র তৎক্ষণাৎ ইহার প্রত্যুত্তর দিলেন :

কেঁদে কহে বৃন্দাবলী বলিরাজ শুন বলি ছলিবারে বনমালী
হলেন উদয়।
হেন ভাগ্য কবে হবে যার বস্তু সেই লবে জগতে ঘোষণা রবে
বলি জয় জয়॥
এক পদ আছে বক্রী প্রকাশ করিলে চক্রী এদেহ করিয়া বিক্রী
ধরহ মাথায়।
তুমি আমি দুজনের ঘুচিল কর্ণের ফের মিলাইল বামনের
'পায় পায় পায়'॥

১৩৮. মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের কিছু রচনাশক্তি ছিল। শাস্ত্রাদি সম্বন্ধে তিনি অভিজ্ঞও ছিলেন বলিয়া তাঁহার উপাধি ছিল—"অগ্নিহোত্রী বাজপেয়ী শ্রীমন্মহারাজ'। তাঁহার সভাকবি বাণেশ্বরের সঙ্গে তিনি সংস্কৃত কবিতাও রচনা করিতেন। তাঁহার নামে একটি শ্যামাসঙ্গীত শাক্ত পদসংগ্রহে গৃহীত হইয়াছে—"অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী"। তাঁহার দুই পুত্র শিবচন্দ্র ও শম্ভুচন্দ্রও শাক্ত গান বাঁধিয়াছিলেন।

ভারতচন্দ্র কখনও কখনও মিশ্রভাষায় কবিতা লিখিয়া [১৩৯] নানা ভাষাজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন :

শ্যাম হিত প্রাণেশ্বর বারদকে গোয়দ কবর কাতর দেখে আদর কর
কাহে মর রো রোয়কে।
রক্তু, বেদং চন্দ্রমা ছুঁ লালা যে রেমা ক্রোধিত পর দেও ক্ষমা
নেট্রিমে কাহে শোয়কে॥

এসমস্ত রচনাকণ্ডূয়ন অধিকাংশ স্থলেই বিরক্তিকর—অলস, অর্ধশিক্ষিত, অমার্জিত ধনিসমাজের মনস্তুষ্টির জন্য বশংবদ কবির কাব্যছলনা মাত্র। এ সমস্ত রচনা ঈশ্বর গুপ্ত লোকমুখে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। তাই এইগুলির প্রামাণিকতা সন্দেহাতীত নহে। তবে এইরূপ রঙ্গরসের দুই একস্থানে কিঞ্চিৎ আন্তরিকতা ফুটিয়াছে। যেমন বর্ষার বর্ণনা :

কখনও দারুণ ঝড় শাখী উড়ে পাখী জড়, ঘর ভাঙ্গে উড়ে খড়
নাহি যায় চাওয়া।
বেগ কে সহিতে পারে মেঘ স্থির হতে নারে হুলস্থূল পারাবারে
প্রলয়ের দাওয়া॥

এখানে ঝড়ের চাক্ষুষ বর্ণনা ঊনবিংশ শতাব্দীর গীতিকবিতার পূর্বাভাস সূচিত করিতেছে। আর একটি কবিতায় ('বাসনা বর্ণনা') কবির ব্যক্তিগত জীবনের কিয়দংশ চকিতে ফুটিয়া উঠিয়াছে। সম্পন্ন ঘরের সন্তান ভারতচন্দ্র সারাজীবন নানা বিড়ম্বনা ভোগ করিয়াছিলেন, দারিদ্র্যের হাত হইতে বহু-দিন মুক্তি পান নাই, রাজানুকূল্যে কিঞ্চিৎ সচ্ছলতা ঘটিলেও[১৪০] অল্পদিনের

১৩৯. কখনও বা হিন্দী ভাষায় কবিতা লিখিতেন :

এক সময় বৃকভানুকুমারী।
মাতপিত সন বৈঠ নেহারী॥
হয়ে লগ্ আউসর দূতী জো আয়ী।
ভেট চল নন্দলাল বোলায়ি॥

১৪০. কবির শেষজীবনে এই রাজানুকূল্যও দুর্লভ হইয়াছিল। কৃষ্ণচন্দ্র কবিকে যে মূলাজোড় গ্রাম ইজারা দিয়াছিলেন, তাহাই আবার ফিরাইয়া লইতে চাহিয়াছিলেন। "বড়র পিরীতি বালির বাঁধ, ক্ষণে হাতে দড়ি, ক্ষণেকে চাঁদ"—ইহার নিদারুণ তাৎপর্য ভারতচন্দ্র নিজ জীবনে উপলব্ধি করিয়াছিলেন। 'বিদ্যাসুন্দরে' সুন্দর বর্ধমানে উপনীত হইয়া একজন রাজকর্মচারীর সঙ্গে আলাপ করিতে থাকিলে সেই কর্মচারী (দ্বারপাল) চাকুরীজীবনের বিড়ম্বনা প্রসঙ্গে বলিয়াছিল :

মধ্যে কবিকে আবার ভাগ্যবিপর্যয়ের সম্মুখে পড়িতে হয়। কবিপ্রিয়ার জবানীতে কবি নিজ দুর্ভাগ্যের কথা এইভাবে বলিয়াছেন :

মহাকবি মোর পতি কত রস জানে।
কহিলে বিরস কথা সরস বাখানে॥
পেটে অন্ন হেটে বস্ত্র যোগাইতে নারে।
চালে খড় বাড়ে মাটি শ্লোক পড়ি সারে॥
শাঁখা সোনা রাঙ্গা শাড়ী না পরিনু কভু।
কেবল কাব্যের গুণে বিহারের প্রভু॥

নিজের সাংসারিক দুরবস্থার কথা এইভাবে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন। কিন্তু 'বাসনা বর্ণনা' কবিতায় তাঁহার মনের কথা স্পষ্টই প্রকাশিত হইয়াছে। কবির ইচ্ছা ছিল ঐশ্বর্যলাভ--"বাসনা করয়ে মন পাই কুবেরের ধন সদা করি বিতরণ"। কিন্তু "বাসনা পূরণ নৈল"। কবির বাসনা পুরিল না, লাভের মধ্যে শুধু লোকের মিথ্যাভাষণ সার হইল—"লাভ হতে লাভ হৈল লোকে মিথ্যাভাষণা"। যাহা হউক এই সমস্ত প্রকীর্ণ কবিতা হইতে দেখা যাইতেছে, রাজসভাজীবী কবিকে প্রভুর মনস্তুষ্টির জন্য অনেক সময় প্রতিভা-সরস্বতীকে বাজার তাম্বূলকরঙ্কবাহিনীতে পরিণত করিতে হইয়াছে—বুদ্ধিজীবী সারস্বত ব্যক্তির এ দুর্ভাগ্য কোন দিন ঘুচে নাই, ঘুচিবেও না। ইহার পর 'রসমঞ্জরীর' উল্লেখ করা প্রয়োজন।

ঈশ্বর গুপ্তের মতে সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্র ও রতিমঞ্জরীর আদর্শে ও অনুকরণে ভারতচন্দ্র 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন। গুপ্তকবি এই পুস্তিকার রচনা-কাল সম্পর্কে বলিয়াছিলেন, "এই চারুগ্রন্থের (অন্নদামঙ্গল) পর "রসমঞ্জরী" রচনা করেন তাহাও সর্ব্বপ্রকারে উৎকৃষ্ট হইয়াছে।" কিন্তু বর্তমান কালের গবেষণায় প্রমাণিত হইয়াছে, 'রসমঞ্জরী' অন্নদামঙ্গলের পর নহে, পূর্বে রচিত

ঠকভরা দরবার ছলে লয় ঘর দ্বার
থরধার ছুঁতে কাটে মাছি।
চাকুরির মুখে ছাই ছাড়িতে না পারি ভাই
বিষকৃমি সম হয়ে আছি॥

ইহা কি চল্লিশ টাকা বেতনের রাজবয়স্ত ভারতচন্দ্রের প্রচ্ছন্ন ক্ষোভ?

হইয়াছিল। কারণ এই কাব্যে কবি নিজ বংশপরিচয় দিতে গিয়া ইঙ্গিতে সনের উল্লেখ করিয়াছেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের গুণব্যাখ্যানে কবি বলিয়াছেন :

সিন্ধু অগ্নি রাহু মুখে শশী ঝাঁপ দেয় দুখে
যার যশে হয়ে অভিমানী।

ইহা হইতে কেহ কেহ ১১৪৭ বঙ্গাব্দ (১৭৪০ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছেন। কাব্য রচনার সন হিসাবে ইহা সত্য হইতে পারে।[১৪১] কিন্তু যে-ভাবে ইহা উল্লিখিত হইয়াছে, তাহাতে ইহা যে কোন্ সনের প্রহেলিকা, তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অবশ্য আর এক দিক হইতে 'রসমঞ্জরী'র রচনাকাল সম্পর্কে অনুমানের আশ্রয় লওয়া যাইতে পারে। ভণিতায় কবি কোথাও 'গুণাকর' উপাধি সংযুক্ত করেন নাই, এই উপাধি তিনি 'অন্নদামঙ্গল' রচনার সময়ে (১৭৫২) বা পরে পাইয়াছিলেন। ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দের একটি দলিলে কিন্তু তাঁহাকে 'রায়গুণাকর' বলা হইয়াছে। এই দলিলের নকল (১২০২ সালের নকল) নদীয়ার কালেক্টরীতে আছে। মূল দলিল ১১৫৬ সালে ১লা অগ্রহায়ণ (১৭৪৯) সম্পাদিত হয়। ইহাতে তাঁহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, "শ্রীশ্রীদুর্গা শরণং শ্রীতরঙ্গ নকল শ্রীযুক্ত ভারতচন্দ্র রায়গুণাকর সদ্গুদার-চরিতেষু"। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দেই তিনি 'রায়-গুণাকর' উপাধি পাইয়াছিলেন। অতঃপর সিদ্ধান্ত করিতে হয়, কবি অন্নদামঙ্গল রচনার পূর্বেই রাজার নিকট 'রায়গুণাকর' উপাধি লাভ করিয়াছিলেন। 'রসমঞ্জরী'তে 'রায়গুণাকর' ভণিতা কোথাও ব্যবহৃত হয় নাই—তাই মনে হয় ইহা অন্নদামঙ্গলের কিছু পূর্বে, ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দেরও পূর্বে রচিত হয়।

ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে প্রসিদ্ধ মৈথিলি কবি ভানুদত্ত কামশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্র মিলাইয়া 'রসমঞ্জরী' শীর্ষক একখানি গ্রন্থ রচনা করেন। ভারত-চন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র আদর্শ ভানুদত্তের এই গ্রন্থ। মৈথিলী কবি বাঙালী জয়দেবের 'গীতগোবিন্দে'র অনুসরণে 'গীতগৌরীশ' নামে একখানি কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি জয়দেবের পরবর্তী কালের কবি। ১৪২৮ খ্রীঃ অব্দে অনন্তপণ্ডিত 'রসমঞ্জরী'র একখানি টীকা ('রসমঞ্জরী প্রকাশিকা')

১৪১. ডঃ মদনমোহন গোস্বামী—রায়গুণাকর ভারতচন্দ্র, পৃ. ১৩৭

রচনা করেন।[১৪২] কবি তাহা হইলে নিশ্চয় ইহার পূর্বে বর্তমান ছিলেন। যাহা হউক ভারতচন্দ্র যে ভানুদত্তের আদর্শে 'রসমঞ্জরী' রচনা করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই—কারণ উভয়ের মধ্যে বহু সাদৃশ্য আছে। কিন্তু রায়গুণাকর ভানুদত্তের রচনার হুবহু অনুবাদ করেন নাই। কাব্যারম্ভে ভারতচন্দ্র বলিয়াছেন :

রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ
আজ্ঞা দিলা রসে মিশাইয়া।

কিন্তু কবি 'রসমঞ্জরী'র মূল লেখক ভানুদত্তের কোন উল্লেখ করেন নাই। ভানুদত্তের গ্রন্থের ধারা অনুসরণ করিলেও রায়গুণাকর অনেক স্থলে নিজস্ব মৌলিকতাও দেখাইয়াছেন। সমধর্মী অন্যান্য গ্রন্থ হইতেও তিনি অনেক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। যথা—জয়দেবের (গীতগোবিন্দের কবি নহেন) 'রতিমঞ্জরী', বিশ্বনাথের 'সাহিত্যদর্পণ', বাৎস্যায়নের 'কামসূত্র', রূপগোস্বামীর 'উজ্জ্বলনীলমণি', জ্যোতিরীশ্বর কবিশেখরাচার্যের 'পঞ্চসায়ক' কল্যাণমল্লের 'অনঙ্গরঙ্গ'।[১৪৩] "ভানুদত্তের গ্রন্থে কামশাস্ত্র ও অলঙ্কারশাস্ত্রের আদর্শে নায়িকাভেদ, নায়িকাসহায়, নায়কপ্রকারভেদ, নায়কসহায়, শৃঙ্গার, বিপ্রলম্ভ, বয়োবিভাগ, জাতিকথন প্রভৃতি বর্ণনা গৃহীত হইয়াছে। ভারতচন্দ্রও সেই ধারা অনুসরণ করিয়া মূল বর্ণনাকে সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন।"[১৪৪] অলঙ্কারশাস্ত্রের বর্ণনার যথাযথ অনুকরণ, কোথাও বা কিছু ব্যতিক্রম—ইহাতে ভারতচন্দ্রের প্রতিভার কিছু পরিচয় থাকিলেও উহা প্রথম শ্রেণীর প্রতিভা নহে, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। নায়ক-নায়িকা, নায়িকাসহায়িকা, নায়কসহায়ক প্রভৃতি বর্ণনায় অলঙ্কারশাস্ত্র ও কামশাস্ত্রের বাঁধা পথ ধরিয়া যেমন ভানুদত্ত অগ্রসর হইয়াছিলেন, ভারতচন্দ্রও সেই পথ ধরিয়াছিলেন।

১৪২. Dr. S. N. Dasgupta & Dr. S. K. De—*History of Sanskrit Literature*, Vol. I, p. 561 (Ist. Edition), C. U.

১৪৩. ডঃ মদনমোহন গোস্বামী প্রণীত উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ১৩৮

১৪৪. পুঁথি বাড়িয়া যাইতেছে বলিয়া তিনি পুনঃপুনঃ স্মরণ করাইয়া দিয়াছেন :

(১) প্রত্যেক বর্ণিতে হয় কবিতা বিস্তর।
অনুভবে বুঝে লবে নাগরী-নাগর॥

(২) পুথি বাড়ে সকলের করিতে কবিতা।
অনুভবে বুঝ সবে লক্ষণ মিলিতা॥

কারণ কাব্যারম্ভেই তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন—"রসমঞ্জরীর রস ভাষায় করিতে বশ" তিনি বাংলা ভাষায় রসমঞ্জরী রচনায় প্রবৃত্ত হইয়াছেন।

একদা বঙ্কিমচন্দ্র গীতিকাব্যের সার্থক দৃষ্টান্ত দিতে গিয়া প্রথমেই ভারতচন্দ্রের 'রসমঞ্জরী'র নাম করিয়াছিলেন। ইহাতে স্থানে স্থানে গীতি-কবিতার স্পর্শ আছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কবি সুললিত ছন্দে শৃঙ্গার রসাদির সংজ্ঞা দিয়া তার পরে তাহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন। যেমন বিপ্রলব্ধা নায়িকার সংজ্ঞায় তিনি বলিয়াছেন :

সঙ্কেত স্থানেতে গিয়া নাহি পায় পতি।
বিপ্রলব্ধা তারে বলে পণ্ডিত সুমতি॥

পরে এই সংজ্ঞার বৃত্তি করিয়াছেন এইভাবে :

তিল পরিমাণ মান সদা করি অনুমান
গুরু ভয় লঘুভয় গেলা।
গৃহ ছাড়ি ঘন বন করিলাম আরোহণ
সাগর তরিনু ধরি ভেলা॥
হরি হরি মরি মরি উহু উহু হরি হরি
তবু নহে হরি সনে মেলা।
পর দুঃখ পর শ্রম পর জনে জানে কম
অপরূপ খলজনে খেলা॥

এই সমস্ত বর্ণনা কৃত্রিমতা দোষদুষ্ট ও গতানুগতিকতার দ্বারা ক্লিষ্ট, কিন্তু নিম্নোদ্ধৃত বর্ণনাটি মধুর গীতিরস সৃষ্টি করিতে পারিয়াছে :

ওলো ধনি প্রাণধন শুন মোর নিবেদন
সরোবরে স্নানহেতু যেও না লো যেও না।
যদ্যপি বা যাও ভুলে অঙ্গুলে ঘোমটা তুলে
কমলকানন পানে চেও না লো চেও না॥
মরাল মৃণাল লোভে ভ্রমর কমল ক্ষোভে
নিকটে আইলে ভয় পেও না লো পেও না।
তোমা বিনা নাহি কেহ ঘামে পাছে গলে দেহ
বায় পাছে ভাঙ্গে কটি ধেও না লো ধেও না॥

যৌবন-বন্দনায় কবি বলিয়াছেন :

যৌবন-মরম না জানে যেবা।
পণ্ডিত তাহারে বলয়ে কেবা॥

লোকপ্রবাদ মতে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশে রচিত হয়—তাঁহার কিছু পূর্বেই ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর রচিত হইয়াছিল। কাব্যের কোথাও রচনাকাল সম্বন্ধে কোন সনতারিখের উল্লেখ নাই। কাব্যের ভণিতায় কবি 'কবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। ১১৬৫ সনে (১৭৫৯ খ্রীঃ অঃ) মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র 'শ্রীরামপ্রসাদ সেন সুচরিতেষু' হালিশহর ও ঔখড়া পরগণার একান্ন বিঘা জমি 'মহোত্তরাণ' হিসাবে দান করেন। এই দলিলে 'কবিরঞ্জন' উপাধি নাই। অথচ কৃষ্ণচন্দ্র যাহাকে জমি দান করিয়া সম্মান করিতেন, দলিলে তাহার উপাধিও লিখিতেন।[২০২] ভারতচন্দ্রকে জমি দান করিয়া তিনি যে দলিল লিখিয়া দিয়াছিলেন তাহাতেও ভারতচন্দ্রের উপাধি ছিল। সুতরাং এরূপ সিদ্ধান্ত করা যায় যে, ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পূর্বে তাঁহার বিদ্যাসুন্দর রচিত হয় নাই, কারণ তাহার পূর্বে তিনি 'কবিরঞ্জন' উপাধি পান নাই। ঈশ্বর গুপ্তের মতে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গানের খুব ভক্ত ছিলেন, কবির গ্রাম হালিশহরেও মহারাজ নাকি শুধু কবির গান শুনিবার জন্যই যাতায়াত করিতেন এবং তাঁহার গান শুনিয়া "সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে কবিরঞ্জন অভিধান দান করিয়াছিলেন।" ইহা হইতে অনুমিত হয় বিদ্যাসুন্দর রচনার পূর্বেই তিনি কবিসাধকরূপে খ্যাত হইয়াছিলেন এবং গানের জন্যই মহারাজের নিকট কবিরঞ্জন উপাধি পাইয়াছিলেন। কিন্তু কবি কোন পদে বা কাব্যে কৃষ্ণচন্দ্রের উল্লেখ করেন নাই। তাই কেহ কেহ মনে করেন, 'কবিরঞ্জন' উপাধি কবির "স্বয়ং-খ্যাপিত"।[২০৩] এই উপাধি কৃষ্ণচন্দ্র প্রদত্ত—ইহার একমাত্র প্রমাণ ঈশ্বর গুপ্তের উক্তি। ঈশ্বর গুপ্ত যখন রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তথ্য সংগ্রহ করিতেছিলেন তখন কবিবরের পুত্র-পৌত্রাদি ও আত্মীয়স্বজন জীবিত ছিলেন। তিনি তাঁহাদের নিকট হইতেই তথ্যাদি পাইয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার উক্তি ততটা অমূলক নহে।

রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল কবে রচিত হইয়াছিল তাহার

আমরা রামপ্রসাদি পত্ত সংগ্রহ করণে প্রবৃত্ত হইয়াছি।" সুতরাং ১৮৩০ খ্রীঃ অব্দের পূর্ব হইতেই তিনি এ বিষয়ে সন্ধান আরম্ভ করিয়াছিলেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে নানা অনুসন্ধানের পর তিনি 'কালীকীর্তন' প্রকাশ করেন।

২০২. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ, ২০-২১

২০৩. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—ঐ পুস্তিকা, পৃঃ ২০

একটা আনুমানিক ইঙ্গিত পাওয়া যাইতেছে দলিলের সনতারিখ হইতে (১৭৫৯ খ্রীঃ)। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দের পর এই কাব্য রচিত হইয়াছিল, ইহা একরূপ স্থির সিদ্ধান্ত করা হইয়াছিল। কিন্তু এবিষয়েও দ্বিমতের অবকাশ আছে। ঈশ্বর গুপ্তের মতে, "মহারাজ রামপ্রসাদি বিদ্যাসুন্দর দৃষ্টি করিয়া ভারতচন্দ্রেব প্রতি বিদ্যাসুন্দর রচনার আদেশ করিয়াছিলেন"।[২০৪] বোধ হয় তাঁহার এই মন্তব্য হইতে পরবর্তী কালের লেখকগণ মনে করিয়াছেন, রামপ্রসাদেব বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। ভারতচন্দ্রেব অন্নদামঙ্গলের রচনাকাল ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দ। সুতরাং কেহ কেহ অনুমান করেন রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর ১৭৫২ খ্রীঃ অব্দেব পূর্বে রচিত হয়।[২০৫] কিন্তু ইদানীং গবেষকগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—ভারতচন্দ্রের মৃত্যুর পর ১৭৬০-৭০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে ইহা রচিত হইয়া থাকিবে। তখন কবির তিনটি সন্তানের জন্ম হইয়াছে, কারণ কাব্যের মধ্যে তিনি তিন সন্তানের উল্লেখ করিয়াছেন, চতুর্থ পুত্র রামমোহনের উল্লেখ করেন নাই।[২০৬]

রামপ্রসাদ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র ও অন্যান্য ভূস্বামীর নিকট নানাপ্রকার সহায়তা, বৃত্তি ও নিষ্কর জমি লাভ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনি 'কালীকীর্তনে' রাজকিশোর নামক এক ধনাঢ্য ব্যক্তির পুনঃপুনঃ উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহাবই অনুরোধে তিনি কালীকীর্তন বচনা করিয়াছিলেন। ইনি হয়তো হুগলীর দেওয়ান রাজকিশোর হইবেন। রামপ্রসাদ যদি কৃষ্ণচন্দ্রের আদেশে বিদ্যাসুন্দর লিখিতেন, তাহা হইলে কাব্যেব কোন না কোন স্থলে তাঁহার নাম উল্লেখ করিতেন। সুতরাং বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণাভাবে এ কথা মানিয়া লওয়া যায় না। তবে এইটুকু সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে যে, কবির চল্লিশ বৎসর বয়সের সময় বিদ্যাসুন্দর রচিত হয়।[২০৭]

---

২০৪. সংবাদ প্রভাকব, ১লা পৌষ, ১২৬০

২০৫. রামচন্দ্র তর্কালঙ্কার, রামগতি ন্যায়রত্ন প্রভৃতি পণ্ডিতেরা রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর কাব্যকে ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী বলিয়াছেন। কাবণ ভারতচন্দ্রের অতি উপাদেয় কাব্য পূর্বে রচিত হইলে রামপ্রসাদ "প্রবহমান নদী সন্নিধানে সরোবর খননের ন্যায় নিতান্ত অবিজ্ঞের কার্য" (ন্যায়রত্ন—বাঙ্গালা ভাষা ও বাঙ্গালা সাহিত্য বিষয়ক প্রস্তাব) করিতে যাইবেন কেন? অবশ্য ইহা অনুমান মাত্র।

২০৬. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৩২

২০৭. ঐ পৃ. ৩২

যদিও রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের পরে বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন, কিন্তু ভারতচন্দ্র অপেক্ষা অন্যান্য কালিকামঙ্গলের দ্বারা অধিকতর প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কাহিনী (সিন্দূর লেপনের দ্বারা চোর ধরা), চরিত্র (বিদু ব্রাহ্মণী) প্রভৃতি ব্যাপারে তিনি অনেক সময় সপ্তদশ শতাব্দীর কালিকা-মঙ্গলের কবি কৃষ্ণরাম দাসের কাব্য হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। কৃষ্ণরামের দ্বারা তিনি এতদূর প্রভাবিত হইয়াছেন যে, কৃষ্ণরামের গ্রাম্য-অশ্লীল-ইতর শব্দগুলিও তিনি অনুসরণ করিয়াছেন।[২০৮] কাহিনীর সর্বশেষে সুন্দর কর্তৃক শবসাধনার বর্ণনা শাক্ত তান্ত্রিক কবিরই উপযুক্ত হইয়াছে।

রামপ্রসাদ প্রায়শঃই কৃষ্ণরামকে অনুসরণ করিয়াছিলেন বলিয়া কাহিনী গ্রন্থনে বিশেষ মৌলিকতার পরিচয় দিতে পারেন নাই। তবে কাব্যটি যে যথার্থ কালীভক্তের রচিত, তাহা ইহার আদ্যন্ত হইতেই পাওয়া যায়। তাঁহার সুন্দরও প্রকৃত ভক্তে পরিণত হইয়াছে, বিদ্যাও মনোমত পতিলাভের জন্য কালিকার কাছে আন্তরিক প্রার্থনা জানাইয়াছে। কবি তাই প্রাগ্‌বিবাহ মিলনকে সিন্দূর দানের দ্বারা কথঞ্চিৎ শাস্ত্রসঙ্গত করিতে চাহিয়াছেন:

সুন্দরীরে সমর্পিলা সুন্দরের হাতে
সুন্দর সিন্দূর দিলা সুন্দরীর মাথে।[২০৯]

সুন্দরের বন্ধনমোচনের পর শাস্ত্রসম্মত বিবাহ-সংস্কারের জন্য রাজা বীরসিংহ ব্রাহ্মণপণ্ডিতদের মত লইয়াছিলেন। ব্রাহ্মণগণ শাস্ত্রের নজির তুলিয়া দেখাইলেন যে, গান্ধর্ব-বিবাহের পর পুনর্বার বিবাহ-সংস্কারের প্রয়োজন নাই, শুধু দ্বিজজাতিকে দান করিলেই এই বিবাহ সিদ্ধ হইবে। বীরসিংহ সেই রীতি অনুসরণ করিয়া জামাতাকে যথাবিধি সম্মান করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, রামপ্রসাদ নায়ক-নায়িকার গান্ধর্ববিবাহ সত্ত্বেও শাস্ত্রসঙ্গত

২০৮. কৃষ্ণরাম ও রামপ্রসাদের তুলনামূলক আলোচনার জন্য ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদ' (৫ম অধ্যায়) দ্রষ্টব্য।

২০৯. ভারতচন্দ্রও বিদ্যা-সুন্দরের বিবাহের কথা বলিয়াছেন বটে, কিন্তু তাহা রূপকার্থে গৃহীত হইয়াছে:

বিবাহ নহিলে হয় কেমনে বিহার।
গন্ধর্ব বিবাহ হৈল মনে আঁখি ঠার।
কন্যাকর্তা হৈল কন্যা বরকর্তা বর।
পুরোহিত ভট্টাচার্য হৈল পঞ্চশর।

বিবাহের কথা চিন্তা করিয়াছিলেন। ভারতচন্দ্র সে কথা ভাবেন নাই, তিনি বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন—যেখানে মদন-দৌত্যে নায়কনায়িকা মিলিত হইয়াছে, সেখানে শিখাসূত্রধারী ব্রাহ্মণ-পুরোহিতের প্রয়োজন নাই। যাহা হউক রামপ্রসাদ যাঁহার নির্দেশেই এ কাব্য রচনা করুন না কেন, নিছক কৌতুক বা আদিরস তাঁহার কাব্যের প্রেরণা ছিল না। দেবীভক্ত রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দরের আদ্যন্ত শাক্ত মনোভাবের পরিচয় দিয়াছেন। সুন্দর ও বিদ্যা-পরস্পরের প্রতি অনুরক্ত হইবার পূর্ব হইতেই দেবীর সেবক-সেবিকা হইয়াছিল, কারণ তাহারা শাপভ্রষ্ট দেবদেবী, কালিকার পূজা প্রচারের জন্যই মর্ত্যধামে সুন্দর ও বিদ্যারূপে জন্মগ্রহণ করে।[২১০] বর্ধমান যাত্রার পূর্বে সুন্দর সগর্বে বলিয়াছে :

দনুজদলনী শ্যামা জননী যাহার।
জলে স্থলে অন্তরীক্ষে ভয় কি তাহার।[২১১]

বিদ্যাও সুন্দরকে পতিরূপে লাভ করিবার জন্য ভক্তিভরে কালিকার স্তব করিয়াছে :

বিদ্যা রূপবতী সতী কৃতাঞ্জলি শুদ্ধমতি
কায়মনোবাক্যে করে স্তব।
তুমি বিদ্যা পরাৎপরা জন্মজরা মৃত্যুহরা
তুমি ব্রহ্মা বিষ্ণু তুমি ভব।
তুমি জল তুমি স্থল ধর্মাধর্ম ফলাফল
তুমি সন্ধ্যা দিবাবিভাবরী।
তুমি কুলাচল সিন্ধু তুমি রবি তুমি ইন্দু
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ভাণ্ডোদরী।

২১০. সুন্দর শবসাধনা করিলে দেবী আবির্ভূত হইয়া বলিয়াছিলেন :

সাবধানে শুন পুত্র সর্ব কথা কহি।
শাপভ্রষ্ট তোমা দোঁহাকার জন্ম মহী।
বিদ্যাবতী হারাবতী তুমি মালাধর।
মম পূজা প্রকাশার্থে হইয়াছ নর।

২১১. স্বপ্নে আবির্ভূত হইয়া দেবী সুন্দরকে আশ্বাস দিয়াছিলেন :

ভাব কেন ও'রে ভক্ত আমি তব অনুরক্ত
সেও তো আমার দাসী বটে।
পরম রূপসী সেই একান্ত জানিবে এই
তরুণী তোমার তরে ঘটে।

সুন্দর বিদ্যার কক্ষে প্রবেশ করিবার পূর্বেও দেবীবন্দনা সারিয়া লইয়াছে :

নমো ভগবতি কিবা জানি স্তুতি
প্রধানা প্রকৃতি কালী।
শ্মশানবাসিনী দনুজনাশিনী
মুণ্ডমালী মা করালী॥

কাব্যের সর্বত্র এইরূপ অকৃত্রিম শ্যামাভক্তির উদাহরণ মিলিবে। শাক্ত কবি সুন্দরকে দিয়া শবসাধনাও করাইয়া লইয়াছেন। এখানে কবি নিজ অভিজ্ঞতা ও তন্ত্রোক্ত শবসাধনার প্রক্রিয়ার সাহায্যে সুন্দরের শবসাধনার বিস্তারিত পরিচয় দিয়াছেন। অবশ্য কাব্যের পক্ষে এই শবসাধনার বর্ণনা নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিক হইয়া পড়িয়াছে—শাক্ত কবি নিজ ইষ্টদেবীর প্রতি ভক্তি-প্রকাশের জন্যই এই বিচিত্র বর্ণনার আশ্রয় লইয়াছেন। যদিও সাধককবি ধর্মীয় উদারতা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হন নাই,[২১২] কিন্তু এই শাক্ত ভক্ত বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের প্রতি মানসিক ঔদার্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। বিশেষতঃ বীরভদ্রগোষ্ঠীর (বৈষ্ণব সহজিয়া) প্রতি তিনি কিছু নির্মম হইয়াছেন :

গৌড়রাজ্যে গোঁড়াগুলা চলে যে যে ঠাটে।
সেরূপে ভ্রময়ে কত হাটে ঘাটে মাঠে॥
* * *
মুক্ত গুচ্ছচড়া গলে ঠাঁই ঠাঁই ছাব।
দুই ভাই[২১৩] ভজে তারা সৃষ্টি ছাড়া ভাব॥
পৃষ্ঠদেশে গ্রন্থ ঝোলে খান সাত আট।
ভেকা ভুলাইতে ভাল জানে কত ঠাট॥
এক এক জনার ধুমড়ী দুটি দুটি।
দুই চক্ষু লাল গাঁজা ধুনিবারে কুটী॥
ভুগলামি ভাবে ভাব জন্মে থেকে থেকে।
বীরভদ্র অদ্বৈত বিষম উঠে ডেকে।
সে রসে রসিক নবশাক লোক যত।
উঠে ছুটে পায় পড়ে করে দণ্ডবত॥

---

২১২. ভবানী শঙ্কর বিষ্ণু এক ব্রহ্ম তিন।
ভেদ করে সেই মূঢ় জন প্রজ্ঞাহীন॥

২১৩. অর্থাৎ শ্রীচৈতন্য ও নিত্যানন্দ

সমাদরে কেহ নিয়া যায় নিজ বাড়ী।
ভালমতে সেবা চাই পড়ে তাড়াতাড়ি॥
গোষ্ঠী শুদ্ধ পাডা থাকে বাবাজীর কাছে।
মনে মনে ভয় অপরাধী হয় পাছে॥
নানা রস ভুঞ্জায় শোয়ায় দিব্য খাটে।
শেষে মেয়ে পুরুষেতে পাত্রশেষ চাটে॥
বৈষ্ণব বন্দনা গ্রন্থ সকলে পড়ায়।
ছত্রিশ আশ্রম নিয়া একত্রে জুড়ায়॥
কেমন কলির ধর্ম কব আব কি।
মজাইল গৃহস্থের কত বহু ঝি॥

ঘোর শাক্ত কবি বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়ের প্রতি কিঞ্চিৎ প্রতিকূল হইয়াছেন, ইহা আজু গোঁসাইয়ের ব্যঙ্গের প্রত্যুত্তর কিনা কে বলিতে পারে? কিন্তু ভারত-চন্দ্রের কাব্যে এই ধরনের সম্প্রদায়গত ব্যঙ্গবিদ্রূপ নাই—এদিক হইতে রায়গুণাকর অধিকতর ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। ইহার কারণ রামপ্রসাদ নিজেই বিশেষ সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, সেইজন্য বোধ হয় সব সময় অন্য সম্প্রদায়ের প্রতি ঔদার্য রক্ষা করিতে পারেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বীরভদ্রপন্থী সহজিয়া সম্প্রদায় যেভাবে সমাজে গুরুগিরির ব্যবসা চালাইতেন, এবং যেরূপ ব্যক্তিগত জীবনযাপন করিতেন তাহাতে সাধারণ গৃহস্থের মন ইঁহাদের প্রতি অপ্রসন্ন হইয়া পড়িয়াছিল—রামপ্রসাদের উল্লিখিত ছত্রগুলি হইতে তাহাই অনুমান হয়। রামপ্রসাদ বৈষ্ণববিদ্বেষী ছিলেন না, থাকিলে কৃষ্ণকীর্তন লিখিতে পারিতেন না, বা কালীকীর্তনে বৈষ্ণব পদপর্যায় নীতি অনুসরণ করিতেন না। শুধু সহজিয়া বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের অসামাজিক আচার-আচরণের বিরুদ্ধে তাঁহার মন বিষাইয়া গিয়াছিল।

চরিত্রাঙ্কনে কবিরঞ্জন রায়গুণাকর অপেক্ষা অধিকতর কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভারতচন্দ্রের কবিপ্রকৃতিটি হাস্য-পরিহাসমুখর ছিল, রামপ্রসাদ ছিলেন গম্ভীর প্রকৃতির 'সীরিয়স' কবি—তদুপরি ভক্ত-সাধক। তাঁহার বিদ্যাসুন্দর তাই কালিকামঙ্গলের দিকেই অধিক ঝুঁকিয়াছে, ভারতচন্দ্রে 'সেক্যুলর' রস অধিক ফুটিয়াছে। ভারতচন্দ্র চরিত্রসৃষ্টির চেষ্টা করেন নাই, চরিত্রগুলির অন্তর্নিহিত অসঙ্গতি হইতে হাস্যকৌতুক সৃষ্টি করিয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের অঙ্কিত চরিত্রে কিছু

পরিণতি লক্ষ্য করা যাইবে, ভারতচন্দ্রের প্রধান চরিত্রগুলির বিশেষ কোন পরিণতি বা বিকাশ দেখা যায় না।

রায়গুণাকর আদিরসের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িয়াছেন, কিন্তু কোথাও গ্রাম্য ও অশ্লীল মনোভাবের সমর্থন করেন নাই। আদিরসের সঙ্গে কৌতুকরস মিশ্রিত হওয়াতে তাহার দৈহিক দিকের স্থূলতা অনেকটা খর্ব হইয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদের আদিরস নিতান্তই দেহের ব্যাপার, ভক্তকবি রামপ্রসাদ অবিশুদ্ধ কামপিপাসাকে ভারতচন্দ্রের মতো শিল্প-সৌকুমার্যের দ্বারা পরিশুদ্ধ করিতে পারেন নাই। একদিকে ভক্তকবির নির্বেদ বৈরাগ্য, আরেকদিকে অনঙ্গরঙ্গের আসক্তি—এই দুই বিপরীতমুখী প্রবৃত্তির টানে তাঁহার বিদ্যা-সুন্দরের প্রেমের চিত্রগুলি অতিশয় জান্তবধর্মী হইয়া পড়িয়াছে। কোন কোন স্থলে তিনি এতটা লঘুচেতনা ও কুরুচিপূর্ণ ভাষা ও ইঙ্গিত ব্যবহার করিয়াছেন যে, ভক্তকবির প্রতি ভক্তি রক্ষা করা দুরূহ হইয়া পড়ে। বিদু-ব্রাহ্মণীর দুর্গতি, সুন্দরকে দেখিয়া হীরামালিনীর অনুচিত ইচ্ছার আভাস, বিদ্যা ও রাণীর বাক্‌ছল প্রভৃতি বর্ণনা কুরুচিবই পরিচায়ক—ইহাকেই যথার্থ অশ্লীলতা ও গ্রাম্যতা বলে। ভারতচন্দ্র রাজসভায় সুন্দর ও বীরসিংহের যে বাক্‌ছল বর্ণনা করিয়াছেন, হাস্যপরিহাস ও ব্যঙ্গকৌতুকে সুন্দরের সেই ধৃষ্টতাও উপভোগ্য হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু রামপ্রসাদ ভক্ত-কবি হইয়াও ইতর শব্দ ও কদর্য ইঙ্গিত ব্যবহারে সঙ্কুচিত হন নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দরের ভারতচন্দ্রের মতো খ্যাতি না হইবার কারণ—"প্রথমতঃ ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ঝলমল রচনার দ্যুতি, দ্বিতীয়তঃ রামপ্রসাদের কৃষ্ণচন্দ্রের মতো ক্ষমতাবান পোষ্টার অভাব।"[২১৪] প্রথম মন্তব্যটি আংশিক সত্য হইতে পারে। "ভারতচন্দ্রের অলঙ্কার ঝলমল রচনার দ্যুতি"র অর্থ তাঁহার বিচিত্র রচনারীতি—মার্জিত, বিদগ্ধ ও বুদ্ধিদীপ্ত রচনাবৈশিষ্ট্যই ভারতচন্দ্রকে এত জনপ্রিয় করিয়াছিল—রামপ্রসাদের রচনায় এই নাগরিক বৈদগ্ধ্যের অভাব ছিল—বাক্‌রীতির নিষ্প্রভতার জন্যই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের মতো জনপ্রিয় হয় নাই। তাঁহার ভাষা সংযত হইলেও সরস নহে, মাঝে মাঝে রসিকতা থাকিলেও তাহা নির্মল কৌতুক সৃষ্টি করিতে পারে নাই, বরং তাহা কিঞ্চিৎ পরিমাণে

২১৪. ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ৪৮৯

অশালীনতার ধার ঘেঁষিয়া গিয়াছে। অনেকগুলি চরিত্র পরিণতি লাভ করিলেও পাঠকমনে দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে নাই। উদাহরণ স্বরূপ হীরা-মালিনীর কথা ধরা যাক। ভারতচন্দ্রের হীরা হীরার মতোই ঝলমল করিতেছে, রামপ্রসাদের মালিনী অতিশয় অনুজ্জ্বল। কেবল নায়ক-নায়িকার চরিত্র দুইটি মোটামুটি বিকাশ লাভ করিয়াছে। কিন্তু শেষাংশে শাক্ত কবি মাত্রাজ্ঞান বিসর্জন দিয়া নিষ্প্রয়োজনে সুন্দরকে দিয়া শবসাধনা করাইয়া লইয়াছেন। ভারতচন্দ্র ছিলেন নিরাসক্ত শিল্পী—শিল্পীজনোচিত সৌন্দর্যবোধ তাঁহার প্রধান অবলম্বন—অপরদিকে রামপ্রসাদ ছিলেন ভক্ত, তাই তাঁহার বিদ্যাসুন্দরে শ্যামাভক্তি প্রকাশ পাইলেও কাব্যসৌন্দর্যের বিশেষ উৎকর্ষ দেখা যায় না। ভারতচন্দ্রের অনেক উক্তি সূক্তির আকারে এবং অনেক বাক্য প্রবাদের আকারে এখনও চলিতেছে। রামপ্রসাদের বাক্‌রীতি এইরূপ গৌরব লাভ করিতে পারে নাই। নানাভাষাবিদ ভারতচন্দ্র কাব্যসরস্বতীকে দেশী-বিদেশী নানা আভরণে সাজাইয়াছেন। রামপ্রসাদ সেইরূপ অভিজ্ঞ হইলেও কাব্যে অধীতবিদ্যা ততটা কৃতিত্বের সঙ্গে ব্যবহার করিতে পারেন নাই। এইজন্য ভক্ত রামপ্রসাদ শাক্তপদকার রূপেই পূজা পাইয়াছেন, বিদ্যাসুন্দরের কবি বলিয়া জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পাবেন নাই।

দ্বিতীয়তঃ ভারতচন্দ্রের মতো তিনিও কৃষ্ণচন্দ্রের দাক্ষিণ্য লাভ করিয়াছিলেন, আরও অনেক ধনাঢ্য ব্যক্তি ও সম্পন্ন ভূস্বামীরা ভক্ত রামপ্রসাদকে শ্রদ্ধার সঙ্গে নানাভাবে সহায়তা করিতেন। অবশ্য কবির অর্থনৈতিক অবস্থা বিশেষ ভাল ছিল না। সেকথা তিনি বিদ্যাসুন্দরের গোড়াতেই ইঙ্গিতে বলিয়াছেন :

> বিষম দারিদ্র্যদোষে গুণরাশি নাশে।
> থাকুক আদর কেহ কথা না জিজ্ঞাসে॥
> কি আর কহিব বাড়া স্ত্রীপুত্র অবশ।
> বিরস বদনে কহে বচন কর্কশ॥

প্রথম জীবনে তিনি খিদিরপুরের দেওয়ান গোকুলচন্দ্র ঘোষালের (মতান্তরে কলিকাতার ভূস্বামী দুর্গাচরণ মিত্র) নিকট মুহুরীর কাজ করিতেন। তাঁহার নির্লোভ ভক্তিতে মুগ্ধ হইয়া তাঁহার প্রভু তাঁহাকে দাসত্বকর্ম হইতে অব্যাহতি দিয়া মাসিক তিরিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। বাড়ী বসিয়া তিনি

এই বৃত্তি পাইতেন। ভারতচন্দ্র কৃষ্ণচন্দ্রের সভায় যাতায়াত ও রাজার মনোরঞ্জন করিয়া যাহা পাইতেন (চল্লিশ টাকা) তাহা মাস-মাহিনা মাত্র, সম্মানজনক 'বৃত্তি' নহে। রামপ্রসাদ কৃষ্ণচন্দ্রের নিকট অনেক বিঘা নিষ্কর জমি লাভ করেন। হালিশহরের সুভদ্রা দেবী কবিকে একটি বাড়ী সহ এক বিঘা বাস্তুজমি দান করেন। ঐ হালিশহরের জমিদার দর্পনারায়ণ রায় কবিকে দুই বিঘা এবং রাম রায় ও কালীচরণ রায়ের সহযোগে আরও আট বিঘা জমি দিয়াছিলেন। তাঁহার পোষ্টা বা পৃষ্ঠপোষকের অভাব ছিল না—তিনি কৃষ্ণচন্দ্রের মতো "ক্ষমতাবান পোষ্টা"র সাহায্য পান নাই একথা ঠিক নহে। আর তাহা ছাড়া, পোষ্টা মুরুব্বির সাহায্য না পাইলে কবিরা জনপ্রিয় হন না —একথাও ঠিক নহে। কারণ কবিখ্যাতির চূড়ান্ত দরবার পাঠকসমাজ—ক্ষমতাবান পোষ্টা নহে। ভারতচন্দ্র মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতা না পাইলেও কবিরূপে একই প্রকার খ্যাতি লাভ করিতেন। যিনি দুঃখদারিদ্র্য-বিপর্যয়কে হাসিমুখে মানিয়া লইয়া বিরস আবহাওয়াকে সরস করিয়াছেন, তিনি যে পোষ্টার সহায়তায় এতটা জনপ্রিয় হইয়াছেন তাহা মনে হয় না। আসল কথা ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর কাব্যে অসাধারণ নৈপুণ্য ও প্রথমশ্রেণীর শিল্পী-প্রতিভার পরিচয় দিয়াছেন, রামপ্রসাদের প্রতিভা সেরূপ নহে। তাই স্বাভাবিক কারণেই তাঁহার বিদ্যাসুন্দর ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পার্শ্বে নিষ্প্রভ মনে হয়। সে যাহা হউক, ভারতচন্দ্রের কাব্য সম্মুখে থাকা সত্ত্বেও কবি আবার কেন যে একই বিষয় লইয়া কাব্য রচনা করিলেন তাহা এক সমস্যার বিষয় বটে। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নির্দেশেই ভারতচন্দ্র বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া মূল অন্নদামঙ্গলের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। তাহা হইলে অল্প সময়ের ব্যবধানে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে আবার একখানি বিদ্যা-সুন্দর রচনার আদেশ দিবেন কেন?[২১৫] আর তাহা ছাড়া ইহা যে মহারাজের

২১৫. কেহ কেহ বলেন, পল্লীর ধ্যানমগ্ন এই কবি রাজসভার বিদগ্ধরুচির কবি ভারতচন্দ্রের সঙ্গে "মসীযুদ্ধের সুলভ উত্তেজনার জন্য উন্মুখ প্রতিবেশে শক্তির পরীক্ষায় অবতীর্ণ হইয়াছিলেন।" অথবা হয়তো, "কবির লড়াই দেখিতে অভ্যস্ত মহারাজ ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদকে একই বিষয়ে কাব্য রচনায় প্রণোদিত করিয়া উভয়ের শক্তি-প্রতিদ্বন্দ্বিতার মল্লযুদ্ধ উপভোগ করিতে চাহিয়াছিলেন।" (ডঃ শিবপ্রসাদ ভট্টাচার্যের 'ভারতচন্দ্র ও রামপ্রসাদে' ডঃ শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গ্রন্থপরিচিতি' দ্রষ্টব্য, পৃ. ।।৵০) এরূপ অনুমান যুক্তিসঙ্গত বটে, কিন্তু ইহার প্রমাণস্বরূপ তথ্যাদি না পাওয়া পর্যন্ত ইহাকে অনুমানের অধিক মর্যাদা দেওয়া যায় না।

আদেশেই রচিত হইয়াছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই—কবি কাব্যের কোথাও মহারাজের নাম উল্লেখ করেন নাই। কেহ কেহ অনুমান করেন, "শৃঙ্গার রসের বিচিত্র বর্ণনার পদে পদে বীরাচারী তান্ত্রিক ইষ্টদেবীর লীলা অনুভব করিয়াছেন। অর্থাৎ রামপ্রসাদী বিদ্যাসুন্দর একাধারে কাব্য ও কৌলতন্ত্রের নিবন্ধ এবং জনসাধারণের নিকট এ জাতীয় রহস্যময় তন্ত্রগ্রন্থ চিরকালই গুপ্ত থাকে।"[২১৬] কিন্তু কবি বিদ্যা ও সুন্দরের রূপকে তান্ত্রিক রহস্য ব্যবহার করিয়াছেন—ইহাও অনুমান মাত্র—যুক্তি দিয়া ইহা প্রমাণ করা যায় না। সে যাহা হউক ভক্ত রামপ্রসাদ ইহাতে শ্যামাভক্তি ও তান্ত্রিক তত্ত্বকথা শুনাইলেও আদিরসের অনাবৃত বর্ণনা, আপত্তিকর উক্তি ও শব্দব্যবহারে যে পিছাইয়া ছিলেন তাহা মনে হয় না। তবে ভারতচন্দ্রের সঙ্গে তাঁহার পার্থক্য—ভারতচন্দ্র রসপরিহাস, বাগ্‌বৈদগ্ধ্য, ছন্দের কারুকর্ম প্রভৃতি নানাপ্রকার কলাকৌশলের দ্বারা স্থূলতাকে ঢাকিয়া রাখিয়াছেন, রামপ্রসাদ তাহা পারেন নাই—এবং পারেন নাই বলিয়া বিদ্যাসুন্দরের কবি-হিসাবে জনস্মৃতির বাহিরে রহিয়া গিয়াছেন।

কালিকামঙ্গলের কয়েকজন অপ্রধান কবি ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে এবং তাহার পরেও কয়েকজন কবি বিদ্যাসুন্দর পালা অবলম্বনে কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন—ভারতচন্দ্রের প্রভাবে তখন নাগরিক সমাজে বিদ্যাসুন্দরের খুব চল হইয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে গোপাল উড়ে হালকা-চালে বিদ্যাসুন্দর যাত্রা গাহিয়া ভারতচন্দ্রকে আরও জনপ্রিয় করিয়া তোলেন। তাই অনেক ব্যক্তি কবিযশঃপ্রার্থী হইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধেও বিদ্যাসুন্দর কালিকামঙ্গলে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের কিছুমাত্র প্রতিভা ছিল না, শুধু গতানুগতিকতার স্রোতে গা ভাসাইয়া দিয়া বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়া সুলভ উপায়ে জনপ্রিয়তা অর্জনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে তিনজন কবির নাম উল্লেখ করা কর্তব্য।

কলিকাতাবাসী দ্বিজ রাধাকান্ত মিশ্র অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে যে কালিকামঙ্গল রচনা করেন, তাহাকে কবি 'শ্যামার সঙ্গীত' বলিয়াছেন।

---

২১৬. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৩৩

গ্রন্থসমাপ্তিতে তিনি যে শকাব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা হইতে গ্রন্থরচনার কাল হিসাবে ১৬৮৯ শক (১৭৬৮-৬৯ খ্রীঃ অঃ)[২১৭] পাওয়া যাইতেছে। কবি নিজ কুলপরিচয় দিয়া বলিয়াছেন:

বহুকালাবধি কলিকাতা বসতি।
কাশ্যপের বংশ দ্বিজকুলে উৎপত্তি॥
পিতামহ শ্রীবল্লভ মিশ্র মহাশয়।
তাহার তনয় জ্যেষ্ঠ শ্রেষ্ঠ শুভোদয়॥
শ্রীযুত শ্রীরামনাথ মিশ্র খ্যাতনাম।
তার সুত বিখ্যাত শ্রীযুত দেবীরাম॥
তাহার অনুজ দ্বিজ রাধাকান্ত ভণে।
কৃপায় কাতর জনগণ নিজগুণে॥

কবি কাব্যসমাপ্তিতে বলিয়াছেন যে, তিনি নূতন মঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছেন—"নৌতুন মঙ্গল তবে করহ শ্রবণ"। কাব্যের যেটুকু পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে শুধু বিদ্যাসুন্দরের কাহিনীটুকু আছে। কিন্তু পুঁথির শেষে 'কালিকামঙ্গলের সারমর্ম্ম' শীর্ষক বিবৃতি হইতে দেখা যাইতেছে কবি ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলের মতো গোড়ার দিকে পৌরাণিক আখ্যান বর্ণনা করিয়াছিলেন। তারপর বিদ্যাসুন্দর আখ্যান আরম্ভ হইয়াছিল। কাব্যারম্ভেও কবি বলিয়াছেন:

শ্যামার সঙ্গীত সপ্তা করি সমাপন।
আরম্ভিল রসের সাগর জাগরণ॥

প্রথম সাত দিনে গীত হইবার জন্য কবি 'শ্যামার সঙ্গীত' অর্থাৎ পৌরাণিক শিবদুর্গার কাহিনী রচনার পর 'রসের সাগর' অর্থাৎ আদিরসের আকর বিদ্যাসুন্দরে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। কিন্তু শুধু বিদ্যাসুন্দরটুকু রক্ষা পাইয়াছে—'শ্যামার সঙ্গীতে'র সংক্ষিপ্ত বিষয় জানা গেলেও মূল কাব্য পাওয়া যায় নাই। কাব্যসমাপ্তির দিকে কবি কাব্যরচনা প্রসঙ্গে একটি কৌতুকাবহ মন্তব্য করিয়াছেন:

আর এক নিবেদন শুন সর্ব্বজন।
প্রাচীন কবিরা সব কৈর‍্যাছে রচন॥

---

২১৭. শাকে গ্রহ বসু ঋতু বিধুর গণনে।
এই হেতু হইলা গীত প্রকাশ ভুবনে॥

কেহ কহে মায়ের হয়্যাছে প্রত্যাদেশ।
কেহ কহে দিল দেখা ধরি নিজ বেশ॥
কেহ বলে জিহ্বাতে কবিতা দিলা লিখি।
কেহ কেহ বলে আমি সপনেতে দেখি॥
যে পদ ধিয়ান করিয়া পান বিধাতা।
মানব হৈয়া কেহ কহে হেন কথা॥
কেমনে এমন কথা লইবে হিয়ায়।
কিন্তু সত্য মিথ্যা কিছু কহা নাহি যায়॥

কবি আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে কালিকামঙ্গল রচনা করিয়াছিলেন, কাজেই আধুনিক যুগের মনোভাবের অনুরূপ কিছু সংশয় কবিচিত্তে উঁকি দিয়াছে। "আধুনিক কালোচিত সংশয় রাধাকান্তের মনেও জাগিয়াছিল। তাই তিনি এই প্রকার প্রত্যাদেশের যথার্থতায় সন্দেহ তুলিয়া সেই দেব-অনুগৃহীত কবিদের স্পর্ধায় সায় দিতে পারেন নাই"—সমালোচকের[২১৮] এই মন্তব্য যুক্তিপূর্ণ বটে। কিন্তু এখানে ঠিক সংশয় বলিতে যাহা বুঝায় তাহা ফুটে নাই। কবি ঈশ্বরীসত্তায় সংশয় প্রকাশ করেন নাই, করিলে এ কাব্য লিখিতেই তাঁহার প্রবৃত্তি হইত না। যে সমস্ত কবি দেবদেবীর প্রত্যাদেশের দোহাই পাড়িয়া কাব্যরচনার কথা বলিয়াছেন, কবি শুধু তাঁহাদের উক্তির প্রতি সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। কবি বলিয়াছেন :

বেদ বলে ভকতবৎসলা মহামায়া।
কে জানিবে কেমনে কাহার তরে দয়া॥

ভক্তবৎসলা কাহাকে অনুগ্রহ করেন, কাহাকে নিগ্রহ করেন—তাহার কিছুরই ঠিকঠিকানা নাই। তবে কবি এ প্রসঙ্গে দৃঢ়নিশ্চয়—"ভজিলে তাঁহার নাম ভক্তি উপজয়"। কাজেই দেবীভক্ত কবিচিত্তে দেবী বিষয়ে কোন সংশয় ছিল না। বরং রামানন্দ ঘোষ, যিনি নিজেকে সদম্ভে বুদ্ধের অবতার বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন, তিনিই বাস্তব প্রয়োজনবুদ্ধির (pragmatic) দ্বারা প্রণোদিত হইয়া সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ"।[২১৯]

রাধাকান্ত মিশ্রের বিদ্যাসুন্দরে বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন নাই, কেবল

২১৮. ডঃ সেন—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪৮৬

২১৯. অনুবাদ-সাহিত্য প্রসঙ্গে রামানন্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

কাহিনী গ্রন্থনে তিনি কিছু কিছু নূতনত্বের আমদানি করিয়াছেন। যেমন—দেবী কালিকার মায়ায় সুন্দরের নদী পার, দেবী কর্তৃক সুন্দরকে মায়াকাজল দান, সেই কাজল পরিয়া সুন্দরের অদৃশ্য হইয়া যাওয়া, সুন্দর ও বিদ্যার তপস্বী-তপস্বিনীর সাজে বীরসিংহের সভায় উপস্থিত হইয়া কৌশলে বিবাহের অনুমতি আদায়, অপরাধিনী কন্যাকে রাজার বধ করিতে উদ্যোগ প্রভৃতি। ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ প্রভৃতি কবিদের কাব্যরচনার পর রাধাকান্ত একই বিষয় অবলম্বনে পালা রচনা করিতে গিয়াছিলেন। কিন্তু পূর্বসূরীদের কাব্য হইতে যে তিনি বিশেষ লাভবান হইয়াছিলেন তাহা মনে হয় না। কাহিনীতে দুই-একটি মৌলিকতা ভিন্ন আর কোন দিক দিয়া তিনি বিশেষ নৈপুণ্যের পরিচয় দিতে পারেন নাই, চরিত্রগুলিতেও কোনও প্রকার ব্যক্তিবৈশিষ্ট্য ফুটিয়া উঠে নাই। কেহ কেহ তাঁহার রচনারীতির প্রশংসা করিয়া থাকেন।[২২০] তাঁহার ভাষা মার্জিত হইতে পারে, তাহাতে গ্রাম্য কুরুচির বিশেষ সংস্পর্শ না থাকিতে পারে। কিন্তু এ ভাষায় সরসতার একান্ত অভাব বলিয়া গ্রন্থখানি বহু স্থলে ক্লান্তিকর মনে হয়।

এই ব্রাহ্মণ-কবি বেদান্তের ব্রহ্মতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ছিলেন; বিদ্যা ও সুন্দরের দার্শনিক বিচার অংশে বেদান্ত তত্ত্বকে তিনি অতি সহজ ভাষায় ব্যাখ্যা করিয়াছেন। সুন্দর অদ্বৈততত্ত্ব ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে বিদ্যাকে বলিল :

জ্ঞানের স্বরূপ এক ব্রহ্মজ্যোতির্ম্ময়।
তাহা বিনে ত্রিভুবনে কিছু সত্তা নয়॥
নিশ্চয় জানিহ এক নৃপতিতনয়া।
অনাদি তদ্ভূত আছে ঈশ্বরের মায়া॥
*　　*　　*　　*
না কর সন্দেহ সখি আমার বচনে।
এক ভিন্ন দুই নাই এ তিন ভুবনে॥

কালিকামঙ্গলের অনেক কবিই কালিকার স্তবস্তুতি দিয়া কাব্যারম্ভ করিয়াছেন, কিন্তু আদ্যাশক্তির অদ্বৈততত্ত্বে আসিয়া তাঁহাদের যাত্রা থামিয়াছে। যাহা হউক, রাধাকান্ত বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গলে বিশেষ কোন

---

২২০. ডঃ সেনের মন্তব্য—"রাধাকান্তের কাব্যের ভাষা মার্জিত, ভাব গ্রাম্যতা বর্জিত।"—বা. সা. ইতি. ১ম (অপরার্ধ) পৃ. ৪৮৬

নূতনত্ব দেখাইতে না পারিলেও সহজ ভাষায় কাহিনীটি বিবৃত করিয়াছেন বলিয়া ইহা কথঞ্চিৎ পাঠযোগ্য হইয়াছে।

রাঢ়ের আর এক কবি মধুসূদন চক্রবর্তী অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিদ্যাসুন্দর-কালিকামঙ্গল কাব্য রচনা করিয়াছিলেন। অম্বিকাচরণ গুপ্ত মধুসূদনের কাব্যের একখানি পুঁথি অবলম্বনে কাব্য প্রকাশের চেষ্টা করিয়াছিলেন।[২২১] কিন্তু এ কাব্য প্রকাশিত হয় নাই। বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদে কবিচন্দ্র-উপাধিক মধুসূদন চক্রবর্তীর কালিকামঙ্গলের একখানি পুঁথি আছে। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য অনুমান করেন—ইহাই সেই পুঁথি।[২২২] ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, কবির প্রকৃত নাম কবিচন্দ্র। কিন্তু কোন কোন পুঁথিতে মধুসূদন চক্রবর্তী, মধুসূদন কবীন্দ্র, কবিচন্দ্র ইত্যাদি ভণিতাও পাওয়া যায়। কেহ কেহ অনুমান করেন, "মধুসূদন কবীন্দ্রের বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থের ভাষা, বিষয়বস্তু ও লক্ষ্য বিবেচনা করিয়া আমাদের ধারণা হইয়াছে যে, ইহা রামপ্রসাদ ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরের পূর্ববর্তী এবং অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগের রচনা।"[২২৩] কিন্তু ইহার ভাষার মধ্যে এমন কোন প্রাচীনত্বের চিহ্ন নাই যাহাতে উহাকে ভারতচন্দ্র-রামপ্রসাদের পূর্ববর্তী বলিতে হইবে। এই অপরিণত ও দুর্বল রচনা কোন দিক দিয়াই উল্লেখযোগ্য নহে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা স্মরণীয়। কেহ কেহ মনে করেন, একই সময়ে নিধিরাম কবিচন্দ্র নামে আর একজন কালিকামঙ্গল কবির আবির্ভাব হইয়াছিল। মধুসূদন কবীন্দ্র এবং নিধিরাম কবিচন্দ্রের নিবাস ছিল একই অঞ্চলে—দক্ষিণ রাঢ়ে। তাই মনে হয় উভয়ের রচনা মিশ্রিত হইয়া গিয়াছে। আবার চট্টগ্রামে নিধিরাম আচার্য নামে আর একজন কবির কালিকামঙ্গল (১৬৭৮ শক=১৭৫৬ খ্রীঃ অঃ) পাওয়া গিয়াছে।[২২৪] এই দুই কবীন্দ্র-কবিচন্দ্র এবং একজোড়া নিধিরামে মিলিয়া কালিকামঙ্গলে পাড়ি জমাইতে

২২১. সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা ১৩৫০

২২২. বসুমতী সাহিত্য মন্দির প্রকাশিত 'বিদ্যাসুন্দর গ্রন্থাবলী' (মধুসূদন চক্রবর্তী কবীন্দ্রের 'বিদ্যাসুন্দর' অংশে শ্রীযুক্ত প্রফুল্ল পালের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।)

২২৩. শ্রীযুক্ত পালের মন্তব্য দ্রষ্টব্য।

২২৪. সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত বাঙ্গালা প্রাচীন পুথির বিবরণ, ১—১

চাহিয়াছিলেন—কিন্তু ভারতচন্দ্র প্রভৃতি থাকিতে ইঁহারা সমুদ্রের পার্শ্বে কূপ খননে মাতিয়াছিলেন কেন বুঝা যাইতেছে না।

কালিকামঙ্গলের লোভনীয় বিষয়বস্তু, যাহাতে ভক্তিরস ও আদিরস মিশিয়া গিয়াছে, তাহার প্রতি কবিযশঃপ্রার্থীদের আকর্ষণ থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য কালিকামঙ্গলে ভক্তিরসের শর্করামণ্ডন থাকিলেও ভিতরে আছে আদিরসের তিক্ত বটিকা—একথা সে যুগের পাঠকসম্প্রদায় ও শ্রোতারা জানিতেন। তাঁহারা আরও জানিতেন—এই তিক্ত বটিকা যতই তিক্ত হউক, ইহার প্রতি সাধারণ মানুষের দুর্নিবার আকর্ষণ অস্বীকার করা যায় না—তাই সেই আকর্ষণকে কবিরা ভক্তিরসের গঙ্গোদক ছিটাইয়া পবিত্র করিতে চাহিয়াছিলেন—কালিকামঙ্গলের ইহাই বাঁধা দস্তুর। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে যাঁহারা সেই বাঁধাপথের পথিক হইয়াছিলেন, তাঁহাদের প্রতিভার পাথেয় ছিল না। তাই তাঁহাদের স্থান পাঠকের সজীব মন নহে, বিবর্ণ পুঁথির তালিকা তাঁহাদের শেষ আশ্রয়।

এই শতাব্দীতে ব্রতকথা ধরনের আরও নানা প্রকার মঙ্গলকাব্য রচিত হইয়াছিল। তখন জীবন ও সমাজের স্বাভাবিক স্রোত বদ্ধ হইয়া গিয়াছে। তাই বদ্ধ জলাশয়ের মতো তথাকথিত মঙ্গলকাব্যে শুধু পঙ্কস্তর জমিয়া উঠিতেছিল। সূর্য, পঞ্চানন, গঙ্গা, সারদা, লক্ষ্মী, ষষ্ঠী, শনি প্রভৃতি পৌরাণিক ও লৌকিক দেবদেবীকে অবলম্বন করিয়া ছোট ছোট পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তন্মধ্যে কয়েকটি মুদ্রণ-সৌভাগ্যও লাভ করিয়াছে—যথা রামজীবন বিদ্যাভূষণের সূর্যমঙ্গল (সা. প. পত্রিকা, ১৩শ খণ্ড), দুর্গাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের 'গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী' (১৮শ শতাব্দীর শেষভাগে রচিত), দয়ারামের সারদামঙ্গল, নরোত্তমের লক্ষ্মীমঙ্গল, রুদ্ররামের ষষ্ঠীমঙ্গল—এগুলির সাহিত্যগুণ নগণ্য। মাঝে মাঝে দু' একটি রূপকথা ইহাতে কাহিনী হিসাবে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু সে সমস্ত বালক-ভুলানো গল্প শুধু স্ত্রীসমাজেই প্রচলিত ছিল, সাহিত্যরসিক সমাজে বড় কেহ তাহার খোঁজ রাখিত না। ঊনবিংশ শতাব্দীর আলোকিত যুগেও এই ধারা গ্রামাঞ্চলে বহুকাল প্রবাহিত ছিল, শনি ও লক্ষ্মীর পাঁচালী এখনও মুদ্রিত হইয়া গ্রামে গ্রামে

বিক্রয় হয়। শনির কোপদৃষ্টি হইতে বাঁচিবার জন্য এবং ধনেপুত্রে লক্ষীলাভের জন্য এখনও ভক্তিমতী মহিলারা এই দেবদেবীর ব্রতপূজা করিয়া থাকেন। শনি, লক্ষী ও সত্যনারায়ণ—এই তিনজনের পূজা-উপাসনা এখনও বেশ জনপ্রিয়। কিন্তু আধুনিক জীবনের আঘাতে এই সমস্ত অর্ধ-গ্রামীণ সংস্কার ক্রমেই অবলুপ্তির পথে চলিয়াছে।

যাহা হউক এই সমস্ত পাঁচালী-ব্রতকথা-মঙ্গলকাব্য শ্রেণীর পুঁথিগুলির বিশেষ কোন সাহিত্যমূল্য না থাকিলেও বাঙালীর যথার্থ মানসিক বিকাশ জানিতে হইলে এই সমস্ত তুচ্ছ রচনারও বিশ্লেষণ হওয়া উচিত—তবে সে কাজে সাহিত্যের ইতিহাস অপেক্ষা সমাজবিজ্ঞানের আলোচনায় অধিকতর সুষ্ঠুরূপে সমাধা হইতে পারে।

এইস্থানে আমরা অষ্টাদশ শতাব্দীর মঙ্গলকাব্যের কথা সমাপ্ত করিলাম। এই শতাব্দীর মধ্যভাগ হইতে বাংলার রাষ্ট্রব্যবস্থা, সমাজজীবন, অর্থনীতির স্বরূপ ও জীবনপ্রতীতির দ্রুত পরিবর্তনের ফলে মধ্যযুগীয় সংস্কারের প্রতীক মঙ্গলকাব্য ধরনের রচনা কোনও প্রকারে আত্মরক্ষার চেষ্টা করিলেও, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে ইহাদের আয়ুর পরিধি ক্রমেই সঙ্কুচিত হইতে লাগিল। তখন কালিকা, চণ্ডী, মনসা, ধর্ম, শনি, লক্ষ্মী, শীতলা, বাসুলীর স্থলে আধুনিক জীবনের নানা প্রশ্ন, সমস্যা, জটিলতা বাঙালী-মানসকে নব নব অভিজ্ঞতার আঘাতে উচ্চকিত করিয়া তুলিল। অবশ্য তখনও গ্রামের চণ্ডীমণ্ডপে, নাটমন্দিরে, বারোয়ারীতলায় এই সমস্ত দেব-দেবীর পূজানুষ্ঠান, মঙ্গলগান, পাঁচালী গান হইতেছিল বটে, কিন্তু সহস্র দীপালোকিত কলিকাতার নাগরিক জীবনে সেই ধ্বনিতরঙ্গ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া অবশেষে মিলাইয়া গেল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের নাগরিক জীবনে তবু খানিকটা মধ্যযুগীয় স্পর্শ ছিল। কিন্তু শেষার্ধে ইংরাজ রাজত্বের বনিয়াদ রচনার যুগে কলিকাতা নগরীর রূপসজ্জার সম্পূর্ণ পরিবর্তন হইল। বণিক-রাজের কেন্দ্রভূমি কলিকাতায় তখন আখড়াই, হাপ-আখড়াই, কবিগান, টপ্পা, যাত্রা ও আধুনিক পাঁচালীর বান ডাকিয়াছে। ভক্তিরস নহে, পারত্রিক কল্যাণ নহে–বণিক, মুৎসুদ্দি, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সাধারণ কর্মচারী, হীনবৃত্তিজীবী সাধারণ লোক তখন দুইদণ্ডের জন্য আমোদের উত্তেজনা চাহিতেছিল। নাগরিক জীবনের আবিল কল্লোলে মধ্যয়

মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীরা ক্রমেই ক্ষীণকণ্ঠ হইয়া পড়িলেন, অবশেষে সম্পূর্ণ নীরব হইয়া গেলেন। তারপর আরম্ভ হইল নব যুগ—নব জীবনের এক অভিনব ইতিবৃত্ত—উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ ভাগ।

২

অ নু বা দ সা হি ত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে মৌলিক অনুবাদ-সাহিত্যের সংখ্যা খুবই অল্প, গুণগত উৎকর্ষ আরও অল্প - যদিও এই বিষয়ে অসংখ্য পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত অবলম্বনে রচিত অনুবাদধর্মী বহু পুঁথি এই শতাব্দীতে স্তূপাকার হইয়া উঠিতেছিল। কিছু কিছু বৈষ্ণবপুরাণ, কাব্য, তত্ত্ব ও গোস্বামীপ্রভুদের গ্রন্থাদি সংক্ষেপে অনূদিত হইতেছিল। বলিতে কি, অষ্টাদশ শতাব্দীতে অনুবাদ-সাহিত্য বাংলা সাহিত্যের বারো আনা অংশ অধিকার করিয়া রাখিয়াছিল। অবশ্য পূর্ব-শতাব্দীর রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের পুঁথির প্রচুর নকল এই শতাব্দীতে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কৃত্তিবাস ও কাশীরামই অধিকতর ভাগ্যবান, কারণ তাঁহাদের মহাগ্রন্থের পৃথক পৃথক পর্ব ও কাণ্ডের অসংখ্য পুঁথি বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষদ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, বিশ্বভারতীর পুঁথিশালায় রক্ষিত আছে। রামায়ণ ও মহাভারত বাঙালীর মনোভূমিকে সরস করিয়া রাখিয়াছে বলিয়া অধিকাংশ পুঁথিই এই দুই মহাগ্রন্থের নকল। ভাগবত পুরাণ বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের মধ্যে অধিকতর জনপ্রিয় ছিল বলিয়া উক্ত সম্প্রদায়ের কোন কোন লেখক ভাগবত বা ভাগবতধরনের বৈষ্ণব পুরাণ ও আখ্যানের কিছু কিছু ভাবানুবাদ করিয়াছিলেন। তবে পূর্বশতাব্দীর ভাগবত অনুবাদকগণের কাব্যই বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, ইহার বহু নকল হইয়াছিল, সেগুলি বৈষ্ণবগৃহে স্থান পাইয়াছিল। ভাগবতের বাহিরেও অনেক বৈষ্ণব গ্রন্থের বঙ্গানুবাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর বৈষ্ণবসমাজে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। নিম্নে এই সমস্ত অনুবাদ-সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

রামায়ণের অনুবাদ ও রামায়ণাশ্রয়ী রচনা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিচ্ছিন্নভাবে রামায়ণের অনেক পর্ব অনূদিত ও প্রচারিত হইয়াছিল, অবশ্য কৃত্তিবাসের রামায়ণ অধিক জনপ্রিয় হইয়াছিল— এই রামায়ণের পুরা ও বিচ্ছিন্ন কাণ্ডের পুঁথি প্রচুর পাওয়া গিয়াছে। তাই মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে কৃত্তিবাসী রামায়ণ বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। এমন কি অন্য কবির উৎকৃষ্ট রচনাও কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে—কৃত্তিবাসেব নামের এমনই মহিমা। কিন্তু আকাশে চন্দ্র-সূর্য থাকিলেও যেমন খদ্যোৎ স্বল্পতম আলো দিয়া ধন্য হয়, তেমনি কৃত্তিবাসী রামায়ণ সত্ত্বেও স্বল্প প্রতিভাবিশিষ্ট কয়েকজন কবি বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণের কিয়দংশ বা সম্পূর্ণ ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাঁহাদের গ্রন্থগুলি অঞ্চলবিশেষে কিছু জনপ্রিয়-ও হইয়াছিল। তাহা না হইলে ইঁহাদের কাব্যের পুরা বা বিচ্ছিন্ন অংশের একাধিক পুঁথি মিলিয়াছে কেন? যাঁহাদের রচনার কোন দিক দিয়াই কোন গৌরব নাই, এখানে অনর্থক তাঁহাদের পরিচয় দিয়া ভিজা কম্বল বেশী ভারী করিবার প্রয়োজন নাই। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর এমন কয়েকজন রামায়ণকাবের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে—যাঁহাদের যৎকিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভা ছিল।

১. **শঙ্কর কবিচন্দ্রের রামায়ণ ॥** ইতিপূর্বে ভাগবত প্রসঙ্গে আমরা শঙ্কর কবিচন্দ্র সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিয়াছি। বিষ্ণুপুরের প্রসিদ্ধ ভূস্বামী রাজা রঘুনাথের (দ্বিতীয়) রাজত্বকালের মধ্যে ১৭০২ খ্রীঃ অব্দে কবি শঙ্কর চক্রবর্তী বাল্মীকি ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে অতি সংক্ষেপে রামায়ণ পাঁচালী রচনা করিয়াছিলেন। কোথাও তিনি নিজের কাব্যকে 'রামলীলা' ("শঙ্কর রচিলা রামলীলা উপাখ্যান") কখনও-বা 'শ্রীরাম মঙ্গল' ("শ্রীরাম মঙ্গল দ্বিজ কবিচন্দ্র গায়") বলিয়াছেন। কবি শুধু অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বন করেন নাই, বাল্মীকি হইতেও অনেক কাহিনী গ্রহণ করিয়াছিলেন, কিছু কিছু রচনা তাঁহার নিজস্ব পরিকল্পনা হইতে সৃষ্ট। অবশ্য তাঁহার একখানিও পুরাপুঁথি পাওয়া যায় নাই। বিচ্ছিন্নভাবে 'অঙ্গদের রায়বার', 'কুম্ভকর্ণের রায়বার', 'শিবরামের যুদ্ধ' প্রভৃতি পালার অনেক পুঁথি মিলিয়াছে। আমাদের মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সপ্তকাণ্ড রামায়ণ ও অষ্টাদশ পর্বের

মহাভারত রচনা করিবার মতো মানসিক 'দম' বড় কাহারও ছিল না, তাই তাঁহারা দুই একটি পালার বেশী লিখিতে পারেন নাই। শঙ্কর কবিচন্দ্রেরও বিচ্ছিন্ন পালাগুলি অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল, পুরা কাব্য তিনি নিশ্চয়ই লিখিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার কোন সন্ধান পাওয়া যায় না।

কবি যে নিষ্ঠাসহকারে কোন বিশেষ সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ করেন নাই তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বাল্মীকি রামায়ণ, অধ্যাত্ম রামায়ণ, নিজস্ব কল্পনা প্রভৃতি মিশাইয়া কবি এই মিশ্রধরনের রামকাব্য লিখিয়াছেন। ইহা বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বিশেষভাবে প্রচারিত হইয়াছিল বলিয়া ইহার অপর নাম 'বিষ্ণুপুরী রামায়ণ'।[১] কবির রচনা সরল, কিন্তু প্রসাদগুণযুক্ত নহে। স্থানে স্থানে কৃত্তিবাসের রচনার সঙ্গে তাঁহার অনেক রচনা মিশিয়া গিয়াছে—যেমন শিবরামের যুদ্ধ ও অঙ্গদের রায়বার। প্রাচীন কৃত্তিবাসী পুঁথিতে এই দুই পালা পাওয়া যায় না। কবিচন্দ্রের রচনা দুইটি নকলনবিশ বা রামায়ণগায়কদের কৃপায় কৃত্তিবাসের পুঁথিতে প্রবেশ করিয়াছে। অঙ্গদের রায়বার, কবিচন্দ্রের রঙ্গরস ও ব্যঙ্গকৌতুকের সার্থক দৃষ্টান্ত। কবিচন্দ্র প্রতিভার দিক দিয়া কখনোই কৃত্তিবাসের সমকক্ষ নহেন, কিন্তু তাঁহার রচনার কোন কোন অংশ কৃত্তিবাসের সমতুল্য তাহা স্বীকার করিতে হইবে। দুই-এক স্থলে তাঁহার আন্তরিক উক্তি বেশ হৃদয়গ্রাহী হইয়াছে। বনবাসে কত কষ্ট ভয়, বনগমনের পূর্বে রামচন্দ্র তাহা সীতাকে বুঝাইতে আসিলে তিনি বলিলেন:

অমৃত সমান মোর না হইবে ক্লেশ।
ব্যাঘ্র ভল্লুক আদি না করিব দ্বেষ॥
বাকল অজিন মোর পট্টের বসন।
তৃণপত্র শয্যা মোর পালঙ্গ যেমন॥
তোমা ছাড়া একদণ্ড রহিতে নারিব।
চৌদ্দ বৎসর নাথ কি করা৷ গোঙাব॥

এই উক্তিতে বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই বটে, কিন্তু সহজ প্রাণের সাদা কথা পাঠকের মনকে সহজেই আকর্ষণ করে। কবিচন্দ্র শঙ্কর রামায়ণ রচনায় বিশেষ কোন উৎকৃষ্ট ঐতিহ্য সৃষ্টি করিতে না পারিলেও রামায়ণের কোন

১. মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙ্গালা সাহিত্য, ২য়, পৃ. ১৪৭

কোন কাহিনী সরল ভাষায় রচনা করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিষ্ণুপুর অঞ্চলে বেশ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিলেন।

২. জগদ্রামের রামায়ণ ॥ পিতা জগদ্রাম (জগৎরাম) ও পুত্র রামপ্রসাদ দুইজনে যৌথভাবে অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে রামায়ণ রচনা করেন। রামায়ণের কাহিনী অবলম্বনে 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' শীর্ষক আর একখানি কাব্যেও পিতা-পুত্রের ভণিতা দেখা যায়। জগদ্রাম-রামপ্রসাদের রামায়ণ মুদ্রিত হইয়াছে[২] বলিয়া ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর অন্যান্য রামায়ণকারের মতো বিস্মৃত হইয়া যান নাই। তাঁহার রামায়ণ কাব্যে ('অদ্ভুত রামায়ণ') তিনি সবিস্তারে নিজের পরিচয়, বংশপরিচয়, গ্রন্থরচনার সন-তারিখ প্রভৃতি উল্লেখ করিয়াছেন। তখন মধ্যযুগীয় ভাবধারার দ্রুত অবসান হইতেছিল। কর্নওয়ালিস-প্রবর্তিত চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে দেশের ভূমিরাজস্ব ও অর্থনৈতিক কাঠামোরও পরিবর্তন ঘনাইয়া আসিতেছিল। কলিকাতা ও ইহার চতুষ্পার্শ্বে আধুনিক ভাবাবেগ বহিতে আরম্ভ করিয়াছে, কিছু কিছু ছাপাখানার কাজকর্ম চলিতেছে, তাহা হইতে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর বিজ্ঞাপন, ইস্তাহার, আইনের তর্জমা প্রভৃতি মুদ্রিত হইতেছে—অজ্ঞাতকুলশীল কলিকাতা নগরী ধীরে ধীরে নব রঙ্গমঞ্চের পাদপ্রদীপের তলে আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এই যুগসন্ধিক্ষণে বর্ধমানের ভুলুই গ্রামে (দামোদর নদের তীরে পঞ্চকোটের রাজা রঘুনাথ রায়ের জমিদারী) জগদ্রাম রায় (বন্দ্যোপাধ্যায়)[৩] জ্যেষ্ঠপুত্র রামপ্রসাদের সহায়তায় বাল্মীকি, অধ্যাত্ম, অদ্ভুত ও কৃত্তিবাসী রামায়ণ হইতে উপাদান ও আদর্শ গ্রহণ করিয়া বিরাট আকারের রামায়ণ রচনা করেন। কবির জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরামের আদেশেই এই কাব্য রচিত হয়।[৪] কবির তিন পুত্র—রামপ্রসাদ, কৃষ্ণপ্রসাদ,

২. কালীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রকাশিত।

৩. বিপ্রবংশ বন্দ্যঘটী ভুলুই গ্রামেতে বাটী
জগত রচিল মহাকাব্য।

৪. পিতা রঘুনাথ রায় মাতা শোভাবতী। দোঁহে জন্মদাতা আমি অধম অকৃতী॥
সে দোঁহার পাদপদ্মে নতি বহুবার। জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা জিতরাম পদে নমস্কার॥
তাঁহার আদেশে হৈল এ গ্রন্থ রচনা। নিরন্তর তাঁর পদ করিয়ে বন্দনা॥

রামনারায়ণ। জ্যেষ্ঠ রামপ্রসাদ পিতার মতোই কবিত্বশক্তিসম্পন্ন ছিলেন, পিতার গ্রন্থে তাঁহারও দান বড় কম নহে।

কবি জগদ্রাম পুত্রের সহযোগিতায় ১৭১২ শকে (১৭৯১ খ্রীঃ অঃ) রামায়ণ রচনা করেন।[৫] অবশ্য এই সনতারিখ সম্বন্ধে একটু সন্দেহ আছে। কারণ পিতাপুত্র মিলিয়া 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' শীর্ষক রামায়ণ বিষয়ক যে কাব্য লিখিয়াছিলেন, তাহা বৃহৎ রামায়ণের পূর্বে ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খ্রীঃ অঃ) রচিত হইয়াছিল।[৬] ইহাতে পুত্র রামপ্রসাদ কিন্তু রামায়ণের উল্লেখ করিয়াছেন:

পিতা জগৎ রাম মোর রামপরায়ণ।
যেঁহ কাব্য রচিল অদ্ভুত রামায়ণ॥

সুতরাং 'দুর্গাপঞ্চরাত্রে' (১৬৯২ শক—১৭৭০ খ্রীঃ অঃ) যখন রামায়ণের উল্লেখ রহিয়াছে, তখন এইরূপ সিদ্ধান্ত করিতে হয় যে, উক্ত রামায়ণ 'দুর্গাপঞ্চরাত্রের' পূর্বে অর্থাৎ ১৬৯২ শকের পূর্বে রচিত হইয়াছিল। এই বিষয়ে সাহিত্যের ইতিহাসকারগণ কিছু গোলে পড়িয়াছেন। মণীন্দ্রমোহন বসু সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া অনুমান করিয়াছেন—'দুর্গাপঞ্চরাত্রে'র "গ্রন্থ-রচনার তারিখ সম্বন্ধে সন্দেহ উপস্থিত হয়।"[৭] কাশীবিলাস বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা ১৩০৮ সনে দুর্গাপঞ্চরাত্রের পুঁথি মুদ্রিত করিয়াছিলেন। তাহাতে কিন্তু সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩০২) প্রকাশিত 'ভুজ-রন্ধ্র-রস-চন্দ্র' ইত্যাদি শ্লোকটি মুদ্রিত হয় নাই। এইজন্য মণীন্দ্রমোহন বসু মহাশয় সিদ্ধান্ত করিয়াছিলেন—দুর্গাপঞ্চরাত্রের সমস্ত পুঁথিতে ঐ সন ছিল না। আবার কেহ কেহ দুর্গাপঞ্চরাত্রের সনকেই প্রামাণিক বলিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, ১৭১২ শকে (১৭৯১) রামায়ণ সমাপ্ত হইয়াছিল বলিয়া রামায়ণে পুত্র রামপ্রসাদ যে শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন, আসলে তাহা পিতার সমাপ্তিসূচক

৫ সপ্তদশ শতাব্দে দ্বাদশ যুক্ত তাথে। ফাল্গুনের শুক্লপক্ষ তিথি পঞ্চমীতে।
উনত্রিশ দিবসে বারেতে বৃহস্পতি। জন্মভূমি ভুলুই গ্রামেতে করি স্থিতি॥

ইহা হইতে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মহাশয় (প্রবাসী, ১৩৩৬, পৃ. ৩৫০-৫১) ১৭১২ শক ২৯শে ফাল্গুন এই তারিখ গণিয়া বাহির করিয়াছেন।

৬ দুর্গাপঞ্চরাত্রিতে পুত্র রামপ্রসাদ বলিয়াছেন—"ভুজরন্ধ্র রসশকে"—অর্থাৎ ১৬৯২ শকে (১৭৭০ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। সা-প-প, ১৩০২

৭ মণীন্দ্রমোহন বসু—বাঙলা সাহিত্য, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৫৩

শ্লোক নহে। পুত্র পিতার রামায়ণ রচনার অনেক পরে (অন্ততঃ বিশ-বাইশ বৎসর পরে) রামায়ণের বাকি অংশ সমাপ্ত করেন।[৮]

জগদ্রাম অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে তাঁহার রামায়ণকে আট কাণ্ডে বিভক্ত করেন—আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, লঙ্কা, পুষ্কর এবং উত্তরকাণ্ড। কেহ কেহ গ্রন্থোক্ত 'রামরাস'কে পুষ্কর ও উত্তরকাণ্ডের মধ্যে স্থাপন করিয়া আটের স্থলে নয় কাণ্ড স্থির করিয়াছেন। যাহা হউক জগদ্রাম আটকাণ্ডই রচনা করিয়াছিলেন—কিন্তু কৃত্তিবাসের কাব্যে লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড বিস্তৃতভাবে বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া তিনি উহা সংক্ষেপে রচনা করেন, পরে পুত্র রামপ্রসাদকে ঐ দুই কাণ্ড সবিস্তারে লিখিতে আদেশ দেন। পুত্র সেই প্রসঙ্গে উক্ত রামায়ণের এক স্থানে বলিয়াছেন :

পিতা জগদ্রাম মোরে রামলীলা বর্ণিবারে
উপদেশ দিলেন যেমতে ॥
সীতারাম লীলা নব্য রচিলা সুন্দর কাব্য
শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ নাম।
অদ্ভুত অধ্যাত্ম মত একত্র করিয়া যুত
রচনা বিবিধ রসধাম ॥
তারপর জ্ঞাত করি লঙ্কাকাণ্ড পরিহরি
সংক্ষেপেতে করিলা বর্ণন।
লঙ্কাকাণ্ড সুপ্রকাশ রচিলা সে কৃত্তিবাস
বিস্তারে শুন্যছে সর্ব্বজন।
এই মনে করি পিতা ছাড়িয়া লঙ্কার কথা
অদ্ভুত প্রসঙ্গে দিলা মন ॥
লঙ্কা ও উত্তর কাণ্ড যেমত অমৃত ভাণ্ড
সংক্ষেপে বর্ণন আছে ইথে।
মোর লৈয়া অনুমতি বিস্তার করিয়া অতি
রচনা করহ রামপ্রীতে ॥

ইহাতে দেখা যাইতেছে, জগদ্রাম প্রথমে পুত্রের সহযোগিতায় রামায়ণ রচনা করেন নাই। তিনি অধ্যাত্ম ও অদ্ভুত রামায়ণ অবলম্বনে সর্বপ্রথম ('দুর্গাপঞ্চরাত্র' রচনার পূর্বে) একক চেষ্টার দ্বারা, 'শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করেন। কৃত্তিবাস লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড সবিস্তারে লিখিয়াছিলেন বলিয়া

৮. ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি, ১ম (অপরার্ধ), পৃ. ৪১১-৪১২

জগদ্রাম ঐ দুই কাণ্ড সংক্ষেপে বর্ণনা করেন, কিন্তু তৎস্থলে পুষ্করকাণ্ড ও 'রামরাস' রচনা করেন। পুষ্করকাণ্ডে অদ্ভুত রামায়ণ অনুসৃত হইলেও 'রামরাস' কবির মৌলিক রচনা—বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবে পরিকল্পিত। এই সমস্ত তথ্য হইতে মনে হইতেছে, কবি জগদ্রাম অদ্ভুত ও অধ্যাত্মরামায়ণ অবলম্বনে পুরা মাপেই রামায়ণ রচনা করেন, কিন্তু লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ড সম্বন্ধে বিশেষ কিছু লিখেন নাই। পরে পুত্র কবিত্বশক্তি অর্জন করিলে তিনি তাঁহার সহযোগিতায় 'দুর্গাপঞ্চরাত্র' রচনা করেন। হয়তো পুত্রের কবিত্বশক্তিতে খুশি হইয়া পিতা নিজে রামায়ণে সংক্ষেপে বর্ণিত লঙ্কা ও সুন্দরাকাণ্ড সবিস্তারে লিখিতে আদেশ করেন। পুত্র পিতার নির্দেশক্রমে এই দুই কাণ্ড সবিস্তারে রচনা করিয়াছিলেন—১৭১২ শক (১৭৯১ খ্রীঃ অঃ) পুত্রের কাব্য-সমাপ্তির তারিখ। এইরূপ অনুমান অনেকটা যুক্তিসঙ্গত। অবশ্য জগদ্রাম কবে তাঁহার রামায়ণ রচনা সমাপ্ত করেন তাহার কথা কিছু বলেন নাই। তাঁহার রামায়ণের শেষে পুত্রের কাব্য সমাপ্তির তারিখটিকেই অনেকে জগদ্রামের রামায়ণ সমাপ্তির তারিখ মনে করেন এবং সেইজন্য 'দুর্গাপঞ্চ-রাত্রে'র রচনাকালের সঙ্গে রামায়ণ রচনার সনতারিখ মিলাইতে পারেন না। যাহা হউক এই বিষয়ে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করাই যুক্তিসঙ্গত—জগদ্রামের একক প্রচেষ্টায় লেখা রামায়ণের অধিকাংশ 'দুর্গাপঞ্চরাত্রের' পূর্বেই সমাপ্ত হইয়াছিল, বাকি অংশ পুত্র রামপ্রসাদ বিশ-বাইশ বৎসর পরে ১৭১২ শকে সমাপ্ত করেন।

জগদ্রাম দেখিয়াছিলেন, প্রধানতঃ বাল্মীকি অবলম্বনে রচিত কৃত্তিবাসী রামায়ণ জনসমাজে অধিকতর প্রচার লাভ করিয়াছিল। তাই তিনি বাল্মীকির পথ পরিত্যাগ করিয়া অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণ অবলম্বনে 'শ্রীঅদ্ভুত রামায়ণ' রচনা করিলেন। মুদ্রিত গ্রন্থে আদি, অযোধ্যা, অরণ্য, কিষ্কিন্ধ্যা, সুন্দর, পুষ্করকাণ্ড এবং 'রামরাসে' জগদ্রামের ভণিতা এবং লঙ্কা ও উত্তরকাণ্ডে পুত্র রামপ্রসাদের ভণিতা দৃষ্টে পিতাপুত্রের কতটুকু অংশ তাহা সহজেই নির্দেশ করা যায়। জগদ্রাম অদ্ভুত রামায়ণ হইতে এই কাহিনী গ্রহণ করেন—পৃথিবী ও দেবতাদের প্রার্থনায় রাবণবধের জন্য নারায়ণের চারি অংশে দশরথের চারি পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ হইতে আরম্ভ করিয়া সেতুবন্ধে শিবস্থাপনা পর্যন্ত অংশ মোটামুটি অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গৃহীত। ইহার পরে

লঙ্কাকাণ্ড হইতে রামের অযোধ্যায় প্রত্যাবর্তন ও অভিষেক পর্যন্ত অংশ পুত্র রামপ্রসাদের রচনা। পুষ্করকাণ্ডের কাহিনী জগদ্রাম অদ্ভুত রামায়ণ হইতে গ্রহণ করেন। অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে তিনি রামের সভায় অগস্ত্যের আগমন ইত্যাদি কাহিনী সংগ্রহ করেন। রামপ্রসাদও অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতে লঙ্কাকাণ্ডাদির কাহিনী লইয়াছিলেন।

কবিদ্বয় অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রধান প্রধান ঘটনা যথাসম্ভব সংক্ষেপে বর্ণনা করিলেও পুঁথি নানা ঘটনা ও তত্ত্বকথায় বিরাট আকার ধারণ করিয়াছে। দুইজনেই নানাস্থান হইতে উপাদান সংগ্রহ করিয়া প্রচলিত রামসাহিত্যের এক নূতন রূপ দিতে চাহিয়াছিলেন বটে, কিন্তু যথেষ্ট শক্তি ও পাণ্ডিত্য সত্ত্বেও ইহাতে বিশেষ কোন প্রশংসনীয় কাব্যগুণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সেইজন্য কৃত্তিবাসের তুলনায় এই কাব্য কিছু নীরস মনে হয়। বাল্মীকির রামায়ণ ছাড়াও অদ্ভুত ও অধ্যাত্ম রামায়ণের প্রতি তৎকালীন বাঙালী পাঠক ও কবিসমাজের কিরূপ কৌতূহল সঞ্চারিত হইয়াছিল তাহা এই রামায়ণ হইতেই বুঝা যাইবে। অদ্ভুত রামায়ণের অদ্ভুত গল্প (যেমন সীতাকর্তৃক সহস্রশীর্ষ রাবণ বধ) এবং অধ্যাত্ম রামায়ণে বর্ণিত যোগদর্শনাদির তত্ত্বকথা সমাজের উপরিতলে বেশ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। আর একটা কথা—'রামরাস' শীর্ষক বিচিত্র মৌলিক রচনাটি জগদ্রামের কবিপ্রতিভার আর একটি দৃষ্টান্ত। চৈতন্যযুগের পর সমাজের নানাস্তরে বৈষ্ণব প্রভাব ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। শাক্ত সাহিত্য, রামায়ণ, মহাভারতাদির অনুবাদে এই প্রভাব বিশেষভাবে লক্ষ্য করা যাইবে। জগদ্রামও সেই বৈষ্ণব প্রভাবের বশে 'রামরাস' শীর্ষক একটি অপ্রাসঙ্গিক উপচ্ছেদ যোগ করিয়াছিলেন। ইহাতে আছে, অগস্ত্য মহাদেবের কাছে গিয়া বলিলেন যে, পূর্বে হনুমান রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যলীলা বর্ণনা করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু কেহ তো শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্যলীলা বর্ণনা করেন নাই। অগস্ত্য মহাদেবের নিকট রামের মাধুর্যলীলা শুনিতে চাহিলে মহাদেব কবুল জবাব দিয়া বলিলেন যে, তিনিও শুধু রামচন্দ্রের ঐশ্বর্যলীলাই জানেন ("ঐশ্বর্য প্রকট লীলা জ্ঞাত হই আমি")। কিন্তু—

মাধুর্য নিগূঢ়তত্ত্ব অতি গুপ্ততম।
পুরুষের ব্যক্ত নহে মাধুর্যের ক্রম।

নারীভাব হইয়া ভজয়ে যেই পাত্র।
মাধুর্য রসের বেত্তা সেই হয় মাত্র॥

সেই মাধুর্য রসের ভাণ্ডারী হইলেন হনুমান। তখন অগস্ত্য শিবের নির্দেশে হনুমানের কাছে আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রের মাধুর্য লীলা শুনিতে চাহিলে হনুমান সেই লীলা ব্যাখ্যা করিলেন। সরযূর তীরে সখীসহ রামচন্দ্রের রাসলীলাই এই বর্ণনার মূল প্রতিপাদ্য বিষয়। বলাবাহুল্য জগদ্রাম বৈষ্ণবপদাবলীর প্রভাবে এই বিচিত্র রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন—কিন্তু প্রতিভার স্বল্পতার জন্য বৈষ্ণব রাসলীলাকে রাম-রাসলীলার সঙ্গে মিলাইতে পারেন নাই। উত্তর ভারতে রামচন্দ্রকে অবলম্বন করিয়া বাৎসল্য ও ভক্তিরসের ধারা প্রাদেশিক সাহিত্যে প্রবাহিত হয়, তুলসীদাস গোস্বামী তাহার ভাণ্ডারী। তাহার কাব্যরস ও ভক্তিরস অতি অপূর্ব। কিন্তু জগদ্রাম তুলসীদাসের মতো কবিত্বের অধিকারী ছিলেন না। কাজেই রামচরিত্রে রাসলীলা প্রয়োগ করায় রসসৃষ্টিতে ব্যাঘাত ঘটিয়াছে। বৈষ্ণব পদাবলীর প্রতি অত্যন্ত আকর্ষণের জন্যই কবি নিষ্প্রয়োজনে রামরাস রচনা করিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা জানিয়া রাখা ভাল। লঙ্কাকাণ্ডে কবির বর্ণনায় আছে, ইন্দ্রজিতের স্ত্রী বীর্যবতী সুলোচনা সখীদের সঙ্গে লঙ্কায় প্রবেশ করিতে যাইতেছে। মাইকেল মধুসূদনের প্রমীলা চরিত্রের সঙ্গে, বিশেষতঃ লঙ্কা প্রবেশের বর্ণনার সঙ্গে রামপ্রসাদের লঙ্কাকাণ্ডের সুলোচনা চরিত্রের বেশ মিল আছে।[১] মাইকেলের মেঘনাদবধের এক শতাব্দী পূর্বে এই রামায়ণ রচিত হইয়াছিল, কিন্তু মুদ্রিত হয় নাই, প্রচারও অতিশয় সীমাবদ্ধ ছিল। অথচ এরূপ সাদৃশ্য কি করিয়া সম্ভব হইল তাহা চিন্তার বিষয় বটে।

১. এ বিষয়ে দীনেশচন্দ্র বলিয়াছেন, "But on reading the account given by the two poets one cannot but conclude that Madhusudana must have read this portion of Jagat Ram's Ramayana. The character of Sulochana and Pramila have not only a family likeness, but the grandeur of the processions led by the two heroines bear a close affinity to each other." D. C. Sen—*Bengali Ramayanas*, p. 25.

এ কাব্য সম্বন্ধে মধুসূদনের কিছু জানা সম্ভব ছিল না, কারণ তখন ইহা মুদ্রিত হয় নাই। কেহ ইহার সম্বন্ধে কোন সংবাদই রাখিতেন না। কিন্তু এরূপ সাদৃশ্যের কারণ কি, তাহা ব্যাখ্যা করা যায় না।

'দুর্গাপঞ্চরাত্র'-ও পিতাপুত্র দুইজনের রচনা। রামচন্দ্র কর্তৃক শরৎকালে অকালে দেবীর বোধন এই কাব্যের বিষয় লইয়া পাঁচপালায় সম্পূর্ণ এই কাব্যের প্রথম তিনপালা পিতার এবং শেষ দুই পালা পুত্রের রচিত। জগন্নাম আর একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন, ইহার নাম 'তত্ত্ববোধ'[১০]। এই তত্ত্বমূলক রূপককাব্যটির রচনাকাল কবি স্পষ্টই বলিয়া দিয়াছেন :

সতরশ নবম শকে পৌষ পূর্ণমাসী।
আত্মবোধ কহিব জগন্নাম দাসী॥

অর্থাৎ ১৭০৯ শকে (১৭৮৭ খ্রীঃ অঃ) এই কাব্য রচিত হয়। এই কাব্যে কবি পূর্বে-রচিত রামায়ণেরও উল্লেখ করিয়াছেন :

এই স্থলে বসি ভাবি শ্রীরামচরণ
রামকাব্য এই স্থানে হল উদ্দীপন॥

রামভক্ত কবি রূপকার্থে মনের অধ্যাত্মমার্গে উত্তরণের কথা বলিয়াছেন। দ্বাদশ উল্লাস বা অধ্যায়ে বিভক্ত এই রূপককাব্যে নানাবিধ তত্ত্বগ্রন্থ, বিশেষতঃ বৈষ্ণবদর্শন, কাব্য ও তত্ত্বদর্শন হইতে প্রচুর সাহায্য লইয়াছিলেন। বৈষ্ণব আবহাওয়ায় মানুষ হইয়া কবি রামচন্দ্রকেই আরাধ্য ইষ্টদেবতা বলিয়া গ্রহণ করিয়াছিলেন—অবশ্য বৈষ্ণবীয় ভাবই তাঁহাকে রামভক্তে পরিণত করিয়াছে। মনের দুই পত্নী—সুমতি ও কুমতি। সুমতির সুপুত্র ও কুমতির কুপুত্রদের কলহ কোন্দল, সুমতি-কুমতির দ্বন্দ্ব—পরিশেষে চিত্তের সংশয় নাশ এবং রামচন্দ্রের কৃপায় সমস্ত নরনারীর মধ্যে 'রসরাজ' রামচন্দ্রের উপলব্ধির পর এই তত্ত্বকাব্য শেষ হইয়াছে। কবি যে নানা তত্ত্বদর্শনে প্রাজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। এমন কি বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বও তিনি জানিতেন, সেই আদর্শে তিনি রামচন্দ্রকে এক বিচিত্রভাবে (প্রকৃতিভাবে) ভজনার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তাঁহার মতে "প্রকৃতি-আশ্রয় বিনা এ জলা না যায়," এবং—

প্রকৃতি স্বরূপে রাম দেখ বর্তমান।
রসরাম[১১] স্ত্রীপুরুষ দেহে অধিষ্ঠান।

সহজিয়া বৈষ্ণবদের মতো কবি দেহকে অবলম্বন করিয়া ইহার মধ্যে রামচন্দ্রকে উপলব্ধি করিতে চাহিয়াছেন :

১০. তত্ত্ববোধ—ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল সম্পাদিত দ্বিতীয় সংস্করণ (১৩৬১)
১১. ইহা কি সহজিয়াদের 'রসবীজ' বা রসরাজ সাধনা?

এই সর্ব্ব অবয়ব কলেবরখানি।
এই দেহরূপ মধ্যে রামবস্তু চিনি॥
দেহালয় দেবালয় বেদে সত্য কয়।
এই দেহ যে জানে সেই আনন্দে ভাসয়॥

বৈষ্ণব সাহিত্য ও ধর্ম যেমন সহজিয়াদের কবলিত হইয়াছিল, তেমনি কবি কি এখানে রামভক্তিবাদের সঙ্গে সহজিয়া দেহবাদ মিশাইতে চাহিয়াছেন?[১২] তাঁহার রামায়ণের অন্তর্ভুক্ত 'রামরাসে' যেন তাহার আভাস পাওয়া যাইতেছে।

জগৎরাম রামায়ণ কাহিনীকে যে রূপকের দৃষ্টিতে দেখিতেন তাহা 'আত্মবোধে' স্বীকার করিয়াছেন:

সেই দশরথ রাজা ত্রেতাযুগে গেছে।
আর দশরথ দেখ বর্ত্তমান কাছে॥
দশজন ইন্দ্রিয় তাহাতে যার গতি।
দশরথ বলিয়া মনের গুপ্ত খ্যাতি॥
মনকে আনন্দে রাখে সে কৌশল্যা হয়।
ভাবরূপা কৌশল্যা জানিহ নিশ্চয়॥
মন দশরথ আর ভাব কৌশল্যাতে।
দোঁহে যুক্ত হইলে রামের জন্ম তাতে॥
যথা রাম তথা সীতা সদা অবিচ্ছেদ।
হ্লাদিনী শক্তিরূপা যুক্তি বলে বেদ॥

কবি রূপকধর্মের অন্তরালে সুগভীর দার্শনিক তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন—এইরূপ আদর্শ তিনি বোধ হয় অধ্যাত্ম রামায়ণ হইতেই পাইয়াছিলেন। যাহা হউক, জগৎরাম অষ্টাদশ শতাব্দীর একজন উল্লেখযোগ্য কবি হইয়াও রচনাশক্তির নীরসতার জন্য বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিতে পারেন নাই।

৩. রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ॥ রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ অষ্টাদশ শতাব্দীর এক বিচিত্র বস্তু। যদিও কাব্যটির বিশেষ কোন সাহিত্য-গুণ

১২. এ সম্বন্ধে ডঃ সুকুমার সেন বলিয়াছেন, "জগৎরাম যে রামায়েত বৈষ্ণব হইয়াও রাগানুগা পদ্ধতির সাধক ছিলেন তাহার প্রমাণ ইহাতে প্রচুর আছে।" ডঃ সেনের এই অনুমান বাংলা সাহিত্যের এক অজ্ঞাতপূর্ব শাখার ইঙ্গিত দিতেছে। এই সম্বন্ধে অনুসন্ধান চালাইবার মতো উপাদান এখনও পাওয়া যায় নাই।

নাই, তবু কবির অদ্ভুত মনোভাবের জন্য তাঁহার কাব্য সম্বন্ধে ততটা না হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত সম্বন্ধে আমাদের মনে বিশেষ কৌতূহল সঞ্চারিত হয়। আবার রামানন্দ যতি বলিয়া আর একজন কবির রামায়ণ পাওয়া গিয়াছে। এই দুইজন এক ব্যক্তি না পৃথক ব্যক্তি তাহা লইয়াও বেশ জটিলতার জট পাকাইয়াছে।

রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ সম্বন্ধে প্রথম তথ্য উদ্ধার করেন নগেন্দ্রনাথ বসু প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়। ১৯১৮ সালে বর্ধমান জেলার অম্বিকা কালনা নিবাসী পশুপতি হাজরা নামে আগুরি সম্প্রদায়ের এক ভদ্রলোক নিকটবর্তী গ্রাম হইতে রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ উদ্ধার করিয়া তাহা নগেন্দ্রনাথকে দিয়াছিলেন। সাহিত্যপরিষদে রামানন্দের রামায়ণের দুইখানি পুঁথি আছে। তন্মধ্যে ১৯৬ সংখ্যক পুঁথিতে শুধু অযোধ্যা ও অরণ্য কাণ্ড আছে। পুঁথিটির লিপিকাল ১২৪১ সাল। ২৪৫ সংখ্যক পুঁথিটি উত্তরকাণ্ড বাদে প্রায় সম্পূর্ণ অবস্থায় আছে, ইহার লিপিকাল ১১৮৬-৮৭ সাল। এইটিই নগেন্দ্রনাথ বসু পশুপতি হাজরার নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। *Bengali Ramayans* গ্রন্থে দীনেশচন্দ্র এই পুঁথিটির কথাই বলিয়াছেন।

নগেন্দ্রনাথের পুঁথিটিও খণ্ডিত—যদিও লঙ্কাকাণ্ড পর্যন্ত প্রায় সমস্তই আছে। ইহাকে রামানন্দ 'নূতন রামায়ণ' বলিয়াছেন—"রামানন্দ রচিত নূতন রামায়ণ।"[১৩] খুব সম্ভব কবি অধ্যাত্ম রামায়ণ অথবা অদ্ভুত রামায়ণের[১৪] প্রভাবে এই নূতন রামায়ণ রচনা করেন। কবির আর কোন পরিচয় বা কাব্যরচনার সময় সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। কবি এক-স্থলে "বলেতে হামির হৈলা রূপেতে কন্দর্প"—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারও কাহারও মতে এই হামির হইতেছেন বিষ্ণুপুররাজ বীর হামবীর।[১৫] সুতরাং কবি সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে এই কাব্য রচনা করিয়াছিলেন

১৩. কবি কোথাও কোথাও 'রামলীলা'ও বলিয়াছেন।

১৪. নগেন্দ্রনাথের মতে ইহা অদ্ভুত রামায়ণের প্রভাবে রচিত হয় এবং মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে অধ্যাত্ম রামায়ণই কবির আদর্শ ছিল। এই সম্পর্কে 'হরপ্রসাদ-সংবর্ধন লেখমালা'র নগেন্দ্রনাথের 'বুদ্ধাবতার রামানন্দ ঘোষ' প্রবন্ধটি এবং মণীন্দ্রমোহনের 'বাংলা সাহিত্য' (২য় খণ্ড) দ্রষ্টব্য।

১৫. মণীন্দ্রমোহন বসু—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ১৪৬

বলিয়া মনে হয়। কবি নিজেকে একবার শূদ্র, আবার পরক্ষণেই দ্বিজ বলিতেছেন। নগেন্দ্রনাথ তাঁহাকে কায়স্থ বলিয়াছেন। দীনেশচন্দ্রের মতে সদ্‌গোপ বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তবে তিনি দ্বিজ ছিলেন বলিয়া মনে হয় না, তাহা হইলে নিজেকে কখনও শূদ্র বলিতেন না। ভাষা ও রচনা-ভঙ্গিমা দেখিয়া রামানন্দ ঘোষকে সপ্তদশ শতাব্দীর অনেক পরবর্তী মনে হইতেছে। বিশেষতঃ তাঁহার ব্যক্তিগত মতামত এমন বিচিত্র যে, তাঁহাকে আধুনিক কালের অব্যবহিত পূর্ববর্তী কবি বলাই সঙ্গত। তাঁহার রামায়ণ গ্রন্থ কিন্তু বিশেষ কোন কাব্যগুণান্বিত নহে। আমরা তাঁহার বিচিত্র মনোভাবের জন্যই এখানে একটু পৃথগ্‌ভাবে তাঁহার উল্লেখ করিতেছি।

গ্রন্থ মধ্যে নানা প্রসঙ্গে কবি অকপটে নিজ ধর্মমত, নৈতিক আদর্শ ও জীবনের পরিণাম সম্পর্কে এমন সমস্ত কথা বলিয়াছেন যে, মাঝে মাঝে তাঁহাকে অতিশয় তীক্ষ্ণ বুদ্ধির পণ্ডিত বলিয়া মনে হয়, কখনও-বা তাঁহার মত ও আদর্শের মধ্যে কোনও প্রকার সামঞ্জস্য খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কবির মন্তব্য হইতে মনে হইতেছে, তিনি কিছুকাল পুরীধামে জগন্নাথের ভক্তরূপে বাস করিয়াছিলেন। হিন্দুসমাজের উপর, বিশেষতঃ দারুব্রহ্মের উপর মুসলমানের অত্যাচার দূর করিবার জন্য মহাকালী বুদ্ধদেবকে অভিশাপ দিয়া মর্ত্যভুবনে পাঠাইয়া দেন। 'ঘোষপুত্রের' মতে তিনিই সেই অভিশপ্ত বুদ্ধদেব, যিনি ম্লেচ্ছশক্তির হস্ত হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া দারুব্রহ্মের (অর্থাৎ জগন্নাথদেবের) করে তাহা সমর্পণ করিবেন। তিনি বহুস্থলে নিজেকে বুদ্ধ অবতার বলিয়াছেন:

(১) আমি বুদ্ধ আমা অন্তে কল্কি অবতার।

(২) শূদ্রকুলে রামানন্দ জন্ম লয়েছিল।
বুদ্ধবেশ ধরি এবে তত্ত্ব লিখে গেল॥

(৩) কলিযুগে রামানন্দ বুদ্ধ অবতার।

প্রাচীন বুদ্ধ কালীর অভিশাপে আধুনিক বুদ্ধ-রামানন্দ আকার ধরিয়াছেন।[১৬]

১৬. মণীন্দ্রমোহন বসুর মতে "কবি নিজেকে 'বুদ্ধ' অর্থে 'জ্ঞানী' রূপেই প্রচারিত করিয়াছেন। তাঁহার অন্তর জ্ঞান জন্মিয়াছিল বলিয়াই তিনি নিজেকে 'বুদ্ধ' বলিয়াছেন।" (বা. সা. ইতি, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৪৫) কিন্তু কবি নানা স্থানে যেভাবে নিজেকে বুদ্ধের অবতার বলিয়াছেন, তাহাতে বুদ্ধশব্দ শুধু জ্ঞানী অর্থে লওয়া যায় না।

তিনি মনে করিয়াছিলেন কালীর শাপে মর্ত্যে জন্মাইয়া ম্লেচ্ছের হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইয়া দারুব্রহ্ম অর্থাৎ পুরীধামের জগন্নাথদেবকে দিবেন :

যবন ম্লেচ্ছের রাজ্য বলে কাড়ি লব।
একচ্ছত্র রাজা করি দারুব্রহ্মে দিব॥

এইজন্য পুনঃ পুনঃ কালীর কাছে প্রার্থনা করিয়াছেন, শাপের অবসানে তিনি যেন বুদ্ধ-অবতার রামানন্দ ঘোষকে মর্ত্য হইতে স্বস্থানে ফিরাইয়া লইয়া যান :

বুদ্ধ কহে কালি রহিবারে নারি।
স্বধাম আমার দান দেহ শীঘ্র করি॥

এই সমস্ত উক্তি হইতে দেখা যাইতেছে, বালসুলভ মনোভাবের অধিকারী 'ঘোষপুত্র' রামানন্দ নিজেকে যথার্থই বুদ্ধ-অবতার মনে করিতেন এবং কালিকার অভিশাপে তিনি মর্ত্যধামে অবতীর্ণ হইয়া ম্লেচ্ছ অধিকার হইতে দেশ উদ্ধার করিয়া জগন্নাথদেবের মহিমা বাড়াইতে আসিয়াছেন—ইহা তিনি সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতেন। বৌদ্ধধর্ম, শাক্ত ভক্তি ও রামোপাসনা—এই তিনপ্রকার ধর্মীয় মনোভাব তাঁহাকে প্রভাবিত করিয়াছিল। তিনি বৌদ্ধ দর্শন সম্বন্ধেও নিতান্ত অনভিজ্ঞ ছিলেন না।

এই যে শরীর দেখ জলবিম্ব প্রায়।
জলেতে উপজি বিম্ব জলেতে মিশায়॥
লোভ মোহ কাম ক্রোধ শরীর জড়িত।
ভবভয় ত্রাণ হবে ভজ লঙ্কাজিত॥

এখানে তিনি বৌদ্ধ নীতি-আদর্শের পটভূমিকায় রামচন্দ্রের ভজনা করিতে বলিয়াছেন। কখনও-বা কবি পঞ্চশক্তির উপাসনার কথাও বলিয়াছেন :

রাধা কালী লক্ষ্মী বাণী গঙ্গা গুণবতী।
পঞ্চশক্তি প্রকাশ করিব এই ক্ষিতি॥

কবি রামভক্ত হইয়াও বৈষ্ণব ধর্মের প্রতি ততটা অনুকূল ছিলেন না। একস্থানে তিনি স্পষ্টই বলিয়াছেন, "বিমল বৈষ্ণবী পূজা জগতে টুটাইব।" অর্ধোন্মাদের মতো তিনি নিজেকে কখনও স্বয়ং বুদ্ধদেব, কখনও কালিকার সেবক, পঞ্চশক্তির প্রচারক, কখনও-বা শুধু রামভক্ত বলিয়াছেন। কবির ধর্মমতের এইরূপ বিশৃঙ্খলার শেষ পরিণাম—নৈরাশ্যযন্ত্রণা ও ব্যর্থতার পীড়ন। কবি কেন যে হঠাৎ বুদ্ধ-অবতার বনিয়া গেলেন তাহা বুঝা

যাইতেছে না—দারুব্রহ্মের জন্ম তিনি স্বর্গমর্ত্যপাতাল তোলপাড় করিয়াছেন, কিন্তু জীবনের শেষ প্রান্তে পৌছাইয়া তিনি দেখিলেন তাঁহার অবতার গ্রহণ নিষ্ফল হইয়াছে। এই ব্যর্থতার বেদনা কয়েকস্থলে বেশ আন্তরিক হইয়াছে :

ক্ষুধায় না মিলে অন্ন পিয়াসে না পানি।
মিথ্যা ধন্দে গেল মোর দিবসরজনী॥

*   *   *

দারা ছাড়ি পাপভরা ভরিনু অপার।
অস্থিচর্ম্মসার কৈলা অভিশাপ তার॥
দারা সুত সুতা আর বন্ধু কেহ নাই।
অবশেষে কি হইবে নাহি মিলে ঠাই॥
কাল হইল কণ্টক কল্পনা রৈল মনে॥
না পূরিল চিত্ত-আশা কবে কোন জনে॥

এখানে কবি অকপটে নিজ জীবনাদর্শের ব্যর্থতা স্বীকার করিয়াছেন। জগন্নাথের পূজা করিয়া তাঁহার কোন লাভ হয় নাই। সুতরাং কাঠের ঠাকুর পূজিয়া কি লাভ? তাই তিনি নিজেকেই নিজে প্রশ্ন করিয়াছেন :

দারুব্রহ্মে সেবা করি জেরবার হৈল।
বৃথাকাষ্ঠ সেবি কাল কাটা নহে ভাল॥
বস্তুহীন বিগ্রহ সেবিয়া নহে কাজ।
নিজ কষ্ট দায় আর লোকমধ্যে লাজ॥

বড়ই কৌতুকের বিষয়, এই আধুনিক 'সম্বুদ্ধ' ব্যক্তিগত লাভ-লোকসানের ঊর্ধ্বে উঠিতে পারেন নাই, 'দারুভূতো মুরারি'র পূজা করিয়াছিলেন ঐহিক সুখের কামনায়। জগন্নাথ পূজা করিয়াও যখন তাঁহার দুঃখ ঘুচিল না, তখন তিনি কাষ্ঠ-বিগ্রহের সম্পর্ক ত্যাগ করিলেন। দেবোপাসনা সম্বন্ধে তাঁহার এই pragmatic মনোভাব একটু অদ্ভুত মনে হইতেছে। ঈশ্বর সম্পর্কে এই ধরনের নাস্তিক্যবাদ ও সংশয়ী মনোভাব আধুনিক কালের পূর্বে বাংলা সাহিত্যের কোথাও দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। ভারতচন্দ্র দেবদেবীকে লইয়া রঙ্গকৌতুক করিলেও দেবসত্তায় তাঁহার অবিশ্বাস বা সংশয় ছিল না। সেদিক হইতে রামানন্দ ঘোষ যথার্থ আধুনিক যুগের সূত্রপাত করেন। শুনা যায় তাঁহার কিছু শিষ্য ছিল। মনে হয় অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলাদেশে বৌদ্ধ প্রভাব গোপনে প্রবাহিত হইত। তাহা না হইলে কবি নিজেকে বুদ্ধ-

অবতার বলিবেন কেন? যাহা হউক রামানন্দ ঘোষের রামায়ণ কাব্যাংশে অকিঞ্চিৎকর হইলেও তাঁহার ব্যক্তিগত জীবনকথা ও বিচিত্র অভিমতের জন্ম তাঁহার সম্বন্ধে এখানে দুই-এক কথা বলিতে হইল।

রামায়ণরচনাকার হিসাবে আর-এক রামানন্দের নাম পাওয়া যাইতেছে। ১৩৫০ সনের সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় প্রাচীন পুঁথির বিবরণীতে রামানন্দ যতির রামায়ণের সংক্ষিপ্ত পরিচয় মুদ্রিত হয়।[১৭] ১৯৫ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ এই পুঁথিতে (সা প পুঁথি সংখ্যা-৫০) রামানন্দ যতির ভণিতা আছে। ইঁহার বহু শিষ্য ছিল—তাঁহার রামায়ণে সেইরূপ উল্লেখ আছে। এই রামায়ণ খুব সম্ভব গান করিবার জন্ম রচিত হইয়াছিল। ১৬৮৪ শকাব্দে (১৭৬২ খ্রীঃ অঃ) ইহা রচিত হয়—ইহাও অদ্ভুত রামায়ণের আদর্শে রচিত। কবির রচনা মধ্যম শ্রেণীর, উল্লেখযোগ্য সাহিত্যগুণ অতি অল্প। একটু দৃষ্টান্ত :

রামপদ মন নামে কাঁপে যম
চিদানন্দ অবতার।
দেবমুনিভয় শাসিত হৃদয়
ধ্রুব হইলা গুণাগার॥
মায়ারূপ ধরি রাবণ সংহরি'
দিলা মুক্তি পদধাম।
অহল্যার শাপ নিবারিয়া তাপ
মোরে দয়া কর রাম॥

কবির শিষ্যগণ গুরুর বিশেষ প্রশংসা করিয়াছেন। কবি যে সংস্কৃত সাহিত্য-দর্শনে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন তাহা রামায়ণের পুঁথি হইতে বুঝা যায়। তিনি অন্ততঃ চৌদ্দখানি সংস্কৃত গ্রন্থের টীকা করিয়াছিলেন।[১৮] ধর্মমতে তিনি রামায়েৎ বৈষ্ণব ছিলেন বলিয়া মনে হয়। অবশ্য তাঁহার শিষ্যেরা তাঁহাকে 'শচীসুতে'র সঙ্গে তুলনা দিয়াছেন।

১৭. সাহিত্যপরিষৎ পত্রিকায় বলা হইয়াছে, "গ্রন্থখানি সংক্ষিপ্ত রামায়ণ। ১৯৫ পত্রে সম্পূর্ণ। গ্রন্থকার সুকবি ও কৃতবিদ্য ছিলেন।" (সা. প. প. ১৩৫০)

১৮ উক্ত রামায়ণে এই কবির রচিত অনেকগুলি টীকার নাম উল্লিখিত হইয়াছে। যথা—গীতার টীকা, শান্তিশতক টীকা, ষটচক্রটীকা, মোহমুদ্গরটীকা, গায়ত্রীর টীকা, কুণ্ডতত্ত্বপ্রকাশিকা, তত্ত্বসার, জ্ঞানভৈরব, অদ্বৈতরহস্য, জ্ঞানাবলী, অধ্যাত্মসার, যোগসারাবলী, অত্যাচার নীর্ধিত প্রভৃতি।

রামানন্দ যতি একখানি চণ্ডীমঙ্গল কাব্যও লিখিয়াছিলেন। তাহার বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও দুই এক স্থল একটু উল্লেখযোগ্য। কাব্যের প্রারম্ভে তিনি তীক্ষ্ণ ভাষায় কবিকঙ্কণের কাব্যের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, মুকুন্দরাম বিশেষ অভিজ্ঞ ব্যক্তি ছিলেন না, তাঁহার চণ্ডীমঙ্গলে অনেক ভুলভ্রান্তি আছে। মুকুন্দরামের প্রতি দেবীর প্রত্যাদেশ রামানন্দ হাসিয়া উড়াইয়া দিয়াছেন। এই কবি মুকুন্দ-রামের দোষক্রটি হইতে চণ্ডীমঙ্গলকাব্যকে রক্ষা করিবার জন্যই নূতন চণ্ডীমঙ্গল কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত হন। তিনি নিজেও তাহা স্বীকার করিয়াছেন:

এত দোষ উদ্ধারিতে লোকের চৈতন্য দিতে
চণ্ডী রচে রামানন্দ যতী।
অনেকের উপরোধ কেহ না করিত ক্রোধ
অনেক শিষ্যের অনুমতি।

ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় এই দুই রামানন্দ এক ব্যক্তি কি না তাহা লইয়া প্রশ্ন তুলিয়াছেন। দুই জনের রচনা, জগন্নাথ সেবা, পুরীধামে বাস এবং কালীভক্তি বিচার করিলে তাঁহাদিগকে এক ব্যক্তি বলিয়া মনে হয়। কিন্তু রামায়ণ দুইখানি এক ব্যক্তির রচনা নহে। সুতরাং দুইজনকে আপাতত দুইজন পৃথক কবি বলিয়া গ্রহণ করা গেল।

উল্লিখিত চারিজন কবিকে ছাড়িয়া দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে আর বিশেষ কোন কবি পুরা রামায়ণের অনুবাদে অগ্রসর হন নাই, অধিকাংশ স্থলে দুই একটি বিচ্ছিন্ন কাণ্ড বা পালার পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কথকতার জন্যই শ্রোতৃসমাজে রামায়ণের এত চাহিদা ছিল, এবং কথকগণ জনরুচির দিকে চাহিয়া রামায়ণের বিশেষ বিশেষ ঘটনা বা পালা ব্যবহার করিতেন। যাঁহাদের অল্পস্বল্প কবিত্ব ছিল তাঁহারা এই প্রয়োজনের দিকে চাহিয়াই রামায়ণের পালা লিখিতেন। অঙ্গদ, কুম্ভকর্ণ, বিভীষণ প্রভৃতির কাল্পনিক রায়বার অবলম্বনে অনেকগুলি রায়বার পালা পাওয়া গিয়াছে। রাজসভায় উপস্থিত হইয়া দূতের অনুযোগ-অভিযোগ এবং তৎসহ রঙ্গরস প্রভৃতি ব্যাপার ধামালি জাতীয় স্বরাঘাতপ্রধান ছন্দে এবং অশিষ্ট ভাষায় বর্ণিত এই রায়বারের পুঁথিগুলি অষ্টাদশ শতাব্দীর যুগোপযোগী হইয়াছিল। সমাজের

লঘুচপল গ্রাম্য মনোভাব ও নাগরিক তির্যকতা—উভয়ই রায়বারের রঙ্গরসে ফুটিয়াছে। কেহ কেহ 'রঙের উপর রসান চড়াইবার' জন্ম রায়বারের গালিতে হিন্দী শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন। ফকিররাম কবিভূষণ, খোশাল শর্ম্মা, রামনারায়ণ প্রভৃতি কবিদের রায়বারে হিন্দী শব্দের ছড়াছড়ি। উদাহরণস্বরূপ ফকিররাম কবিভূষণের অঙ্গদের রায়বার হইতে অল্প উদ্ধৃত হইতেছে। অঙ্গদ মেঘনাদকে 'বাপ তুলিয়া' যথেচ্ছা গালি দিতেছে :

কহত মেঘনাদ কমজাত রাভণ কি বেটে।
কোন দাউ তেরে কাহা গিআথা দিগবিজই রণ ভেটে॥
কোন দাউ তেরে নহুডিকা ঝুঁঠা খাআথা হে পাতালে।
কোন দাউ তেরে বান্ধা থা অর্জ্জুনকো ঘোটকশালে॥
কোন দাউ তেরে দচ্ছিন জাকে জুঝা জমকি সাথে।
কোন দাউ তেরে মান্ধাতার বাজমে ঘাস কিআথা দাঁতে॥
*　*　*　*　*
কোন দাউ তেরে বধু সাথে ধরকে আসক কিআ।
কোন দাউকা বহিনি তেরা দৈত্য মধু হরলিআ॥
এতে বাত সুনরে কমজাত হেঅ তেরা মনমে।
কোন দাউ তেরে জন্ম হুআথা জামদগ্নিকা জুমে॥
একে ২ কহা তেরে সব দাউকি বাত।
উএ সব মেরে কাম নেহি তেরে কাহা জুগিআ তাত॥

অঙ্গদের রায়বাবের অনুকরণে বিভীষণ, শূর্পণখা, কালনেমি, কুম্ভকর্ণ—সকলেরই রায়বার রচিত হইয়াছিল, কিছু কিছু পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। ইহার অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর অক্ষম রচনা। এই শতাব্দীর বৈষ্ণব-পদাবলীর আদর্শে কিছু রামপদাবলীও রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে দু'একটির কাব্যমূল্য ও আন্তরিকতা মন্দ নহে। যথা—সীতার বিলাপ :

রাম মোর না কৈল উদ্দেশ।
কাননিবাসী হৈল　রাক্ষসের হাথে মৈল
ভাবিতে পরাণ হৈল শেষ॥
যদি না পাইব রঘুবরে।
সাগরে মরিব গিয়া　রামপদ ধিয়াইয়া
এই সত্য কহিনু প্রভুরে॥

শক্তিশেলে মূর্চ্ছিত লক্ষ্মণের প্রতি রামের শোক :

উঠ উঠ লক্ষ্মণ ধানুকি ।
কেবা করে রাজ্য পাট রথ গজ বাজিঠাট
কি করিবে বনিতা জানকি ॥
মোর রাজ্যে হব রাজা হরসিত যত প্রজা
নবদণ্ড ধরাব তোমায় ।
আসি ভরতের মাতা পণ্ড হৈল তথা
জটা দিয়া বনেতে পাঠায় ॥
এ হেন সোনার গায় শোণিতের ধারা তায়
কেমনে দেখিয়া জীব আমি ।
এতদিনে বিধি বাম লুকালে জানকি নাম
বিদেশে ছাড়িয়া গেলা তুমি ॥

রামায়ণ রচনার এই আদর্শ উনবিংশ শতাব্দীতেও পরিত্যক্ত হয় নাই। কেহ কেহ পুরাতন পন্থা অনুসরণ করিয়া (রঘুনন্দন গোস্বামী, রামমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়), কেহ-বা আধুনিক পন্থা অবলম্বনে (রাজকৃষ্ণ রায়) রামায়ণের ভাবানুবাদের চেষ্টা করিয়াছিলেন। সে সম্বন্ধে পরবর্তী খণ্ডে আলোচনা করা যাইবে।

মহাভারতের অনুবাদ ॥

অষ্টাদশ শতকে মহাভারতের বহু বিচ্ছিন্ন পর্বের পুঁথি পাওয়া গেলেও পুরা মহাভারতে কেহ হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না—সেরূপ 'দম' কাহারও ছিল না। কাশীরামের নামে প্রচারিত মহাভারতের পর্বগুলির বহু নকল হইয়াছিল এবং সেইগুলিই অধিকাংশ স্থলে পাঠক-শ্রোতার মনোরঞ্জন করিত। কিন্তু তাহা ছাড়াও মহাভারতের বিভিন্ন পর্বের ও পালার পুঁথি অষ্টাদশ শতাব্দীতেও নিতান্ত মন্দ পাওয়া যায় নাই। ইহার কিছু কিছু সপ্তদশ শতাব্দীর শেষের দিকেও রচিত হইয়া থাকিবে। নিম্নে এইরূপ কয়েকজন কবির নাম উল্লেখ করা যাইতেছে :—

(১) দ্বৈপায়ন দাস (অশ্বমেধ পর্ব), (২) নন্দরাম (দ্রোণপর্বাদি), (৩) দ্বিজ শ্রীনাথ, (৪) কৃষ্ণানন্দ বসু (শান্তি পর্ব), (৫) দ্বিজ কৃষ্ণরাম (অশ্বমেধ পর্ব), (৬) অনন্ত মিশ্র (অশ্বমেধ পর্ব), (৭) দ্বিজ গোবর্ধন (গদা পর্ব), (৮) রামলোচন (নারী পর্ব), (৯) রাজারাম দত্ত (দণ্ডী পর্ব), (১০)

রাজেন্দ্র দাস (শকুন্তলার উপাখ্যান), (১১) গঙ্গাদাস সেন (সমগ্র মহাভারত), (১২) কবিচন্দ্র।

এই সমস্ত বিচ্ছিন্ন পালার পুঁথিতে অনেক সময় সন-তারিখ থাকিত না, দুই-একটিতে আবার নকলের তারিখ প্রদত্ত হইয়াছে। এইজন্য মূল পুঁথির রচনাকাল নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে অধিকাংশই অষ্টাদশ শতাব্দীর রচনা, অন্ততঃ ভাষা ও রচনারীতি হইতে তাহাই মনে হয়। বিচ্ছিন্ন পালা হিসাবে শকুন্তলা ও দাতাকর্ণের কাহিনী খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল। কারণ এই পালার অনেকগুলি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কবিচন্দ্রের দাতা কর্ণের পালা এবং রাজেন্দ্র দাসের শকুন্তলার উপাখ্যান কিছু উল্লেখযোগ্য। অবশ্য দাতা কর্ণের পালা মূল মহাভারতের অন্তর্ভুক্ত নহে, খুব সম্ভব ধর্মমঙ্গলের লুইচন্দ্র পালার প্রভাবে পরিকল্পিত।[১৯]

নন্দরাম দাসের ভণিতাযুক্ত উদ্যোগ পর্ব, দ্রোণ পর্ব, ও কর্ণ পর্বের কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কবি পুরা মহাভারত লিখিয়াছিলেন কিনা বুঝা যাইতেছে না। কবি সম্ভবতঃ কাশীরামের ভ্রাতুষ্পুত্র, কাশীরামের মহাভারতের অনেকটা ইঁহার রচনা। বিশেষতঃ ইঁহার কর্ণ পর্ব ও দ্রোণ পর্ব কাশীরাম দাসের সঙ্গে প্রায় হুবহু মিলিয়া যায়। কেবল উদ্যোগ পর্বটি ইঁহার নিজস্ব রচনা হইতে পারে—কারণ কাশীরামের সঙ্গে ইহার সাদৃশ্য নাই। ইঁহার ভাষাও প্রায় কাশীরামের অনুরূপ, সংস্কৃত প্রভাবিত, অলঙ্কৃত ও মার্জিত।

দ্বৈপায়ন দাস ভণিতাযুক্ত এক কবি নিজেকে 'কাশীর নন্দন' বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন (ক. বি. পুঁথি-১৩৬২)। ইঁহার রচিত বনপর্ব, গদাপর্ব ও স্বর্গারোহণ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। অনেক সময় পিতার রচনার সঙ্গে পুত্রের রচনাংশ মিলিয়া গিয়াছে। দ্বিজ শ্রীনাথের দুই একটি পর্ব পাওয়া গেলেও কেহ কেহ অনুমান করেন, কবি পুরা মহাভারত রচনা করিয়াছিলেন।[২০] কবি কুচবিহাররাজের আজ্ঞায় মহাভারত রচনায় অগ্রসর হন। ইঁহার পিতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতাও কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক কবি দ্বিজ গোবর্ধন ১৬৩২ শকে (১৭১০ খ্রীঃ)

১৯. ডঃ সুকুমার সেন—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৪২০

২০. মণীন্দ্রমোহন বসু—বাংলা সাহিত্য, ২য়, পৃ. ১০৯

গদাপর্ব সমাপ্ত করেন—ইহা অনেকটা কবির স্বাধীন রচনা। এই যুগে প্রায় কেহই কাশীরামের প্রভাব ছাড়াইতে পারেন নাই। কিন্তু কবি এদিক দিয়া যথাসম্ভব মৌলিকতার পরিচয় দিবার চেষ্টা করিয়াছেন। রামলোচন নামে আর এক কবি তো পুরাপুরি কাশীরামকে (স্ত্রীপর্ব) অনুকরণ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ জৈমিনি ভারত অবলম্বনেও অশ্বমেধ পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন। দ্বিজ কৃষ্ণরায় ও অনন্তমিশ্রের দুইখানি অশ্বমেধ পর্বের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। উর্বশী উদ্ধার বা দণ্ডীপর্বের চমকপ্রদ কাহিনীর জন্তও অনেকে শুধু এই পর্বের অনুবাদ করিয়াছিলেন।

গঙ্গাদাস সেনের মহাভারতের দুই একটি পর্ব পাওয়া গেলেও তিনি বোধহয় সমস্ত পর্বেরই অনুবাদ করিয়াছিলেন। কারণ তিনি একস্থলে বলিয়াছেন :

গঙ্গাদাস সেন কবি রচিলেক সর্ব্ব।
শ্লোক ভাঙ্গি রচিলেক অষ্টাদশ পর্ব্ব॥

তিনি বিচিত্র প্রতিভার কবি ছিলেন। তাঁহার ভণিতায় রামায়ণ ও মনসার পুঁথিও পাওয়া গিয়াছে। তিনি পিতা ষষ্ঠীবরের প্রতিভার অনেকটা উত্তরাধিকার সূত্রে পাইয়াছিলেন। বিষ্ণুপুরের রাজা গোপাল সিংহের আদেশে কবিচন্দ্র মহাভারতের অনেকটা রচনা করিয়াছিলেন। ইঁহার গোবিন্দমঙ্গল একদা বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

মহাভারতের এই সমস্ত অনুবাদ সম্বন্ধে বিশেষ কিছু বক্তব্য নাই। কারণ বিচ্ছিন্ন পর্বের অনুবাদগুলিতে প্রায় কোথাও প্রতিভার চিহ্ন ফুটে নাই। অবশ্য দুই-একজনের রচনারীতিতে কিছু কিছু প্রশংসনীয় গুণ লক্ষ্য করা যাইবে। কিন্তু সমগ্র মহাভারতকে আয়ত্ত করিবার মতো ক্ষমতা খুব কম কবিরই ছিল। কাশীরামের আদর্শ অবলম্বনে ইঁহাদের প্রায় সকলেই মহাভারতের দুই-এক পর্ব ফাঁদিয়াছিলেন, কেহ-বা কাশীরামের বহু অংশ আত্মসাৎ করিতেও দ্বিধা বোধ করেন নাই। যাহা হউক, মহাভারত অনুবাদের রীতি আধুনিক যুগেও হ্রাস পায় নাই—তবে তাহার বাহন বদল হইয়াছে। পদ্যের স্থলে গদ্যই হইয়াছে অনুবাদের ভাষা।

ভাগবত-অনুসারী রচনা॥

যে-কোন কারণেই হোক, মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ভাগবত শাখায়

প্রথমশ্রেণীর কবিপ্রতিভার বড় একটা সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না—যদিও শিক্ষিত ও অশিক্ষিত সমাজে ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলা বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই একই ব্যাপার লক্ষ্য করা যায়। সপ্তদশ শতাব্দী হইতেই সম্প্রদায়গত চৈতন্যধর্ম গৌড়ীয় বৈষ্ণবধর্মরূপে সমগ্র দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ভাগবত-অনুসারী পূর্ণাঙ্গ রচনা একাধিক পাওয়া গিয়াছে; ভাগবত বা অন্য পুরাণের কৃষ্ণলীলা বিষয়ক আখ্যানের অনুবাদও কিছু কম হয় নাই। তন্মধ্যে কয়েকজনের রচনায় কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয় পাওয়া যায়। নরহরিদাস, অচ্যুতদাস, কবিচন্দ্র শঙ্কর চক্রবর্তী, দ্বিজ মাধবেন্দ্র, অভিরাম দাস, বলরাম দাস, দ্বিজ রামেশ্বর,—ইঁহারা সকলেই ভাগবতকেন্দ্রিক পুরা কাব্যই লিখিয়াছিলেন—যদিও সকলের পুরা কাব্য পাওয়া যায় নাই। ইঁহাদের মধ্যে শঙ্কর কবিচন্দ্র (গোবিন্দমঙ্গল বা ভাগবতামৃত), বলরাম দাস (শ্রীকৃষ্ণমঙ্গল), দ্বিজ মাধবেন্দ্র (ভাগবতসার), দ্বিজ রমানাথ (শ্রীকৃষ্ণবিজয়) বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইঁহারা মূল ভাগবতের কৃষ্ণলীলা-সংক্রান্ত অধ্যায়গুলি সংক্ষেপে রচনা করিয়াছেন, আক্ষরিক অনুবাদ ইঁহাদের কাহারও উদ্দেশ্য ছিল না। তাঁহারা মূল ভাগবতের বহির্ভূত পালাও (যেমন দানখণ্ড ও নৌকাখণ্ড) নিজ নিজ কাব্যে গ্রহণ করিয়াছেন। শঙ্কর কবিচন্দ্র, দ্বিজ রমানাথ, বলরাম দাস—ইঁহাদের ভাগবত-অনুসারী কাব্যে অনেক কবিকল্পিত আখ্যানও স্থানলাভ করিয়াছে। দ্বিজ রমানাথের রচনারীতি নিরাভরণ হইয়াও সাদা কথায় পাঠকের মন জয় করিয়া লইয়াছে। যেমন—কৃষ্ণ-বলরাম মথুরাযাত্রার উদ্যোগ করিলে যশোদার বিলাপ:

> অভাগিনী মায়ে ছাড়ি যাবে কোথাকারে।
> বুঝিলাম কাঙ্গালিনী করিবে আমারে॥
> হিয়ার পুতলী তুমি নয়নের তারা।
> তিল আধ না দেখিলে জীয়ন্তে হই মরা॥
> হাপুতীর বাছা তুমি আন্ধালার নড়ি।
> নিধনের ধন তুমি কৃপণের কড়ি॥
> না যাহ না যাহ বাছা জননী ছাড়িয়া।
> তোমা না দেখিলে বুক যায় বিদরিয়া॥

মাতৃহৃদয়ের এরূপ আন্তরিক বেদনা বৈষ্ণব পদাবলীতেও খুব সুলভ

নহে। নরহরি দাসের ভাগবতে প্রাকৃতিক চিত্রের বর্ণনাও কিছু প্রশংসা দাবি করিতে পারে :

> রবিকর তাপেতে তাপিত অষ্টমাস।
> তাপ দূরে গেল হৈল মেঘের প্রকাশ।
> ঘন ঘন সঘনেতে মেঘের গর্জন।
> দমকে দামিনী দুরু দুরু বরিষণ॥
> ধরাধর বরিষণে ধরা ভেল সুখী।
> সর্বদা সন্তোষে নৃত্য করে সব শিখী॥

বর্ষার বর্ণনা হিসাবে ইহা মন্দ হয় নাই।

কেহ কেহ আবার ভাগবতের কাহিনী বর্ণনা করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের আদর্শে দানলীলা-নৌকালীলার বেশ জঁাকালো-রকমের বর্ণনা দিয়াছেন। কবিশেখরের শুধু দানলীলার একখানি পুঁথি (কলি. বিশ্ব. পুঁথি—৯৬৩) পাওয়া গিয়াছে—তাহাতে প্রায় শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের লীলাই অনুসৃত হইয়াছে। কৃষ্ণ-রাধাবিষয়ক লৌকিক লীলা কোন কোন কবিকে এমন প্রভাবিত করিয়াছিল যে, তাঁহারা ভাগবতের নানা পালা বিস্মৃত হইলেও বড়াইবুড়ী-রাধাকৃষ্ণ ঘটিত অমার্জিত গ্রাম্যকাহিনী সালঙ্কারে ব্যাখ্যানে অগ্রসর হইয়াছেন।

ভাগবতের দুই-একপালা লইয়া রচিত কয়েকখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উদ্ধবসংবাদ উল্লেখযোগ্য। নরসিংহ দাস (মিশ্র), শিবরাম, পঞ্চানন—ইঁহারা সকলেই ভাগবতের দশম স্কন্ধে (৪৬-৪৭ অধ্যায়) বর্ণিত কৃষ্ণকর্তৃক উদ্ধবকে বৃন্দাবনে দূত করিয়া পাঠাইবার কাহিনী অবলম্বনে উদ্ধবসংবাদ রচনা করিয়াছিলেন। এই কবিগণ সকলেই অষ্টাদশ শতাব্দীর নহেন, কেহ কেহ কিছু পূর্ববর্তীও হইতে পারেন। ভাগবতের উদ্ধব-সংবাদের কাহিনী অবলম্বন করিয়া ইঁহারা প্রায় স্বাধীনভাবে রচনা করিয়াছিলেন। রূপগোস্বামীর 'হংসদূত' অবলম্বনে নরসিংহ একখানি কাব্য লিখিয়াছিলেন (ক. বি. পুঁ.—৯৮৩)। তাঁহার মতে সংস্কৃত হংসদূত রূপগোস্বামীর নহে, দাসগোস্বামী অর্থাৎ রঘুনাথ দাস রচিত। ইহা অবশ্য ঠিক নহে—'হংসদূত' রূপগোস্বামীরই রচনা। 'রাধিকামঙ্গল' নামে রাধাকৃষ্ণ-সংক্রান্ত কিছু কিছু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে উদ্ধবানন্দ, দ্বিজ কবিচন্দ্র, কৃষ্ণরামদাস,

বৃন্দাবন দাস, কৃষ্ণরাম দত্ত—ইঁহারা সংক্ষেপে রাধিকার জন্ম হইতে কাহিনী শুরু করিয়াছেন। ইহার সঙ্গে ভাগবতের সম্পর্ক অল্প, কবিত্বের সম্পর্ক আরও অল্প। ইহা ছাড়াও পদ্মপুরাণের অন্তর্গত 'ক্রিয়াযোগসার'-এর আখ্যান অবলম্বনে কেহ কেহ আধা-রোমান্টিক ধরনের তত্ত্বকথা-সংবলিত কাহিনী রচনা করিয়াছিলেন। তালধ্বজা নগরীর রাজা বিক্রমের পুত্র মাধবের সঙ্গে প্লক্ষদ্বীপের রাজকুমারী সুলোচনার মিলনকথাই ইহার মূল কাহিনী। পুরাণের কথা হইলেও ইহাতে বিশুদ্ধ রোমান্টিক প্রেম ও দুঃসাহসের কাহিনী স্থান পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কবিরা এই আখ্যান অবলম্বনে দুইচারিখানি পুঁথি রচনা করিয়াছিলেন। কেহ কেহ পদ্মপুরাণের পাঁচ অধ্যায়ে সম্পূর্ণ কাহিনীটিকে পুরাপুরি অনুকরণ করিয়াছেন, কেহ-বা প্রায় আক্ষরিক অনুবাদ করিয়াছেন। ইহার সমাপ্তিতে নারায়ণ মাহাত্ম্য বর্ণিত হইলেও আধুনিক পাঠকের নিকট ইহার মানবিক আবেদনই অধিকতর চিত্তাকর্ষী মনে হইবে—যদিও এই মধ্যম-শ্রেণীর কবিদের বিশেষ কোন কবিপ্রতিভা ছিল না।

সমগ্র অষ্টাদশ শতাব্দী ধরিয়াই ব্রাহ্মণাদি উচ্চতর সমাজে কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক পুরাণ অনুবাদের ধুম পড়িয়া গিয়াছিল। পদ্মপুরাণ, ব্রহ্মবৈবর্তপুরাণ, বরাহপুরাণ প্রভৃতির অন্তর্গত কৃষ্ণলীলাবিষয়ক কোন কোন পালা শিক্ষিত সমাজে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। কোন কোন কবি সংযত পরিচ্ছন্ন রচনা-রীতিও আয়ত্ত করিয়াছিলেন—এরূপ কবির সংখ্যা প্রচুর। কিন্তু এইরূপ পুঁথিতে যথার্থ প্রতিভাশালী কবির সাক্ষাৎ দুর্লভ। সমাজের নানা স্তরে, ভূস্বামী সমাজে সংস্কৃত পুরাণের প্রভাব বেশ স্থায়ী হইয়াছিল। সাহিত্য ও সমাজের দিক হইতে শুধু এইটুকু প্রণিধানযোগ্য। বস্তুতঃ অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে পণ্ডিতসমাজের দ্বারা বিভিন্ন জমিদারবংশ সংস্কৃত পুরাণের বাংলা অনুবাদ করাইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কুচবিহার, ত্রিপুরা ও বর্ধমান রাজাদের উৎসাহদান সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতি লাভের যোগ্য। পরবর্তী কালে 'বঙ্গবাসী' মুদ্রাযন্ত্র হইতে সুলভ মূল্যে যাবতীয় পুরাণ সানুবাদ প্রকাশিত হইয়া গোটা বাংলা দেশেই প্রচার লাভ করিয়াছিল। কিন্তু তাহারও প্রায় দুই শতাব্দী পূর্ব হইতে বাংলার কোন কোন বিদ্যোৎসাহী ও ধর্মানুরাগী ভূস্বামী ও সামন্তগণ বৈষ্ণব-অবৈষ্ণব পুরাণের অনুবাদ করাইয়া উচ্চসমাজে পুরাণ প্রচারের বিশেষ চেষ্টা করিয়াছিলেন। এই সমস্ত অনুবাদ

অধিকাংশ স্থলে রাজসভার পণ্ডিতের দ্বারা সমাধা হইত বলিয়া ইহাতে লৌকিক ভাবের অবতারণার অবকাশ ছিল না। অনুবাদক ব্রাহ্মণপণ্ডিতগণ, কবিত্বের দিকে ততটা না হইলেও, অনুবাদে মূলের বিশুদ্ধি রাখিবার চেষ্টা করিতেন। অবশ্য এই ধরনের রচনা কিছু পাণ্ডিত্যপূর্ণ, কেতাবী ও কৃত্রিম হইতে বাধ্য। কিন্তু উচ্চতর সমাজে বাংলা ভাষার মারফতে পৌরাণিক ভাব ও সংস্কার বেশ দৃঢ়মূল হইতেছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। পরবর্তী কালে উচ্চতর সমাজে ইংরাজী শিক্ষা-সংস্কৃতি বিস্তার লাভ করিলে, একদল কালাপাহাড়ী যুবসম্প্রদায় ('ইয়ং বেঙ্গল') এবং ব্রাহ্মসম্প্রদায় যে-কোন পুরাণ গ্রন্থের প্রতি খড়্গহস্ত হইয়াছিলেন বটে, কিন্তু ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে আবার নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর সাহায্যে পুরাণের অনুশীলন আরম্ভ হয়। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে অধিকাংশ স্থলে বাছিয়া বাছিয়া কৃষ্ণলীলাবিষয়ক বৈষ্ণবপুরাণের দিকেই অধিক দৃষ্টি পড়িয়াছিল, শাক্তপুরাণের অনুবাদ অতি বিরল। সমাজে বৈষ্ণবপ্রভাবের প্রাধান্যই ইহার কারণ। যাহা হউক, এই সমস্ত পুরাণ অনুবাদ প্রায় কোন দিক দিয়াই কাব্যগুণান্বিত হয় নাই। কারণ অনুবাদক-গণের পাণ্ডিত্য থাকিলেও বড় একটা কবিত্ব ছিল না। সুতরাং এই সমস্ত পুঁথিপত্র গবেষকদের আনন্দ বর্ধন করিলেও সাধারণ পাঠক ইহা হইতে বিশেষ কোন মানসিক তৃপ্তি পাইবেন না। শুধু যুগমানসের স্বরূপ নির্ধারণের জন্যই এই পুরাণাশ্রয়ী রচনাগুলির কিঞ্চিৎ সার্থকতা – কাব্যগুণের মাপকাঠির দ্বারা ইহাদিগকে বিচার করিতে গেলে ইহাদের প্রতি অবিচার করাই হইবে।

বৈ ষ্ণ ব সা হি ত্য

বাংলা দেশে অষ্টাদশ শতাব্দীতে নানাধরনের বৈষ্ণব সাহিত্য রচিত হইয়াছে। সমাজে বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের প্রভাব বৃদ্ধির ফলে বাঙালী হিন্দুর একটা বড় অংশ বৈষ্ণবভাবাপন্ন হইয়া গিয়াছিল। হয়ত কুলধর্মের দিক দিয়া কেহ কেহ শাক্তমতাবলম্বী ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত প্রবণতার ফলে অনেকে বৈষ্ণব আদর্শের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। শুধু বাংলা নহে, বাংলার প্রান্তীয় অঞ্চলেও এই গৌড়ীয় বৈষ্ণব ধর্মমত, দার্শনিকতা ও আচার-আচরণ

দৃঢ়মূল হইয়াছিল। বিশেষ বিশেষ ভূস্বামিবংশ বৈষ্ণব আচার্যদের শ্রদ্ধা করিতেন, কোন কোন জমিদার বৈষ্ণব ধর্মগুরুর নিকট আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষাও লইয়াছিলেন। সমাজে এইরূপ প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় ধর্মসংস্থাপক সাহিত্যেরও প্রয়োজন অনুভূত হইল। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও বহু বৈষ্ণব কবি ও তাত্ত্বিক বাংলা ভাষায় নানা শ্রেণীর বৈষ্ণব সাহিত্য রচনা করিয়াছিলেন, পদ লিখিয়াছিলেন—অষ্টাদশ শতাব্দী বৈষ্ণব পদাবলীর সঙ্কলন ও সংগ্রহের যুগ বলিয়া অভিহিত হইতে পারে। গত তিন শতাব্দী (১৫শ-১৭শ) ধরিয়া যে সমস্ত বৈষ্ণবপদ রচিত হইয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীর সঙ্কলকগণ তাহা হইতে নির্বাচিত করিয়া, টীকাটিপ্পনীসহ যে-সমস্ত পদসঙ্কলনগ্রন্থ রাখিয়া গিয়াছেন তাহার জন্য বাংলা সাহিত্যের যে-কোন পাঠক কৃতজ্ঞতা বোধ করিবেন। এখানে অষ্টাদশ শতাব্দীর বিভিন্ন শ্রেণীর বৈষ্ণব সাহিত্যের কিছু কিছু পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। তবে প্রসঙ্গক্রমে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন—এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব গ্রন্থের সংখ্যাপ্রাচুর্য থাকিলেও তাহার গুণগত উৎকর্ষ, সজীবতা ও মৌলিকতা যে বিশেষভাবে ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

মহাপুরুষ-জীবনী ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রধান প্রধান আচার্যের তিরোধানের ফলে মহাপুরুষ জীবনী বা আচার্যদের চরিতগ্রন্থের সংখ্যা বহুল পরিমাণে হ্রাস পাইয়া গিয়াছিল। দুই একজন আচার্য সম্বন্ধে যে জীবনীকাব্য রচিত হইতেছিল তাহারও গুণগত উৎকর্ষ এমন কিছু উচ্চাঙ্গের নহে। এই শতাব্দীতে কৃষ্ণদাস কবিরাজ ও বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবনকাব্যের প্রচুর নকল হইয়াছিল; সেইগুলি বৈষ্ণবসমাজে নিত্য পঠিত-অনুশীলিত হইত। অবৈষ্ণব সমাজও তাহাতে যোগ দিত এরূপ বিশ্বাস করিবার কারণ আছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোন আচার্যকে অবলম্বন করিয়া মৌলিক কোন জীবনীগ্রন্থের বিশেষ সাক্ষাৎ পাওয়া যায় না। তবু যে দুই একখানি পুঁথি আবিষ্কৃত হইয়াছে, এখানে সংক্ষেপে তাহার উল্লেখ করা যাইতেছে।

প্রেমদাস—এই শতাব্দীতে চৈতন্যদেব সম্বন্ধে যে দুই-একখানি পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহাতে এমন কোন নূতন কথা নাই। তবে চৈতন্য সম্প্রদায়

ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। কবি প্রেমদাস এই বিষয়ে নূতন আলোক সম্পাত করিয়াছেন। প্রেমদাসের আসল নাম পুরুষোত্তম মিশ্র। তাঁহার দুইখানি গ্রন্থ 'চৈতন্যচন্দ্রোদয় কৌমুদী' এবং 'বংশী-শিক্ষা'য় চৈতন্যদেব ও বৈষ্ণব সমাজ সম্বন্ধে কিছু নূতন সংবাদ আছে। কবির বৃদ্ধ প্রপিতামহ চৈতন্যদেবের সমসাময়িক। প্রেমদাস ষোল বৎসর বয়সে বৈরাগ্য অবলম্বন করিয়া মথুরা বৃন্দাবন প্রভৃতি তীর্থ দর্শন করেন। শুনা যায় তিনি বৃন্দাবনের গোবিন্দ জিউর মন্দিরের পাচক ছিলেন। কেহ-বা বলেন, পাচক নহে, উক্ত মন্দিরের তিনি পূজারী ছিলেন।[১] ইহার প্রথম গ্রন্থ 'চৈতন্য-চন্দ্রোদয়কৌমুদী' কবি কর্ণপূরের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' শীর্ষক চৈতন্য-জীবন বিষয়ক সংস্কৃত রূপক নাটকের স্বচ্ছন্দ অনুবাদ। অনুবাদের রচনাকাল সম্বন্ধে কবি নিজেই এইভাবে সন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন :

চৌদ্দশত সাত শকে নবদ্বীপে নরলোকে
গৌরহরি আবির্ভাব হৈল।
চৌদ্দশত চোরনই শক যবে গ্রন্থ এই
মোর মুখে প্রকট হৈল।
কর্ণপুর ইহা বলি শ্রীচৈতন্য নমস্করি
নাটক করিল সমাপন।
ষোল শত চৌত্রিশ শকে লৌকিক ভাষাতে মুখে
প্রেমদাস করিল লিখন।

অর্থাৎ ১৪০৭ শকে (১৪৮৫-১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ) মহাপ্রভুর আবির্ভাব, ১৪৯৪ শকে (১৫৭২ খ্রীঃ অঃ) কবি কর্ণপূর কর্তৃক 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নাটক রচনা এবং ১৬৩৪ শকে (১৭১২ খ্রীঃ অঃ) প্রেমদাস কর্তৃক ইহার বঙ্গানুবাদ রচনা—উক্ত ত্রিপদী হইতে এইরূপ সঙ্কেত পাওয়া যাইতেছে। কর্ণপূর প্রকৃতপক্ষে কৃষ্ণমিশ্রের রূপক নাটকের ('প্রবোধচন্দ্রোদয়') আদর্শ অবলম্বনে সংস্কৃতে 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়' নামীয় রূপক নাটক রচনা করেন। কবি প্রেমদাস সরল পয়ার ত্রিপদীতে সেই নাটকীয় কাহিনীকে বিবৃত করেন। প্রেমদাসের 'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' নাটক নহে—আখ্যান-কাব্য। কবি মূল নাটকের কিছু কিছু অংশ সংক্ষিপ্ত আকারে পরিবেশন করিয়াছেন, কোথাও-বা একটু-আধটু নূতন কথা জুড়িয়া দিয়াছেন। আবেগের স্থলে বা করুণ রসের স্থলে

১. পদকল্পতরু, ৫ম খণ্ড, পৃ. ১৫০

তিনি মূল ছাড়িয়া একটু অধিক দূর অগ্রসর হইয়াছেন। গৌরাঙ্গ সন্ন্যাস গ্রহণ করিলে সে সংবাদ শুনিয়া শচীমাতার বিলাপ কবি কর্ণপূরের মূল নাটক অপেক্ষা অনেক বেশী আন্তরিক হইয়াছে। যথা :

মোর কোল শূন্য করি কোথা গেল গৌরহরি
আর নাহি পাব দরশন।
তপ্ত মোর বক্ষস্থল কে করিবে সুশীতল
কার মুখে করিব চুম্বন।
বড় অভাগিনী আমি যদি না জানিতুঁ তুমি
ছাড়ি যাবে অনাথ করিয়া।
বুকভরি কোলে নিতুঁ চাঁদমুখে চুম্ব দিতুঁ
নিরখিতুঁ নয়ন ভরিয়া।

কর্ণপূর শচীমাতার দুঃখ খুব সংক্ষেপে সারিয়াছেন, প্রেমদাস একটু বিস্তৃত ভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতে চৈতন্যকাহিনী ও চৈতন্য-পরিকরবৃন্দের যে চিত্র আছে তাহা কর্ণপূরের নাটক হইতে পুরাপুরি সংগৃহীত হইয়াছে।

তাঁহার দ্বিতীয় গ্রন্থ 'বংশীশিক্ষা'ও চৈতন্যতত্ত্ব ও চৈতন্যজীবনকথার আংশিক উপাদান হিসাবে গ্রহণযোগ্য। চৈতন্য-সমসাময়িক ও চৈতন্য-সহচর বংশীবদন বা বংশীদাস চট্টো। ইঁহার পিতার নাম ছকড়ি চট্টো। চৈতন্যদেব বংশীদাসকে গুহ্য রসতত্ত্ব ('রসরাজোপসনা'—অর্থাৎ সহজিয়া তত্ত্বকথা) শিক্ষা দিতেছেন, এইভাবে ইহা রচিত হইয়াছে। বংশীবদন চৈতন্যদেবের সন্ন্যাস গ্রহণের পর নিজ গ্রাম ত্যাগ করিয়া বাঘনাপাড়ায় শ্রীপাট স্থাপন করেন। শচীমাতা ও বিষ্ণুপ্রিয়ার দেখাশুনার ভার চৈতন্যদেব বংশীবদনের উপর অর্পণ করেন। বংশীবদন বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীচৈতন্যবিরহে অতি কাতর দেখিয়া চৈতন্যদেবের মূর্তি নির্মাণ করাইয়া পূজার ব্যবস্থা করেন। বংশীবদনের পুত্র চৈতন্যদাস, চৈতন্যদাসের পুত্র রামচন্দ্র বা রামাই এবং শচীনন্দন। জাহ্নবাদেবী রামচন্দ্রকে দীক্ষা দিয়া নিজের পালিতপুত্ররূপে গ্রহণ করেন। ইঁহাদের চেষ্টায় খড়দহ শান্তিপুরের মতোই বাঘনাপাড়া বিখ্যাত বৈষ্ণবকেন্দ্রে পরিণত হয়। যাহা হউক প্রেমদাস চারি উল্লাসে সমাপ্ত 'শ্রীশ্রীবংশী শিক্ষা' রচনা করেন—"ষোলশত অষ্টবিংশ শকের গণনে", অর্থাৎ ১৬২৮ শক বা ১৭১৬ খ্রীঃ অব্দে। কবি এই গ্রন্থকে 'রসরাজ' বলিয়াছেন। চৈতন্যদেবই 'রসরাজ', তিনিই শ্রেষ্ঠ রসতত্ত্ব। তাই প্রেমদাস কাব্যারম্ভে চৈতন্যবন্দনায় বলিয়াছেন :

অভিন্ন রসরাজায় শ্রীশচীনন্দনায় চ
গুরবে ভক্তরূপায় চৈতন্যায় নমোনমঃ।

চৈতন্যদেব বংশীবদনকে 'রসরাজোপাসনা' বিষয়ে শিক্ষা দিতেছেন, এইভাবে পুঁথিটি আরম্ভ হইয়াছে। চৈতন্যদেব বংশীবদনকে প্রথম 'উল্লাসে' রসরাজ ও গোপীতত্ত্ব, দ্বিতীয় উল্লাসে শ্রীরাধিকাতত্ত্ব, তৃতীয় উল্লাসে রসতত্ত্ব এবং চতুর্থ উল্লাসে সখীসাধনা সম্পর্কে উপদেশ দিতেছেন—কবি এইভাবে বর্ণনা করিয়াছেন। সর্বশেষ উল্লাসে (চতুর্থ) শ্রীচৈতন্যের সন্ন্যাস গ্রহণের পর বিষ্ণুপ্রিয়ার বিরহ, বংশীবদনের তিরোধান, বংশীদাসের পুত্র চৈতন্যদাস, চৈতন্যদাসের দুই পুত্র রামচন্দ্র ও শচীনন্দনের কথা, জাহ্নবাদেবী কর্তৃক রামচন্দ্রকে দীক্ষা দান, জাহ্নবাদেবীর সঙ্গে রামচন্দ্রের বৃন্দাবন যাত্রা প্রভৃতি বর্ণনায় পরবর্তী কালের চৈতন্যসম্প্রদায় সম্পর্কে কিছু কিছু নূতন তথ্য আছে। রামচন্দ্রের তিরোধানে 'বংশীশিক্ষা' সমাপ্ত হইয়াছে।

এই পুস্তিকার দুই অংশ—একটিতে অনেকটা সহজিয়া ধরনের তত্ত্বকথা বর্ণিত হইয়াছে। আর একটিতে উত্তর-চৈতন্যযুগের বৈষ্ণবসমাজে খড়দহ ও বাঘনাপাড়ার প্রভাবের কথা বর্ণিত হইয়াছে। প্রেমদাস বলিতেছেন:

বহিরঙ্গভাবে হরেকৃষ্ণ রাম নাম।
প্রচারিল জগমাঝে গৌর গুণধাম॥
অন্তরঙ্গভাবে অন্তরঙ্গ ভক্তগণে।
রসরাজ উপাসনা করিল অর্পণে॥

কবি মূলতঃ কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তত্ত্বাদর্শ গ্রহণ করিয়াছেন। সেই তত্ত্বদর্শনকে কবি সংক্ষেপে ও গূঢ়শব্দে 'রসরাজোপাসনা' নাম দিয়াছেন। কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে একটা গুহ্যপন্থী ভক্তিসাধনার কথা নানা আভাস ইঙ্গিতে পাওয়া যাইতেছে। সহজিয়া বৈষ্ণবগণ শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত গ্রন্থকেই মূল প্রেরণারূপে গ্রহণ করিয়াছেন। 'বংশীশিক্ষা'তেও বংশীবদনের প্রতি মহাপ্রভুর উপদেশ-সংক্রান্ত তথ্য প্রেমদাস চৈতন্যচরিতামৃত হইতে সংগ্রহ করিয়া তাহাতে আংশিকভাবে রহস্যবাদী সহজিয়া সাধনার তত্ত্বকথাও সংমিশ্রিত করিয়াছেন।

কাহিনীর দিক দিয়া ইহার শেষাংশে একটি বিচিত্র ব্যাপার বর্ণিত হইয়াছে। বংশীবদনের নাতি জাহ্নবাদেবীর শিষ্য রামচন্দ্রের মাহাত্ম্যে বাঘনা-পাড়ার খ্যাতি

বৃদ্ধি পায়। একদা রামদাস নামে বাঘনাপাড়া নিবাসী এক ভক্ত খড়দহে নিত্যানন্দপুত্র বীরচন্দ্রকে (বীরভদ্র) প্রণাম করিতে গিয়াছিলেন। বীরচন্দ্র রামদাসের মুখে রামচন্দ্রের মাহাত্ম্য ও বাঘনাপাড়ার গৌরব শুনিয়া অনুচর 'নাড়া' দিগকে রামচন্দ্রের অলৌকিক ক্ষমতা পরীক্ষা করিয়া আসিতে বলিলেন।

এতেক শুনিল যবে প্রভু বীরচন্দ্র।
নাড়া নাড়া নাড়া বলি ডাকে মন্দ মন্দ॥

ডাকিবামাত্র তাঁহার অনুচর বারো শত নাড়া হাজির হইল। বীরচন্দ্র তাহাদের বলিয়া দিলেন—বাঘনাপাড়ায় এক অতিথিপরায়ণ পরম বৈষ্ণব (রামচন্দ্র) আছেন, তোমরা গিয়া তাঁহার অতিথিপরায়ণতা পরীক্ষা করিয়া আইস।

বীরচন্দ্র কহে সবে কর এক কাম।
ত্বরা করি যাহ যাঁহা বাঘ্না'পাড়া গ্রাম॥
কোন জনা আসি করে বৈষ্ণব সেবন।
তোমরা যাইয়া তারে কর বিড়ম্বন॥

তাঁহার কথামতো বারো শত নাড়া গভীর রাত্রিতে শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় হাজির হইয়া রামচন্দ্রকে বলিল, "ক্ষুধার্ত আজি যে মোরা করাও ভোজন।" বিপদে পড়িয়া রামচন্দ্র জাহ্নবাদেবীকে স্মরণ করিলেন—এবং দেবীর কৃপায় বারো শত নাড়াদিগকে পৌষমাসের রাত্রিতে তাহাদের ইচ্ছামত আম্রের ব্যঞ্জন রাঁধিয়া আহার করাইলেন। নাড়ারা পরিতুষ্ট হইয়া খড়দহে ফিরিয়া গিয়া বীরচন্দ্রকে এই সংবাদ জানাইল। তখন বীরচন্দ্র বুঝিলেন, এই রামচন্দ্র তাঁহার বিমাতা জাহ্নবাদেবীর পুত্রস্থানীয়। সুতরাং তিনি বীরচন্দ্রের এক প্রকার ভাই হইলেন। ইহার পর বীরচন্দ্র আর কি করিয়া চুপ করিয়া খড়দহে থাকিবেন? তিনি সদলবলে বাঘনাপাড়ায় উপস্থিত হইয়া ভ্রাতৃস্থানীয় রামচন্দ্রকে প্রেমালিঙ্গন দিলেন। অতঃপর এখানে কিছুদিন অতিবাহিত করিয়া দুইজনে গভীরভাবে রসতত্ত্ব আলোচনা ও আস্বাদন করিতে লাগিলেন। এইরূপে বীরচন্দ্র প্রায় চারিমাস শ্রীপাট বাঘনাপাড়ায় রামচন্দ্রের সাহচর্য লাভ করিয়া বাস করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা হইতে দেখা যাইতেছে, বীরচন্দ্রের নিকট সর্বদা বারো শত নাড়া অবস্থান করিত এবং তাহারা তাঁহার নির্দেশানুসারেই চলিত। ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর বৈষ্ণব সমাজ প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি, বীরচন্দ্রের

সঙ্গে নাড়া অর্থাৎ মুণ্ডিত মস্তক সহজিয়াগণ অবস্থান করিত। ইহাদিগকে তিনি বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের মধ্যে স্থান দিয়াছিলেন। ইহারা যে বৈষ্ণবসমাজে কিঞ্চিৎ ভীতির কারণ হইয়াছিল, তাহা উপর্যুক্ত বর্ণনা হইতে বুঝা যাইবে।

প্রেমদাস স্বল্প কথায় কবিরাজগোস্বামীর 'শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে' বর্ণিত তত্ত্বকথা ভালই ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

প্রেমের প্রথমাবস্থা ভাব নাম ধরে।
যাহাতে সাত্ত্বিকভাব অল্প ব্যক্ত করে॥
ভাবশব্দে রতি কহে রতিশব্দে ভাব।
পুরাণাদি মতে এই একার্থতা লাভ॥
রতি গাঢ় হৈলে হয় প্রেমের উদয়।
যাহা মানবের মাত্র প্রয়োজন হয়॥

* * *

প্রেমের অপর নাম পিরীতি কহয়।
প্রীতির অর্থ একান্ত অনুরাগ হয়॥
বিবেকহীনের যৈছে বিষয়ের প্রতি।
অবিচ্ছিন্না মতি রহে জানিহ সুমতি॥
তৈছে গুরু কৃষ্ণে অবিচ্ছিন্ন মতি যেই।
পিরীতি আখ্যান তার কহিলাম এই॥

এই ধরনের পুস্তিকা হইতে মনে হইতেছে, সপ্তদশ শতাব্দীতেই সহজিয়া মত বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের কোন কোন অংশে জনপ্রিয় হইতেছিল। শ্রীখণ্ডের সমাজে যেমন একপ্রকার 'নাগরীভাবের' সাধনা ও সাহিত্যে খানিকটা সহজিয়া প্রভাব পড়িয়াছিল, তেমনি বাঘনাপাড়ার কেন্দ্রে বংশীদাস ও তাঁহার পৌত্র রামচন্দ্রের (রামাই) নেতৃত্বে এইরূপ সহজিয়া সাধনা ('রসরাজ') বৈষ্ণব-সমাজে ছাড়পত্র পাইয়াছিল। সহজিয়া চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদেরও এই সময়ে বিশেষ প্রচার হইয়াছিল, কারণ এই ধরনের পুস্তিকায় তাঁহার অনেক রাগাত্মিকাপদ উদ্ধৃত হইয়াছে।

অকিঞ্চন দাস—বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র গোস্বামী বা রামাইয়ের আর এক শিষ্য অকিঞ্চন দাস 'বিবর্তবিলাস' নামে এই শ্রেণীর একখানি পুস্তিকা রচনা করিয়াছিলেন। পাঁচটি বিলাসে সমাপ্ত এই কাব্যে বৈষ্ণবসমাজ, ব্যক্তি ও সম্প্রদায় সম্বন্ধে এমন অনেক তথ্য আছে, যাহার ঐতিহাসিক

ইঙ্গিত উল্লেখযোগ্য। অকিঞ্চন দাস বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বকথাই ব্যাখ্যা ও প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন—কিন্তু কৃষ্ণদাস কবিরাজ ব্যাখ্যাত রাগানুগা ভক্তির পটভূমিকায় ইহাতে সহজিয়া চণ্ডীদাস সম্বন্ধে অনেক গালগল্প স্থান পাইয়াছে। কবি যে কবিরাজ গোস্বামীর চৈতন্যচরিতামৃতের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন তাহা তিনি গোড়াতেই বলিয়া লইয়াছেন :

বিদ্যাহীন ভক্তিহীন হওত সন্তোষে।
চরিতামৃত অর্থ কিছু চরিত প্রকাশে॥
কবিরাজ গোসাঞের মহা কৌশল সামর্থ্য।
এক স্থানে উক্তি করেন আর স্থানে অর্থ॥
আমি করিঞে তারে অষ্টাঙ্গ হইঞা।
তাঁহার মনের অর্থ লিখি বাড়াইয়া॥

তবে কবি রাগানুগা ভক্তিসাধনাকে অনেক স্থলে বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্বের বেশ পরাইয়া দিয়াছেন। কবির বৈষ্ণবোচিত বিনয়োক্তি বেশ চমৎকার হইয়াছে :

বালকের দোষ কেহ না লইবে মনে।
নিজ দাস করি সবে রাখহ চরণে॥

কবি সাধনমার্গে ততটা সার্থক হইতে পারিতেছেন না বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন :

এ জন্মে না হইল মোর সাধনভজন।
পুনঃ জন্মে পাই যেন এ ধর্ম্মবতন॥
কোটী জন্ম হয় যদি ভাগ্য করি মানি।
এক জন্মের কর্ম্ম নাহ সাধুমুখে শুনি॥
যতবার জন্ম পাই ভাবতভূমিতে।
ততবার পাই ধর্ম্ম কৈশোর কালেতে॥

সহজিয়া ও রাগানুগা সাধনাকে কবি 'বিবর্ত্ততত্ত্ব' বলিয়াছেন। এই প্রসঙ্গে তিনি এই ভাবে 'বিবর্ত্ততত্ত্ব' ব্যাখ্যা করিয়াছেন :

এই কহিল স্থায়ী স্থিতি বিলাস নির্ধার।
সাধুসঙ্গে জানি সব বস্তু বিচার॥
সাধুসঙ্গ বিনে বস্তু কেহ বুঝিতে নারিবে।
বর্ত্ত আছে বিবর্ত্তে কেমনে সাধিবে॥
বর্ত্তমান কামরূপ জগতে বিহরে।
কামগন্ধহীন হৈলে প্রেমের সঞ্চারে॥

সম্বন্ধরূপে বর্ত্তদেশে করায় বিহার।
বিবর্ত্ত কহিয়ে সম্ব রহে দেশান্তর॥
*　　　*　　　*
শোণিত শুক্র যারে কহি আনন্দ মদন।
রতিরস তেঁহ কাম কহিল কারণ॥
অতএব প্রাকৃতরূপে তেঁহ সে আছয়।
ইহা সাধি অপ্রাকৃত মানুষ পায়।

অতঃপর অকিঞ্চন দাস কবি চণ্ডীদাসের উল্লেখ করিয়া বলিয়াছেন:

শ্রীযুত চণ্ডীদাস ঠাকুর মহাশয়।
পদেতে বর্ণিয়া তেঁহ স্পষ্ট করি গায়॥
কামমদন যে দুইয়ের পিতা যেহ।
তার পিতা যারে কহি সহজ মানুষ সেহ॥

কবি গুহ্য ইঙ্গিতের সাহায্যে এই সহজ মানুষের কথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

এই শতাব্দীতে দুইচারিখানি পুঁথিতে চৈতন্য-জীবনকথা এবং চৈতন্য-পরিকরদের কাহিনী সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যেমন—ভগীরথের 'চৈতন্য-সংহিতা', হৃদানন্দের 'চৈতন্যলীলা' (খণ্ডিত), রামরত্নের 'শ্রীচৈতন্যরত্নাবলী', পুরন্দরের 'চৈতন্যচরিত', দ্বিজ নিত্যানন্দের 'শ্রীচৈতন্যপাঁচালী' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুস্তিকায় চৈতন্যদেব ও তাঁহার অনুচরদের সম্বন্ধে কিছু কিছু উল্লেখ আছে বটে, কিন্তু কাব্য বা জীবনচরিত হিসাবে এগুলির বিশেষ কোন মূল্য নাই। বৈষ্ণব আচার্যদের মধ্যে শ্যামানন্দের একখানি ক্ষুদ্র জীবনালেখ্য উল্লেখযোগ্য। কৃষ্ণচরণ দাসের 'শ্যামানন্দপ্রকাশে' শ্যামানন্দের জীবনকথা বর্ণিত হইয়াছে।[২] যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীতে এমন কোন বৈষ্ণব-জীবনবিষয়ক কাব্য রচিত হয় নাই, যাহাতে উৎকৃষ্ট জীবনী সাহিত্য ও তত্ত্ব-কথা আলোচিত হইয়াছে। দুইচারি জনে চৈতন্যদেব ও অন্যান্য বৈষ্ণব-মহাজনদের সম্বন্ধে কিছু কিছু চরিতগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহাতে তথ্য ও ইতিহাস অপেক্ষা গালগল্পই বেশী। তাহার সঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়া তত্ত্ব মিশিয়া গিয়া উহাদের জীবনী-সাহিত্যের লক্ষণ অনেক সময়

২. এই বিষয়ে বিস্তারিত উল্লেখের জন্য ডঃ সুকুমার সেনের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাসে'র (১ম—অপরার্ধ) চতুর্দশ পরিচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

হারাইয়া গিয়াছে। তখনও বিভিন্ন বৈষ্ণবসম্প্রদায়, সমাজ, আখড়া ও ভক্তদের নিকট কৃষ্ণদাস কবিরাজ এবং বৃন্দাবনদাসের চৈতন্য-জীবনীকাব্যগুলির অত্যন্ত জনপ্রিয়তা ছিল। কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীতেও এই দুই জীবনীগ্রন্থের বহু পুঁথি পাওয়া গিয়াছে।

বৈষ্ণব সমাজবিষয়ক গ্রন্থ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বৈষ্ণবসমাজ, সম্প্রদায় ও আচার্যদের বিষয়ে বিস্তারিত গ্রন্থ রচনা করিয়া নরহরি চক্রবর্তী বা ঘনশ্যাম বৈষ্ণবসমাজ সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য দিয়া গিয়াছেন। এখানে সংক্ষেপে তাঁহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম দাস)—নরহরির 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস' বৈষ্ণব সমাজ-সম্প্রদায়ের ও আদর্শের একটি মূল্যবান ইতিহাস বলিলেই চলে—যদিও তথ্য ও অতথ্য একই সঙ্গে ইহাতে স্থান পাইয়াছে। ইনি একজন পদকর্তাও ছিলেন, গ্রন্থের মধ্যে সেই সমস্ত পদের কিছু কিছু উল্লেখ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস কবিরাজের পৌত্র ঘনশ্যামদাস ব্রজবুলির উৎকৃষ্ট পদকর্তা ছিলেন, আবার নরহরি চক্রবর্তীও ঘনশ্যাম নামে পদ লিখিতেন। ফলে উভয়ের পদের মধ্যে অল্লাধিক গোলমাল হইয়া যাওয়া স্বাভাবিক। যাহা হউক, 'ভক্তিরত্নাকর' ও 'নরোত্তমবিলাস'ই তাঁহার সর্বশ্রেষ্ঠ পরিচয় বহন করিতেছে।

নরহরি ভক্তিরত্নাকরের শেষে 'গ্রন্থানুবাদ' প্রসঙ্গে নিজের যৎসামান্য পরিচয় দিয়াছেন :

> নিজ পরিচয় দিতে লজ্জা হয় মনে।
> পূর্ব্ব বাস গঙ্গাতীরে জানে সর্ব্বজনে ॥
> বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী সর্ব্বত্র বিখ্যাত।
> তাঁর শিষ্য মোর পিতা বিপ্র জগন্নাথ ॥
> না জানি কি হেতু হৈল মোর দুই নাম।
> নরহরি দাস আর ঘনশ্যাম ॥
> গৃহাশ্রম হইতে হইনু উদাসীন।
> মহাপাপ বিষয়ে মজিনু রাত্রি দিন ॥

নরহরির পিতা জগন্নাথ চক্রবর্তী প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব দার্শনিক বৃন্দাবনবাসী বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর শিষ্য ছিলেন। কবি অল্প বয়সে গার্হস্থ্যধর্ম ত্যাগ করিয়া কিছুকাল বৃন্দাবনে অবস্থান করেন এবং গোবিন্দ মন্দিরে পাচকের কাজ গ্রহণ করেন। ইঁহার নামে তিনখানি গ্রন্থ ('ভক্তিরত্নাকর', 'নরোত্তমবিলাস', 'শ্রীনিবাস-চরিত্র'), দুইখানি পদসংগ্রহ ('গীতচন্দ্রোদয়', 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি') ও অনেক পদ প্রচলিত আছে। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে ('গৌরপদতরঙ্গিণী') নরহরি 'ছন্দঃসমুদ্র', 'পদ্ধতিপ্রদীপ' প্রভৃতি গ্রন্থও লিখিয়াছিলেন। ভদ্র মহাশয় ছন্দঃসমুদ্রের পুঁথি দেখিয়াছিলেন। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে তিনি এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "ছন্দঃসমুদ্র পাঠ করিলে ইঁহার সংস্কৃত ভাষা ও সাহিত্যে গভীর ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়।" কিন্তু এই দুই গ্রন্থের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না।[৩] তবে সংস্কৃত সাহিত্যে পরমপণ্ডিত নরহরি যে সংস্কৃত ছন্দেও অভিজ্ঞ ছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তিনি নিজের বাংলা পদেও ছন্দের নানাপ্রকার বৈচিত্র্য দেখাইয়াছেন।

নানা শাস্ত্রবিশারদ, সঙ্গীতশাস্ত্রের আচার্য,[৪] বাস্তববুদ্ধিসম্পন্ন নরহরি যথার্থ ই বৈষ্ণবসমাজ-সম্প্রদায়ের প্রকৃত ইতিহাসকার। তাঁহার রচিত বলিয়া প্রচারিত তিনখানি জীবনচরিত গ্রন্থের মধ্যে শুধু 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র কোন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। কোনও স্থলে ইহার কোন প্রসঙ্গ নাই, কোনও উদ্ধৃতিও পাওয়া যায় না। অথচ তিনি 'ভক্তিরত্নাকরে'র একাধিক স্থানে বলিয়াছেন যে, সর্বাগ্রে তিনি শ্রীনিবাসচরিত্র লিখিয়াছেলেন। কারণ তিনি বলিয়াছেন, পূর্বগ্রন্থ 'শ্রীনিবাসচরিত্রে' অনেক কথা বলিয়াছেন বলিয়া 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাস সম্পর্কীয় বর্ণনা সংক্ষেপে সারিয়াছেন।[৫] মনে হয়, 'ভক্তিরত্নাকরে' শ্রীনিবাস সম্বন্ধে অধিকাংশ তথ্য ব্যবহৃত হওয়ায় শ্রীনিবাসচরিত্র কালে লুপ্ত হইয়া যায়। কিন্তু একটা কথা—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভভাগে ইহা রচিত

৩. নবদ্বীপের হরিবোলা কুটীরের পূজ্যপাদ ৺হরিদাস দাস মহাশয়ের 'গৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যে' ছন্দঃসমুদ্রের খণ্ডিত পুঁথি মুদ্রিত হইয়াছে।

৪. নরহরি সংস্কৃতে 'সঙ্গীতসারসংগ্রহ' নামে সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক একখানি গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন। সম্প্রতি উহা স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ মহারাজ কর্তৃক সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

৫. শিষ্যগণনাথ এথা লিখিতে নারিনু।
শ্রীনিবাস চরিত্র গ্রন্থেতে বিস্তারিনু। ('ভক্তিরত্নাকর')

হইয়াছিল, কিন্তু এক শতাব্দীর মধ্যেই তাহার পুঁথি লুপ্ত হইল—ইহা বিস্ময়কর ব্যাপার ঘটে। অন্তত কবি ইচ্ছা করিয়া তথাকথিত শ্রীনিবাসচরিত্র লোপ করেন নাই, করিলে ভক্তিরত্নাকরে তাহার ইঙ্গিত থাকিত। 'ভক্তি'তে শ্রীনিবাসচরিত্র বর্ণিত হইয়াছে বলিয়া কবির 'শ্রীনিবাসচরিত্র' লুপ্ত হইয়াছিল, ইহা যদি মানিতে হয়, তাহা হইলে 'নরোত্তমবিলাস' লুপ্ত হইল না কেন? কারণ 'ভক্তি'-তে নরোত্তম চরিত্রও বর্ণিত হইয়াছে। কাজেই 'শ্রীনিবাসচরিত্রে'র পুঁথি লুপ্ত হইল কেন তাহা বলা কঠিন।

'ভক্তিরত্নাকর' নরহরির শ্রেষ্ঠ প্রতিভার পরিচায়ক। ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীর গৌড় ও বৃন্দাবনের বৈষ্ণবসমাজ, আচার্য, কাহিনী, ধর্ম, দর্শন ইত্যাদি বিষয়ে রচিত এরূপ বিরাট সমাজ ও ইতিহাসবিষয়ক গ্রন্থ মধ্যযুগে অল্পই রচিত হইয়াছে। পঞ্চদশ তরঙ্গে বিভক্ত এই ইতিহাস-কাব্যে শ্রীনিবাস, নরোত্তম ও শ্যামানন্দের জীবনকথা, প্রচারকার্য, ভক্তিবাদ, তত্ত্বকথা ও শিষ্য সম্বন্ধে সুবিস্তৃত আলোচনা আছে। তবে কবি শ্রীনিবাস সম্বন্ধেই অধিক আলোচনা করিয়াছেন।[৬] বৃন্দাবনে তিন বন্ধুর শিক্ষালাভ, গ্রন্থাদি লইয়া গৌড় যাত্রা, গ্রন্থচুরি, গ্রন্থের পুনরুদ্ধার, শ্রীনিবাস কর্তৃক পশ্চিমবঙ্গে অভিজাত সমাজে চৈতন্যধর্ম প্রচার প্রভৃতি ঐতিহাসিক বিষয় নরহরি নানা তথ্য অবলম্বনে বিবৃত করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে নিত্যানন্দের বিবাহ ও পুত্র বীরচন্দ্রের (বীরভদ্র) কাহিনীও বর্ণিত হইয়াছে। বলিতে কি, ষোড়শ-অষ্টাদশ শতাব্দী—এই দুইশত বৎসরে বৈষ্ণব সমাজ ও সম্প্রদায়ের ক্রমবর্ধমান ইতিহাস ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গৌড় ও বৃন্দাবনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কটি বেশ চমৎকাররূপেই দেখান হইয়াছে। অবশ্য তথ্যাদির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কেহ কেহ কিছু সংশয় উত্থাপন করিয়াছেন এবং সে সংশয় নিতান্ত অমূলক নহে। ভক্তির দৃষ্টিতে অনেক সময় তথ্যের কিছু কিছু গোলমাল হওয়াই স্বাভাবিক।

মার্গসঙ্গীতে নরহরি যে পরম অভিজ্ঞ ছিলেন—তাহার প্রমাণ ভক্তি-রত্নাকরের পঞ্চম তরঙ্গ। যদিও এই তরঙ্গে বৃন্দাবন পরিক্রমা বর্ণিত হইয়াছে, কিন্তু গবেষকের দৃষ্টি লইয়াই তিনি মার্গসঙ্গীতের নানা তথ্য ও স্বরবিজ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন। 'সঙ্গীতপারিজাত', 'সঙ্গীতসার', 'সঙ্গীতদামোদর',

---

৬. ইতিপূর্বে আমরা শ্রীনিবাস জীবনকথা আলোচনায় 'ভক্তিরত্নাকরে' বিবৃত অনেক তথ্য গ্রহণ করিয়াছি।

'সঙ্গীতদর্পণ', 'নারদসংহিতা' প্রভৃতি সঙ্গীতশাস্ত্রবিষয়ক গ্রন্থাদি অবলম্বনে কবি স্বর, তাল, গ্রাম, মূর্চ্ছনা, রাগরাগিণী, বাদ্যযন্ত্র, নৃত্য, অঙ্গাভিনয় প্রভৃতি সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন এখনও তাহার তুলনাস্থল বিরল।

অবশ্য একথা সত্য যে, গ্রন্থটির মধ্যে সংহতির কিঞ্চিৎ অভাব আছে। মাঝে মাঝে প্রসঙ্গচ্যুতি যে হয় নাই তাহা নহে। ঘটনা, চরিত্র, তত্ত্বকথা—সবই মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে—এ অভিযোগ মিথ্যা নহে। অনেক স্থলের বর্ণনাও অতিশয় নীরস ও তথ্যসর্বস্ব। তবে কবি মাঝে মাঝে নিজের পদ উল্লেখ করিয়া নীরস তথ্যপ্রীতি অনেকটা কাটাইয়া উঠিয়াছেন।

নরহরির দ্বিতীয় জীবনী-ইতিহাস 'নরোত্তম বিলাস' আকারে হ্রস্ব, কিন্তু রচনার উৎকর্ষে অধিকতর প্রশংসনীয়।[৭] আকারে হ্রস্ব বলিয়াই ইহাতে গ্রন্থনশৈথিল্য বড় বেশী নাই এবং রচনাভঙ্গীও কোন কোন দিক হইতে উৎকৃষ্ট হইয়াছে। নরোত্তমের অদ্ভুত বৈরাগী জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে কবি উত্তরবঙ্গে নরোত্তমের প্রভাব এবং বৈষ্ণবমতবাদ প্রচারের কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। ইহাতেও বৈষ্ণবসমাজ ও আচার্যদের জীবনবিষয়ক অনেক মূল্যবান তথ্য আছে—বৈষ্ণব সমাজের ক্রমবিকাশের ইতিহাসে তাহার প্রয়োজনীয়তা অবশ্য স্বীকার্য।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব আচার্যদের বিভিন্ন শাখা-প্রশাখা ও শিষ্য-পরম্পরা অবলম্বনে কিছু কিছু পুস্তিকা রচিত হইয়াছিল—তাহাতে বৈষ্ণব সম্প্রদায়, বিশেষতঃ গুরু আচার্যদের পারিবারিক পরিচয় ও শিষ্যপ্রশিষ্যের দীর্ঘ তালিকা আছে। সাহিত্যের ইতিহাসে এই সমস্ত পুঁথিপত্রের আলোচনার বিশেষ অবকাশ নাই।

প্রসঙ্গক্রমে সহজিয়া সম্প্রদায় ও তাহাদের প্রচার-সাহিত্যের কথাও এখানে উল্লিখিত হইতে পারে। আমরা সপ্তদশ শতাব্দীর প্রসঙ্গে বৈষ্ণব সহজিয়াদের মত, আদর্শ ও সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করিয়াছি। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সম্প্রদায়গত ও তত্ত্বদর্শনের যে শক্তি বৃদ্ধি হইয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই রহস্যময় প্রেমসাধনার প্রতি সাধারণের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। তদুপরি সহজিয়া গুরুদের বিচিত্র

৭. ইতিপূর্বে নরোত্তম প্রসঙ্গে ইহা হইতে অনেক কাহিনী গৃহীত হইয়াছে বলিয়া এখানে বিস্তারিত পরিচয় দেওয়া হইল না।

জীবনধারার জন্যও অনেকে ইহাদের প্রতি কৌতূহলী হইয়াছিলেন। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমাজে সহজিয়া মতাবলম্বী বৈষ্ণব গুরুদের বিশেষ প্রভাব স্থাপিত হয়—সহজিয়া সাধনভজন-সংক্রান্ত অনেক পুঁথি-পুস্তিকাও রচিত হয়। তন্মধ্যে সহজিয়া চণ্ডীদাসের রাগাত্মিকা পদগুলি এই শতাব্দীতে বৈষ্ণব ও অবৈষ্ণব সমাজে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। ইতিপূর্বে আমরা 'বংশীশিক্ষা' ও 'বিবর্তবিলাস' সম্পর্কে বলিয়াছি—সহজিয়া তত্ত্ব ও কৃষ্ণদাস কবিরাজের শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তত্ত্বকথা মিশাইয়া নূতনধরনের 'পিরীতি' সাধনা বৈষ্ণবসমাজে ক্রমে ক্রমে জনপ্রিয় হইতেছিল। এই সময়ে সহজিয়াগণ নিজ নিজ সাধন-ভজন ও আচার-আচরণ জনপ্রিয় করিবার জন্য রায় রামানন্দ, কৃষ্ণদাস কবিরাজ, রূপ-সনাতন প্রভৃতি শ্রদ্ধার্হ আচার্যদের নামে পুঁথি লিখিয়া প্রচার করিতেন। এরূপ কিছু কিছু পুঁথি ('মর্ম্মনিরূপণ' 'কায়িকাপটল', 'মনঃশিক্ষা', 'ভক্তিলহরী' প্রভৃতি) কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিবিভাগে আছে। কোন কোনটিতে আবার ধর্মপুরাণোক্ত সৃষ্টিতত্ত্বও ব্যাখ্যাত হইয়াছে।[৮] এই ধরনের সহজিয়া-সংক্রান্ত মতাদর্শ দুইটি কেন্দ্র হইতে সর্বাধিক প্রচারিত হইয়াছিল—শ্রীখণ্ড ও বাঘনাপাড়া। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে শ্রীখণ্ডের রঘুনন্দন এবং বাঘনাপাড়ার রামচন্দ্র (রামাই) এই মতের প্রধান প্রবক্তা ছিলেন বলিয়া মনে হয়। তন্ত্রের দেহঘটিত সাধনা, যোগদর্শন এবং কৃষ্ণদাসের চৈতন্যচরিতামৃতের ব্যাখ্যা ও রাগানুগা ভক্তির তত্ত্বকথা মিশ্রিত করিয়া সহজিয়াগণ যে-সমস্ত আদর্শ ছড়াইতে থাকেন, তাহাই অসংখ্য পুঁথি ও পাতড়ায় বিবৃত হইয়াছে। ক্রমে ক্রমে সুফী সাধনা, বাউল ও সহজিয়া মত মিশিয়া গিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীতে দেহঘটিত রহস্যবাদী সাধনা হিন্দু ও মুসলমান সমাজে বিস্তার লাভ করে।[৯] যাহা হউক, কাব্যাংশে এই সমস্ত পুঁথিপত্রের যেরূপ মূল্যই থাক না কেন, ইহাদের ঐতিহাসিক ও সামাজিক মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

বৈষ্ণব পদাবলী ও পদাবলী সঙ্কলন॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে দুই একজন পদকর্তা কিছু কিছু কবিত্বের পরিচয়

৮. দ্রষ্টব্য: ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ইতি. (১ম, অপরার্ধ) পৃ. ৩৭৯-৮০

৯. ইহার পরে বাউল গানের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

দিলেও, এযুগ যে মৌলিক পদাবলীর যুগ নহে তাহাতে কোন সন্দেহ নাই, প্রথাপালনের জন্যও অনেক বৈষ্ণব কবি লেখনী সঞ্চালন করিয়াছেন। ফলে আন্তরিকতার স্থলে কৃত্রিম কলাকৌশল প্রাধান্য পাইয়াছে। তবে এই শতাব্দীর বৈষ্ণব সাহিত্যের একটা বড় বৈশিষ্ট্য, অনেকগুলি সঙ্কলনে বৈষ্ণবপদ সংগৃহীত হইয়াছিল—এই সঙ্কলনগ্রন্থগুলি না পাইলে বহু বৈষ্ণব পদ নষ্ট হইয়া যাইত। বস্তুতঃ এই সঙ্কলনগুলিই বৈষ্ণব কবিদিগকে বিস্মৃতির গ্রাস হইতে রক্ষা করিয়াছে। এখানে কয়েকখানি প্রধান সঙ্কলনগ্রন্থের উল্লেখ করা যাইতেছে।[১০]

১. বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর ক্ষণদাগীতচিন্তামণি—ইহাই বৈষ্ণবপদ-সঙ্কলনের আদি গ্রন্থ। সপ্তদশ শতাব্দীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ বৈষ্ণব দার্শনিক বিশ্বনাথ চক্রবর্তী বৃন্দাবনে বাসকালে এই সঙ্কলন-গ্রন্থ প্রস্তুত করেন। তিনি বাংলা ভাষায় কিছু কিছু পদও লিখিয়াছিলেন। পদে তিনি হরিবল্লভ বা বল্লভ ভণিতা ব্যবহার করিতেন। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে ('গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা) বিশ্বনাথ আনুমানিক ১৫৮৬ শকাব্দে (১৬৬৪ খ্রীঃ অঃ) নদীয়া জেলার অন্তর্ভুক্ত দেবগ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। অল্প বয়সেই তাঁহার পাণ্ডিত্যের খ্যাতি ছড়াইয়া পড়ে। ব্যাকরণ, অলঙ্কার, দর্শনে তাঁহার অসাধারণ অধিকার জন্মিয়াছিল। যদিও পিতার নির্দেশে বিশ্বনাথ বিবাহ করেন, কিন্তু ভাগবত পাঠের পর অন্তরে বৈষ্ণবভক্তি জাগ্রত হইলে সংসারের প্রতি তাঁহার আসক্তি অন্তর্হিত হয়। ইনি তরুণ বয়সে সংসার ত্যাগ করিয়া বৃন্দাবনে চলিয়া যান—এখানে অপেক্ষাকৃত অল্প বয়সে অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ইহার তিরোধান হয়। সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনশাস্ত্রে তাঁহার অসাধারণ পাণ্ডিত্য ছিল। তাঁহার রচিত তেইশখানি সংস্কৃত গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়, তন্মধ্যে ষোলখানিই টীকা।[১১] এতদ্ব্যতীত তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত কাব্যও রচনা

---

১০. এই লেখকের বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত (২য় খণ্ড), পৃ. ৫৬২-৬৩ দ্রষ্টব্য

১১. কয়েকখানি টীকার নাম :

ভাগবতের টীকা—সারার্থদর্শিনী
গীতার টীকা—সারার্থবর্ষিণী
অলঙ্কারকৌস্তুভের টীকা—সুবোধিনী
আনন্দবৃন্দাবনচম্পূর টীকা—সুখবর্তিনী
উজ্জ্বলনীলমণির টীকা—আনন্দচন্দ্রিকা

করিয়াছিলেন—'শ্রীকৃষ্ণভাবনামৃত', 'স্বপ্নবিলাসামৃত', 'সংকল্পকল্পদ্রুম',—এই-গুলিই প্রধান। পাণ্ডিত্য ও কাব্যরসে মণ্ডিত হইয়া তাঁহার গ্রন্থগুলি অপূর্ব শ্রী ধারণ করিয়াছে। এ কথা অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে, "পরবর্তী বৈষ্ণব সাহিত্যে কবি হিসাবে রূপগোস্বামী ও কবিকর্ণপূরের পরেই চক্রবর্তী মহাশয়ের স্থান।"[১২] তাঁহার 'সঙ্কল্পকল্পদ্রুম' স্তোত্রকাব্য হিসাবে সংস্কৃত বৈষ্ণবসাহিত্যে সুপ্রসিদ্ধ। কিন্তু কবিত্বের কথা বাদ দিলেও তাঁহার টীকা-টিপ্পনীগুলিতে যে অসাধারণ মনীষা, যুক্তিবাদ ও বিচক্ষণতা প্রকাশিত হইয়াছে, বলদেব বিদ্যাভূষণকে ছাড়িয়া দিলে এবিষয়ে তাঁহার সমকক্ষ পণ্ডিতের সন্ধান পাওয়া ভার। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পরকীয়াতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁহার সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ ('উজ্জ্বলনীলমণি'র টীকা 'আনন্দচন্দ্রিকা'য় ব্যাখ্যাত) বিস্ময়কর। কাব্য রচনা করিলেও তাঁহার মনটি দার্শনিকের মতো ছিল। সংস্কৃত গ্রন্থ ছাড়িয়া দিলে তাঁহার পদ ও পদাবলীসঙ্কলন উল্লেখযোগ্য।

১৬২৬ শকাব্দে বিশ্বনাথ ভাগবতের টীকা ('সারার্থদর্শিনী') সমাপ্ত করেন। ইহার অল্পদিন পরেই তাঁহার তিরোধান হয়। ভাগবতের টীকা রচনা ও তিরোধানের মধ্যবর্তী সময়ে, অর্থাৎ ১৬২৬ শকাব্দের (১৭০৪ খ্রীঃ অঃ) পর তিনি 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' নামে একখানি বৈষ্ণবপদ সঙ্কলন করেন।[১৩] বোধহয় তিনি দুইখণ্ডে (পূর্ব ও উত্তরবিভাগ) সঙ্কলনটি পূর্ণ করিতে চাহিয়াছিলেন। কারণ 'ক্ষণদা'র প্রত্যেক বিভাগের শেষে আছে—"ইতি শ্রীগীতচিন্তামণৌ পূর্ববিভাগে।" অর্থাৎ বিশ্বনাথ নিশ্চয় উত্তরবিভাগের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন। কিন্তু মৃত্যুর জন্য বোধ হয় তাহা সমাপ্ত করিয়া যাইতে পারেন নাই—আমরা 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'র শুধু পূর্ববিভাগ পাইয়াছি। ক্ষণদার অর্থ রাত্রি। ইহাতে একমাসের প্রতি রাত্রির উৎসব-সংক্রান্ত পদ সঙ্কলিত হইয়াছে—তাই ইহা তিরিশ ক্ষণদা বা রাত্রিতে বিভক্ত। নায়ক-নায়িকার বিভিন্ন পর্যায় অনুসারে সাজাইয়া বিশ্বনাথ ৪৫ জন কবির তিন শতেরও অধিক পদ সংগ্রহ করেন। তন্মধ্যে বল্লভ ও হরিবল্লভ ভণিতায় তাঁহার নিজস্ব ৪০টি পদ ইহাতে স্থান পাইয়াছে—প্রায় সবগুলি পদই ব্রজ-

১২. পদকল্পতরু (সা. প. সংস্করণ), ৫ম, পৃ. ২৩১

১৩. সতীশচন্দ্র রায়ের মতে ইহা ১৭০০ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১

বুলিতে রচিত। বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাস প্রভৃতি বহু কবির পদ স্থান পাইলেও ইহাতে চণ্ডীদাসের একটি পদও গৃহীত হয় নাই। ইহার কারণ নির্ণয় দুরূহ। কেহ কেহ বলেন, ইহাতে যে পর্যায়ে পদ বিন্যস্ত হইয়াছে, (যেমন—সংক্ষিপ্ত সম্ভোগ, বয়ঃসন্ধি, মুগ্ধা ইত্যাদি) চণ্ডীদাসের সেই পর্যায়ের কোন উৎকৃষ্ট পদ নাই বলিয়া ইহাতে তাঁহার কোন পদ গৃহীত হয় নাই। এই যুক্তি কিন্তু পুরাপুরি মানিয়া লওয়া যায় না। কারণ যে পর্যায় অনুসারে 'ক্ষণদা' বিন্যস্ত হইয়াছে, চণ্ডীদাসের সেই পর্যায়ের কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ আছে, বিশ্বনাথ ইচ্ছা করিলে তাহা সঙ্কলনে গ্রহণ করিতে পারিতেন। সপ্তদশ শতাব্দীতেও চণ্ডীদাসের পদ অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তাই 'ক্ষণদাগীত-চিন্তামণি'তে তাঁহার কোন পদ কেন গৃহীত হয় নাই, তাহা চিন্তার বিষয় বটে। কিন্তু আমাদের মনে হয়, বিশ্বনাথ দুই পর্বে 'ক্ষণদা' সঙ্কলন করিবেন এইরূপ মনস্থ করিয়াছিলেন। আকস্মিক মৃত্যু বা যে কোন কারণেই হোক, তিনি উত্তরপর্ব সঙ্কলন করিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক বিশ্বনাথের এই সঙ্কলনটি প্রথম বৈষ্ণব-পদসঙ্কলন বলিয়া বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি নিজেও কিছু কিছু পদ লিখিয়াছিলেন, কিন্তু এই সমস্ত পদ "স্বয়মাগতা" নহে বলিয়া ইহাদের মধ্যে আন্তরিকতার সুর অতি ক্ষীণ।[১৪] নগেন্দ্রনাথ গুপ্ত সঙ্কলিত বিদ্যাপতির পদে হরিবল্লভ ভণিতায় রচিত বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর পদগুলি বিদ্যাপতির বলিয়া মুদ্রিত হইয়াছে। এরূপ সিদ্ধান্তের পক্ষে কোন যুক্তি নাই। কারণ ক্ষণদা ও পদকল্পতরুতে হরিবল্লভ-বল্লভ ভণিতার পদগুলির অধিকাংশই বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর রচনা।[১৫]

১৪. এবিষয়ে 'পদকল্পতরু'র সম্পাদক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় যথার্থ বলিয়াছেন, "সুপ্রসিদ্ধ সংস্কৃতের কবিকর্ণপূরের ন্যায় তিনিও ভাষাপদ রচনায় বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইতে পারেন নাই। বৈষ্ণব পদকর্তাদিগের গণনায় কবিকর্ণপুর ওরফে পরমানন্দ সেনের ন্যায় বিশ্বনাথ ওরফে হরিবল্লভের স্থান অনেক নীচে।"—পদ. ৫ম. পৃ. ২৩১

১৫. বৈষ্ণব সাহিত্যে একাধিক বল্লভদাস পদ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে একজন কবিরাজ উপাধিধারী এবং শ্রীনিবাস আচার্যের শিষ্য। তিনি পদকর্তা হিসাবেই প্রসিদ্ধ। নরোত্তম, শ্রীনিবাস ও রামচন্দ্র কবিরাজের স্তবস্তুতি করিয়া কয়েকটি পদ লিখিয়াছিলেন। আর একজন বল্লভদাস চৈতন্য সমসাময়িক ও চৈতন্যভক্ত বংশীবদন চট্টোর পৌত্র শ্রীবল্লভ অনেক পদ লিখিয়াছিলেন। 'বংশীলীলা' শীর্ষক পুস্তিকাও তাঁহার রচনা। বল্লভের পদগুলির কোন কোনটিতে যে ভণিতার গোলমাল ঘটে নাই এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না।

২. **নরহরির পদসঙ্কলন** গ্রন্থ—ভক্তিরত্নাকরের রচনাকার, পণ্ডিত, কবি ও সঙ্গীতরসজ্ঞ নরহরি চক্রবর্তী (ঘনশ্যাম) দুইখানি পদসঙ্কলন প্রস্তুত করিয়াছিলেন—'গীতচন্দ্রোদয়' ও 'গৌরচরিত্রচিন্তামণি'। গীতচন্দ্রোদয়ের দুইখানি পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। শিবচন্দ্র শীলের নিকট যে পুঁথিটি ছিল,[১৬] নবদ্বীপের হরিবোলা কুটীরের পূজ্যপাদ হরিদাস দাস তাহা অবলম্বনে যে পদসংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন (১৯৪৮), তাহাতে মোট ১১৭১টি পদ আছে। ত্রিপুরা রাজদরবারে যে পুঁথিটি[১৭] আছে, তাহাতে নাকি ১৪৪৬ পদ স্থান পাইয়াছে।[১৮] মনে হয় মূল 'গীতচন্দ্রোদয়ে'র পুঁথিতে আরও অনেক পদ ছিল। নরহরি সমস্ত পদকে আট অংশে বিভক্ত করিয়া নানা 'আস্বাদ' বা উপবিভাগে বিন্যাস করিয়া বিরাট সঙ্কলনের পরিকল্পনা করিয়াছিলেন।[১৯] এই পরিকল্পনা অনুযায়ী সমস্ত অধ্যায় ও লীলাপর্যায় সঙ্কলিত হইতে পারিয়াছিল কিনা বুঝা যাইতেছে না। সঙ্গীতশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ নরহরি ইহাতেও সঙ্গীতবিষয়ক নানা তত্ত্বকথা সন্নিবিষ্ট করিতে চাহিয়াছিলেন। তাঁহার 'গৌরচরিত চিন্তামণি'-ও হরিদাস দাস কর্তৃক প্রকাশিত হইয়াছে (১৯৪৭)। ইহাতে শুধু গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগৃহীত হইয়াছে; পদের সংখ্যা ৩৭১। এই অভিনব সঙ্কলনটির বিশেষ প্রচার হয় নাই কেন, তাহা চিন্তার বিষয়—প্রচার হইলে ইহার একাধিক পুঁথি মিলিত।

৩. রাধামোহন ঠাকুরের পদামৃতসমুদ্র—শ্রীনিবাস আচার্যের প্রপৌত্র রাধামোহন ঠাকুর অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে ('গীতচন্দ্রোদয়ে'র পরে ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে) 'পদামৃতসমুদ্র' শীর্ষক এক পদসঙ্কলন প্রস্তুত করেন। ইনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শুধু বৈষ্ণবসমাজেই নহে, বৃহত্তর হিন্দুসমাজেও বিশেষ শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছিলেন। পাণ্ডিত্য, কবিত্ব ও বৈষ্ণবশাস্ত্রে অগাধ

১৬. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকা, ১৩০৮

১৭. ত্রিপুরার পুঁথিতে প্রায় আড়াই হাজার পদ ছিল। HBBL, p. 279

১৮. ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ইহার একখানি খণ্ডিত পুঁথি আছে। Ibid, p. 279

১৯. সতীশচন্দ্র রায়ের মতে 'গীতচন্দ্রোদয়' ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কারণ নরহরির পিতার গুরু বিশ্বনাথ চক্রবর্তীর 'ক্ষণদাগীতচিন্তামণি' ১৭০০ খ্রীঃ অব্দের দিকে সঙ্কলিত হইলে নরহরির 'গীতচন্দ্রোদয়' নিশ্চয় ইহার বিশ-পঁচিশ বৎসর পরে সঙ্কলিত হইয়া থাকিবে।

জ্ঞানের জন্য[20] তিনি বিশিষ্ট অভিজাত বংশের গুরুর স্থান লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার শিষ্য মহারাজ নন্দকুমার ইতিহাসপ্রসিদ্ধ ব্যক্তি।[21] যাহা হউক 'পদামৃতসমুদ্র' সঙ্কলনগ্রন্থ হিসাবে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছে। ইহার মোট পদসংখ্যা—৭৪৬; তন্মধ্যে স্বয়ং সঙ্কলক নিজের ২৩৮টি পদ ইহাতে গ্রহণ করিয়াছেন। গোবিন্দদাস ও রাধামোহনের মিলিত পদসংখ্যা প্রায় পাঁচশত, অন্যান্য পদকর্তাদের মাত্র আড়াই শত পদ গৃহীত হইয়াছে। পদের ধ্বনি-ঝঙ্কার, যাহা কীর্তনগানে বেশী ব্যবহৃত হয়, রাধামোহন সেই দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই ইহা সঙ্কলন করিয়াছিলেন। কাজেই ইহাতে ঝঙ্কারমুখর ও আলঙ্কারিক কলারীতিতে উজ্জ্বল গোবিন্দদাসের পদের সংখ্যাই সর্বাধিক। তবে সঙ্কলক এতগুলি নিজের পদ গ্রহণ করিয়া সুবিবেচনার পরিচয় দেন নাই। কারণ তাঁহার পদগুলি গোবিন্দদাসের অনুকরণ মাত্র; কিঞ্চিৎ ধ্বনিঝঙ্কার থাকিলেও উহাদের এমন কোন উৎকৃষ্ট কাব্যগুণ নাই যাহার জন্য সঙ্কলনে এতগুলি পদ স্থান দিতে হইবে। এ বিষয়ে রাধামোহন বৈষ্ণবীয় বিনয়ের ততটা পরিচয় দিতে পারেন নাই। সে যাহা হউক, তিনি সঙ্কলিত পদগুলির 'মহাভাবানুসারিণী' নামক যে সংস্কৃত টীকা করিয়াছিলেন তাহাতে পাণ্ডিত্য ও রসজ্ঞতার চমৎকার পরিচয় পাওয়া যায়। অবশ্য তাঁহার টীকা-টিপ্পনী জনপ্রিয় হইলেও আধুনিক কালের কোন কোন পণ্ডিত ইহাকে পুরাপুরি স্বীকার করেন নাই। সতীশচন্দ্র এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "তিনি নিজের সঙ্কলিত 'পদামৃত সমুদ্র' গ্রন্থের যে সংস্কৃত টিপ্পনী রচনা করিয়া এই গ্রন্থের

---

২০. সে যুগে বৈষ্ণবসমাজে স্বকীয়া ও পরকীয়া তত্ত্ব লইয়া তত্ত্বগত বিরোধ ঘনাইয়াছিল। রাধা কৃষ্ণের স্বকীয়া, না পরকীয়া নায়িকা—ইহা লইয়াই বিরোধের সূচনা। এই মতান্তর চৈতন্যদেবের সময় হইতেই চলিয়া আসিতেছিল। সনাতন-রূপ-জীব গোস্বামীকে বহু পরিশ্রম করিয়া স্বকীয়া-পরকীয়া দ্বন্দ্ব মিটাইতে হইয়াছিল। যাহা হউক ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে এই বিষয় লইয়া বৈষ্ণবসমাজে চূড়ান্ত আকারে মতভেদ দেখা দিলে এক তর্ক সভা অনুষ্ঠিত হয়। রাধামোহন তাহাতে পরকীয়া তত্ত্বের পক্ষ লইয়া জয়লাভ করেন। এই ব্যাপার লইয়া এমনই কৌতূহল-উত্তেজনা সৃষ্টি হইয়াছিল যে, এই ঘটনা সুবাদার মুর্শিদ কুলি খাঁ কর্তৃক স্বীকৃত হইয়াছিল।

২১. অথচ মহারাজ নন্দকুমার শাক্তপন্থী ছিলেন, শাক্তপদও লিখিয়াছিলেন, খুব ঘটা করিয়া দুর্গা, কালী প্রভৃতি দেবীর পূজা করিতেন। মুমূর্ষু মিরজাফরকে তিনি কিরীটেশ্বরী দেবীর চরণামৃত পান করাইয়াছিলেন বলিয়া শুনা যায়।

সহিত সংযোজিত করিয়া গিয়াছেন, উহা হইতে পদাবলীর পাঠান্তরের ও দুরূহ বাক্যসমূহের অর্থনির্ণয়ে আশানুরূপ সাহায্য না পাওয়া গেলেও, তাঁহার সংক্ষিপ্ত অথচ পাণ্ডিত্যপূর্ণ রসবিশ্লেষণ দ্বারা রসজ্ঞ পণ্ডিত পাঠকদিগের যথেষ্ট জ্ঞান-লাভ হইয়া থাকে" (পদকল্প, ৫ম, পৃ. ২)। ইহাতে প্রায় ৩৯ জন কবির পদ সংগৃহীত হইয়াছে।[২২] রাধামোহনের অনেক পদ (১৮২টি) বৈষ্ণবদাসের 'পদকল্পতরু'তে গৃহীত হইয়াছে। তিনি গোবিন্দদাসের ব্রজবুলির অনুসরণে যে সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন তাহা নিতান্তই অনুকরণমূলক। যথা :

অপরুব দিনহি কুঞ্জমণি মণ্ডপে
শিতল পবন বহ মন্দ।
দ্বিজকুল নাদ সুবাদন যৈছন
মনমথ গন্থক ছন্দ॥
জয় রাধা মাধব মেলি।
দুহুঁক প্রেমলব কো করু অনুভব
যবহুঁ সুরতরস কেলি॥
তহিঁ পুন অতিশয় নাগরি আগরি
অতএ সে নিমীলিত আঁখি।
আনন্দসিন্ধু নিবেশহিঁ মোহিত
দেয়ই প্রতিঅঙ্গ সাখী॥

৪. বৈষ্ণবদাসের পদকল্পতরু—বৈষ্ণব পদের সর্ববৃহৎ ও সর্বশ্রেষ্ঠ সঙ্কলন 'পদকল্পতরু' সমগ্র ভারতীয় সাহিত্যের এক অভিনব সংগ্রহ। ইহাকে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় বলিয়াছেন, "This work can be said to be the most representative and exhaustive anthology of Vaiṣṇava Lyrics—a veritable Veda of Bengali Vaiṣṇava religious poetry (HBBL, P. 5). ইহা অতিশয় যুক্তিসঙ্গত। এই সঙ্কলনের

২২. পদকারদের নাম : জয়দেব, বিদ্যাপতি, চণ্ডীদাস, সনাতন, গোবিন্দদাস কবিরাজ, গোবিন্দ চক্রবর্তী, নয়নানন্দ, বৃন্দাবন দাস, রামানন্দ রায়, অনন্ত দাস, যদুনন্দন, বলরাম দাস, জ্ঞানদাস, বংশীবদন, বংশীদাস, সুবল, কবিশেখর, কবিরঞ্জন, চম্পতি, সিংহভূপতি নৃপতিসিংহ, নরোত্তম দাস, জগন্নাথ দাস, শেখর রায়, মুরারি গুপ্ত, মাধো, ঘনশ্যাম, মাধব ঘোষ, মাধব আচার্য, বীরনারায়ণ, বিজয় নারায়ণ, বাসুদেব ঘোষ, শ্রীনিবাস দাস, শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদ, নরহরি, গোপাল দাস, লোচনদাস, বল্লব দাস, রাধামোহন।

সাহায্যেই সমগ্র বৈষ্ণব সাধনার শিল্পরূপ অবধারণ করিতে পারা যায়। সঙ্কলক গোকুলানন্দ সেন এই সুবৃহৎ সঙ্কলনে যে পরিশ্রম করিয়াছেন এবং যেরূপ রসজ্ঞতার পরিচয় দিয়াছেন, সেরূপ কোন তুলনা আধুনিক যুগেও পাওয়া যায় না।

গোকুলানন্দ সেন বৈষ্ণবদাস নামে পদ লিখিতেন। বৈদ্যবংশোদ্ভূত কবির নিবাস ছিল মুর্শিদাবাদ জেলার টেঞা-বৈদ্যপুর গ্রাম। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ পদকর্তা উদ্ধব দাসের (কৃষ্ণকান্ত মজুমদার) সঙ্গে তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। ১৭১৮ খ্রীঃ অব্দে রাধামোহন ঠাকুরের নেতৃত্বে স্বকীয়া ও পরকীয়া লইয়া যে বিতর্ক উপস্থিত হয়, সেই সভায় গোকুলানন্দ উপস্থিত ছিলেন—মনে হয়, তখন তিনি নবযুবক। সুতরাং অনুমান হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে তাঁহার জন্ম। জগদ্বন্ধু ভদ্রের মতে কবি ছিলেন রাধামোহন ঠাকুরের মন্ত্রশিষ্য।[২৩] ইহা সত্য হইতে পারে। কারণ গোকুলানন্দ 'পদকল্পতরু'তে শুধু গুরু বলিয়াই রাধামোহনের ১৮২টি সাধারণ শ্রেণীর পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। গোকুলানন্দ একজন সুদক্ষ কীর্তনিয়াও ছিলেন। তিনি যে বিশেষ গায়নপদ্ধতি অনুসরণ করিয়া কীর্তন গাহিতেন তাহা 'টেঞার ছপ' (অর্থাৎ টেঞা গ্রামের বিশেষ ঢঙ) নামে পরিচিত। বৈষ্ণব সাহিত্যে তাঁহার প্রতিভার শ্রেষ্ঠ প্রমাণ 'পদকল্পতরু' সঙ্কলন। প্রথমে ইহার নাম ছিল 'গীতকল্পতরু':

এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।
পূর্বরাগাদি ক্রমে চারি শাখা যার॥

পরে ইহা 'পদকল্পতরু' নামে বিখ্যাত হয়। গোকুলানন্দ রাধামোহনের 'পদামৃতসমুদ্রে'র আদর্শে এই সঙ্কলনের পরিকল্পনা করেন। প্রথমে তিনি 'পদামৃতসমুদ্র' অবলম্বনে কীর্তন গান করিতেন। তখনই তাঁহার মনে আর

২৩. 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা দ্রষ্টব্য। কবি 'পদকল্পতরু'র শেষে অনুবাদ-প্রকরণে এইভাবে উল্লেখ করিয়াছেন:

শ্রীআচার্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥

কিন্তু কবি তাঁহার কোন পদে রাধামোহনকে গুরু বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। তাই কেহ কেহ মনে করেন, কবির গুরু রাধামোহন আর পদামৃতসমুদ্রের রাধামোহন এক ব্যক্তি নহেন। কবির গুরু রাধামোহন কবিরই স্বগ্রামনিবাসী দ্বিজ হরিদাসের বংশধর। দ্রষ্টব্য: সা—প—প, ১৩১২, পৃ. ৬৫—৬৯

একটি বৃহৎ সঙ্কলনগ্রন্থের ইচ্ছা জাগে। তখন তিনি নানা স্থান পর্যটন করিয়া বহু পদ সংগ্রহ করেন। 'পদামৃত' হইতে বহু পদ লইয়া এবং নিজের সংগৃহীত পদসমূহ একত্র করিয়া তিনি এই 'গীতকল্পতরু' বা 'পদকল্পতরু' সংগ্রথিত করেন। 'পদকল্পতরু'র সমাপ্তিতে গ্রন্থ অনুবাদ প্রকরণে তিনি বলিয়াছেন :

শ্রীআচার্য প্রভুবংশ শ্রীরাধামোহন।
কে কহিতে পারে তার গুণের বর্ণন॥
যাহার বিগ্রহে গৌরপ্রেমের নিবাস।
যেন শ্রীআচার্য প্রভুর দ্বিতীয় প্রকাশ॥
গ্রন্থ কৈলা পদামৃত সমুদ্র আখ্যান।
জন্মিল আমার লোভ তাহা করি গান॥
নানা পর্যটনে পদ সংগ্রহ করিয়া।
তাহার যতেক পদ সব তাহা লৈয়া॥
সেই মূল গ্রন্থ অনুসারে ইহা কৈল।
প্রাচীন প্রাচীন পদ যতেক পাইল॥
এই গীতকল্পতরু নাম কৈলুঁ সার।
পূর্বরাগাদিক্রমে চারি শাখা যার॥

কেহ কেহ মনে করেন ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর একেবারে শেষের দিকে সঙ্কলিত হইয়াছিল। কিন্তু দেখা যাইতেছে ১৭১৮ সালের দিকে স্বকীয়া-পরকীয়া বিতর্ক সভায় যুবক-কবি উপস্থিত ছিলেন। সুতরাং ইহা অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সঙ্কলিত হইয়াছিল মনে হয়। এই বৃহত্তম বৈষ্ণবপদ-সঙ্কলনে প্রায় ১৪০ জন পদকর্তার তিন হাজারেরও অধিক পদ সংগৃহীত হইয়াছে। চারি শাখায় বিভক্ত ইহার প্রথম শাখায় ১১টি 'পল্লব' (অধ্যায়), দ্বিতীয় শাখায় ২৪, তৃতীয় শাখায় ৩১, এবং চতুর্থ শাখায় ৩৬টি পল্লব আছে। গোকুলানন্দ ইহাতে কোন টীকা সংযোজন না করিলেও বৈষ্ণব রসশাস্ত্র হইতে যে সমস্ত প্রবেশক শ্লোক যোগ করিয়া দিয়াছেন, তাহাতে পদবিন্যাসপদ্ধতি সাধারণ পাঠকের নিকটেও সুবোধ্য বলিয়া বোধ হইবে। কবি প্রধান প্রধান পদকর্তাদের যে সমস্ত পদ নির্বাচিত করিয়াছেন তাহার সংখ্যা :—গোবিন্দদাস কবিরাজ—৪০৬, চণ্ডীদাস (অদি-দ্বিজ বড়ু)—১১৮, জ্ঞানদাস—১৮৬, বলরামদাস—১৩৬, বিদ্যাপতি—১৬৩। কবির বন্ধু দীনবন্ধু দাসের—৯৯টি পদ এবং কবির গুরু বলিয়া পরিচিত 'পদামৃতসমুদ্রে'র সঙ্কলক

রাধামোহনের ১৮২টি মধ্যম শ্রেণীর পদ সংগ্রহে কবি কিছু বন্ধুপ্রীতি, কিছু গুরুভক্তির দ্বারা প্রভাবিত হইয়াছিলেন। কবি নিজেও বৈষ্ণবদাস ভণিতায় পদ রচনা করিতেন। কিন্তু অত্যন্ত প্রশংসার বিষয়, তিনি মাত্র ২৬টি স্বরচিত পদ এই সুবৃহৎ সঙ্কলনে স্থান দিয়াছেন—এ বিষয়ে তাঁহার বৈষ্ণবীয় বিনয় বিস্ময়কর। বহু বৈষ্ণবপদসঙ্কলক এইরূপ বিনয়ের পরিচয় দিতে পারেন নাই। তাঁহারা অনেক সময় চক্ষুলজ্জা বিসর্জন দিয়া নিজেদের অসংখ্য তৃতীয় শ্রেণীর পদ নিজ নিজ সঙ্কলনে চালাইয়া দিয়াছেন। অবশ্য গোকুলানন্দের পদগুলিতে যে বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই, তাহা তিনি জানিতেন—তাই বোধ হয় মাত্র কয়েকটি নিজস্ব পদ সংযোজিত করিয়াছিলেন। যাহা হউক গোকুলানন্দ সেন বহু বৈষ্ণব কবিকে বিস্মৃতির কালগ্রাস হইতে রক্ষা করিয়া বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে বিখ্যাত হইয়া থাকিবেন।

অন্যান্য পদসঙ্কলন—উপরি-লিখিত পদসঙ্কলনগুলিতে সমুদ্রবৎ বিশাল বৈষ্ণব সাহিত্যের বহু পদ সংগৃহীত হইলেও পরবর্তী কালে অনেক কবি পদ রচনা করিয়াছিলেন, যাঁহাদের পদ ঐ সমস্ত সঙ্কলনে স্থান পায় নাই। সঙ্কলকগণ গ্রন্থের পরিধি হ্রাস করিবার জন্য অনেক সময় নির্মমভাবে অনেক পদ বাদ দিয়েছেন—কোন কোন পদকর্তা সম্পূর্ণ বাদ পড়িয়াও গিয়াছেন। তাই অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে কোন কোন সঙ্কলক নূতনভাবে পদ-সঙ্কলনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। অষ্টাদশ শতাব্দীতে সঙ্কলিত 'কীর্তনানন্দ' ('সঙ্কীর্তনানন্দ'), ও 'সঙ্কীর্তনামৃত' এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। গোকুলানন্দের সমসাময়িক গৌরসুন্দর দাস ৬০ জন কবির প্রায় সাড়ে ছয়শত পদ সঙ্কলন করেন—ইহাই 'কীর্তনানন্দ' নামে পরিচিত। মুর্শিদাবাদ হইতে বনোয়ারীলাল গোস্বামী ইহা প্রকাশ করেন। গোকুলানন্দ সেন ও গৌরসুন্দর সমসাময়িক হইলেও গৌরসুন্দর নিজ সঙ্কলনে বৈষ্ণবদাসের কোন পদ উল্লেখ করেন নাই, কিন্তু 'পদকল্পতরু'তে গৌরসুন্দরের ভণিতায় ৫টি পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ইনি সঙ্কলক গৌরসুন্দর হইতে পারেন। তবে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় এ বিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন।[২৪] কারণ পদসাহিত্যে গৌরদাস ও গৌরসুন্দর দাসের ভণিতায় কিছু কিছু পদ পাওয়া

২৪. পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৪

গিয়াছে। ইহার মধ্যে কে কীর্তনানন্দের যথার্থ সঙ্কলক তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে।

দীনবন্ধু দাস 'সঙ্কীর্তনামৃত' শীর্ষক যে পদসঙ্কলন গ্রথিত করিয়াছিলেন নানা দিক দিয়া তাহা উল্লেখযোগ্য। মূল পুঁথিটি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের সংগ্রহে ছিল। তিনি সমস্ত পুঁথির সঙ্গে 'সঙ্কীর্তনামৃতে'র পুঁথিটিও সাহিত্য পরিষদে দান করেন। পরে অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের সম্পাদনায় ইহা সাহিত্য পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। পুঁথিতে ১৭৯৩ শকাব্দের (১৭৭১ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ রহিয়াছে দেখিয়া মনে হয় সঙ্কলক অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকেই বর্তমান ছিলেন। ইহাতে ৪০ জন কবির লেখা প্রায় পাঁচশত পদ গ্রথিত হইয়াছে। তন্মধ্যে প্রায় অর্ধেক পদই স্বয়ং দীনবন্ধুর রচনা। কবি বৈষ্ণবশাস্ত্রে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন। ইহাতে তিনি রসশাস্ত্রের সংজ্ঞা দিয়া যেন ব্যাখ্যার জন্যই নানা পদ উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং ইহা শুধু সঙ্কলন না হইয়া বৈষ্ণব রসশাস্ত্রের ব্যাখ্যায় পরিণত হইয়াছে। সঙ্কলকের কিঞ্চিৎ কবিত্বশক্তি ছিল, কিন্তু তাই বলিয়া সঙ্কলনের প্রায় অর্ধেক পদ স্বয়ং সঙ্কলকের রচনা, ইহাও যুক্তিসঙ্গত নহে। আর একটা কথা—ইহাতে সঙ্কলক দীনবন্ধু কবি চণ্ডীদাসের একটা পদও গ্রহণ করেন নাই—ইহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। কবি শ্রীখণ্ডের প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব সরকারবংশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি বৈষ্ণবশাস্ত্র ও সাহিত্যে পরম প্রাজ্ঞ ছিলেন, অথচ চণ্ডীদাসের পদ কেন সংগ্রহ করিলেন না তাহার কারণ দুর্জ্ঞেয়। সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় বলিয়াছেন (পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ৫), তিনি 'পদকল্পতরু'র ৫ম খণ্ডে দেখাই-বেন যে, কেন দীনবন্ধু চণ্ডীদাসের কোন পদ সংগ্রহ করেন নাই।' কিন্তু রায়মহাশয় পরে চণ্ডীদাস প্রসঙ্গে এ বিষয়ে কিছু বলেন নাই। কেহ কেহ মনে করেন, দীনবন্ধু অষ্টাদশ শতাব্দীরও পূর্ববর্তী সঙ্কলক। তাই তাঁহার সঙ্কলনে চণ্ডীদাসের কোন পদ উদ্ধৃত হয় নাই।[২৫] ইহাও খুব যুক্তিসঙ্গত মনে হয় না। কারণ সপ্তদশ শতাব্দীর শেষে চণ্ডীদাসের নানা পদ সমগ্র দেশে যথেষ্ট জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। তবে সঙ্কলনগ্রন্থগুলি অধিকাংশ ক্ষেত্রে কীর্তনের জন্য প্রস্তুত হইত বলিয়া চণ্ডীদাস অপেক্ষা গোবিন্দদাসাদির

২৫. "Caṇḍidāsa too is entirely absent, which is a strong point in favour of its comparative antiquity." Dr. S K Sen—HBBL, p. 308

ঝঙ্কারমুখর পদাবলী অধিক গৃহীত হইত। কিন্তু দীনবন্ধুর 'সঙ্কীর্তনামৃতে' চণ্ডীদাসের একটি পদও নাই ইহা বিস্ময়ের কথা বটে। শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন কাব্যতীর্থ মহাশয় এই 'সঙ্কীর্তনামৃত' অবলম্বনে ১৩২৬ সালের 'নারায়ণ' (কার্তিক সংখ্যা) পত্রে 'সঙ্কীর্তনামৃত' নামে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন তাহার এক স্থানে তিনি এইরূপ মন্তব্য করেন : "আশ্চর্যের বিষয়, যে চণ্ডীদাসের নাম বাঙ্গালীর অস্থিমজ্জার সহিত মিশিয়া গিয়াছে, তাঁহার একটি পদও আলোচ্য গ্রন্থে উদ্ধৃত হয় নাই। আরও আশ্চর্যের বিষয় এই যে, বর্তমানে আমরা যাহাকে চণ্ডীদাসের পদ বলি, দীনবন্ধু দাসের কয়েকটা পদে তাহার স্বর যেন বিলক্ষণ অনুভূত হইয়া থাকে।" দীনবন্ধু চণ্ডীদাসের অনুকরণে পদ লিখিয়াছিলেন বলিয়াই বোধ হয় উত্তমর্ণের নাম ও পদ চাপিয়া গিয়াছেন—উক্ত মন্তব্য হইতে এইরূপ একটা তাৎপর্য বাহির হইয়া পড়ে। যিনি গোটা সঙ্কলনে অনেক ভাল পদ বাদ দিয়া প্রায় অর্ধেকটা নিজের মধ্যম শ্রেণীর পদের দ্বারা ভরাইয়া দিতে পারেন, তিনি চণ্ডীদাসের পদ সম্পূর্ণ বাদ দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই।

ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে কমলাকান্ত দাসের 'পদরত্নাকর' (১৮০৬-১৮০৭), নিমানন্দ দাসের 'পদরসসার', গৌরমোহন দাসের 'পদকল্প-লতিকা' প্রভৃতি সঙ্কলনগুলি মূলতঃ পুঁথি-আশ্রয়ী। কিন্তু ছাপার যুগেও কিছু কিছু নূতন সঙ্কলন প্রকাশিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বটতলা প্রকাশিত 'পদকল্পলতিকা'র নাম উল্লেখযোগ্য। কারণ একদা ইহা বাংলার গ্রামাঞ্চলে অতিশয় জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। চুঁচুড়ার অক্ষয়চন্দ্র সরকারের 'প্রাচীন কবিতাসংগ্রহ' (১২৮৫ সাল), জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী' এবং রবীন্দ্রনাথ ও শ্রীশচন্দ্র মজুমদারের সম্পাদনায় প্রকাশিত 'পদরত্নাবলী' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। তন্মধ্যে জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী' অতিশয় মূল্যবান। ইহাতে সম্পাদক প্রায় দেড় হাজার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সঙ্কলন করিয়া বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন।[২৬]

---

২৬. ডঃ সেন বৃন্দাবন দাস নামক এক সঙ্কলকের 'রসনির্যাস' শীর্ষক একখানি সঙ্কলনের কথা বলিয়াছেন (HBBL)। তাঁহার মতে এই বৃন্দাবন দাস অষ্টাদশ শতকের প্রথম দিকে বর্তমান ছিলেন। ইনি খুব সম্ভব শ্রীখণ্ডের অধিবাসী ছিলেন। কারণ ডঃ সেন পুঁথিটি শ্রীখণ্ড হইতেই সংগ্রহ করিয়াছেন। এই বৃন্দাবন দাস বোধ হয় শেষজীবন বৃন্দাবন ধামেই অতিবাহিত করেন। এই সঙ্কলনে প্রায় ৪০ জন পদকর্তার পদ সংগৃহীত হইয়াছে। ডঃ সেন ইহা হইতে একটি বিচিত্র

এই প্রসঙ্গে আর একটি রহস্যজনক ও সন্দেহসঙ্কুল সঙ্কলনের নাম উল্লেখ করি। ইহা বৈষ্ণব আলোচক মহলে 'পদসমুদ্র' নামে পরিচিত। বৈষ্ণবভক্ত ও বৈষ্ণব সাহিত্যরসিক হুগলীর বদনগঞ্জ নিবাসী হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি নানা পত্র-পত্রিকায় প্রবন্ধ লিখিয়া যে সমস্ত নূতন পদ উদ্ধৃত করিতেন, সে সম্বন্ধে তিনি জানাইয়াছিলেন যে, তাঁহার অতিবৃদ্ধ প্রপিতামহের সমসাময়িক বাবা আউল মনোহর দাস নামক প্রসিদ্ধ বৈষ্ণব মোহান্ত প্রায় পনের হাজার পদের এক বিরাট পদাবলী সঙ্কলন করেন—ইহার নাম 'পদসমুদ্র'। তাহাতে 'পদকল্পতরু'র পাঁচ গুণ পদ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় উক্ত বিরাট পুঁথি মুদ্রিত করেন নাই, কাহাকে দেখিতেও দেন নাই। এমন কি, কলিকাতার কোন এক প্রকাশক ইহা দুই হাজার টাকায় কিনিতে চাহিলেও ভক্তিনিধি মহাশয় উহা হাতছাড়া করেন নাই।[২৭] ইহাতে 'গৌর-পদতরঙ্গিণী'র সম্পাদক জগদ্বন্ধু ভদ্র এবং বাংলা সাহিত্যের ঐতিহাসিক দীনেশচন্দ্র কিছু সন্দিহান হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে ভক্তিনিধি মহাশয় সাধনোচিতধামে প্রস্থান করিলে এ বিষয়ে আর কোন সন্ধান করা গেল না, সন্দেহের কারণ থাকিলেও জগদ্বন্ধু ভদ্র অতঃপর এ বিষয়ে নীরব হইলেন।[২৮]

পদ উদ্ধার করিয়াছেন। ইহা হইতে গোবিন্দ দাস ভণিতায় একটি শাক্ত পদ—অর্ধনারীশ্বরের পদ (পূর্বে তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে আমরা গোবিন্দদাস প্রসঙ্গে এই পদের কিয়দংশ উল্লেখ করিয়াছি) পাওয়া গিয়াছে। ইহার খানিকটা 'প্রেমবিলাসে'ও উল্লিখিত হইয়াছে। পদটির আরম্ভ এইরূপ :

হেম হেমগিরি দুই তনু চিরি
আধ নর আধ নারী।
আধ উজর আধ কাজর
তিনই লোচন ধারী।
দেখ দেখ দুহুঁ মিলিত এক গাত।
ভকতক ভুবনবন্দিত
ভুবন মারতি তাত।

২৭. 'গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকায় জগদ্বন্ধু ভদ্রের মন্তব্য।

২৮. "সন্দেহ করিবার প্রচুর কারণ আছে। কিন্তু ভক্তিনিধি মহাশয় এখন গৌরধামে গোলোকে। তথা হইতে তাঁহাকে টানিয়া আনিবার চেষ্টা নিষ্ঠুর ও অসভ্যের কাজ, অতএব আমরা নীরব রহিলাম।" ('গৌরপদতরঙ্গিণী'র ভূমিকা)

অবশ্য তিনি নীরব হইলেও ভক্তিনিধির উপর কিছু অনৃতাচারের অভিযোগ আসিয়া পড়ে তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। পরে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয় ভক্তিনিধিকে এইরূপ অভিযোগ হইতে রক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। তাঁহার মতে, সন্দেহের কারণ থাকিলেও প্রকৃষ্ট প্রমাণ না পাইলে একজন বিশিষ্ট বৈষ্ণব ভক্তের বিরুদ্ধে এরূপ অভিযোগ উচ্চারণ করা শোভন নহে। তবে ইতিহাস ও সত্যের খাতিরে সন্দেহ প্রকাশ করাই ভালো—ব্যক্তির প্রতি ভক্তি-অনুরক্তি ত্যাগ করা সত্য নির্ধারণের পক্ষে অতি প্রয়োজন। ভক্তিনিধি মহাশয় আরও নানা বিষয়ে যেরূপ সংশয় সন্দেহ জিয়াইয়া রাখিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহার প্রচারিত 'পদসমুদ্রে'র অস্তিত্বের বিষয়ে সন্দেহ উপস্থিত হওয়াই স্বাভাবিক। সতীশচন্দ্র ভক্তিনিধির পক্ষ অবলম্বন করিয়াও স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছেন যে, তথাকথিত 'পদসমুদ্রে' আছে বলিয়া ভক্তিনিধি প্রচারিত রামীর ভণিতাযুক্ত পদ এবং বিদ্যাপতির পদের "লছিমাচরণ ধ্যান কবিতা নিকসয়ে" প্রভৃতি অংশ সম্পূর্ণ অসম্ভব"।[২৯] তাঁহার মন্তব্য—"কিন্তু তা বলিয়াই কি ভক্তিনিধি মহাশয় বাহাদুরী লওয়ার জন্য এই সকল রচনা জাল করিয়া 'পদসমুদ্রে'র নামে প্রকাশিত করিয়া গিয়াছেন—এরূপ মনে করা যাইতে পারে?" আমাদের মতে—এইরূপই মনে করা যাইতে পারে। ভক্তিনিধির কাছে পনের হাজার পদের কোন সঙ্কলন কস্মিনকালেও যে ছিল না সে বিষয়ে সতীশচন্দ্র নিঃসন্দেহ।[৩০] তবে তাঁহার বিশ্বাস, "পদসমুদ্রের পুঁথির কিয়দংশ ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল; তিনি উহা হইতেই এইরূপ অনেক অজ্ঞাতপদ তাঁহার লেখায় উদ্ধৃত করিয়াছেন।" অথচ তিনি পুঁথিখানা কাহাকেও দেখিতে দেন নাই কেন? ইহার উত্তরে সতীশচন্দ্র বলিতেছেন, "তাঁহার পুঁথিখানি খণ্ডিত বলিয়া তিনি সম্ভবতঃ আগে প্রকৃত কথাটা গোপন করিয়া গিয়াছেন এবং পরে অপ্রতিভ হইবেন বলিয়া তাঁহার খণ্ডিত পুঁথিখানা আর লোকলোচনের গোচর করিতে সমর্থ হন নাই। সম্পূর্ণ পুঁথিখানাতে পনের হাজার পদ ছিল বলিয়া হয়ত একটা জনপ্রবাদ ছিল; তিনি উহার উপরে নির্ভর করিয়াই সে কথাটা প্রচার করিয়া

২৯. পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১৪

৩০. "পনের হাজার পদপূর্ণ পদসমুদ্রের সম্পূর্ণ পুঁথিখানা ভক্তিনিধি মহাশয়ের নিকট ছিল কিনা সে বিষয়ে আমাদেরও সন্দেহ আছে।" পদকল্প, ৫ম, পৃ. ১৪

গিয়াছেন।"৩১ এইরূপ অনুমানও ভক্তিনিধি মহাশয়কে অপবাদের হাত হইতে রক্ষা করিতে পারে নাই। পুঁথি খণ্ডিত বলিয়া যিনি প্রকৃত কথা গোপন করেন, তিনি আর একটু অগ্রসর হইয়া যে সমস্তটাই নিজে বানাইয়া দেন নাই তাহার বিরুদ্ধ প্রমাণ কোথায়? ইতিপূর্বে আমরা রামায়ণ এবং ভাগবত প্রসঙ্গে দেখিয়াছি যে, হারাধন দত্ত ভক্তিনিধি মহাশয় কৃত্তিবাসী রামায়ণের আত্মপরিচয়জ্ঞাপক পুঁথি এবং মালাধর বসুর সন-তারিখযুক্ত শ্রীকৃষ্ণবিজয়ের পুঁথিতেও নানা গোলমাল পাকাইয়া তুলিয়াছিলেন।৩২ এখানেও যে সেরূপ বিভ্রাট ঘটে নাই তাহাই বা কে বলিল? সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মতে 'পদসমুদ্রে'র কোন পুঁথি হারাধন দত্ত মহাশয়ের নিকট নিশ্চয়ই ছিল। তবে তাহা খণ্ডিত বলিয়া তিনি লোকসমাজে বাহির করেন নাই। যাহা হউক, যে মাছ ধরা পড়ে নাই, অথবা জাল ছিঁড়িয়া পলাইয়াছে, তাহার আকার-আয়তন লইয়া গবেষণা নিষ্ফল।

ডঃ শ্রীযুক্ত সুকুমার সেন মহাশয় *History of Brajabuli Literature*-এ সজনীকান্ত দাসের নিকট রক্ষিত একটি সুপ্রাচীন পদসঙ্কলনের কথা উল্লেখ করিয়াছেন।৩৩ তাঁহার মতে ইহাই সর্বপ্রাচীন বৈষ্ণবপদসঙ্কলন। পুঁথিটি পুস্তকের আকারে লিপিকৃত, ইহার প্রথমদিকের কয়েকখানি পৃষ্ঠা নষ্ট হইয়া গিয়াছে। সুতরাং ইহার নাম জানা যায় না। সবচেয়ে কৌতূহলের ব্যাপার ইহার প্রতি পৃষ্ঠায় সনের উল্লেখ আছে। যথা—পুঁথির ৭৭ পৃষ্ঠা পর্যন্ত প্রতি পৃষ্ঠায় ১০৬০ সন (১৬৫৩ খ্রীঃ অঃ), ৭৮-৯৭ পৃষ্ঠায় ১০৬১ সন (১৬৫৪ খ্রীঃ অঃ) এবং ৮৯ হইতে পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলিতে ১০৬৩ সনের (১৬৫৭ খ্রীঃ অঃ) উল্লেখ রহিয়াছে। ইহাতে বহু অজ্ঞাতনামা কবিরও পদ উল্লিখিত হইয়াছে। ডঃ সেন উহার একখানি পৃষ্ঠার আলোকচিত্রও নিজ গ্রন্থে জুড়িয়া দিয়াছেন। পুঁথির লিপি অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে। পুঁথিটি খাঁটি হইলে ইহাকে প্রাচীনতম পদসংগ্রহ বলিতেই হইবে। কিন্তু প্রতি পৃষ্ঠায় যেভাবে সন-

৩১. সতীশচন্দ্র এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "বলা বাহুল্য, আমরা ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষে ওকালতী গ্রহণ করি নাই।" কিন্তু তিনি যেভাবে ভক্তিনিধি মহাশয়ের পক্ষ সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই মোয়াক্কেলের 'কেস' জিতাইবার চেষ্টা করিয়াছেন!

৩২. এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত', ১ম, (২য় সংস্করণ), পৃ ৪৭৯-৮০ এবং পৃ. ৬২৯-৩০ দ্রষ্টব্য।

৩৩. Dr. S. K. Sen—HBBL, p. 6

তারিখ দাগিয়া দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে ইহার প্রামাণিকতায় সন্দেহ জন্মে। বাংলা পুঁথিপত্রে সন-তারিখ লইয়া নানা গোলমাল পাকাইয়া উঠিয়াছে। সেখানে সঙ্কলক যেন ভবিষ্যৎ গবেষকদের পরিশ্রম বাঁচাইবার জন্য প্রতি পৃষ্ঠায় সন-তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন। আরও একটা সন্দেহের কথা, সপ্তদশ শতাব্দীর পুঁথি, অথচ ইহা পুঁথির আকারে লেখা নহে, ছাপা বহির ধরনে প্রস্তুত। ইহাতেও সন্দেহ দৃঢ়তর হইতেছে। ডঃ সেন ও সজনীকান্ত দাস মহাশয় এরূপ মূল্যবান পুঁথি সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই বলিয়া এ বিষয়ে কোনরূপ আলোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

সর্বশেষে বৈষ্ণবসাহিত্যের পরমপ্রাজ্ঞ ও বিশেষ রসিক সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' উল্লেখ করিয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকর্তা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। জগদ্বন্ধু ভদ্র মহাশয় উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে প্রায় দেড়হাজার গৌরাঙ্গবিষয়ক পদ সংগ্রহ করিয়া কবিদের পরিচয় সহ 'গৌরপদতরঙ্গিণী' প্রকাশ করিয়াছিলেন। তাহাতে অল্পস্বল্প ভুলভ্রান্তি থাকিলেও একক চেষ্টায় আধুনিক কালে এরূপ সঙ্কলন আর প্রকাশিত হয় নাই। ইহার সঙ্গে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের কৃতিত্বের তুলনা চলিতে পারে। তিনি যে 'পদকল্পতরু'র সটীক সংস্করণ ও কবিপরিচয় প্রকাশ করিয়াই ক্ষান্ত হইয়াছেন তাহা নহে। তাঁহার সম্পাদিত 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী'ও একটি মূল্যবান সঙ্কলন রূপে পরিগণিত হইবার যোগ্য। পূর্বে প্রকাশিত হয় নাই এরূপ অনেক পদ অবলম্বনে (পদসংখ্যা—ছয় শতেরও অধিক) সতীশচন্দ্র 'অপ্রকাশিত পদরত্নাবলী' প্রকাশ করেন। উপরন্তু অনেক অজ্ঞাতপরিচয় কবির পরিচয়াদি আবিষ্কার করিয়া সতীশচন্দ্র যেরূপ তীক্ষ্ণ ধীশক্তি ও গবেষণার পরিচয় দিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে ভূয়সী প্রশংসা করিতে হয়।

পদসঙ্কলন ছাড়াও মধ্যযুগে এই ধরনের আরও কয়েকখানি পদসংগ্রহ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে রামগোপাল দাস বা গোপাল দাসের 'শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণরসকল্পবল্লী' (১৬৭৩ খ্রীঃ অব্দে সঙ্কলিত) এবং তৎপুত্র পীতাম্বর দাসের 'রসমঞ্জরী', মুকুন্দদাসের 'সিদ্ধান্তচন্দ্রোদয়', চন্দ্রশেখর ও শশিশেখরের 'নায়িকারত্নমালা' প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য। এগুলি ঠিক সঙ্কলন গ্রন্থ নহে। কেহ রসতত্ত্ব ব্যাখ্যায়, কেহ-বা ধর্মতত্ত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্ব ব্যাখ্যায় অনেক পদ

উল্লেখ করিয়াছেন। সেই সমস্ত পদের কোন কোনটি অন্ত কোন সঙ্কলনে গৃহীত হয় নাই। সেই দিক দিয়া ইহাদের মূল্য আছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকর্তা ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বৈষ্ণব পদকর্তাদের সংখ্যা নিতান্ত অল্প নহে। ডঃ সুকুমার সেন মহাশয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় পঁচাত্তর জন পদকর্তার পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন।[৩৪] ইঁহাদের কেহ কেহ পদ সঙ্কলন করিতে গিয়া পদ রচনার স্পৃহা দমন করিতে পারেন নাই। বিশ্বনাথ চক্রবর্তী ('ক্ষণদাগীতচিন্তামণি'), রাধামোহন ঠাকুর ('পদামৃতসমুদ্র'), বৈষ্ণবদাস ('পদকল্পতরু'), গৌরসুন্দর দাস ('কীর্তনানন্দ'), দীনবন্ধু দাস ('সঙ্কীর্তনানন্দ'), নিমানন্দ ('পদরসসার'), কমলাকান্ত দাস ('পদরত্নাকব') প্রভৃতি পদ-সঙ্কলকগণ নিজেরাও কিছু কিছু পদ রচনা করিয়া নিজেদের সঙ্কলনে চালাইয়া দিয়াছেন। ইঁহাদের কথা সঙ্কলন প্রসঙ্গে কিছু কিছু বলা হইয়াছে। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ কিঞ্চিৎ কবিত্বের অধিকারী ছিলেন—যেমন রাধামোহন ঠাকুর, দীনবন্ধু দাস, কমলাকান্ত দাস প্রভৃতি। এই প্রসঙ্গে কমলাকান্তের একটু স্বতন্ত্র উল্লেখ প্রয়োজন। ইনি বীরভূম জেলার অধিবাসী, ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে 'পদরত্নাকর' সঙ্কলন করেন। পদের সংখ্যা—১৩৫৮। ইহাতে সঙ্কলক যে কয়টি স্বরচিত পদ গ্রহণ করিয়াছেন তন্মধ্যে দুটি একটি পদ মন্দ নহে—বাংলা ও ব্রজবুলি উভয়-ধবনের পদে তিনি কিছু কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন। যথা :

কদম্ব কাননে উঠিছে সঘনে
একি ধ্বনি অনুপাম।
শ্রুতিপথ দিয়া অন্তরে পশিয়া
চঞ্চল করিল প্রাণ ॥
সই এ তোরে কহিলু সার।
হেন সুমধুর ধ্বনি রসপুর
ভুবনে না শুনি আর ॥
না জানি সজনি হেন ধ্বনি শুনি
কেন কাঁপে মোর গা।

৩৪. Dr. S. K. Sen, HBBL

বসন খসিল কেশ আউলাইল
চলিতে না চলে পা॥

কবি বাংলা পদে চণ্ডীদাসের সরল ভাষা ও ভাব বেশ আয়ত্ত করিয়াছেন। এইবার অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১. প্রেমদাস (প্রেমানন্দ দাস)—'চৈতন্যচন্দ্রোদয়কৌমুদী' প্রসঙ্গে ইতিপূর্বে আমার তাঁহার পরিচয় দিয়াছি। 'পদকল্পতরু'তে তাঁহার ভণিতায় ৩১টি পদ আছে, তন্মধ্যে অধিকাংশই বাংলা ভাষায় এবং চৈতন্যদেব-সংক্রান্ত রচনা। ব্রজবুলিতে রচিত দুই একটি পদ কাব্যাংশে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নহে। বাংলা পদগুলি মোটামুটি চলনসই :

সই কাহারে করিব রোষ।
না জানি না দেখি সরল হইলু
সে পুনি আপনা দোষ॥
বাতাস বুঝিয়া পেলাই থু
পা বাঢাইযা বুঝিয়া গেহ।
মানুষ বুঝিয়া কথা সে কহিএ
রসিক বুঝিয়া নেহ॥

কবির চৈতন্যবিষয়ক পদগুলির আন্তরিকতায় রচনার ত্রুটি অনেকটা ঢাকিয়া গিয়াছে। 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে জগদ্বন্ধু ভদ্র প্রেমদাসের পদের অতি-প্রশংসা ("একজন উচ্চ দরের কবি") করিয়াছেন বটে, কিন্তু এ বিষয়ে সতীশচন্দ্র রায় মহাশয়ের মন্তব্যই যুক্তিসঙ্গত—"কবিত্ব হিসাবে প্রেমদাসের স্থান দ্বিতীয় শ্রেণীর কবি লোচনদাস, অনন্ত, উদ্ধব, বংশীবদন, বসন্তরায় প্রভৃতি বহুসংখ্যক পদকর্তার পরে নির্দেশ কবিতে হইবে।"[৩৫]

২. গোকুলচন্দ্র-গোকুলানন্দ—বৈষ্ণব পদসাহিত্যে একাধিক গোকুলচন্দ্র ও গোকুলানন্দ পদকর্তার উল্লেখ পাওয়া যায়। শ্রীনিবাস আচার্যের তিনজন শিষ্যেরই নাম ছিল গোকুলানন্দ—একজনের নাম গোকুলানন্দ আচার্য, দুইজনের নাম গোকুলানন্দ দাস। 'পদকল্পতরু'তে গোকুলদাসের

৩৫. পদকল্পতরু, ৫ম, পৃ. ১৫২

একটি ব্রজবুলির পদ উদ্ধৃত হইয়াছে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে একখানি পুঁথির (পুঁথি—২৪১৬) কয়েকখানি পৃষ্ঠা পাওয়া গিয়াছে। মনে হয় ইহা গোকুলচন্দ্র বা গোকুলানন্দের কোন পদসঙ্কলন। ভণিতায় কবি গোকুলদাস, গোকুলচাঁদ, গোকুলচন্দ্র এইরূপ নাম ব্যবহার করিয়াছেন।[৩৬] এখানে একটি সরল বাংলা পদ উদ্ধৃত হইতেছে :

ললিতার সনে রাই গেলা নিজ ঘর।
শ্যামপ্রেমে গরগর সভয় অন্তর॥
নিরবধি চমকিত নহে গৃহকাজ।
সঙের বন্ধুর গুণ তেজি সব লাজ॥
হেনকালে আইলা তথি ব্রজবধূগণ।
রাই বলে ভাল হৈল আইলা সখিগণ॥

এই সমস্তপদের সারল্য ব্যতীত আর কোন গুণ নাই।

৩-৪. শেখর ভ্রাতৃদ্বয়—চন্দ্রশেখর ও শশিশেখর দুইভাই 'নায়িকা-রত্নমালা' নাম দিয়া নায়িকার ৬৪ প্রকার বৈশিষ্ট্যসহ ৬৪টি পদ সঙ্কলন করেন। তাহাতে জ্যেষ্ঠ চন্দ্রশেখরের পদসংখ্যা—৪৫, কনিষ্ঠ শশিশেখরের পদসংখ্যা—১৪। চন্দ্রশেখর নামটিও একাধিক বৈষ্ণব ভক্ত ও কবি গ্রহণ করিয়াছিলেন।[৩৭] কিন্তু যিনি 'নায়িকা-রত্নমালা' সঙ্কলন করেন তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীতে জীবিত ছিলেন।[৩৮] শেখর ভ্রাতৃদ্বয়ের 'নায়িকারত্নমালা' ছাড়িয়া দিলে আরও দুই-একটি সঙ্কলনে দুই ভাইয়ের দুই-একটি পদ স্থান পাইয়াছে। চন্দ্রশেখরের ছন্দের হাত বেশ পরিপক, বিশেষতঃ তাঁহার ব্রজবুলিগুলি উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে। যথা :

কাহে তুহুঁ কলহ করি কান্ত সুখ তেজলি
অব সে বসি রোয়সি কাহে রাধে।
মেরুসম মান করি উলটি ফেরে বৈঠলি
নাহ যব চরণ ধরি সাধে॥

৩৬. Dr. S. K. Sen—HBBL, Chap. XI

৩৭. চন্দ্রশেখর আচার্য—চৈতন্যদেবের মেসো
বৈদ্যচন্দ্রশেখর—চৈতন্যচরিতামৃত, আদি—১০ম
আচার্যচন্দ্র—HBBL, p. 396

৩৮. 'বীরভূম বিবরণের' মতে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে।

তবহুঁ উহে নাগরি ভর্ৎসনা করি তেজলি
মান বহু রতন করি গণলা।
অবহুঁ তুহুঁ ধরমপথ- কাহিনী উগারসি
রোখে হরি বিমুখ ভই চললা।

চন্দ্রশেখরের কনিষ্ঠভ্রাতা শশিশেখর কখনও শেখর, কখনও বা শশী এইরূপ ভণিতা দিয়াছেন। ফলে রায়শেখরের সঙ্গে তাঁহার কোন কোন পদ মিশিয়া যাওয়া আশ্চর্য নহে। যাহা হউক কবি প্রাণবন্ত ঝঙ্কারমুখর ছন্দে বেশ নিপুণতা দেখাইয়াছেন। যেমন:

অতি শীতল মলয়ানিল
মন্দ মধুর বহনা।
হরি বৈমুখ হামারি অঙ্গ
মদনানলে দহনা।
কোকিলাকুল কুহু কুহরই
অলি ঝঙ্কর কুসুমে।
হরিলালসে তনু তেজব
পাওব আনজনমে॥

জ্যেষ্ঠের পদের আন্তরিকতা ও গাম্ভীর্য থাকিলেও কনিষ্ঠের পদে জীবনচাঞ্চল্য অধিক।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে আরও বহু পদকারের দুই একটি পদ পাওয়া যায়। উদাহরণস্বরূপ বিশ্বম্ভর দাস, অকিঞ্চন দাস, সর্বানন্দ, রাধানাথ দাস, মুকুন্দদাস (রাধামুকুন্দ দাস), পরাণদাস, গদাধর দাস প্রভৃতির নাম উল্লেখ করিতে পারা যায়। অবশ্য ইঁহাদের শুধু নামই উল্লেখ করা যাইতে পারে, স্বাদগন্ধহীন এই সমস্ত পদের বিস্তারিত আলোচনা নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু ভারতচন্দ্রও যে কোন কোন দিক দিয়া বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙটি অনুসরণ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহার অন্নদামঙ্গল হইতেই জানা যাইবে।[৩৯]

উনবিংশ শতাব্দীতে আধুনিকতার জোয়ার আসিলেও পুরাতন ধারার কোন কোন কবি (এবং দুই-এক জন আধুনিক ধারার কবি) বৈষ্ণবপদাবলীর রীতিটি বজায় রাখিবার চেষ্টা করিয়াছিলেন। রাজা রাজেন্দ্রলাল মিত্রের প্রপিতামহ রাজা পীতাম্বর মিত্র বাহাদুর অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে অযোধ্যার

৩৯. ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

নবাবের উকিল হিসাবে কার্য করিয়াছিলেন। তিনি দীক্ষিত বৈষ্ণব হইয়াছিলেন। কর্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া মিত্র বাহাদুর ধর্মজীবন অবলম্বন করেন এবং বাংলা ও ব্রজবুলিতে কয়েকটি বৈষ্ণব পদ রচনা করেন। ১৮০৬ খ্রীঃ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার পদের দুই চারিটি তাঁহার পৌত্র জনমেজয় মিত্র (ইনিও বৈষ্ণবপদ লিখিয়াছিলেন) নিজের পদ-সঙ্কলন 'সঙ্গীত-রসার্ণবে' মুদ্রিত করিয়াছিলেন।

রাজেন্দ্রলালের পিতা জনমেজয় মিত্রও পিতামহের বৈষ্ণবপদাবলী রচনার আদর্শ গ্রহণ করেন এবং ১৮৬০ খ্রীঃ অব্দে 'সঙ্কর্ষণদাস' ভণিতায় 'সঙ্গীত-রসার্ণব' শীর্ষক একটি স্বরচিত পদসঙ্কলন প্রকাশ করেন। ইহাতে তাঁহার পিতামহেরও কয়েকটি পদ গৃহীত হইয়াছিল। প্রায় আড়াইশত পদে কবি ব্রজবুলি ও বাংলা উভয়ই ব্যবহার করিয়াছেন। ইঁহার গৌরাঙ্গবিষয়ক কয়েকটি পদ জগদ্বন্ধু ভদ্রের 'গৌরপদতরঙ্গিণী'তে গৃহীত হইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীতে আরও কয়েকজন আধুনিক ধারাব কবি ও লেখক 'বৈষ্ণবধারার কিছুটা অনুবর্তন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে মাইকেল মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনাকাব্য', বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে ব্যবহৃত দুই-একটি বিচ্ছিন্ন পদ, রাজকৃষ্ণরায়ের নাটকপ্রহসনে দুইচারিটি ব্রজবুলির পদ, কবি রজনীকান্ত সেনের পিতা গুরুপ্রসাদ সেনের 'পদচিন্তামণিমালা' (১৮৭৬ সালে প্রকাশিত) এবং তরুণ রবীন্দ্রনাথের 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' (বাংলা ১২৯১ সালে প্রকাশিত) উল্লেখযোগ্য।

মধুসূদন আধুনিক তন্ত্রেব কবি হইয়াও রাধাকৃষ্ণ কাহিনীর প্রতি প্রতিকূল ছিলেন না। তাঁহার মহাকাব্যাদিতেও সুযোগ-সুবিধা পাইলেই তিনি রাধা-কৃষ্ণের প্রেমের উল্লেখ করিয়াছেন। সহপাঠী ভূদের মুখোপাধ্যায়ের অনুরোধে[৪০] তিনি 'Poor Lady of Vraja' রাধার বিরহ সঙ্গীত অবলম্বনে ব্রজাঙ্গনা কাব্য রচনা করেন। কবি বিলাতী ওডের (Ode) ছাঁচে সরল বাংলায় ব্রজাঙ্গনা কাব্যে রাধার বিলাপ রচনা করেন—যদিও ইহাতে ভারত-চন্দ্র ও কবিওয়ালাদের, বিশেষতঃ টপ্‌পা গায়কদের প্রভাব বেশী। কবি বৈষ্ণবপদের অনুকরণে ভণিতাও দিয়াছিলেন :

৪০. শুনা যায় ভূদেব নাকি মাইকেলকে বৈষ্ণবপদ রচনার অনুরোধ করিয়া বলিয়াছিলেন, "ভাই, তুমি ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি করতে পার?" ('মধুস্মৃতি'—নগেন্দ্রনাথ সোম)

সহসা হইনু কালা জুড়া এ প্রাণের জ্বালা
আর কি এ পোড়া প্রাণ পাবে সে রতন।
মধু—যার মধুধ্বনি কহে, কেন কাঁদ ধনি,
ভুলিতে কি পাবে তোমা শ্রীমধুসূদন।

বাহিরের দিক হইতে কবি নিপুণতার সঙ্গে বৈষ্ণব ধারা অনুকরণ করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণবপদাবলীর অধ্যাত্ম বাতাবরণের সঙ্গে তাঁহার কিছু মাত্র যোগ ছিল না—যদিও তাঁহার একান্ত প্রিয় সুহৃদ গৌরদাস বসাক বৈষ্ণব বংশের সন্তান। মানবিক আদর্শ ও লীরিক গীতোচ্ছ্বাস মধুসূদনের রাধাকে নায়িকা রাধায় পরিণত করিয়াছে, 'শ্রীমতী' রাধায় পরিণত করিতে পারে নাই।[৪১] কেহ কেহ মনে করেন বঙ্কিম ও রবীন্দ্রনাথের চেয়েও মধুসূদনের 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে বৈষ্ণবপদাবলীর ভাবাদর্শ অধিক রক্ষিত হইয়াছে।[৪২] বঙ্কিমচন্দ্র সম্বন্ধে তাহা সত্য হইলেও রবীন্দ্রনাথের ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী সম্বন্ধে তাহা বলা যায় না। কারণ রবীন্দ্রনাথ তরুণ বয়সে ব্রজবুলির আদর্শে বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙটা অনেকটা আয়ত্ত করিয়াছিলেন। যাঁহারা মনে করেন, "Madhusudan's poems breathe, however faintly, the perfume of devotion, but Rabindranath's Brajabuli poems have a purely esthetic appeal."[৪৩]—তাঁহাদের এই অভিমত যুক্তিসঙ্গত বলিয়া বোধ হয় না। কারণ বৈষ্ণব সাহিত্য ও সাধনার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের যতটা মানসিক আনুকূল্য ছিল, মধুসূদনের ততটা ছিল না—এ বিষয়ে মধুসূদন সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের কবি। 'ব্রজাঙ্গনা' কাব্যে মধুসূদনের কোনও প্রকার "Perfume of devotion" ফুটে নাই, তাহা সম্ভবও ছিল না। তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর মানবিক দিকটি বাছিয়া লইয়াছেন—তাই রাধার মর্মবেদনা মানবিক আবেগে ব্যাকুল হইলেও তাহার মধ্যে বৈষ্ণব পদাবলীর অধ্যাত্ম ব্যঞ্জনা কিছু মাত্র নাই। অপর দিকে তরুণ বয়সে রবীন্দ্রনাথ লীলাচ্ছলে ব্রজবুলির অনুকরণে ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী লিখিলেও তাহার ভাবে ভাষায় বৈষ্ণব স্বাদের

৪১. এই বিষয়ে লেখকের 'আধুনিক বাংলা সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত ইতিবৃত্ত' দ্রষ্টব্য।

৪২. "But Madhusudan's poems conform to the spirit of Vaisnava poetry in much greater degree than the works of the latter two (i. e. Bankim Chandra and Rabindra Nath)". HBBL. p. 369

৪৩. Ibid, p. 369

ব্যঞ্জনা বহু স্থলেই উপলব্ধি করা যাইবে—যদিও ইহার 'esthetic appeal'-ও অতিশয় চিত্তাকর্ষী হইয়াছে।

এখানে আমরা বৈষ্ণব সাহিত্যের আলোচনা সমাপ্ত করিলাম। মধ্য-যুগীয় বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালী-মানসে বৈষ্ণব আদর্শ যে কী বিপুল প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল তাহা এই যুগের অসংখ্য বৈষ্ণবপদ, জীবনীকাব্য, সমাজ-ইতিহাস, তত্ত্বকথা, পদসঙ্কলন প্রভৃতি আলোচনা করিলেই বুঝা যাইবে। সূক্ষ্ম শিল্পরীতি, কারুকর্ম ও ভক্তিরসে বাঙালীর যে মন আর্দ্র হইয়া উঠিয়াছিল, তাহার পরিচয় এই বিপুলায়তন বৈষ্ণব সাহিত্যে পাওয়া যাইবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের যদি কোন শাখা দেশ-কাল-নিরপেক্ষভাবে নিখিল রসিক-চিত্তে সারস্বত হর্ষ সঞ্চার করিতে পারে, তবে তাহা বৈষ্ণব সাহিত্য। অনুবাদ-সাহিত্য পুরাপুরি বাঙালীর নিজস্ব সংস্কার নহে, মঙ্গলকাব্যে গ্রামীণ প্রভাব বহু স্থলে প্রকট হইয়াছে। কিন্তু বৈষ্ণব পদামৃত-সমুদ্র যে চিরদিন রসিকজনের হৃদয় আনন্দরসে প্লাবিত করিবে তাহাতে সন্দেহ নাই—রাসরস-শেখর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধা এই রসতীর্থের যুগল বিগ্রহ হইলেও মহাপ্রভু শ্রীচৈতন্যদেবের আবির্ভাবেই বাংলার বৈষ্ণবসাহিত্য আকারে-আয়তনে এবং গুণগত উৎকর্ষে এরূপ বিস্ময়কর অনুপম মহিমা লাভ করিয়াছে। শুধু ভক্তির দিক হইতেই নহে, বিশুদ্ধ রোমান্টিকতা ও সৌন্দর্যের দিক হইতেও এই পদ রসিকজন উপভোগ করিতে পারেন। তবে বৈষ্ণব সাধ্যসাধনপ্রকৃতি সম্বন্ধে অনবহিত থাকিলে ইহার পুরা রসভোগ করা যায় না, তাহাও স্বীকার্য। কারণ এই সমস্ত পদ নিছক সৌন্দর্যভোগের দিক হইতে রচিত হয় নাই। যাঁহারা সেকালে এই পদ লিখিয়াছিলেন, তাঁহারা মূলতঃ ছিলেন সাধক, তৎপরে কবি। সাধনার ধারা ও কবিতার ধারা গঙ্গাযমুনার মতো এই পদে মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে। সে যাহা হউক, কাল যত অগ্রসর হইয়াছে, বৈষ্ণবপদাবলীর স্বাভাবিক বিকাশও তত মন্থর হইয়া পড়িয়াছে, পরিশেষে আধুনিকযুগের বন্যায় অবলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। একালে বৈষ্ণব পদ আর রচিত না হইলেও কীর্তনের মধ্য দিয়া ইহা এখনও বাঙালীর অন্তরে বাঁচিয়া আছে। ইদানীং বহু পণ্ডিত ও গবেষক বৈষ্ণব পদাবলীর তত্ত্ব লইয়া যে সমস্ত আলোচনা করিতেছে তাহাও বৈষ্ণব সাহিত্যের অনুরাগসূচক।

তৃতীয় অধ্যায়

নূতন শাখার উৎপত্তি ও বিকাশ

শাক্ত পদাবলী, বাউল গান ও গাথাসাহিত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা-সাহিত্যের আলোচনায় ছেদ টানিবার পূর্বে আর কয়েকটি বিচিত্র শাখা সম্পর্কে কিছু আলোচনা করা প্রয়োজন। আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের চারটি খণ্ডে সমগ্র মধ্যযুগীয় সাহিত্যের রূপ ও রীতি, বিষয়-বস্তু প্রভৃতি বিশ্লেষণ করিয়া দেখাইয়াছি যে, খ্রীঃ দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী প্রায় আটশত বৎসর ধরিয়া প্রচুর পুঁথিপত্র লিখিত-অনুলিখিত হইলেও বৈচিত্র্য ও নূতনত্বের অভাব এই দীর্ঘকালবিস্তারী বাংলা সাহিত্যের দীনতাকে আরও প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। কবিগণ অধিকাংশ স্থলে পুরাতনের পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন; দুই-একজন একটু ভিন্ন পথে যাইবার চেষ্টা করিলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে নূতন সাহিত্যশাখা, শিল্পরীতি ও বিষয়বস্তুর বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে কোন কোন স্থলে অল্পস্বল্প নূতনত্বের ইঙ্গিত-আভাস ফুটিয়া উঠিতে লাগিল, কিছু কিছু কবি পুরাতন ও বহুকথিত বিষয়বস্তু ও বক্তব্যভঙ্গিমা ত্যাগ করিয়া নূতন দিক হইতে সাহিত্য সৃষ্টির কিঞ্চিৎ চেষ্টা করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে শাক্ত পদাবলী, বাউলগান এবং কাহিনী-কেন্দ্রিক গাথা-কাব্যের কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এগুলির সূচনা অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বেও হইতে পারে, কিন্তু যথার্থ বিকাশ অষ্টাদশ শতাব্দীতেই হইয়াছিল; তাহার জের ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত চলিয়াছিল। আধুনিক কালেও কোন কোন কবি পুরাতন শাক্ত গীতিকা ও বাউলগান রচনায় আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। যাহা হউক এই তিনটি শাখার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

শাক্ত পদাবলী

পঞ্চদশ হইতে সপ্তদশ শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা সাহিত্যে মূলতঃ প্রেম-ভক্তি-আশ্রিত বৈষ্ণব সাহিত্য অধিকতর প্রাধান্য বিস্তার করিলেও অষ্টাদশ শতাব্দী শাক্ত পদাবলীর যুগ—অধিকাংশ শাক্ত কবি এই শতাব্দীতে অসংখ্য শাক্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন। বৈষ্ণব সাহিত্যে যেমন রাধাকৃষ্ণকে কেন্দ্র করিয়া

বৈষ্ণব পদাবলীশাখা বিকশিত হইয়াছে তেমনি শাক্ত সাহিত্যে উমা-পার্বতী-চণ্ডী-কালিকাকে কেন্দ্র করিয়া শাক্ত পদাবলীর উৎপত্তি ও বিকাশ হইয়াছে। বস্তুতঃ প্রাচীনকালে বাঙালী দুই নারীর ভজনা করিয়াছে—একজন কুলত্যাগিনী শ্রীরাধা, আর একজন কুলকন্যা ও কুলবধূ উমা-হৈমবতী। একজন নিখিল মানবচিত্তকে সমাজসংসারের পর্যুসিত জীবন হইতে টানিয়া সুদূর রসস্বর্গে উন্নীত করিয়াছেন, আর একজন সহস্র কর্মজালজড়িত প্রতিদিনের সুখদুঃখের জীবনের মধ্যে তৃষাতপ্ত মানবশিশুকে ফিরাইয়া আনিয়াছেন। একজন সৌন্দর্য-ললিতকলার প্রতীক রূপে প্রেয়সীমূর্তিতে আদিরসের পুটপাকে চিত্তকে তুরীয়ানন্দের পথে লইয়া গিয়াছেন, আর একজন ষড়ৈশ্বর্যময়ী মাতৃমূর্তিতে স্নেহবাৎসল্যের প্রতীকরূপে মানুষের ঘরসংসারে আবির্ভূত হইয়াছেন। একজন অসীমের ইঙ্গিত দিয়াছেন, আর একজন সীমার মধ্যেই জীবনের চরিতার্থতা দান করিয়াছেন। বাঙালীর চেতনায় এই দুই নারী মূর্তি দেবীর বেশে বিচিত্র প্রভাব বিস্তার করিয়াছেন। রাধাকৃষ্ণের দ্বৈতসত্তার যুগলরস ভক্তের ধ্যানের সামগ্রী, আর ব্রহ্মস্বরূপিণী দেবী কালিকার অদ্বৈত উপলব্ধির দ্বারা মোক্ষলাভ সাধকের মূল লক্ষ্য। এই দুই দার্শনিক প্রত্যয়কে কেন্দ্র করিয়া মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে দুইটি প্রধান গীতিশাখা (বৈষ্ণব ও শাক্ত) যুগপৎ গান ও কবিতায় রূপান্তরিত হইয়াছে।

শক্তিতত্ত্বের উদ্ভব ও বিকাশ ॥

শাক্তপদাবলী পূর্বে 'মালসী' (∠মালবশ্রী) গানরূপেই পরিচিত ছিল। 'শাক্তপদাবলী' শব্দ বৈষ্ণবপদাবলীর অনুকরণে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে ব্যবহৃত হইয়াছে। মালসীগান বা শাক্তপদাবলী আদ্যাশক্তি চণ্ডী-কালিকাকে অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে। মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তি এই পদসাহিত্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী। তাই এই পদ শাক্ত পদ নামে পরিচিত হইয়াছে। মহাশক্তির আধারভূতা চণ্ডী-কালিকাকে কেন্দ্র করিয়া বাংলাদেশে যে বিপুল পদসাহিত্য রচিত হইয়াছে তাহার স্বরূপ বিচার করিবার পূর্বে শাক্ততত্ত্বের বিকাশধারা সংক্ষেপে আলোচনা করিয়া দেখা প্রয়োজন।

শৈশবে মানুষ মাতৃক্রোড়ে পরম নির্ভয়ে বাস করে, অসহায় শিশুর তখন একমাত্র সম্বল মাতৃস্নেহের পীযূষধারা। অর্ধচেতন অর্ধজড় অবস্থায় সে তখন

মাকেই আঁকড়াইয়া ধরে। পরে শিশু শৈশব ছাড়িয়া বয়ঃপ্রাপ্ত হয়, জগৎ ও জীবনকে চিনিয়া লয়, মাতৃবক্ষ ছাড়িয়া সে মাটিতে নামিয়া আসে। কিন্তু কোনদিনই সে সেই শৈশবস্মৃতির অনুষঙ্গ ভুলিতে পারে না, মাতৃভাব তাহার অন্তর-প্রকৃতির সঙ্গে একেবারে জড়াইয়া যায়। মানবসভ্যতার শৈশবেও মানুষ ক্রূর প্রকৃতির প্রতিকূলতার মধ্যে নিক্ষিপ্ত হইয়া এইরূপ মাতার প্রয়োজন বোধ করিত—যিনি রক্ষা করিবেন, পালন করিবেন, স্নেহ করিবেন। তাই অতি প্রাচীনকাল হইতে সৃষ্টিরহস্যের মধ্যে একটি জননীতত্ত্ব মানবচিত্তকে অধিকার করিয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ তাই সমস্ত সৃষ্টিতত্ত্বের অন্তর্নিহিত প্রেরণা বলিতে এইরূপ এক মহাজননীকে বুঝিত। তাই বহুযুগের পরপারে যে মানুষ বাস করিত, যাহারা শিক্ষাসভ্যতার ধার ধারিত না, তাহারাও আদিম জীবনপিপাসার তাড়নায় সমস্ত সৃষ্টিশক্তির মূলে সৃজন-পালনক্ষম একটি মাতৃদেবতার অস্তিত্ব উপলব্ধি কবিত। ইনি অমিত শক্তি-ধারিণী। মানবশিশুকে ইনি কখনও অপার স্নেহের বশে, কখনও বা আঘাত দিয়া শ্রেয়ের পথ দেখাইয়া দেন, বাস্তব দুঃখ-বেদনা ও ক্ষয়ক্ষতি হইতে রক্ষা করেন।*

প্রাচীন বিশ্বের অনেক জাতি মাতৃস্বরূপিণী পৃথিবীকেই আদিজননী বলিয়া পূজা করিত, কাবণ মা যেমন সন্তানকে পালন করেন, এই জড়পৃথিবীও সেইরূপ স্নেহরসে মৃত্তিকা সরস করিয়া মানবশিশুর ভরণ-পোষণের ব্যবস্থা করেন। তাই দেখা যায়, প্রাচীন মেক্সিকো, প্রাচীন জার্মানী, প্রাচীন গ্রীস-রোমেও মাতৃরূপিণী পৃথিবীদেবীর পূজা-উপাসনা প্রচলিত ছিল। প্রাচীন জার্মানীতে পৃথিবী-মাতার নাম ছিল নের্থাস; প্রাচীন গ্রীসের রিয়া এবং রোমের সাইবিল দেবীও পৃথিবীর মাতৃমূর্তির প্রতীক। ভারতবর্ষেও বৈদিক সাহিত্যে মাতৃরূপিণী পৃথিবীর কথা আছে। ঋগ্‌বেদের দেবমাতা অদিতিকে পৃথিবীমাতা বলিয়াই গ্রহণ করা হইয়াছে। অথর্বদের 'পৃথিবীসূক্তে' এই স্নেহময়ী কল্যাণী পৃথিবীমাতার বর্ণনা আছে। কিন্তু নারী-দেবতাকে একমাত্র প্রধান করিয়া তোলার পশ্চাতে একটি বিশেষ ধরনের সমাজপ্রভাব কার্যকরী হইয়াছিল। সমস্ত সৃষ্টির মূলে একটি জগৎ প্রসবিত্রী নারীদেবতা বর্তমান—

* অবশ্য একালের বৈজ্ঞানিক সমাজতত্ত্ব ও নৃতত্ত্ব বলিবে যে, এই মাতৃকতত্ত্বের পশ্চাতে আছে কৃষিভিত্তিক প্রজনন-তত্ত্ব।

এইরূপ প্রাচীন বিশ্বাস সাধারণতঃ মাতৃতান্ত্রিক সমাজেই উদ্ভূত হইয়াছিল। দ্রাবিড়, নিষাদ, পীতজাতি (কিরাত) প্রভৃতি মাতৃতান্ত্রিক সমাজে তাই দুর্গার অনুরূপ দেবীপূজার আভাস পাওয়া যাইতেছে। ক্রমে বৈদিক আর্যদের মধ্যে এইরূপ মাতৃদেবতার প্রাধান্য স্থাপিত হয়। ঋগ্বেদের দশমমণ্ডলে দেবীসূক্তে অম্ভৃণ মুনির কন্যা বাক্ সমস্ত সৃষ্টির মূলীভূত শক্তিকে মাতৃরূপেই বুঝিয়াছিলেন। কাহারও কাহারও মতে ব্রহ্মবাদিনী বাকের মাতৃশক্তির বন্দনাই (ঋগ্‌বেদ—১০।১০।১২৫) ভারতীয় আর্যসাহিত্যে সর্বপ্রথম মহাশক্তি বা আদ্যাশক্তির উল্লেখ বলিয়া গৃহীত হইতে পারে। সামবেদের রাত্রিসূক্তেও যে দেবীকে ময়ূরপুচ্ছধারিণী, পাশহস্তা, যুবতী-কুমারী ("শিখণ্ডিনীং পাশহস্তাং যুবতীং কুমারিণীম্") বলিয়া বর্ণনা করা হইয়াছে, তাহাতে মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু অথর্ববেদেই শক্তিপূজা, অভিচার প্রভৃতির স্পষ্ট উল্লেখ আছে। তাই কোন কোন মতে ঋক্-সামে শক্তিদেবীর উল্লেখ থাকিলেও তাঁহার পৃথক স্বরূপ অথর্ববেদেই বিশেষভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই জন্য বিশুদ্ধ বৈদিকগণ অথর্ববেদকে যজ্ঞের উপযুক্ত মনে করেন নাই—কারণ ইহাতে বেদপন্থাবহির্ভূত অভিচারাদি কর্মের বিধান আছে। তাহা হইলে দেখা যাইতেছে, বৈদিক সংহিতায় পুরুষ-দেবতার প্রাধান্য থাকিলেও ইহাতে ধীরে ধীরে শাক্ত দেবীও নিজ স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। উপনিষদে, বিশেষতঃ কেনোপনিষদের (৪।১) উমা হৈমবতীর গল্পটি এই প্রসঙ্গে স্মরণীয়।

অসুরদিগকে পরাজিত করিয়া ইন্দ্র-অগ্নি-বরুণ প্রভৃতি দেবতারা যখন অহংভাবে স্ফীত হইয়া উঠিয়াছিলেন, তখন পর্বত অন্তরালে এক ভয়াবহ যক্ষকে দেখিয়া তাঁহারা সভয়ে তাঁহার স্বরূপ জানিতে চাহিলেন। অগ্নি-বরুণাদি দেবগণ সেই যক্ষের সম্মুখে সমস্ত শক্তি হারাইয়া ম্লান হইয়া গেলেন। অতঃপর ইন্দ্র তাঁহার স্বরূপ জানিতে আসিলে সেই যক্ষ দ্রুত অদৃশ্য হইয়া গেলেন এবং আকাশে উমা-হৈমবতীর জ্যোতির্ময় রূপ ফুটিয়া উঠিল। ইনিই ব্রহ্মস্বরূপিণী।

উপনিষদের অন্যত্র রুদ্রপত্নী অম্বিকা, অগ্নিশিখারূপিণী কালিকা প্রভৃতির উল্লেখ থাকিলেও উমা-হৈমবতীর কাহিনী হইতে মনে হয়, উপনিষদের যুগে উমা-পার্বতীকে আদ্যাশক্তিরূপে গ্রহণ করা হইতেছিল। দর্শনের যুগে

সাংখ্যের পুরুষ-প্রকৃতি তত্ত্বও যে শক্তি-উপাসনাকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু ভারতবর্ষে শক্তিপূজা এবং উমা-পার্বতী-চণ্ডী কালিকাকে আদ্যাশক্তিরূপে গ্রহণের রীতি সর্বপ্রথম পৌরাণিক সাহিত্যে প্রকাশিত ও প্রচারিত হইয়াছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, দেবীভাগবত, ব্রহ্মবৈবর্ত-পুরাণ, কালিকা পুরাণ, এমনকি বৈষ্ণব পুরাণ ভাগবতেও শক্তি উপাসনার প্রকৃষ্ট পরিচয় পাওয়া যাইতেছে।[১] দক্ষপ্রজাপতির কন্যা সতীর সঙ্গে মহাদেবের বিবাহ, সতীর দেহত্যাগ, হিমাচলগৃহে তাঁহার উমা-পার্বতীরূপে পুনর্জন্ম, শিবের সঙ্গে বিবাহ, উভয়ের দাম্পত্য জীবন প্রভৃতি নানা কাহিনী এই সমস্ত শাক্ত ও শৈবপুরাণে পাওয়া যাইতেছে। অবশ্য এই পুরাণগুলি বিশেষ প্রাচীন নহে। সে যাহা হউক, বাংলার শাক্ত-সাহিত্যের অনেকটা—বিশেষতঃ উমা-সংক্রান্ত কাহিনীগুলি শাক্ত-শৈবপুরাণ হইতেই গৃহীত হইয়াছে। তন্মধ্যে মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্গত 'দেবীমাহাত্ম্য' (ত্রয়োদশ অধ্যায়) উপচ্ছেদে সবিস্তারে চণ্ডীকাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। বাংলার শাক্ত সাহিত্যে ও শাক্ত সম্প্রদায়ে এই চণ্ডীর প্রভাব সর্বাধিক।

এই প্রসঙ্গে বাংলার মঙ্গলকাব্যের চণ্ডীর কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই মঙ্গলকাব্য নানা দিক দিয়া গ্রাম্য সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। তাই বাঙলীর আর্যেতর সংস্কার—বিশেষতঃ নিষাদ সংস্কারের সঙ্গে মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীর কিছু কিছু যোগাযোগ লক্ষ্য করা যাইবে। মঙ্গলকাব্যের অন্যতম প্রধান শাখা চণ্ডীমঙ্গলকাব্যের অধিষ্ঠাত্রী দেবী চণ্ডিকাকে মহাদেবের সহধর্মিণী উমাপার্বতী ও মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীর সঙ্গে অভিন্ন করা হইলেও, অনুমান হয়, মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী আদিতে পর্বতকান্তারবাসী কোন ব্যাধজাতির উপাস্য দেবী ছিলেন। পরে আর্যীকরণের যুগে মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী বা মঙ্গলচণ্ডীকে শিবসহধর্মিণীর সঙ্গে একীভূত করা হইয়াছে। নিজ পূজা প্রচারের জন্য মঙ্গলকাব্যের চণ্ডী কোন কোন সময় হীনপন্থা অবলম্বনেও সঙ্কুচিত হন নাই। মঙ্গলকাব্যে যাঁহার আচার-আচরণ হইতে বিস্মৃতযুগের নিষাদ সংস্কৃতির ছাপ দূর হয় নাই, বাংলার শাক্তপদাবলীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী উমা-পার্বতী-কালিকা-

১. ভাগবতে ব্রজের অধিষ্ঠাত্রী দেবী কাত্যায়নীর কাছে গোপীগণ কৃষ্ণকে পতিরূপে পাইবার জন্য প্রার্থনা জানাইত।

চণ্ডী সে চণ্ডী নহেন। ইনি শাক্তপুরাণ ও ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন।

ভারতীয় পুরাণ, মহাকাব্য, স্মৃতি-সংহিতা, ধর্মদর্শনে হরপার্বতী, শিবদুর্গা, উমামহেশ্বর—'জগৎপিতরৌ' এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছেন। সংস্কৃতে রচিত শিবদুর্গা সাহিত্যের দুই শাখা—একটি মূলতঃ কাহিনী-কেন্দ্রিক, যাহাতে মহাদেব-সতী ও মহাদেব-উমার ঘরোয়া কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। আর একপ্রকার তত্ত্বাশ্রয়ী ও সাধন মার্গের সাহিত্যে (বিশেষতঃ নানা তন্ত্রে) শাক্ততত্ত্ব ও শাক্তদর্শন ব্যাখ্যাত হইয়াছে—যাহা মূলতঃ তন্ত্রের অধিকারভুক্ত। সেখানে সাধক আদ্যাশক্তির আরাধনা এবং দুরূহ সাধনপন্থা অবলম্বন করিয়া পিণ্ডদেহের মধ্যেই মোক্ষের চিদানন্দ উপলব্ধি করেন। বাংলার শাক্তগীতিকায় এই দুই বৈশিষ্ট্য—অর্থাৎ একটিতে কাহিনী-কেন্দ্রিক ঘরোয়া জীবনের ছায়া, আর একটিতে সাধনার দ্বারা মোক্ষলাভের কথা বলা হইয়াছে।

চণ্ডীকে পুরাণে শিবের গৃহিণীরূপে গ্রহণ করা হইলেও চণ্ডীতত্ত্বের মূল উৎস মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীমাহাত্ম্য অংশে মহাদেবের সঙ্গে চণ্ডীর পতিপত্নীর সম্পর্ক স্পষ্টতঃ উল্লিখিত হয় নাই।[২] 'চণ্ডী'তে দেবীকে কোথাও হিমাচল-কন্যা উমা বলিয়া সম্বোধন করা হয় নাই—যদিও মাঝে মাঝে তাঁহাকে 'দুর্গা' ও 'পার্বতী' বলা হইয়াছে। তবে সেখানে 'পার্বতী'র অর্থ পর্বতের কন্যা নহে, পর্বতবাসিনী দেবী বলিয়াই তাঁহাকে পার্বতী বলা হইয়াছে। সেইজন্য পণ্ডিতেরা অনুমান করেন, মার্কণ্ডেয় পুরাণের চণ্ডীতত্ত্ব ও চণ্ডীপ্রসঙ্গ সম্পূর্ণ পৃথক বস্তু। তাহার সঙ্গে পুরাণে-বর্ণিত উমাপার্বতীর বিশেষ কোন সম্পর্ক খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। ব্রহ্মার স্তবে বিষ্ণুর দেহ হইতে বিষ্ণু-মায়া জাগ্রত হইয়া অসুরগণকে বিনাশ করিলেন। ইহার সঙ্গে শিব অপেক্ষা বিষ্ণুরই যেন অধিক সম্পর্ক। চণ্ডী বিষ্ণুর শক্তি, বিষ্ণুতেই লীন হইয়াছেন। কিন্তু অসুর বিনাশের জন্য তিনি খড়্গ, শূল, গদা, চক্র, শঙ্খ, ধনুক (চাপ), বাণ, ভুসণ্ডী, পরিঘ প্রভৃতি আয়ুধ ধারণ করিয়া আবির্ভূত হন[৩] এবং দৈত্যদানবদিগকে

২. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্ত—ভারতের শক্তি সাধনা ও শাক্ত সাহিত্য, পৃ ৫১

৩. খড়্গিনী শূলিনী ঘোরা গদিনী চক্রিণী তথা।
শঙ্খিনী চাপিনী বাণভুসণ্ডী পরিঘায়ুধা॥
—শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১৷৮০

নির্মমভাবে বিনাশ করেন। ইহার সঙ্গে শিবের বিশেষ সম্পর্ক নাই। শুম্ভাসুর বিনাশের সময় দেবতারা দেবী চণ্ডিকার মধ্যে শক্তির সঞ্চার করিয়াছিলেন, মহাদেবও দৈত্যবিনাশের জন্য চণ্ডিকাকে শক্তি দান করিয়াছিলেন এবং তিনি দেবীর দূত হইয়া শুম্ভ-নিশুম্ভের নিকট গিয়াছিলেন। 'চণ্ডী'তে দেবী চণ্ডিকা এক স্বতন্ত্র দেবী, তিনি শুম্ভকে সদম্ভে বলিয়াছেন, "একৈবাহং জগত্যত্র দ্বিতীয়া কা মমাপরা"—এ জগতে আমিই একমাত্র, আমার আবার দ্বিতীয় কে? দেবতারা চণ্ডীর স্তবে তাঁহাকে 'বিশ্বেশ্বরী', 'বিশ্বাত্মিকা', 'বিশ্বাশ্রয়া' ইত্যাদি শব্দে ভূষিত করিয়াছেন। সুতরাং তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের একমাত্র দেবী এইরূপ স্পষ্ট ইঙ্গিত মার্কণ্ডেয় পুরাণের অন্তর্ভুক্ত চণ্ডী আখ্যানে আছে। পরবর্তী কালে রচিত দেবীভাগবতে তাঁহাকে অখিল জগতের বিশ্বজননী বলা হইয়াছে। তিনি ও ব্রহ্ম যে একই, একথা দেবীভাগবত প্রকাশ্যেই প্রচার করিয়াছে। ব্রহ্মা দেবীর কাছে জানিতে চাহিলেন, তাঁহার সঙ্গে ব্রহ্মের কি সম্পর্ক। দেবী বলিলেন, "যোঽসৌ সাহমহং যাসৌ ভেদোঽস্তি মতিবিভ্রমাৎ"—তিনিও যা, আমিও তাই; মতিবিভ্রম বশতঃই লোকে আমাদের মধ্যে ভেদ করিয়া থাকে। সুতরাং লক্ষ্য করা যাইতেছে, চণ্ডী প্রথমে ছিলেন ব্রহ্মের শক্তি, পরে হইলেন বিষ্ণুমায়া বা বিষ্ণুশক্তি এবং মার্কণ্ডেয় পুরাণ ও দেবীভাগবতের মধ্য দিয়া তিনি ক্রমে ক্রমে অদ্বিতীয়া ব্রহ্মসনাতনী হইয়া উঠিলেন। কিন্তু পরবর্তী কালে উমা-পার্বতী ও চণ্ডিকার ধারা প্রায়ই এক হইয়া গিয়াছে।

বাংলার শাক্ত পদাবলীতে হিমাচল-দুহিতা উমা-পার্বতী-গৌরী দুর্গার যেরূপ উল্লেখ আছে, তেমনি আছে কালিকার। বোধ হয় এই পদসাহিত্যে দেবী কালিকার প্রভাবই অধিক। প্রাচীন বৈদিক সাহিত্য, মহাভারত ইত্যাদি গ্রন্থে কালিকা বা মহাকালিকার ঈষৎ ইঙ্গিত আছে। বিশেষজ্ঞের মতে বেদের রাত্রি দেবীই কালিকার পূর্বাভাস। মহাভারতেও রক্তাস্যনয়না, রক্তমাল্যানুলেপনা, পাশহস্তা ভয়ঙ্করী কালীর বর্ণনা আছে। খিলহরিবংশে আছে—মদ্যমাংসপ্রিয়া কালীকে শবর, বর্বর, পুলিন্দ প্রভৃতি অনার্য জাতিরা পূজা করিত। পরে কালী ও চামুণ্ডাদেবীকে প্রায় এক বলিয়া মনে হয়।[৪]

৪. চণ্ডীতে তাঁহাকে 'চামুণ্ডা' বলা হইয়াছে, কারণ তিনি চণ্ডমুণ্ডকে বধ করেন।
(চণ্ডী—৭।২৭)

চণ্ডীতেও আছে, দেবী চণ্ডিকার ক্রুদ্ধ ললাটফলক হইতে নরকঙ্কালধারিণী, নরমালাবিভূষণা, লোলজিহ্বা, কৃষ্ণাঙ্গী, আরক্তলোচনা কালীর জন্ম হইল।[৫] ইনি অসুরগণকে মহাক্রোধে গ্রাস করিতে লাগিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, দেবী চণ্ডিকার দেহ হইতে কালিকার আবির্ভাব হইয়াছে, এবং চণ্ডীর নির্দেশেই তিনি রক্তবীজকে গ্রাস করেন। পরবর্তী পুরাণ ও তন্ত্রেও কালিকার সুবিস্তৃত বর্ণনা আছে। কিন্তু ইঁহার সহিত শিবের সংযোগ ঘটিল কি প্রকারে তাহা নির্ণয় করা সহজ নহে। আরও বিস্ময়ের কথা, মাতা চণ্ডিকা অসুরবিনাশের সময় শিবকে পদদলিত করিতেছেন এইরূপ বর্ণনাই নানাতন্ত্রে, বিশেষতঃ কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশের 'তন্ত্রসারে' গৃহীত হইয়াছে। অবশ্য তন্ত্রে ইহার নানাপ্রকার দার্শনিক ও রূপক-ব্যাখ্যাও দেখা যায়।

কালিকা মূর্তির পূজোপাসনা অনেক পূর্ব হইতেই তন্ত্রের দেশ বাংলায় প্রচারিত হইয়াছে।[৬] কৃষ্ণানন্দ আগমবাগীশ (বোধ হয় চৈতন্যদেবের সমসাময়িক) 'তন্ত্রসারে' বাংলা দেশে পূজিতা নানা প্রকার কালিকার উল্লেখ করিয়াছেন। ষোড়শ শতাব্দীর প্রসিদ্ধ তান্ত্রিক আচার্য ব্রহ্মানন্দ ('শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী' ও 'তারারহস্য' প্রণেতা), পূর্ণানন্দ ('শ্যামারহস্য' প্রণেতা) প্রভৃতি শাক্তসাধকগণ তান্ত্রিক সাধনা ও কালীর উপাসনা সম্বন্ধে নানা প্রকরণ ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। বাংলায় খ্রীঃ চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে দশভুজার মূর্তি ও পূজার সন্ধান পাওয়া গেলেও চতুর্ভুজা কালিকার পূজা-পদ্ধতি ষোড়শ শতাব্দীর পূর্বে বড় একটা পাওয়া যায় না। অবশ্য এই ভয়ঙ্করী দেবীমূর্তির উপাসনা সমাজের সর্বত্র চলিত বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণব সম্প্রদায় তো মদ্যমাংসদানে কালিকাপূজার ঘোর বিরোধী ছিলেন। ফলে বহুস্থলে, কোথাও প্রকাশ্যে, কোথাও-বা অন্তরালে শাক্ত ও বৈষ্ণবের দ্বন্দ্ব চলিত। এমন কি অষ্টাদশ শতাব্দীতে কাশীনাথ 'কালীশপর্যাবিধি' গ্রন্থে যে ভাবে কালীপূজার সমর্থন করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, উচ্চতর সমাজের সর্বত্র এই দেবীর পূজা তখনও গৃহীত হয় নাই।[৭] কালিকাপুরাণে ও মহানির্বাণ

৫. বিচিত্র খট্বাঙ্গধরা নরমালাবিভূষণা দ্বীপিচর্মপরিধানা শুষ্ক মাংসাতিভৈরবা।
অতিবিস্তারবদনা জিহ্বাললনা ভীষণা নিমগ্নরক্তনয়না নাদাপূরিতদিঙ্‌মুখা॥
(চণ্ডী, ৭।৭-৮)

৬. 'ব্রহ্মযামলে'র "কালিকা বঙ্গদেশে চ" উক্তিটি লক্ষণীয়।

৭. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৭৫

তন্ত্রাদিতে এই দেবীকে নানা গল্পকাহিনীর মধ্য দিয়া প্রধানা দেবী করিয়া তোলা হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের বহুস্থলে উমামহেশ্বর বা হরপার্বতীর নানাপ্রকার মানবলীলার চিত্র থাকিলেও কালীপূজা একটা বিশেষপ্রকার তন্ত্রসাধনারূপে বাংলা দেশেই অধিকতর জনপ্রিয় হইয়াছিল। 'তন্ত্রসারে' কালী, তারা প্রভৃতির যে বন্দনা ও স্তব আছে, বাংলা দেশের পরবর্তী কালের নিত্যকালী ও নৈমিত্তিক কালীপূজার যাবতীয় উপকরণ সেখান হইতেই সংগৃহীত হইয়াছে। বৌদ্ধ তারা, একজটা প্রভৃতি দেবীও কালিকার অনুরূপ—[৮ক] মহাযানী বৌদ্ধধর্মতন্ত্রের দ্বারা যে বিশেষ প্রভাবিত হইয়াছিল তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।[৯ক] যতটুকু তথ্য পাওয়া যাইতেছে তাহাতে অনুমান হয়, মাতৃকা-উপাসনার দার্শনিক পটভূমিকারূপে তন্ত্রবিদ্যা বেদের পূর্বে দ্রাবিড়গোষ্ঠীর মধ্যে প্রচলিত ছিল। তন্ত্রে 'চীনাচার' কথাটা এত অধিকবার ব্যবহৃত হইয়াছে যে মনে হয়, আদিতে ভোটচীনীয় নরগোষ্ঠীর

৮. ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, মহাচীনতারা, ছিন্নমস্তা প্রভৃতি শাক্তদেবীগণ মূলতঃ মহাযানী বৌদ্ধ দেবী। এক বৌদ্ধ ডাকিনীর বর্ণনা এই রূপ :

চতুর্ভুজা কৃষ্ণবর্ণা তু ত্রিনেত্রা একবক্ত্রকা।
দংষ্ট্রারৌদ্রকরালী চ পঞ্চমুদ্রাভিধারিণীঃ ॥

তন্ত্রশাস্ত্র ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ উভয় মতকেই প্রভাবিত করিয়াছিল—এই উল্লেখ হইতেই তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে। (ডঃ ভট্টাচার্যের *Sadhanmala*—II দ্রষ্টব্য)

৯. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের মতে তন্ত্র কোন সম্প্রদায়বিশেষের নহে। ব্রাহ্মণ, বৌদ্ধ, জৈন ধর্মাবলম্বী বিভিন্ন সম্প্রদায় তন্ত্রকে নিজ নিজ ধর্মসাধনার অঙ্গ হিসাবে গ্রহণ করিয়াছিলেন। "Tantricism is neither Buddhist nor Hindu in origin; it seems to be religious under-current, originally independent of any abstruse metaphysical speculation, flowing on from an obscure point of time in the religious history of India." (Dr. S. B. Dasgupta—*Obcure Religious Cults as the Background of Bengali Literature*) কিন্তু ডঃ বিনয়তোষ ভট্টাচার্যের মতে, "The bulk of literature which goes by the name of the Hindu tantras, arose almost immediately after the Buddhist ideas had established themselves." (*Sadhanmala*, Vol. II, Introduction) এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু সিদ্ধান্ত করা দুরূহ। তবে মনে হয় তান্ত্রিক দেবদেবীর পরিকল্পনায় ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধমত একে অপরের দ্বারা অন্যোন্যভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল।

মধ্যে মন্ত্রতন্ত্রসংযুক্ত একপ্রকার উপাসনা ও সাধনা প্রচলিত ছিল। তারপরে ভোটচীনীয় গোষ্ঠীর সঙ্গে ভৌগোলিক নৈকট্যের জন্য পূর্বভারতে তন্ত্রের বিশেষ প্রভাব দেখা যায়। "গৌড়ে প্রকাশিতা বিদ্যা"—ইহা অমূলক নহে। যাহা হউক তন্ত্রসাধনা কালক্রমে উত্তরবৈদিক যুগে ব্রাহ্মণ্য-বৌদ্ধ-জৈন ধর্মে প্রবেশ করে, তাহার সঙ্গে যোগ-হঠযোগ-তন্ত্রমন্ত্র-মুদ্রামণ্ডল যোগ দিয়া একটা বিচিত্র সাধনা-প্রণালী গড়িয়া তোলে।

তন্ত্রের দেবতা শক্তি বা নারী। তিনি আদ্যাশক্তি, সৃষ্টিপ্রপঞ্চের মূল বীজ। জন্মযূপে বদ্ধ পশুভাবালম্বী জীবের মোহ বিনাশের পর কি করিয়া মোক্ষ লাভ হয় তাহাই তন্ত্রে নানা সাধনপ্রকরণের মধ্য দিয়া ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তান্ত্রিক দার্শনিকগণ দেখিয়াছেন, কলিতে মানবগণ "শিশ্নোদর-পরায়ণাঃ" ও "নিদ্রালস্যপ্রযুক্তাঃ" হইবে। ঐহিক সুখকামী জীবের যুগপৎ মোক্ষ ও সুখ, ভুক্তি ও মুক্তির জন্য তাঁহারা তন্ত্রাচারকেই কলিযুগের ভবব্যাধির একমাত্র নিদান বলিয়া নির্দেশ করিয়াছেন। তাঁহাদের মতে মানুষ যখন শুধু দেহী হইয়া থাকে, তখন তাহার নাম 'পশুভাব'। পরে সাধনার দ্বারা যাঁহারা দেহকে জয় করেন তাঁহারা বীরভাবের সাধক বলিয়া পরিচিত হন। এই 'বীরভাব' কোন কোন তন্ত্রে ('রুদ্রযামল') সর্বশ্রেষ্ঠ বলিয়া স্বীকৃত হইয়াছে। বীরভাবের সাধক দ্রঢিষ্ঠ মানসিক বলের সাহায্যে দুঃসাধ্য শবসাধনাদি করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। শীঘ্র সিদ্ধি লাভের জন্য বীরাচারী সাধকগণ 'পঞ্চমকার' এবং 'ষট্কর্মাদি'[১০] আভিচারিক ক্রিয়াদি অনুশীলন করিয়া থাকেন। এই সমস্ত স্থূল ব্যাপারের গূঢ় তাৎপর্য আছে। ইহার পর 'দিব্যভাব'। ইহাই শ্রেষ্ঠ ভাব—সাধকের অন্তরে তখন মহাশক্তির দিব্যলীলা অনুভূত হয়—ইহা নিরাসক্ত নির্দ্বন্দ্ব অন্তর্যাগ—যাহার মূলকথা আদ্যাশক্তির আনন্দস্রোতে সাধক-সরিৎধারার পূর্ণ অবলুপ্তি। জীবকে অজীবলোকে উন্নীত করা, দেহপিণ্ডকে চিদানন্দময় ভাগবত তনুতে পরিণত করা, প্রবৃত্তি-তরঙ্গকে নিবৃত্তিসমুদ্রে বিলীন করা—ইহাই তন্ত্রসাধনার মূল রহস্য। প্রথমে পশুভাব, তারপর ক্রমোন্নতির ফলে বীরভাব, পরিশেষে দিব্যভাব—জীবের মোক্ষ-

১০. পঞ্চমকার—মদ্যং মাংসং তথা মৎস্যং মুদ্রাং মৈথুনমেব চ।
মকারং পঞ্চ সেবেৎ শীঘ্রসিদ্ধিপ্রদায়কম্॥
ষট্কর্ম— শান্তি, বশীকরণ, স্তম্ভন, বিদ্বেষণ, উচাটন, মারণ।

মুক্তি।[১১] এই পশু, বীর ও দিব্যভাবকে যথাক্রমে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্বগুণের প্রতীক হিসাবে গ্রহণ করা হয়।

তন্ত্রসাধনা প্রধানতঃ দেহকে কেন্দ্র করিয়াছে। তাই সাধককে ইষ্টসিদ্ধির জন্য প্রথমে দেহকে অবলম্বন করিয়া 'বহির্যাগ' করিতে হয়। 'শাক্তানন্দ-তরঙ্গিণী'তে বলা হইয়াছে, চৌরাশি লক্ষ শরীরীর মধ্যে মনুষ্য শরীর ভিন্ন অন্য কাহারও দ্বারা এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয় না। সাধক দেখিয়াছেন, ব্রহ্মাণ্ড ও দেহভাণ্ডের মধ্যে কোন পার্থক্য নাই। সুতরাং তাঁহারা দেহ-সাধনার উপর পুনঃ পুনঃ গুরুত্ব দিয়াছেন। তান্ত্রিক ক্রিয়ার দ্বারা ভঙ্গুর জীবদেহেই পরামুক্তি লাভ হইতে পারে। এই প্রক্রিয়ায় তন্ত্র, যোগ, হঠযোগ —সব মিলিয়া মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়া আধিদৈহিক চর্যার রূপ ধারণ করিয়াছে। ইঁহারা দেহবিজ্ঞান আলোচনা করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ভূত-শরীরে সাড়ে তিন লক্ষ নাড়ীর মধ্যে মেরুদণ্ডে প্রবাহিত ইড়া-পিঙ্গলা-সুষুম্না —এই তিন নাড়ীই প্রধান। আবার তাহার মধ্যে সুসুম্নাই সর্বপ্রধান। এই সুষুম্না নাড়ী গুহ্যদেশ হইতে শিরোদেশ পর্যন্ত প্রসারিত বলিয়া কল্পিত হইয়াছে; এই নাড়ী বাহিয়াই চিৎশক্তির গতায়াত হইয়া থাকে। সুষুম্নাতে আবার ছয়টি চক্র (ষট্চক্র) পরিকল্পিত হইয়াছে। এই চক্রগুলি 'পদ্ম' নামেও অভিহিত হয়। ইহাদের নাম—মূলাধার চক্র, স্বাধিষ্ঠান চক্র, মণিপুর চক্র, অনাহত চক্র, বিশুদ্ধ চক্র ও আজ্ঞা চক্র। শিরোদেশে যে পদ্ম আছে তাহা সহস্র দল যুক্ত, তাহার নাম সহস্রার। গুহ্য ও লিঙ্গের মধ্যে মূলাধার চক্র, লিঙ্গমূলে স্বাধিষ্ঠান চক্র, নাভিমূলে মণিপুর চক্র, হৃদয়ে অনাহত চক্র, কণ্ঠে বিশুদ্ধ চক্র এবং ভ্রূমধ্যে আজ্ঞাচক্র অবস্থিত। তন্ত্রসাধনায় শ্বাস ও প্রাণায়ামের দ্বারা সাধক মূলাধারে নিদ্রিতা কুলকুণ্ডলিনী অর্থাৎ আদ্যাশক্তিকে জাগ্রত করিবেন, এবং কুম্ভকযোগের দ্বারা জাগ্রত কুলকুণ্ডলিনীকে মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে ঊর্ধ্বাভিমুখে উঠাইয়া স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ এবং আজ্ঞাচক্রে উন্নীত করিবেন। এইরূপ হইলে সাধকের অন্তরে বাহিরে চিদানন্দময় দিব্যানুভূতি জাগিবে। অতঃপর সাধক কুলকুণ্ডলিনীকে শিরঃস্থিত সহস্রারে

---

১১. আদৌ ভাবং পশোঃ কৃত্বা পশ্চাৎ কুর্যাদাবশ্যকম্।
বীরভাবং মহাভাবং সর্বভাবোত্তমোত্তমম্।
তৎপশ্চাদতি সৌন্দর্যং দিব্যভাবং মহাফলম্। (রুদ্রযামল)

নিদ্রোত্থিত শিবের সহিত 'সামরস্য' সাধন[১২] করিবেন। ইহাই সাধকের মোক্ষ, নির্বাণ, মুক্তি। এইরূপ মানসিক অবস্থায় সাধকের আত্মপর ও জড়চেতন-বোধ এবং ভূতদেহের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায়, তখন তিনি অপরিমেয় আনন্দস্রোতে ডুবিয়া যান। ইহার পর দিব্যচৈতন্যের অবস্থা আসে, যাহাকে সাধারণ ভাষায় 'সমাধি' বলা হয়।[১৩]

এই পটভূমিকায় অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত পদাবলীর স্বরূপ বিচার করিতে হইবে। বাংলার শাক্ত কবিগণের অধিকাংশই তান্ত্রিক সাধক ছিলেন। তাই এই পদসমূহ নিছক কাব্যরসপিপাসা বা সহজভক্তির বশে রচিত হয় নাই। সাধ্য-সাধন-সম্পর্কিত মোক্ষতত্ত্বই বাংলার শাক্ত পদাবলীকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে।

শাক্তপদের স্বরূপ ॥

অষ্টাদশ শতাব্দীই শাক্তপদাবলীর বিকাশ ও পরিণতির যুগ। শ্রেষ্ঠ শাক্তপদকর্তৃগণ সকলেই এই শতাব্দীতে—বেশীর ভাগ দ্বিতীয়ার্ধে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, কেহ কেহ উনবিংশ শতাব্দীতেও শাক্তপদসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। কিন্তু ঐতিহাসিক উপাদান বিচার করিলে দেখা যাইবে যে, ষোড়শ-সপ্তদশ শতাব্দীতেও শাক্তপদাবলীর প্রায় অনুরূপ সাহিত্য এদেশে একেবারে অজ্ঞাত ছিল না। গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রথম জীবনে শাক্ত ছিলেন। তাঁহার ভণিতায় হরপার্বতীর অর্ধনারীশ্বর বিষয়ক একটি পদও পাওয়া গিয়াছে।[১৪] শ্রীনিবাস আচার্যের প্রভাবে আসিবার পূর্বে তিনি শাক্ত সাধকই ছিলেন এবং অনুমান হয়, স্বভাবদত্ত কবিপ্রতিভার অধিকারী গোবিন্দদাস কিছু কিছু শাক্তপদও লিখিয়া থাকিবেন। কিন্তু বৈষ্ণব ধর্ম গ্রহণের পর তাঁহার শাক্ত মনোভাব ও শাক্তপদ সমভাবে মুছিয়া গিয়াছে। ইহা ছাড়াও চণ্ডীমঙ্গল বা ভবানীমঙ্গল ধরনের সাহিত্যে এবং শাক্তপুরাণের

---

১২. এই সামরস্যকে যৌনমিলনের প্রতীকেই ব্যাখ্যা করা হইয়াছে—"স্ত্রীপুংযোগে তু যৎ সৌখ্যং সামরস্যং প্রকীর্তিতম্।"

১৩. বিস্তারিত বর্ণনার জন্য অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা' (পৃ. ১৫৮–১৭১) দ্রষ্টব্য।

১৪. গোবিন্দদাস কবিরাজ প্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে। এই লেখকের 'বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্তে'র ৩য় খণ্ডের ১ম পর্বে সে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

বাংলা অনুবাদে শাক্তপদাবলীর পূর্বাভাস পাওয়া যায়। কিন্তু বিশিষ্ট কাব্য-শাখারূপে শাক্তপদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীতেই সর্বাধিক প্রাধান্য অর্জন করে।

একদা পাঠান রাজত্বের অবসানকালে অরাজকতার মুহূর্তে জনসাধারণ প্রচণ্ড ক্ষমতাশালিনী দেবীর বরাভয় প্রার্থনা করিয়া মঙ্গলকাব্যকে প্রায় জাতীয় সাহিত্যে পরিণত করিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীতে, বিশেষতঃ মধ্যভাগে যখন সাম্রাজ্য, সমাজ, ধর্ম ও মনুষ্যত্ব ভাঙিয়া পড়িতেছিল, তখন দুর্বিপাক হইতে মুক্তি পাইবার জন্য ভক্তহৃদয় আদ্যাশক্তির কাছে মোক্ষ প্রার্থনা করিয়া বাস্তব দুঃখনৈরাশ্যের কবল হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছে। এই জন্য দেখা যাইতেছে যাহারা উচ্ছৃঙ্খল শাসকের খামখেয়ালে সর্বস্বান্ত হইতেছিল, যে সমস্ত ধনাঢ্য ভূস্বামী নবাবী লীলার ইন্ধন জোগাইতে গিয়া নিঃস্ব হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের অনেকে শ্যামা মায়ের নিকট অন্তরের আকৃতি নিবেদন করিয়াছেন। তাঁহারা মোক্ষের কথা বলিলেও বাস্তব দুঃখকে বৈরাগ্যের গেরুয়া বস্ত্রাঞ্চলের দ্বারা ঢাকিয়া ফেলেন নাই। যাহা হউক, প্রসিদ্ধ পদকর্তাদের শাক্তপদ হইতে দেখা যাইতেছে, এই পদসাহিত্যের কয়েকটি বিশেষ ভাবদ্যোতক শাখা জনসাধারণ, কবি ও সাধকদের কাছে বিশেষভাবে জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই শাখার একটি অংশ কাহিনীকেন্দ্রিক, পুরাণে বর্ণিত হরপার্বতীর কাহিনী এবং তাহার সহিত সংযুক্ত লৌকিক গার্হস্থ্য জীবনের কাহিনী দুই-ই অবিরোধে স্থান পাইয়াছে। এই কাহিনীতেই আবার মার্কণ্ডেয় পুরাণোক্ত চণ্ডীর আখ্যান ও তত্ত্ব গৃহীত হইয়াছে। আর একটি অংশে সাধকগণ কালিকাকে মাতৃরূপে ভজনা করিয়াছেন। মায়ের সঙ্গে সন্তানের যে স্নেহমধুর সম্পর্ক, ইহারা কালিকার সঙ্গে সেই সম্পর্ক পাতাইয়াছিলেন। এই অংশটি বৈষ্ণব-পদাবলীর বাৎসল্যরসের পদকে স্মরণ করাইয়া দেয়। অবশ্য শাক্তপদাবলীর বাৎসল্যরসের তুলনায় বৈষ্ণবপদাবলীর সমপর্যায়ের পদ ভাবের ঐকান্তিকতা ও আবেগের গভীরতায় ঈষৎ নিষ্প্রভ মনে হয়। তাহার কারণ শাক্তপদাবলীকারগণের বাৎসল্যরস একান্তভাবে বাস্তব মায়ের তীব্র চেতনায় পূর্ণ; বাস্তব বলিয়াই সে আবেগ এখনও এমন প্রত্যক্ষভাবে শ্রোতার চিত্ত আকর্ষণ করে। আর একটি পর্যায়ের পদে সাধকের 'সাধনসমর' অর্থাৎ মাতৃপ্রসাদে মোক্ষমুক্তি লাভের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস ইঙ্গিতে ব্যক্ত হইয়াছে। এই অংশে কবি ও সাধকগণ তন্ত্রের নানা

ক্রিয়াকর্ম অবলম্বনে আদ্যাশক্তির করুণায় মোক্ষাভিপ্রয়াসী হইয়াছেন। শেষ পর্বই শাক্ত পদের ফলশ্রুতি, ভক্তের অদ্বৈতপন্থী ও ভূমানন্দময় মোক্ষলাভ।

কবিগণ হরপার্বতীর গার্হস্থ্যজীবন বর্ণনায় বাংলাদেশের প্রতিদিনের ছবিই গ্রহণ করিয়াছেন। এই সমস্ত অংশে কৃত্রিম কাব্যকলা সৃষ্টির কোনরূপ প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায় না। বিশেষতঃ আগমনী ও বিজয়াবিষয়ক পদগুলিতে নিরাভরণ প্রাণের কথা মানবীয় আধারে পরিবেশিত হওয়াতে ইহাদের জনপ্রিয়তা এখনও অব্যাহত আছে। এখনও যখন হঠাৎ সজল দম্‌কা হাওয়া দিয়াই বর্ষা বিদায় লয়, শরতের রৌদ্রাকীর্ণ প্রান্তরে উদাসী রাখালের মেঠো সুরের বাঁশী বাজে, তখন আগমনী পর্যায়ের পদগুলি ঘুরিয়া ফিরিয়া মনের মধ্যে গুনগুন করিতে থাকে, পথভিখারীর কণ্ঠে আগমনীর উল্লাস এবং বিজয়ার বিষণ্ণতা রামপ্রসাদী সুরে মাঠঘাট ভরিয়া ফেলে। তাই এই পদগুলিতে বাংলা দেশের মায়েদের প্রাণের কথা বড় আন্তরিক করুণ সুরে ধরা পড়িয়াছে। এই জাতীয় পদের ভাবে-ভাষায় চেষ্টাকৃত কাব্যসৌন্দর্য সংযোজনার কোন চিহ্ন নাই—প্রাণের কথা কবি সাধকদের লেখনীতে সহজ-সরলভাবেই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কিন্তু তত্ত্বকথা বর্ণনায় কবিরা অলঙ্কার-কলা, বিশেষতঃ উপমারূপকের প্রচুর সাহায্য লইয়াছেন। কিংবা যেখানে সাধকেরা দেবীর প্রচণ্ড মূর্তির কথা বলিয়াছেন, সেখানেও ভাষায় তৎসম শব্দপ্রধান ক্লাসিক গাম্ভীর্য সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। যেখানে গিরিরাণী শিশু উমার আদর-আবদারের কথা গিরিরাজের কাছে আসিয়া নিবেদন করেন, তখন তাহার ভাষা মাতৃহৃদয়ের বাৎসল্য-পরিপূরিত হইলেও তাহাতে কোনও-রূপ কৃত্রিম কাব্যকলার স্পর্শ নাই। উদাহরণস্বরূপ রামপ্রসাদের এই পদটি লক্ষ্য করা যাইতে পারে :

গিরিবর, আর পারি না হে প্রবোধ দিতে উমারে।
উমা কেঁদে করে অভিমান নাহি করে স্তন পান
নাহি খায় ক্ষীর ননী সরে॥
অতি অবশেষ নিশি গগনে উদয় শশী
বলে উমা ধরে দে উহারে।
কাঁদিয়া ফুলালে আঁখি মলিন ও মুখ দেখি
মায়ে ইহা সহিতে কি পারে॥

আয় আয় মা মা বলি ধরিয়ে কর অঙ্গুলি
যেতে চায় না জানি কোথা রে।
আমি কহিলাম তায় চাঁদ কি রে ধরা যায়
ভূষণ ফেলিয়া মোরে মারে॥

এখানে কবির নিরাভরণ বর্ণনাই ইহার অলঙ্কার, সাদা কথাই কাব্যসমুৎকর্ষ সৃষ্টি করিয়াছে। আবার যখন ভক্তকবি আদ্যাশক্তির রণোন্মত্ত বেশ বর্ণনা করেন:

ঢ়ুলিয়ে ঢ়ুলিয়ে কে আসে।
গলিত চিকুর আসব-আবেশে॥
বামা রণে দ্রুতগতি চলে দলে দানবদলে
ধরি করতলে গজ গরাসে।
নীলকান্তমণি নিতান্ত নখরনিকর তিমির নাশে॥
বামার কিরূপ ছটা রে কিরূপ ঘটা রে
ঘন ঘন ঘন উঠে আকাশে॥
কে রে কালী শরীরে শোভিছে রুধিরে
যমুনা সলিলে কিংশুক ভাসে।
কে রে নীলকমল শ্রীমুখমণ্ডল অর্ধচন্দ্র প্রকাশে॥

তখন ভাষা ও ভাবের মধ্যে একপ্রকার শঙ্কাতুর গাম্ভীর্য সঞ্চারিত হয়।

শাক্তপদের কবিত্ব ও সাধনা॥

সাধারণ কাব্যবিচারের মানদণ্ডের আদর্শে শাক্তপদাবলী বিচার করিতে গেলে কবিসাধকদের প্রতি অবিচার করা হইবে। কারণ ইঁহারা কেহই নিছক কাব্য করিবার জন্য বা শ্রোতাদের সঙ্গীত-পিপাসা নিবারণ করিবার জন্য এই গীতিকাসমূহ রচনা করেন নাই। তাঁহারা মূলতঃ সাধক ও মোক্ষাভিলাষী, গৌণতঃ কবি। তাই সাধারণ কাব্যকবিতার আদর্শে দেখিলে শাক্ত পদাবলীর অনেকটাই খর্ব মনে হইবে। কবিসাধকগণ নানা উপমা-অলঙ্কার ইঙ্গিতে-আভাসে জগজ্জননী আদ্যাশক্তির স্বরূপ নির্ধারণ করিতে গিয়াছেন, কারণ যাঁহাকে ভক্তি করিতে হয় তাঁহার একটা রূপায়তন না হইলে চলে না। তাই কবিরা পৌরাণিক সংস্কার ও গার্হস্থ্য চেতনার সমন্বয়ে মহাশক্তির বিশ্বাকাশসঞ্চারী বিরাট রূপের চিত্র যেমন আঁকিয়াছেন, তেমনি

আবার প্রতিদিনের জীবনক্ষেত্রেও বিশ্বমাতাকে ঘরের মায়ের রূপে প্রত্যক্ষ করিতে চাহিয়াছেন। কবি কমলাকান্ত যখন বলেন :

রঙ্গে নাচে রণমাঝে কার কামিনী মুক্তকেশী।
হৈয়ে দিগম্বরী ভয়ঙ্করী করে ধরে তীক্ষ্ণ অসি॥
কে রে তিমিরবরণী বামা হৈয়া নবীন ষোড়শী।
গলে দোলে মুণ্ডমালা মুখে মৃদু মৃদু হাসি॥
বিনাশে দনুজ গণে দেখে মনে ভয় বাসি।
ছাথ, শবছলে চরণতলে আশুতোষ পড়িল আসি॥

তখন কবি তন্ত্রে বর্ণিত বাঁধাগতের কালীরূপে বর্ণনা করেন—যাহাতে কবিত্ব-প্রকাশের বিশেষ অবকাশ নাই। কিন্তু যেখানে কবি কালভয়নিবারিণী মহাকালীকে নিজ অন্তরে উপলব্ধি করেন, তখনই তাহা শিল্পরূপ লাভ করে :

সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা
তুমি আপনি সুখে আপনি নাচ, আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী।
যখন ব্রহ্মাণ্ড না ছিল হেথা মুণ্ডমালা কোথায় পেলি॥

কিংবা কবি যখন সাভিমানে কালিকাকে সম্বোধন করিয়া বলেন :

যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই॥
মা তোমার করুণা যত বুঝিলাম অবিরত
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই॥ (নরচন্দ্র)

তখন তাহাতে মর্ত্যের স্নেহাভিমান চমৎকার রসরূপ লাভ করে। শাক্তপদের কবিগণ কোন কোন স্থলে পৌরাণিক প্রভাবে গুরুগম্ভীর বাক্-রীতি ব্যবহার করিলেও[১৫] যেখানে প্রতিদিনের বাস্তব পরিবেশে আদ্যা-

১৫. যেমন—

অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী।
না সরে নিঃশ্বাস পাশবন্ধনে রয়েছে প্রাণী॥
চমকিত কি কুহক অর্জিত এ তিনলোক
অহংবাদী জ্ঞানী দেখে তমোরজোতে ব্যাপিনী।
বৈষ্ণবী মায়াতে মোহ সচৈতন্ত নহে কেহ
শঙ্কর প্রভৃতি পদ্মযোনি॥

(মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামে প্রচারিত)

শক্তিকে স্থাপন করিয়াছেন সেখানে তত্ত্বরস মানবরসে পরিণত হইয়াছে। ব্যাকুল কবি যখন প্রশ্ন করেন :

বল্ মা আমি দাঁড়াই কোথা।
আমার কেহ নাই শঙ্করী হেথা॥ (রামপ্রসাদ)

কিংবা কবি যখন নির্মম মাতার ব্যবহারে অভিমানস্ফুরিত কণ্ঠে বলেন :

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা সর্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত পীঠস্থান ছিল যত
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত কেন আর যন্ত্রণা পাই॥ (নরচন্দ্র)

তখন ব্যক্তিচিত্তের স্পর্শে তত্ত্বকথাও মানবীয় আবেগ লাভ করে।

কবিগণ আগমনী-বিজয়ার পদে যে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। বাৎসল্য রসের এরূপ স্নিগ্ধতা, দেবীকে মানবীরূপের মধ্য দিয়া এরূপ নিবিড় উপলব্ধি—অথচ দেবীর দৈব মহিমাও ক্ষুণ্ণ হয় নাই, ইহার দৃষ্টান্ত বৈষ্ণব পদাবলীতে বিরল। দীর্ঘকাল পরে গৌরী পিতৃগৃহে ফিরিতেছেন, গিরিরাণীর স্নেহব্যাকুলতার আর্তি কবিরা একেবারে মানবী মাতার অন্তর হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন। গিরিরাণীর অনুযোগে গিরিরাজের গৌরীকে আনিতে কৈলাসধামে যাত্রা, কন্যাকে নিজ পুরীতে লইয়া আসা, কিছুদিন আনন্দের হাটের বর্ণনা—এ সমস্তই বাঙালীর ঘরের পটভূমিকায় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। পুরবাসীরা গিরিরাণীকে সান্ত্বনা দিয়া বলেন :

গা তোল গা তোল বাঁধ মা কুন্তল
ঐ এলো পাষাণী তোর ঈশানী। (দাশরথি রায়)

রাণী ব্যাকুল হইয়া কন্যাকে কোলে ধারণ করেন, "পুনঃ কোলে বসাইয়ে চারুমুখ নিরখিয়ে চুম্ব অরুণ অধরে," দীর্ঘ অদর্শনের পর মাতা-পুত্রীর এ মিলনদৃশ্য বাঙালীর ঘরের স্নেহ ছানিয়াই নির্মিত হইয়াছে। কবিগণ আদ্যা-শক্তির বিরাট স্বরূপ সহস্রারের সহস্রদলে ধরিতে চাহিলেও আগমনী-বিজয়ার গানে কোলের সন্তানের কথাই বলিয়াছেন—এমন কি, কোন কোন পদকর্তা বলিয়াছেন, দশভুজা দুর্গা ও চতুর্ভুজা কালীমূর্তি দেখিয়া গিরিরাণী ভয়ে পিছাইয়া গিয়াছিলেন :

গিরি, কার কণ্ঠহার আনিলে গিরিপুরে।
এতো সে উমা নয়—ভয়ঙ্করী হে দশভুজা মেয়ে। (রসিকচন্দ্র)

কখনও গিরিরাণী বলিয়া ওঠেন :

কে হে গিরি কে সে আমার প্রাণের উমানন্দিনী।
সঙ্গে তব অঙ্গনে কে এলো রণরঙ্গিণী। (দাশরথি)

জননী মেনকা তো ষড়ৈশ্বর্যশালিনী উমামহেশ্বরীকে চাহেন না :

হায় আমার সেই বিমলা অতি শান্তশীলা।
রণবেশে কেন আসবে ঘরে।
* * * *
হায় হেন রণবেশে এল এলোকেশে
এ নারীরে কেবা চিনতে পারে। (রসিকচন্দ্র)

এই রণরঙ্গিণী রমণীতে গিরিরাণীর প্রয়োজন নাই—কবিদেরও প্রয়োজন নাই। মা যখন পুরবাসীকে ডাকিয়া বলেন :

দেখে যা গো নগরবাসী।
অঙ্গনে উদয় আমার উমা অকলঙ্ক শশী।

তখন সে অকলঙ্ক শশী ভূতলেই উদয় হয়। কিন্তু আগমনী গানে যেমন স্নেহাসক্তির মানবীয় স্বাদ চিত্তকে প্রসন্ন করিয়া তোলে, বিজয়ার গানে তেমনি বিষণ্ণতা বৈরাগ্যের বেশ ধরিয়া কাছে আসিয়া দাঁড়ায়। তিন দিন পরে বাঙালীর ঘর-সংসার চণ্ডীমণ্ডপ আঁধার হইয়া যায়। সেই কথা বিজয়ার গানে কবিগণ বড় মর্মান্তিকভাবে বলিয়াছেন। গিরিরাণী জানেন নবমীর নিশি পোহাইলেই ক্ষেপা মহেশ্বর আসিয়া উমাকে লইয়া যাইবেন—"ঐ দ্বারে বাজে ডম্বরু হর বুঝি নিতে এল।" ভোলা মহেশ্বর যে উমাকে আহ্বান করিয়াছেন :

বিছায়ে বাঘের ছাল দ্বারে বসে মহাকাল
বেরোও গণেশমাতা ডাকে বারবার।

মাতৃহৃদয়ের ব্যথা বেদনা বাঙালীর মনে চিরদিনই এমন একটা স্নেহব্যাকুল আবেগ সৃষ্টি করে যে, শরৎ আসিলেই যেমন একদিকে পীতরৌদ্রসিক্ত জলে-স্থলে আগমনীর গান বাজিতে থাকে, তেমনি আবার তাহারই সঙ্গে বিজয়ার বিষণ্ণতাও অন্তরকে ভারাক্রান্ত করিয়া তোলে—বাঙালীর দশভুজা উৎসব শুধু ধর্মীয় উৎসব নহে, সমাজ ও পারিবারিক জীবনের সঙ্গেও ইহা ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। সুতরাং এই গানগুলিকে শুধু সাহিত্যের আদর্শে বিচার করিলে

চলিবে না, ইহার সঙ্গে বাঙালীর দীর্ঘ দিনের সংস্কারের যোগ তাহা ভুলিলে ইহার যথার্থ স্বরূপ বুঝা যাইবে না।

কবিগণ সাধনভজন-সংক্রান্ত যে সমস্ত গান লিখিয়াছেন এবং রূপকের ছলে যে সমস্ত নীতি-তত্ত্ব ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সঙ্গে রসের সম্পর্ক বড় অল্প। সাধক-কবি যখন তন্ত্রসাধনার তাৎপর্য প্রতীকের সাহায্যে ইঙ্গিত দেন :

ভুবন ভুলাইলি মা হরমোহিনী।
মূলাধারে মহোৎপলে বীণাবাদ্যবিনোদিনী॥
শরীর শারীব যন্ত্রে সুষুম্নাদি ত্রয়তন্ত্রে
গুণভেদে মহামন্ত্রে তিন গ্রাম সঞ্চারিণী॥
আধারে ভৈরবাকার ষড়দলে শ্রীরাগ আর
মণিপুরেতে মহ্লার বসন্তে হৃৎপ্রকাশিনী॥ (নন্দকুমার)

কিংবা

হৃৎকমলমঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥ (রামপ্রসাদ)

তখন মনে হয় কবি সাধনতত্ত্ব লইয়া এত ব্যস্ত যে কবিত্বের দিকে দৃষ্টিপাত করিবার সময় পান নাই। কিন্তু কোথাও কোথাও নিছক তত্ত্বকথাও ব্যক্তি-জীবনের স্পর্শে রসময় হইয়া উঠিয়াছে :

যে দেশেতে রজনী নাই সেই দেশের এক লোক ধরেছি।
আমার কিবা দিন কিবা সন্ধ্যা সন্ধ্যাকে বন্ধ্যা করেছি॥
ঘুম ছুটেছে আর কি ঘুমাই যোগেযাগে জেগে আছি
এবার যার ঘুম তারে দিয়ে ঘুমেরে ঘুম পাড়ায়েছি॥

শাক্ত সাধকগণ ভারতবর্ষের সনাতন প্রথামতো রূপক প্রতীকের প্রচুর সাহায্য লইয়াছেন, বিশেষতঃ তত্ত্বকথা ব্যাখ্যায়—এবং সে রূপকপ্রতীক প্রতিদিনের জীবন হইতেই চয়িত হইয়াছে। এখানে এইরূপ কিছু রূপক-প্রতীকের উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

পাশা খেলার রূপক—

ভবের আসা খেলব পাশা বড় আশা মনে ছিল
মিছে আশা ভঙ্গ দশা প্রথমে পঞ্জুড়ি প'ল॥

পঁচার আঠার বোল যুগে যুগে এলাম ভাল
শেষে কচ্চে বার পেয়ে মাগো পাঁজাছকায় বদ্ধ হল। (রামপ্রসাদ)

কলুর বলদ—

মা আমায় ঘুরাবে কত।
কলুর চোখঢাকা বলদের মত। (ঐ)

কূপের ঘড়া—

আর কত কাল ভুগবো কালী হয়ে আমি কুয়োর ঘড়া।
এই ভবকূপে কোনরূপে নিবৃত্তি নাই ওঠা পড়া।
আশী লক্ষ পাটে ঠেকে সর্বাঙ্গে পড়েছে কড়া।
আবার গলায় কশা শক্ত ফাঁসা মায়ামোহ দড়িদড়া। (প্যারীমোহন)

তাস (গ্রাবু) খেলা—

সাধনরূপ গ্রাবু খেলা এই বেলা মন খেলিয়ে নে রে।
জিৎ হবে ভবের বাজি কালী নামের টেকা মেরে। (রসিকচন্দ্র)

কৃষিকার্য—

মন রে কৃষিকাজ জান না।
এমন মানবজমিন রইল পতিত আবাদ করলে ফলতো সোনা। (রামপ্রসাদ)

তারের বাদ্যযন্ত্র—

মন-সেতারে বাজারে তায় তারা তারা বলে।
কাল বন্ধন করিতে তোরে আসে রজ্জু নিয়ে করে।
তোমার দেহরূপী লাউ ছিল বহু দিনে জীর্ণ হল
জ্ঞানপর্দা ছিন্নভিন্ন হল তোর দোষে। (গোবর্ধন)

নৌকা—

মনপবনের নৌকা বটে বেয়ে দে শ্রীদুর্গা বলে।
মন মহামন্ত্র যন্ত্র যার সুবাতাসে বাদাম তুলে।
মহামন্ত্র কর হাল কুণ্ডলিনী কর পাল
সুজন কুজন আছে যারা তাদের দে রে দাঁড়ে ফেলে। (কমলাকান্ত)

ঘুড়ি—

শ্যামা মা উড়াচ্ছেন ঘুড়ি ভবসংসার বাজারের মাঝে।
ঐ যে মন-ঘুড়ি, আশাবায়ু বাঁধা তাতে মায়াদড়ি। (রামপ্রসাদ)

এখানে দেখা যাইবে কবিগণ নিতান্তই দৈনন্দিন অভিজ্ঞতার রূপকে তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিয়াছেন। তবে একথাও স্বীকার করিতে হইবে, এই সমস্ত রূপকপ্রতীকের সাহায্যে তত্ত্বকথার ব্যঞ্জনা যথাযথ হইলেও বহু স্থলেই

ইহাতে বিশেষ কবিত্ব লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু কবিরা যেখানে ব্যক্তিগত কথা বলিয়াছেন, সেখানে তত্ত্বরসও কাব্যরূপ লাভ করিয়াছে। কবি যখন বলেন—

মা, নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিতমুখে সারা দিনটা গেল॥ (রামপ্রসাদ)

কিংবা—

আমি কি দুখেরে ডরাই।
দুখে দুখে জন্ম গেল আর কত দুখ দাও দেখি তাই॥
* * *
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ি বোঝা নামাও ক্ষণিক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোকে গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই॥ (রামপ্রসাদ)

অথবা—

দোষ কারো নয় গো মা।
আমি স্বখাত সলিলে ডুবে মরি শ্যামা॥

তখন কবিদের বাস্তব দুঃখবেদনা ভক্তিরসে সার্থক হইলেও ইহার আবেদন মানুষের সহানুভূতিকে জাগ্রত করে। শাক্তপদের এই তীব্র বাস্তবচেতনার একটা কারণ অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ও রাজনৈতিক দুঃখলাঞ্ছনা। মুঘল শাসনের অবসান এবং ইংরাজ শাসনের প্রারম্ভকালে সাধারণ ব্যক্তি ও জমিদার উভয়কেই সেই বিশৃঙ্খলার তাপ ভোগ করিতে হইয়াছিল। এই যুগে অশান্তি, আশঙ্কা ও অনিশ্চয়তা বাঙালীর মনকে ব্যাকুল করিয়া তুলিয়াছিল—কবিগণ তাহার পটভূমিকায় অধ্যাত্ম রসের কথা বলিয়াছেন বলিয়া ইহার বাহ্যিক রূপ অধিকতর চিত্তাকর্ষক হইয়াছে।

শাক্তপদের সাধনার কথা বিবেচনা করিলে দেখা যাইবে, কবিগণ সকলেই যেন অসহায় মানবশিশু, বাস্তব দুঃখলাঞ্ছনা তাঁহাদিগকে মুমূর্ষু করিয়া তুলিয়াছে। তাই তাঁহারা কালভয়নিবারিণী মহাকালিকার চরণে শরণ লইয়াছেন। কবিদের অধিষ্ঠাত্রী দেবী আদ্যাশক্তি। তিনি কখনও হরগেহিনী পার্বতী, গণেশজননী দুর্গা, কখনও চণ্ডমুণ্ডবিনাশিনী চণ্ডিকা, কখনও-বা ধ্বংসের প্রতীক কালিকা। সাধকগণ সেই আদ্যাশক্তির প্রসাদ প্রার্থনা করিয়াছেন, কালিকার উদ্যত খড়্গের তলে নিজেদের সঁপিয়া দিয়াছেন। তাঁহাদের মতে আদ্যাশক্তিই বিশ্ব ও বিশ্বাতীতের মূল প্রেরণা। এই দিক

দিয়া তাঁহারা বেদান্তবাদীদের মতো অদ্বৈতবাদী। কখনও তাঁহারা আদ্যাশক্তিকে বলেন, "আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী" (কমলাকান্ত), কেহ বলেন, "ঐ যে কালী কৃষ্ণ শিব রাম—সকল আমার এলোকেশী" (রামপ্রসাদ), "আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে—পদে গয়াগঙ্গাকাশী" (ঐ) ষড়দর্শনেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না ("ষড়দর্শনে না পায় দর্শন"—রামপ্রসাদ)। তাই রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "আমি ব্রহ্ম জেনে ধর্মাধর্ম সব ছেড়েছি।"[১৬] দেওয়ান রামদুলাল নন্দী এ বিষয়ে চমৎকার বলিয়াছেন :

জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি।
যে তোমায় যেভাবে ডাকে তাতে তুমি হও মা রাজি।
মগ বলে ফয়া তারা গড্ বলে ফিরিঙ্গী যারা মা
খোদা বলে ডাকে তোমায় মোগল পাঠান সৈয়দ কাজী।
শাক্তবলে তুমি শক্তি শিব তুমি শৈবের উক্তি মা
সৌরী বলে সূর্য তুমি মা, বৈরাগী কয় রাধিকা জি।
গাণপত্য বলে গণেশ যক্ষ বলে তুমি ধনেশ
শিল্পী বলে বিশ্বকর্মা বদর বলে নায়ের মাঝি।

পরিশেষে রামদুলাল আদ্যাশক্তিকে ব্রহ্ম নামেই অভিহিত করিয়াছেন। কমলাকান্তও বলিয়াছেন, "যেরূপ যে জন করেন ভজন সেইরূপ তার মানসে রয়"। তাঁহাকে কবিওয়ালা নীলুঠাকুর (চক্রবর্তী) বলিয়াছেন, "ব্রহ্মরূপিণী, ব্রহ্মার জননী ব্রহ্মরন্ধ্রবাসিনী।" এইরূপ অদ্বৈততত্ত্বের মারফতেই কবিগণ সমস্ত সৃষ্টির মূলশক্তি আদ্যাশক্তিকে ব্রহ্মস্বরূপিণী বলিয়াছেন।

এই প্রসঙ্গে একটি কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। শাক্তপদাবলীর পূর্বে বৈষ্ণবপদাবলী ও বৈষ্ণবমতাদর্শ সমগ্র বাংলাকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল। তাই শাক্তপদাবলীর গঠনপ্রকৃতিতে বৈষ্ণব প্রভাব অস্বীকার করা যায় না। অবশ্য পুরাণে (চণ্ডী) মহামায়াকে পরমবৈষ্ণবী বলা হইয়াছে। তিনি বিষ্ণুর যোগনিদ্রা,[১৭] তাঁহার শক্তি; তাই তিনি বিষ্ণুমায়া নামে পরিচিত।[১৮] বাংলার শাক্তপদকারগণ বৈষ্ণবপদাবলী ও তত্ত্বের দ্বারা

---

১৬. পাঠান্তর—"এবার শ্যামার নাম ব্রহ্ম জেনে ধর্মকর্ম সব ছেড়েছি।"

১৭. শ্রীশ্রীচণ্ডী, ১।৫৪

১৮. যা দেবী সর্বভূতেষু বিষ্ণুমায়েতি শব্দিতা।
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ নমোনমঃ॥

বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছিল। স্বয়ং রামপ্রসাদ কালীকীর্তনে বৈষ্ণব পদপর্যায়ই অনুসরণ করিয়াছেন—যদিও সে বর্ণনায় সর্বত্র সঙ্গতি রক্ষিত হয় নাই। [১৯] শাক্তপদকারগণ এ বিষয়ে প্রচ্ছন্ন বৈষ্ণবানুরক্তির পরিচয় দিয়াছেন। তাঁহারা শ্যামা ও শ্যামকে অভেদ বলিয়াছেন। এখানে এইরূপ কয়েক ছত্রের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) কালীঘাটে কালী তুমি মাগো কৈলাসে ভবানী।
বৃন্দাবনে রাধা প্যারী গোকুলে গোপিনী গো॥ (দ্বিজ রামপ্রসাদ)

(২) কালী হলি মা রাসবিহারী নটবর বেশে বৃন্দাবনে
পৃথক প্রণব নানা লীলা তব কে বুঝে একথা বিষম ভারি।
নিজ তনু আধা গুণবতী রাধা
আপনি পুরুষ আপনি নারী॥ (রামপ্রসাদ)

(৩) জান না রে মন পরম কারণ কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
(কমলাকান্ত)

(৪) অভেদে ভাব রে মন কালা আর কালী।
মোহন মুরলিধারী চতুর্ভুজা মুণ্ডমালী॥ (রামদুলাল দাস)

(৫) হৃদয়রাসমন্দিরে দাঁড়াও মা ত্রিভঙ্গ হয়ে।
একবার বাঁকা হয়ে দে মা দেখা শ্রীরাধারে বামে লয়ে॥ (নবাই ময়রা)

(৬) যশোদা নাচাতো গো মা বলে নীলমণি।
সে বেশ লুকালো কোথা করালবদন শ্যামা॥ (রামপ্রসাদ)

এই সমস্ত উদ্ধৃতি হইতে দেখা যাইতেছে, শাক্তকবিগণ অসাম্প্রদায়িক উদার ধর্মসাধনার দ্বারা উদ্বুদ্ধ হইয়াছিলেন। আদ্যাশক্তির মধ্যেই সমস্ত তত্ত্ব নিহিত আছে, সব দেবদেবীই তাঁহার কায়ব্যূহ নির্মাণ করিয়াছেন, তাঁহার চরণ সমস্ত তীর্থের সার তীর্থ[২০]। তবু তাঁহারা যে কালী ও কৃষ্ণকে

১৯ পরে আলোচনা করা হইয়াছে। শাক্তপদকার রামপ্রসাদ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

২০. মদনমাস্টার নামক এক কবিওয়ালা গাহিয়াছেন, "গয়াগঙ্গা প্রভাসাদি কাশীকাঞ্চী কেবা চায়।" রামপ্রসাদও বলিয়াছেন :

আর কাজ কি আমার কাশী।
মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গা বারাণসী॥

এবং করিয়া ফেলিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, বৈষ্ণবতত্ত্ব তাঁহাদিগকেও বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল।

শাক্তপদাবলীর কাব্যোৎকর্ষ বৈষ্ণবপদের সমতুল্য নহে, তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। কারণ অধিকাংশ কবি মূলতঃ ছিলেন সাধক ও গায়ক। সুতরাং সাধনা ও গানের সুরের প্রতি অধিকতর দৃষ্টি থাকার জন্য শাক্তপদাবলী সর্বত্র কাব্যরূপ লাভ করিতে পারে নাই। বহু স্থলে রূপকাশ্রয়ী তত্ত্বকথা, তান্ত্রিক-সাধনা প্রভৃতি পারিভাষিক ব্যাপার এত বেশী ব্যবহৃত হইয়াছে যে, মণ্ডনকলার প্রতি কবিদেব বিশেষ কোন লক্ষ্যই ছিল না। সহজ সরলভাষায় রূপকের আধারে কবিগণ বাৎসল্যরসের আবেগকে চমৎকার পার্থিব মূর্তি দান করিয়াছেন। কিন্তু বৈষ্ণব পদাবলীর যেমন অযুত ঐশ্বর্য যে-কোন পাঠককেই মুগ্ধ করিয়া রাখে, শাক্তপদাবলী সম্বন্ধে সর্বদা সে কথা বলা যায় না। তবে বৈষ্ণবপদাবলী হইতে বৈষ্ণব কবিদের ব্যক্তিগত কথা ততটা ধরা যায় না, শাক্তপদাবলীর কবিরা কিন্তু নিজেদের ব্যক্তিগত কথা নিবেদন করিতে সঙ্কুচিত হন নাই। সে যাহা হউক, শাক্তপদাবলীর কাব্যসৌন্দর্য ও আবেগের সূক্ষ্মতা ও গভীরতা বৈষ্ণবপদাবলীর মতো উচ্চশ্রেণীর না হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্ত ভক্তিবাদ এবং বাঙালী সমাজের সঙ্গে সেই ভক্তিবাদের সম্পর্ক বুঝিতে হইলে শাক্তপদশাখার বিশেষ মূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

এই প্রসঙ্গে শাক্তপদের সঙ্গীতের আবেদনও স্মরণ করা যাইতে পারে। বৈষ্ণবপদাবলী যেমন বিভিন্ন ঘরানার কীর্তনের দ্বারা জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল, তেমনি অষ্টাদশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীও একটা বিশেষ সঙ্গীতরীতি অবলম্বন করিয়াছিল। অধিকাংশ শাক্তপদ বিভিন্ন রাগ-রাগিণীতে গীত হইত, এখনও হয়। রামপ্রসাদ-কমলাকান্তের শ্যামাসঙ্গীতের মুদ্রিত সংস্করণের গানগুলির শিরোদেশে সব সময় রাগ ও তালের উল্লেখ থাকিত। রামনিধি গুপ্ত (নিধুবাবু), কালী মির্জা, শ্রীধর কথক প্রভৃতি টপ্‌পাগায়কদের দ্বারা কিয়দংশে মার্গসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত টপ্‌পা গায়ন-রীতি অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল। এই টপ্‌পার ঢঙে 'ঠাকরুণ বিষয়ক' গান বা 'মালসী' (<মালবশ্রী) গান সঙ্গীতরসিক মহলে বিশেষ জনপ্রিয়তা লাভ করিয়াছিল। কিন্তু উমার বাল্যলীলা ও

কালীমহিমা বিষয়ক যে ধারাবাহিক পালাগান উনবিংশ শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল, তাহা কালীকীর্তন নামে পরিচিত। ইহাতেও নানা রাগ ও তাল অনুসৃত হইত। কিন্তু শাক্তপদের যে গীতিধারা অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করিয়াছে, এখনও যাহার সহজ সুরে গৃহাসক্ত মন বিবাগী হইয়া ওঠে, তাহা প্রসাদী সুর নামে পরিচিত। রামপ্রসাদ ইহার উদ্ভাবয়িতা অথবা অপর কেহ ইহা শাক্তপদের জন্যই উদ্ভাবন করেন তাহা জানা যাইতেছে না। তবে রামপ্রসাদ একজন সুদক্ষ গায়ক ছিলেন, স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র তাঁহার গান শুনিবার জন্য হালিশহরে আসিতেন, এমন কি নবাব সিরাজদ্দৌলাও নাকি তাঁহার শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হন—এইরূপ নানা জনশ্রুতি হইতে মনে হয় প্রসাদী সুরের গায়ন-রীতিটি তাঁহারই উদ্ভাবন। এ গানের সুরকার তিনিই হউন, অথবা আর কেহ হউক, ইহার প্রাণগলানো সুরের মধ্যে এমন একটা নির্বেদ-বৈরাগ্যের ভাব আছে যে, এ গান এখনও সংসারজালাদগ্ধ সাধারণ বাঙালীর প্রাণে শান্তি ও সান্ত্বনা আনিয়া দেয়। এইবার কয়েকজন শাক্ত পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কয়েকজন শাক্তপদকার ॥

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা দেশে অন্ততঃ কুড়িজন শাক্তপদকারের আবির্ভাব হইয়াছিল যাঁহারা প্রকৃত কবিত্বশক্তির অধিকারী ছিলেন।[২১] মাতৃনাম প্রচারক কবিওয়ালা ও টপ্‌পা গায়কদের সংখ্যা এবং গুণগত উৎকর্ষও অল্প নহে।[২২] অধ্যাপক শ্রীযুক্ত জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী মহাশয় বহু সুপরিচিত ও অল্পপরিচিত সাধক-কবির জীবনী সংগ্রহ করিয়াছেন। সেই সমস্ত বিবরণে দেখা যাইতেছে—শাক্ত কবিগণ সকলেই গৃহিজীবন যাপন করিয়াছেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ আবার তান্ত্রিক মতের সাধকও ছিলেন। যে কবিওয়ালারা কবিগানের আসরে শ্রাব্য-অশ্রাব্য ভাষায় কুৎসিত গান ধরিতে দ্বিধাবোধ করিতেন না, তাঁহারাও 'ঠাকরুণ বিষয়ক' গান গাহিবার সময়

২১. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে ভালোমন্দ মিশাইয়া শাক্ত পদাবলীর কবির "সংখ্যা শতাধিক হইবে।" (কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ, পৃ. ৫৫)

২২. বিস্তারিত বিবরণের জন্য অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' (কবিপ্রসঙ্গ) দ্রষ্টব্য।

অতিশয় সাত্ত্বিক ভাষা অবলম্বন করিতেন। টপ্‌পা গায়কদের প্রধান অবলম্বন মর্ত্যপ্রেমের আলো-আঁধারি লীলা। কিন্তু তাঁহারাও টপ্‌পার গায়নরীতি অনুসারে যে সমস্ত শ্যামাসঙ্গীত ধরিয়াছিলেন, তাহার ভক্তির আন্তরিকতা বিস্ময়কর। সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য—এই যুগের শাক্তপদকারদের মধ্যে অনেকেই জমিদার ও ভূস্বামী বংশীয়। বর্ধমান, কৃষ্ণনগর, নাড়াজোল, নাটোর, কুচবিহার প্রভৃতি রাজবংশের অনেকেই উৎকৃষ্ট শাক্তপদ রচনা করিয়াছেন। রাজাদের আদর্শ অনুসারে তাঁহাদের দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ রাজকর্মচারীরাও পদকর্তারূপে খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ বলেন, কর্নওয়ালিসের চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরাতন জমিদার বংশ নিঃস্ব হইয়া পড়িলে তাঁহারাই ঐহিক ক্ষয়ক্ষতি ভুলিবার জন্য শ্যামামাতার চরণে আশ্রয় লইয়াছিলেন। ইহা কিন্তু পুরাপুরি সত্য নহে। কোন কোন ভূস্বামীর মনের প্রকৃতিটিই সাধকধরনের ছিল। নাটোরের মহারাজ রামকৃষ্ণ প্রকৃত মাতৃভক্ত সাধক ছিলেন। তাঁহার জমিদারি ভাঙিয়া পড়িতে থাকিলে তিনি আনন্দিত হইয়াছিলেন—তিনি ভাবিতেন, এইভাবে মহামায়া তাঁহার সংসারবন্ধন কাটিয়া দিতেছেন। এখানে কয়েকজন প্রধান শাক্ত পদকারের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

১. রামপ্রসাদ সেন ॥

বাংলা সাহিত্যে সাধক-কবি রামপ্রসাদ সেন শুধু একজন কবিমাত্র নহেন, মাতৃমন্ত্রের তিনি প্রধান উদ্‌গাতা না হইলেও অন্যতম শ্রেষ্ঠ পূজারী। তাঁহার পূর্বে বাংলার চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের স্থানে স্থানে শাক্ত পদাবলীর আভাস ফুটিয়া উঠিয়াছে। রামপ্রসাদের সমসাময়িক ভারতচন্দ্রের রচনায় বহু স্থলে শাক্ত পদের প্রত্যক্ষ পরিচয় আছে।[২৩] কিন্তু রামপ্রসাদের কণ্ঠে শ্যামা-সঙ্গীত আকাশগঙ্গার শতধারায় প্রবাহিত হইয়াছে। তাই তাঁহাকে শাক্ত-পদাবলীর প্রথম পূজারী বলিয়া ধরা হয়।

রামপ্রসাদের জীবনী—রামপ্রসাদের জীবনকথা ও শ্যামাভক্তি বাঙালীর ঘরে ঘরে প্রবাদবাক্যের মতো ছড়াইয়া পড়িয়াছে। তাঁহার

২৩. পূর্বে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য।

জীবনের ঘটনা বাস্তব ও অলৌকিকে একেবারে মিশিয়া গিয়াছে বটে, কিন্তু নানা সূত্র হইতে তাঁহার জীবনকাহিনী সম্বন্ধে কিছু কিছু তথ্য পাওয়া গিয়াছে। 'বিদ্যাসুন্দরে'ও তিনি নিজের সম্বন্ধে কিছু কিছু সংবাদ দিয়াছেন। বৈদ্য কুলপঞ্জিকাকারদের মতে বৈদ্যবংশের পূর্বপুরুষ শ্রীহর্ষসেন (চতুর্দশ শতাব্দী) নবাব ফকিরুদ্দিন শাহের ভিষক ছিলেন।[২৪] সুলতানের কৃপায় তিনি সেনভূম পরগণার জমিদারি লাভ করেন। ইঁহার বংশধর বিমলসেন প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। তাঁহার অধস্তন পঞ্চম পুরুষ কীর্তিবাস সেন। কীর্তিবাস ধলহণ্ড গ্রামে বাস করিতেন। রামপ্রসাদ বিদ্যাসুন্দর কাব্যে তাঁহার এই পূর্বপুরুষ কীর্তিবাসের নাম উল্লেখ করিয়াছেন।[২৫] তাঁহার কোন বংশধর (জয়কৃষ্ণ বা রামেশ্বর বা রামরাম) ধলহণ্ড গ্রাম ত্যাগ করিয়া কুমারহট্টে বসবাস করেন। এই সময় তাঁহাদের আর্থিক অবস্থা অত্যন্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছিল।

ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম রামপ্রসাদের জীবনী সংগ্রহের চেষ্টা করেন (সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০)। তাঁহার মতে প্রায় ষাট বৎসর বয়সে (১৭৮১ খ্রীঃ অঃ) রামপ্রসাদ দেহত্যাগ করেন। তাহা হইলে তাঁহার জন্মকাল ১৭২০-২১ খ্রীঃ অব্দের মধ্যেই হইবে মনে হয়। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যও[২৬] ঈশ্বর গুপ্তকে সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার মতে কুলজীগ্রন্থ 'রত্নাপ্রভা' অনুসারে ১৭০০ খ্রীঃ অব্দের নিকটবর্তী সময়ে রামপ্রসাদের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা নিধিরামের জন্ম হয়। এই নিধিরামের প্রপৌত্র গঙ্গাচরণ সেন রেভারেণ্ড কৃষ্ণমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহপাঠী ছিলেন। রামপ্রসাদ কোন এক পদে "সোমমৌলি প্রিয়া নাম, রবিজ মঙ্গল ধাম, ভজে বুধ বৃহস্পতি হীন কর্মনাশা"—এইরূপ উল্লেখ করিয়াছেন। ইহা হইতে ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য ১১২৭ বঙ্গাব্দ (১৭২০ খ্রীঃ অঃ) পাইয়াছেন। যাহা হউক উপস্থিত ক্ষেত্রে তাঁহার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিতে বাধা নাই। রাম-

২৪. কণ্ঠহারের কুলপঞ্জিকা দ্রষ্টব্য।

২৫. ধনহেতু মহাকুল পূর্বাপর শুদ্ধ মূল
কীর্তিবাস তুল্য কীর্তি কই।
দানশীল গুণবন্ত শিষ্টশান্ত গুণান্বিত
প্রসন্না কালিকা কৃপাময়ী॥

২৬. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন

প্রসাদ ভারতচন্দ্র অপেক্ষা কিছু বয়ঃকনিষ্ঠ ছিলেন। তাঁহার পিতা রামরাম সেনের দুই বিবাহ। প্রথম পক্ষের একমাত্র সন্তান নিধিরাম, দ্বিতীয় পক্ষের তৃতীয় সন্তান রামপ্রসাদ। রামপ্রসাদের দুই পুত্র ও দুই কন্যা—রামদুলাল, রামমোহন, পরমেশ্বরী ও জগদীশ্বরী। পিতার মৃত্যুর পর নিতান্ত তরুণ বয়সে রামপ্রসাদ বিষয়কর্মে প্রবৃত্ত হন। কলিকাতার কোন এক ধনাঢ্য ভূস্বামীর বাটীতে তিনি মুহুরিগিরি করিতেন।[২৭] অল্পবয়সেই তিনি শাক্তমতে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, এই সময় তাঁহার মধ্যে ঈশ্বরভক্তির আবেশও দেখা যাইত। তিনি প্রভুর হিসাবের খাতায় "আমায় দাও মা তবিলদারী" গান লিখিয়াছিলেন। তাহা জানিতে পারিয়া ভূস্বামী-প্রভু তাঁহাকে ভৎ´সনা না করিয়া ভক্তকবিকে মাসিক ত্রিশ টাকা বৃত্তির ব্যবস্থা করিয়া কর্ম হইতে মুক্তি দেন। স্বয়ং দেবী কালিকা কবির কন্যা সাজিয়া বেড়া বাঁধিতে কবিকে সাহায্য করিয়াছিলেন, দেবী অন্নপূর্ণা তাঁহার গান শুনিবার জন্য কাশী ছাড়িয়া কবির চণ্ডীমণ্ডপে উপস্থিত হইয়াছিলেন—এইরূপ নানা অলৌকিক কাহিনী এখন চলিয়া আসিতেছে। শুনা যায় সিরাজদ্দৌলাও নাকি নৌকায় ডাকিয়া লইয়া গিয়া কবির শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া তাঁহাকে পুরস্কৃত কবিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু কবি তাহা সবিনয়ে প্রত্যাখ্যান করেন।[২৮] কবির কিছু উপার্জন ছিল। ভক্তগণ প্রণামী দিত; তাহা ছাড়াও অনেক ধনাঢ্য ভূস্বামীর নিকট তিনি ভূমিদান লাভ করিয়াছিলেন। স্বয়ং মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র কবির গ্রামের নিকটে চৌদ্দ বিঘা নিষ্কর জমি দান

২৭. ঈশ্বরগুপ্ত শুনিয়াছিলেন, কবি খিদিরপুরের গোকুলচন্দ্র ঘোষাল অথবা কলিকাতার দুর্গাচরণ মিত্রের বাড়ীতে কর্ম করিতেন। কেহ বলেন—তিনি মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের মুহুরি ছিলেন (হরিমোহন সেন—'বিবিধার্থ সংগ্রহ', ১৭৭৩ শক, ফাল্গুন)। কেহ বলেন, তিনি ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ঠিকাদার কৃষ্ণ মল্লিকের বাটীতে ১২৮ টাকা মাহিনায় চাকুরি করিতেন। আর একমতে রামপ্রসাদ নাকি চুঁচুড়ায় শীলেদের কর্মচারী ছিলেন।

২৮. ১২৬০ সালের (মাঘ) সংবাদ প্রভাকরে রামপ্রসাদ সেনের গ্রামবাসী যে দীর্ঘ পত্র লিখিয়াছিলেন তাহাতেই প্রথম এই ঘটনার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে। পত্রপ্রেরক বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদ সেন অস্মদ গ্রামস্থ ছিলেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়ে আমরা অনেক জ্ঞাত আছি।" সিরাজদ্দৌলা রামপ্রসাদের শ্যামাসঙ্গীত শুনিয়া মুগ্ধ হইয়াছিলেন—ইহা জনরব বলিয়াই মনে হয়। তবে মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র যে মাঝে মাঝে হালিশহরের কাছারিবাটীতে আসিয়া রামপ্রসাদের গান শুনিতেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

করিয়াছিলেন।[২৯] তাঁহার প্রদত্ত জমির মোট পরিমাণ পঞ্চাশ বিঘারও অধিক। সুতরাং কবি নিতান্ত নিঃস্ব ছিলেন না। কিন্তু অধিকাংশ অর্থ দানধ্যানেই ব্যয় হইয়া যাইত বলিয়া কবির দারিদ্র্যদুঃখ কোন দিনই ঘুচে নাই। এই সাধক-কবির তিরোধান সম্বন্ধেও অনেক জনশ্রুতি আছে। তিনি নাকি শ্যামাপূজার বিসর্জনের দিনে জলে নিমজ্জিত হইয়া স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করেন। এবিষয়ে ঈশ্বর গুপ্ত বলিয়াছেন, "প্রাচীন লোকেরা কহেন, তিনি শ্যামা-প্রতিমা বিসর্জনের সময়ে পরিজন স্বজন বান্ধব সকলকে কহিলেন, অদ্য মায়ের বিসর্জনের সঙ্গে সঙ্গেই আমার বিসর্জন হইবে, অতএব তোমরা সকলে প্রতিমা লইয়া আমার সঙ্গে আইস আমি পদব্রজে চলিলাম। এই বলিয়া বহুলোক সমভিব্যাহারে জাহ্নবীতটে গান করিতে করিতে আইলেন।" মৃত্যুর (১৭৮১ খ্রীঃ অঃ)[৩০] পূর্বে তিনি শ্যামাসঙ্গীত গাহিতে গাহিতে জলে নিমজ্জিত হন। তাঁহার তিরোধান সম্পর্কে নানা গালগল্প, প্রবাদ ও জনশ্রুতি গড়িয়া উঠিয়াছে। এইরূপ মাতৃসাধকের জীবনের সঙ্গে নানাপ্রকার অলৌকিক ব্যাপার কালক্রমে জড়াইয়া গিয়া বহু কাহিনীর উদ্ভব হওয়াই স্বাভাবিক। কলিকাতার সঙ্গে কবির কিছু যোগাযোগ ছিল। এখানে তিনি প্রায় দেড় বৎসর জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিয়াছিলেন। কলিকাতার জোড়াসাঁকোর নিকট দয়েহাটায় মাতুলালয়ে তিনি কিছুকাল অতিবাহিত করেন। কলিকাতার বিশিষ্ট ধনী ও কায়স্থ সমাজের অন্যতম নেতা চূড়ামণি দত্তের সঙ্গেও[৩১] তাঁহার সম্প্রীতি ছিল। তখন সবেমাত্র কলিকাতার নাগরিক

২৯. এ বিষয়ে এবং তাঁহার উপাধি ('কবিরঞ্জন') সম্বন্ধে ইতিপূর্বে কবির বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

৩০. ডঃ এডোয়ার্ড টমসনের মতে, "He died in 1775." (*Bengali Religious Lyrics*, p. 17)

৩১. প্রাচীন কলিকাতার প্রসিদ্ধ ধনাঢ্য দুই কায়স্থ নেতা শোভাবাজারের নবকৃষ্ণ দেব এবং চূড়ামণি দত্তের মধ্যে যে কৌতুকপ্রদ রেষারেষি ছিল তাহার নানা গালগল্প প্রচলিত আছে। চূড়ামণি আমৃত্যু নবকৃষ্ণকে 'দুয়ো' দিয়া আসিয়াছেন। মৃত্যুর পূর্বে যখন তাঁহাকে দোলায় চাপাইয়া গঙ্গাযাত্রায় লইয়া যাওয়া হইতেছিল, তখন তাঁহারই রচিত সঙ্কীর্তন গান তাঁহার ইচ্ছাক্রমে গাহিতে গাহিতে যাওয়া হয়। রাজা নবকৃষ্ণের বহির্বাটীর নিকট উপস্থিত হইয়া কীর্তনগায়কেরা তারস্বরে চূড়ামণি রচিত এই গান গাহিতে আরম্ভ করিল :

জীবন মাথা চাড়া দিয়া উঠিতেছিল। তখনই পঙ্কিল শহরে মানসিক পঙ্কিলতা জমা হইতে শুরু করিয়াছিল। কবির কোন কোন গানে তাই জমিজমা, মামলা মোকদ্দমা, পেয়াদা, হাকিম, হুকুম, নীলাম, তহবিল-তছরূপ প্রভৃতি তিক্ত ব্যাপারের প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে। অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে আবির্ভূত হইয়া শাক্তসাধক রামপ্রসাদ সেন বাঙালী চিত্তে একটা সুস্থ ভক্তির আদর্শ মুদ্রিত করিয়া গিয়াছেন। এদেশে অনেক পূর্ব হইতে বহু শাক্ত সাধকের জন্ম হইয়াছিল। পূর্ববঙ্গে অনেক তান্ত্রিক আচার্যের অলৌকিক জীবনকথা এখনও ঘরে ঘরে প্রচলিত আছে। পূর্ববঙ্গের মেহার গ্রামের মহাসাধক সর্বানন্দ ঠাকুরের কথা অনেকেরই মনে পড়িবে। কিন্তু রাম-প্রসাদের জীবনকথা সমগ্র বাঙালী জাতির প্রাণের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়াইয়া গিয়াছে।

দ্বিজ রামপ্রসাদ—যদিও রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের কবি, তবু তাঁহার সম্বন্ধে, বিশেষতঃ তাঁহার রচিত পদাবলী সম্বন্ধে কিছু কিছু সংশয় সৃষ্টি হইয়াছে। কারণ পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ (রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী) নামে একজন শাক্ত পদকার রামপ্রসাদের ঢঙে পদ লিখিয়াছিলেন। ভ্রমক্রমে কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের পদসংগ্রহে দ্বিজ রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত কিছু কিছু পদ ছাপা হইয়াছে। আবার রামপ্রসাদ নামে একজন কবিওয়ালাও ছিলেন। ফলে আসল রামপ্রসাদের পদের সঙ্গে এই দুইজনের পদের কিছু কিছু মিশ্রণ ঘটিয়া যাওয়া অসম্ভব নহে।[৩২]

আয়রে আয় নগরবাসী দেখবি যদি আয়।
সবারে জিনিয়ে চূড় যম জিনিতে যায়।
যম জিনিতে যায় রে চূড় যম জিনিতে যায়,
নবা (অর্থাৎ নবকৃষ্ণ) দেখবি যদি আয়, নবা দেখবি যদি আয়।

চূড়ামণি দত্ত সজ্ঞানে গঙ্গা লাভ করিলেও নবকৃষ্ণ মৃত্যুপথযাত্রী-প্রদত্ত এই শেষ অপমান ভুলিতে পারেন নাই। তাঁহার প্রতিকূলতায় চূড়ামণি দত্তের শ্রাদ্ধাদি কার্যে বিস্তর বাধা ঘটিয়াছিল।

৩২. সে যুগের কোন কোন লেখক রামপ্রসাদ সেনকে 'ব্যবসাদার' কবি বলিয়া তুচ্ছ করিয়া পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ বা রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারীকেই শাক্ত পদের সমস্ত গৌরব দিতে চাহিয়াছেন। 'সাধক সঙ্গীতের' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মনে করিতেন, "যে সকল সঙ্গীত

দ্বিজ রামপ্রসাদ কয়েকটি উৎকৃষ্ট পদ রচনা করিলেও তাঁহার সম্বন্ধে বিশেষ কিছু জানা যায় না। সম্প্রতি কিছুদিন ধরিয়া কোন কোন গবেষক কিছু নূতন তথ্য উদ্ধার করিয়াছেন। পূর্ববঙ্গেও যে রামপ্রসাদী গানের বিশেষ প্রচলন ছিল তাহা ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম উল্লেখ করেন, "পূর্ব অঞ্চলে রামপ্রসাদি কবিতা অনেক প্রচারিত আছে, সে সকল পদ্য এখানে প্রচার নাই। ঢাকা, সিরাজগঞ্জ ও পাবনা প্রদেশের নাবিকেরা সর্বদাই তাহা গান করিয়া থাকে, সে বিষয়ে তাহাদিগের এত ভক্তি যে, যখন অস্নাত থাকে তখন মুখাগ্রে উচ্চারণ করে না। কহে বাসী কাপড়ে রামপ্রসাদের গান গাহিলে নরকে যাইতে হইবে।" এখানে দেখা যাইতেছে, ঈশ্বর গুপ্ত জানিতেন যে, পূর্ববঙ্গে প্রচলিত রামপ্রসাদী গানগুলি পশ্চিমবঙ্গে প্রচারিত হয় নাই। কেন হয় নাই, তিনি তখন তাহা ততটা মনোযোগ দিয়া বিশ্লেষণ করেন নাই। করিলে তিনি দেখিতেন, পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ নামে এক ব্রাহ্মণ-কবি বৈদ্য রামপ্রসাদের মতোই শ্যামাসঙ্গীত লিখিয়াছিলেন।[৩৩] এ বিষয়ে পূর্বে কৈলাসচন্দ্র সিংহ ('সাধনসঙ্গীত'), অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় (রামপ্রসাদ) ও দয়ালচন্দ্র ঘোষের গ্রন্থে ('প্রসাদ প্রসঙ্গ') এবং 'আর্যদর্পণ' (১৩১৯-২০) ও 'নব্যভারতে' (১৩০২) কিছু কিছু তথ্য প্রকাশিত হইয়াছিল। কেহ কেহ পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদকে কায়স্থ বলিয়াছেন।[৩৪] ইহা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কারণ তিনজন রামপ্রসাদের মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের সাধক-কবি রামপ্রসাদ বৈদ্যবংশোদ্ভূত এবং পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদ ও ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কবিওয়ালা রামপ্রসাদ—দুইজনেই ব্রাহ্মণ। দয়ালচন্দ্র ঘোষ ও কৈলাসচন্দ্র সিংহ তাঁহাদের গ্রন্থে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে যৎসামান্য আলোচনা করিয়াছেন। দয়ালচন্দ্র শুধু এইটুকু তথ্য দিয়াছিলেন, "পশ্চিম বাঙ্গালার সেন রামপ্রসাদ ভিন্ন পূর্ববাঙ্গালায় একজন দ্বিজ রামপ্রসাদ ছিলেন।"

বাহ্যাড়ম্বরের নিবিড় কুজ্ঝটিকায় আবৃত নহে, যাহা সরল হৃদয়ের সরল স্রোত—ভক্তিরসের সুবিমল উৎস, যাহাতে গাম্ভীর্য আছে, আস্ফালন নাই, ভাব আছে—ভাবুকতা নাই, সেই সকল সঙ্গীতের অধিকাংশ ব্রহ্মচারীর রচিত, ইহাই আমাদের বিশ্বাস।" বলা বাহুল্য ইহা সম্পাদকের ব্যক্তিগত বিশ্বাস, যুক্তি নহে।

৩৩. পরে ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমালোচকদের মধ্যে এই বিষয় লইয়া রীতিমতো বাগ্‌যুদ্ধ হইয়াছিল। দ্রষ্টব্য: ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৭

৩৪. নব্য ভারত, ১৩০২

কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধকসঙ্গীতে'র দ্বিতীয় সংস্করণে তিনজন রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়া পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদকে (তাঁহার মতে, 'রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী') সর্বোচ্চ প্রশংসা করিয়াছিলেন। তাঁহার মতে, "রামপ্রসাদ ব্রহ্মচারী ব্রহ্মপুত্রতীরে জন্মগ্রহণ করেন। ঢাকা জেলার অন্তর্গত চিনীসপুর নামক স্থানে যে কালীবাড়ী আছে, সেই কালীবাড়ীতে তিনি জীবনযাপন করিয়াছেন। তাঁহার জন্মমৃত্যুর অব্দ নির্ণয় করা সুকঠিন।" এই বিষয়ে একদা সাময়িকপত্রাদিতে প্রচুর আলোচনা হইয়াছিল। সম্প্রতি ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে কিছু অনুসন্ধান করিয়া তাঁহাব 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন' পুস্তিকায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। তাঁহার মতে রামপ্রসাদ নামে কবির সংখ্যা তিনজন নহে—চারজন। তিনি ত্রিপুরা জেলা হইতে একশত বৎসরের প্রাচীন রামপ্রসাদের এই পদটি পাইয়াছেন :

মাগো তারা সুরেশ্বরি।
কোন্ অবিচারে আমার তরে কর দুক্ষের ডিগিরি জারি॥
একা আছি ছটি পেদা বল্ মা কিসে সমাই করি।
আমার মনে লয় বিশ খরচ দিএ ছয় জনারে প্রাণে মারি॥

*　　*　　*　　*

সদরে দরখাস্ত দিতে কোথা পাব ইস্টাম্বরি।
রামপ্রসাদ বলে নিদানকালে দুর্গা ২ বলে মরি॥

এই পদকার সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্য বলেন, "ইহা কবিরঞ্জন, কবিওয়ালা বা 'দ্বিজের' রচনা নহে—চতুর্থ এক অজ্ঞাত ব্যক্তির রচনা।" আমাদের মনে হয়, দ্বিজ বা কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের—যাবতীয় গান একদা লোকের মুখে মুখে ফিরিত। পরে ছাপার যুগে তাহার কিছু কিছু সংগ্রহ করিয়া মুদ্রণের ব্যবস্থা হয়। পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের এই ধরনের কত গান নানাস্থানে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। সুতরাং উল্লিখিত পদটির জন্য স্বতন্ত্র অর্থাৎ চতুর্থ রামপ্রসাদের অস্তিত্ব আবিষ্কারের প্রয়োজন নাই।

ঢাকা জেলার মহেশ্বরদি পরগণায় দ্বিজ রামপ্রসাদের জন্ম হয়—মনে হয় তিনি কবিরঞ্জনের কিছু পূর্বে জন্মগ্রহণ করেন। এখনও ঐ অঞ্চলে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্বন্ধে অনেক অলৌকিক কাহিনী প্রচলিত আছে। আসাম-বঙ্গ রেলের ভৈরবটাঙ্গী শাখার জিনাদি স্টেশনের পাশে চিনীশপুরের কালীবাড়ীতে দ্বিজ রামপ্রসাদ সিদ্ধিলাভ করেন। তিনি রামপ্রসাদ ঠাকুর (সাধারণতঃ

পদ্মঠাকুর নামে পরিচিত) নামে ঐ অঞ্চলে পরিচিত ছিলেন, এবং বহু দূর-দূরান্তরের যাত্রীদের ভক্তি লাভ করিয়াছিলেন। তিনি বৈশাখী অমাবস্যার তিথিতে সিদ্ধি লাভ করেন, এখনও ঐ তিথিতে মন্দিরপ্রাঙ্গণে উৎসব হয়। তাঁহার একটিমাত্র কন্যাসন্তান ছিল, নাম জগদীশ্বরী। এখানেও লক্ষণীয় যে, কবিরঞ্জনেরও অন্যতমা কন্যার নামও জগদীশ্বরী। দ্বিজ রামপ্রসাদের দৌহিত্র-শাখা এখনও বর্তমান আছে। সিদ্ধিলাভের পর তিনি বিবাহ করিয়া গার্হস্থ্যধর্ম পালন করেন এবং সিদ্ধিলাভেব পীঠস্থান চিনীশপুরেই বাকিজীবন অতিবাহিত করেন। মনে হয় তিনি ১৭৪৫-৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে চিনীশপুবে ছিলেন। ঐ যুগে রাজমোহন নামক বিক্রমপুরের এক শাক্ত কবি দ্বিজ রামপ্রসাদের উল্লেখ করিয়া গান লিখিয়াছিলেন। লোকে তাঁহাকে দ্বিজেব সমতুল্য বলিলে তিনি ঘোরতর আপত্তি করিয়া গান লিখিয়াছিলেন, "রামপ্রসাদের তুলনা দেয়, তাব রোমের যোগ্য না হই রে ভাই।" ইহাতে মনে হইতেছে তিনি এখানে পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদেব কথাই বলিয়াছেন—কারণ তাঁহার পক্ষে হালিশহরের বৈদ্য রামপ্রসাদের কথা জানা সম্ভব ছিল না। আরও একটা কথা, দেবী কালিকা কবিকে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া যে গল্পটি চলিয়া আসিতেছে, তাহার উল্লেখ পশ্চিমবঙ্গের কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের কোন গানে পাওয়া যায় না। কিন্তু পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের গানে ইহার উল্লেখ পাওয়া যাইতেছে :—

(১) মা ভক্তে ছলিতে তনয়া রূপেতে বাঁধল আসি ঘরের বেড়া।
(২) ওরে দেখ, কন্যারূপে রামপ্রসাদের বাঁধছে বেড়া।৩৫

ঈশ্বর গুপ্তের মতেও ইহা কবিরঞ্জনের রচনা নহে, "কেন না তাহা হইলে তাঁহার অসীম রচনার কোন স্থানে না কোন স্থানে অবশ্যই ইহার কোন উল্লেখ থাকিত।" ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য এই গানটি পূর্বেই পূর্ববঙ্গের গায়কদের নিকট শুনিয়াছিলেন। এই সমস্ত কাহিনীতে নানাপ্রকার জনশ্রুতি এরূপ জড়াইয়া গিয়াছে যে, এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করা সহজ নহে। দুই রামপ্রসাদের কন্যার একই নাম (জগদীশ্বরী), দুইজনের জীবনীতেই বেড়া বাঁধার গল্প রহিয়াছে। সুতরাং কোন্ কাহিনী কাহার উপর বর্তাইবে তাহা

---

৩৫. দয়ালচন্দ্র ঘোষের 'প্রসাদ প্রসঙ্গ' দ্রষ্টব্য।

নির্ণয় করা অতি দুরূহ। যাহা হউক পূর্ববঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদের বহু গান অদ্যাপি প্রচলিত আছে। কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের গান মুদ্রিত হইবার সময় পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদের অনুরূপ ভাবের কিছু কিছু পদ তাহার সঙ্গে গৃহীত হয়—অবশ্য পূর্ববঙ্গের রামপ্রসাদের পদগুলিকে পৃথক করিবার জন্য প্রায়ই তাঁহার পদের শেষে দ্বিজ রামপ্রসাদ ভণিতা থাকিত। ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের মতে, "রামপ্রসাদী গানের প্রায় চতুর্থাংশ এই দ্বিজ রচিত।"[৩৬] দ্বিজের কোন কোন গান কবিরঞ্জনের গানের ভাব ও ভাষার এমন সমধর্মী যে, দুইজনের পৃথক ভণিতা না থাকিলে পদগুলিকে আলাদা করিয়া চিহ্নিত করা যায় না। দ্বিজ রামপ্রসাদের দুই-চারিটি গান প্রায় সকলেই কবিরঞ্জন রামপ্রসাদের রচনা বলিয়া জানে। যথা :

মা বসন পর।
বসন পর বসন পর মা গো বসন পর তুমি।
চন্দনে চর্চিত জবা পদে দিব আমি ॥

*　　*　　*

আপনে পাগল পতি পাগল মা গো আরও পাগল আছে।
দ্বিজ রামপ্রসাদ হয়েছে পাগল চরণ পাবার আশে গো ॥

কিংবা

এ সংসারে ডরি কারে রাজা যার মা মহেশ্বরী।
আনন্দে আনন্দময়ীর খাস তালুকে বসত করি ॥

*　　*　　*

বলে দ্বিজ রামপ্রসাদ আছে এ মনের সাধ মা।
আমি ভক্তির জোরে কিনতে পারি ব্রহ্মময়ীর জমিদারি ॥

(দয়ালচন্দ্র ঘোষ—প্রসাদ প্রসঙ্গ)

অনুভূতি রস, সাধনা, ভাব, ভাষা প্রভৃতি বিচার করিলে দুই রামপ্রসাদের পদের পার্থক্য নির্ণয় করা প্রায় অসম্ভব—এবং অসম্ভব বলিয়া একের পদ অপরের নামে চলিয়া গিয়াছে—এরূপ অনুমান অযৌক্তিক নহে।

এই প্রসঙ্গে দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের মত আলোচনা করিয়া দেখা যাইতে পারে। 'সাধককবি রামপ্রসাদে' গুপ্ত মহাশয় দ্বিজ রামপ্রসাদ সম্পর্কে কিছু সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে বৈদ্য-

৩৬. ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য—কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন, পৃ. ৫৬

সম্প্রদায়ও ব্রাহ্মণের মতো 'দ্বিজ'। সুতরাং কবিরঞ্জন রামপ্রসাদ সেন নিজেকে দ্বিজ বলিতেও পারেন। অতএব 'দ্বিজ রামপ্রসাদ' ভণিতা দেখিলেই কবিরঞ্জন ছাড়া পূর্ববঙ্গের কোন ঐ নামীয় কবির কথা না মানিলেও চলে। কারণ 'মহানির্বাণতন্ত্রে' আছে :

সম্প্রাপ্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে বর্ণা দ্বিজোত্তমা।
নিবৃত্তে ভৈরবীচক্রে সর্ব্বে ধর্ম্মাঃ পৃথক্ পৃথক্।

অর্থাৎ ভৈরবীচক্রে বসিলে সব জাতিই দ্বিজশ্রেষ্ঠ, ভৈরবীচক্র পরিত্যাগ করিলে আবার সমস্ত বর্ণ পৃথক হইয়া যায়। রামপ্রসাদ তন্ত্রে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। সুতরাং তিনি যে পদে 'দ্বিজ' ভণিতা দিবেন তাহাতে আর আশ্চর্য কি? তাহা ছাড়া বৈদ্যসম্প্রদায়ও দ্বিজত্বের অধিকারী, ইহা বৈদ্যরাও জানেন, অপরেও তাহাতে আপত্তি করে না। শোভাবাজারের রাজা নবকৃষ্ণের দত্তকপুত্র রাজকৃষ্ণ একদা এই ব্যাপারের মীমাংসা করিবার জন্য প্রসিদ্ধ পণ্ডিত জগন্নাথ তর্কপঞ্চাননকে আহ্বান করিয়াছিলেন। পণ্ডিতপ্রবর স্বীকার করেন যে, বৈদ্যজাতি ব্রাহ্মণের মতো দ্বিজত্বের অধিকারী; শিখাসূত্র এবং ঊর্ধ্ব ফোটাতেও তাহাদের ব্রাহ্মণের মতোই অধিকার। যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তের এই যুক্তি নিতান্ত দুর্বল নহে বটে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের চিনীশপুরের দ্বিজরামপ্রসাদকেও উড়াইয়া দেওয়া যায় না। তিনি যে শাক্তসাধক ছিলেন এবং শাক্তপদ লিখিয়াছিলেন তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। তবে গায়কদের মুখে মুখে ফিরিয়া অনেক সময় দ্বিজ ও কবিরঞ্জনের পদের ভণিতার গোলমাল হইয়া গিয়াছে।

আর একজন রামপ্রসাদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে—ঈশ্বর গুপ্তের প্রায় সমকালে কলিকাতায় কবির দলে যোগ দিয়াছিলেন। তিনি কবিওয়ালা রামপ্রসাদ নামে পরিচিত। রামপ্রসাদ চক্রবর্তী ও নীলমণি চক্রবর্তী —দুই ভাই কলিকাতার সিমলা অঞ্চলে বাস করিতেন, তাঁহাদের কবির দলও ছিল।[৩৭] এই দল 'নীলুরামপ্রসাদের দল' নামে পরিচিত হইয়াছিল।

৩৭. এই বিষয়ের মূল উৎস—সাধন সঙ্গীত, পৃ. ৪৮ (কৈলাসচন্দ্র সিংহ-সম্পাদিত); প্রাচীন কবিসংগ্রহ (পৃ. ৩৬, ৪৩, ৪৬, ৭২) এবং প্রসাদপদাবলী (কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ সম্পাদিত)।

নানা কবিসঙ্গীতে ইঁহাদের গানও সংগৃহীত হইয়াছে। কবিওয়ালা রাম-প্রসাদের দুই চারিটি শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীত বৈদ্য রামপ্রসাদের গানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়া থাকিবে।

রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই—প্রসঙ্গক্রমে রামপ্রসাদ ও আজু গোঁসাই সংক্রান্ত দুই-একটি কৌতূহলজনক সংবাদ দেওয়া যাইতে পারে। রামপ্রসাদের সঙ্গে আজু গোঁসাইয়ের বাক্‌যুদ্ধসংক্রান্ত কিছু কিছু কবিতা সর্বপ্রথম ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদ প্রসঙ্গে 'সংবাদপ্রভাকরে' উদ্ধৃত করেন।[৩৮] তিনিই সংক্ষেপে তাঁহার সম্বন্ধে দুই একটি তথ্যও উদ্ধার করেন। "রাজা (অর্থাৎ মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্র) যখন কুমারহট্টে আসিতেন তখন রামপ্রসাদ সেন এবং আজু গোঁসাইকে একত্র করিয়া উভয়ের সঙ্গীতযুদ্ধের কৌতুক দেখিতেন। রাম-প্রসাদ সেন কবীন্দ্র ছিলেন, আজু গোঁসাই আদ-পাগলা ছিলেন, কিন্তু মুখে মুখে রহস্যকবিতা রচনা করিতে পারিতেন। রামপ্রসাদ সেন জ্ঞানভক্তির বিষয়ে পদবিন্যাস করিতেন, ইনি তখন রহস্য ছলে তাঁহারি উত্তর করিতেন" (সংবাদ প্রভাকর)। ঈশ্বর গুপ্ত ইঁহার সম্বন্ধে যেটুকু সংবাদ দিয়াছেন, তাহার অধিক বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় না। পরে কেহ কেহ সন্ধান করিয়া দেখিয়াছেন, ইঁহার প্রকৃত নাম অযোধ্যানাথ বা অযোধ্যারাম গোস্বামী। মতান্তরে অজয় গোস্বামী, অচ্যুত গোস্বামী বা রাজচন্দ্র গোস্বামী[৩৯]। ইনি বৈষ্ণব মতাবলম্বী ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। ঈশ্বর গুপ্ত তাঁহাকে 'আদ্-পাগলা' বলিয়াছেন; তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। শুনা যায়, ইনি বৈষ্ণব সাধনমার্গের পথিক ছিলেন, অপরদিকে বেশ পরিহাস-পটুও ছিলেন। রামপ্রসাদের কোন কোন শ্যামাসঙ্গীতকে তিনি বেশ রঙ্গরহস্যের দ্বারা তীক্ষ্ণভাবে আক্রমণ করিতেন। বৈষ্ণবসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন বলিয়া স্বভাবতঃই তিনি শাক্ত রামপ্রসাদকে ততটা পছন্দ করিতেন না। শাক্ত রামপ্রসাদ উপাসনার অঙ্গ হিসাবে 'কারণ' সেবা করিতেন, পদেও তাহার উল্লেখ আছে।[৪০] এই জন্য গ্রামবাসীদের কেহ কেহ কবির প্রতি কিছু

---

৩৮. সংবাদ প্রভাকর, ১২৬৬, ১ পৌষ

৩৯. যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত—সাধককবি রামপ্রসাদ

৪০. "সুরা পান করি নে আমি সুধা খাই জয় কালী বলে"

বিরূপ ছিলেন।[৪১] হয়তো আজু গোঁসাই ঐ দলে ছিলেন। রামপ্রসাদের গভীর তত্ত্ববহ গানগুলি অবলম্বনে আজু গোঁসাই যেরূপ পরিহাসের ভঙ্গিতে তাহার জবাব দিতেন তাহাতে তাঁহাকে তীক্ষ্ণবুদ্ধিশালী রসিক পুরুষ বলিয়াই মনে হয়। হয়তো রামপ্রসাদ গাহিলেন :

আয় মন বেড়াতে যাবি।
কালীকল্পতরুতলে রে মন চারি ফল কুড়ায়ে খাবি॥

আজু গোঁসাই ইহার উত্তর দিলেন :

কেন মন বেড়াতে যাবি।
কারও কথায় কোথাও যাস নে রে মন
মাঠের মাঝে মারা যাবি॥

রামপ্রসাদ গান ধরিলেন :

ডুব দে রে মন কালী বলে।
হৃদিরত্নাকরের অগাধ জলে॥

আজু গোঁসাই অমনি ফিরাইয়া দিলেন :

ডুবিস নে মন ঘড়ি ঘড়ি।
দম আটকে যাবি তাড়াতাড়ি॥
একে তোমার কফোনাড়ী ডুব দিও না বাড়াবাড়ি
তোমার হলে পরে জ্বরজারি মন যেতে হবে যমের বাড়ী॥

রামপ্রসাদের :

এ সংসার ধোঁকার টাটি।
ও ভাই আনন্দবাজারে লুটি॥

আজু গোঁসাইয়ের উত্তর :

এ সংসার রসের কুটি।
হেথা খাই দাই আর মজা লুটি॥
ওহে যার যেমন মন তার তেমন ধন

---

৪১. একদা কুলক্রিয়ার পর 'কারণ' সেবা করিয়া রামপ্রসাদ কুমারহট্টের বিখ্যাত তার্কিক বলরাম তর্কভূষণের টোলের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিলেন। "উক্ত অভিমানি পণ্ডিত তাঁহাকে দেখিয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিয়াছিলেন, 'দেখ দেখ মাতাল বেটা যাইতেছে'।" (সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, পৌষ) আজু গোঁসাই কবির 'কারণ' সেবাকে বিদ্রূপ করিতেন, বলিতেন, "কর্মের ঘাট, তেলের কাট, মলেও যায় না।' তাহার উত্তরে আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন, "কর্মডোর স্বভাবচোর আর মদের ঘোর মোলেও যায় না।" সংবাদ প্রভাকর, ১২৬০, পৌষ)

মন কর রে পরিপাটি।
ওহে সেন নাহি জ্ঞান বুঝ তুমি মোটামুটি॥

আজু গোঁসাই কর্তৃক রামপ্রসাদের তত্ত্বগানের তীক্ষ্ণ জবাব ঠিক বৈষ্ণবোচিত হয় নাই। এই দিক দিয়া আজু গোঁসাইয়ের মনোধর্ম অনেকটা ভারতচন্দ্রের মতো ছিল। কিন্তু তাঁহার একটি উত্তর বাস্তবিক প্রশংসা দাবি করিতে পারে। এই বৈষ্ণবকবি শাক্ত-রামপ্রসাদের কারণসেবা, ভুক্তিমুক্তি তত্ত্ব, গৃহীজীবনে তন্ত্রসাধনা প্রভৃতি ভালো চক্ষে দেখিতেন না, তাই রামপ্রসাদের পদের সরস ব্যঙ্গাত্মক রূপান্তর করিয়া যথোপযুক্ত জবাব দিতেন। কিন্তু রামপ্রসাদের আর এক প্রকার রচনার তিনি গভীরভাবেই প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। কবিরঞ্জন 'কালীকীর্তনে' বৈষ্ণব ভাবাবেশে বলিয়াছেন যে, দেবী গৌরী কৈশোরে একাম্র কাননে গিয়া শ্যামের মতো গোচারণাদি করিতেছেন।[৪২] গৌরীর বাল্যলীলা বর্ণনায় রামপ্রসাদ কৃষ্ণলীলার দ্বারাই অনুপ্রাণিত হইয়া বৈষ্ণব পদাবলীর গোষ্ঠলীলার অনুরূপ চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন :

গিরিশগৃহিণী গৌরী গোপবধূ বেশ।
কষিত কাঞ্চন কান্তি প্রথম বয়েস॥
সুরভির পরিবার সহস্রেক ধেনু।
পাতাল হইতে উঠে শুনে মার বেণু॥

কৃষ্ণের মতো গৌরীর গোচারণের বর্ণনা আজু গোঁসাইয়ের নিকট হাস্যকর মনে হইয়াছিল। তাই তিনি এই অসঙ্গত বর্ণনার জবাব দিয়াছিলেন তীব্রতর ভাষায় :

না জানে পরম তত্ত্ব কাঁঠালের আমসত্ত্ব
মেয়ে হয়ে ধেনু কি চরায় রে।
তা যদি হইত যশোদা যাইত
গোপালে কি পাঠায় রে॥

এই বিদ্রূপের খোঁচা অতিশয় বুদ্ধিদীপ্ত হইয়াছে। অন্য এক প্রসঙ্গে রামপ্রসাদ গান ধরিয়াছিলেন :

একাম্র কাননে মাতা করিল প্রবেশ॥
চরাইতে ধেনু বেণু দান দিলা ভব।
অধরে সংযোগ করি ঊর্ধ্বে মুখে রব॥
—দ্বারকানাথ বসু সম্পাদিত 'কবিরঞ্জন রামপ্রসাদী' গ্রন্থাবলী' (১৮৯৫), পৃ. ১৩৮

এবার কালী তোমায় খাব।
(খাব খাব গো দীন দয়াময়ী)
এবার তুমি খাও কি আমি খাই মা দুটোর একটা করে যাব।
হাতে কালী মুখে কালী সর্বাঙ্গে কালী মাখিব॥

ইহার প্রত্যুত্তরে আজু গোঁসাই বলিয়াছিলেন:

সাধ্য কি তোর কালী খাবি,
ও যে রক্তবীজের বংশ খেলে তার মুণ্ডমালা কেড়ে নিবি।
সর্বাঙ্গে নয়, উভয় গালে ভূষো কালি মেখে যাবি॥

আজু গোঁসাইয়ের ধর্মবিশ্বাসে রামপ্রসাদের যে গান অসঙ্গত মনে হইয়াছিল, তিনি শাণিত ব্যঙ্গোক্তি নিক্ষেপ করিয়া তাহার যথোপযুক্ত উত্তর দিতেন। দুঃখের বিষয় জনশ্রুতি ছাড়া এবিষয়ে আর কোন নির্ভরযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় না, পাওয়া গেলে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের এক অভিনব দৃষ্টান্ত মিলিত।

রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন—রামপ্রসাদের নামে কালী-কীর্তন, কৃষ্ণকীর্তন ও সীতাবিলাপ শীর্ষক কাব্য ও কবিতার সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে কালীকীর্তন রচনা করিয়া একদা তিনি অতিশয় খ্যাতি লাভ করিয়াছিলেন—আধুনিক কালের কোন কোন প্রসাদ-জীবনীকার এই আখ্যানকাব্যের উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। ১৮৩৩ খ্রীঃ অব্দে ঈশ্বর গুপ্ত সর্বপ্রথম এই কাব্য সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করেন। উক্ত গ্রন্থের ভূমিকায় তিনি বলেন যে, রামপ্রসাদের কালীকীর্তন ঈশ্বর গুপ্তের সমসাময়িক কীর্তনীয়াগণ গান করিতেন বটে, কিন্তু তখনই এই কাব্যের পুঁথি দুষ্প্রাপ্য হইয়া গিয়াছিল।[৪৩] তদুপরি কালীকীর্তন-গায়কদের অল্প বিদ্যার জন্য কবির মূল রচনা অত্যন্ত বিকৃত হইয়া পড়িয়াছিল। তাই সম্পাদক ঈশ্বর গুপ্ত "আকর স্থান হইতে মূল পুস্তক আনয়নপূর্বক সংশোধিত করিয়া কালীকীর্তন মুদ্রিত করণে প্রবৃত্ত" হইয়াছিলেন।[৪৪] কালীকীর্তনের পুঁথিতে অনেক ভুলভ্রান্তি দেখিয়া তিনি নিজে ইহার কিয়দংশ সংশোধন করেন। ভূমিকাতে

৪৩. ঈশ্বর গুপ্ত ভূমিকায় বলিয়াছেন, "পুস্তক অপ্রাচুর্য নিমিত্ত" লোকে ইহার বিশেষ সংবাদ রাখিত না।

৪৪. উক্ত কাব্যের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

তিনি সংস্কৃতে লিখিয়াছিলেন, "সংশোধিতামপি ময়া বহুলপ্রয়াসৈর্গীতাবলীং পুনরিমাং প্রতিশোধয়ন্তু।" সুতরাং মুদ্রিত কালীকীর্তনে ঈশ্বর গুপ্ত যে সংশোধনের জন্য বেশ কিছু লেখনী সঞ্চালন করিয়াছিলেন তাহা সহজেই অনুমেয়। পরে রামপ্রসাদের গ্রন্থাবলীতে এই কালীকীর্তন মুদ্রিত হইয়াছে। তবে ঈশ্বর গুপ্ত সংগৃহীত কালীকীর্তন ও প্রসাদগ্রন্থাবলীতে মুদ্রিত কালীকীর্তনে অনেক পার্থক্য আছে। যাঁহারা কালীকীর্তনের পুঁথি দেখিয়া প্রসাদগ্রন্থাবলীতে ইহার ঠাঁই দিয়াছিলেন তাঁহাদের অবলম্বিত পাঠের সঙ্গে ঈশ্বর গুপ্তের সম্পাদিত পুঁথির কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। কারণ ঈশ্বর গুপ্ত পুঁথির ত্রুটিপূর্ণ রচনার কিছু কিছু সংশোধন করিয়াছিলেন। কালীকীর্তন ঈশ্বর গুপ্তের সংগ্রহের পূর্বেও নিতান্ত অপরিচিত ছিল না, কারণ পাদ্রী ওয়ার্ড সাহেব তাঁহার *The Hindoos*—গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডে এই কাব্যের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছিলেন, "Kalee Keerttun by Ramoprasada a shoodra." এই গীতিধর্মী ক্ষুদ্র আখ্যানকাব্যের বিষয়বস্তু একটু অভিনব বটে। ইহাতে বৈষ্ণব পদশাখার অনুকরণে হিমাচল গৃহে উমার বাৎসল্য ও কৈশোর লীলার এবং শেষে হরপার্বতীর বিবাহ বর্ণিত হইয়াছে। রাজকিশোর মুখোপাধ্যায় নামক এক পৃষ্ঠপোষকের নির্দেশে কবি এই কাব্য রচনা করেন।[৪৫] ভণিতায় নিজ নামের পূর্বে তিনি 'শ্রীকবিরঞ্জন' উপাধি ব্যবহার করিয়াছেন। ১৭৫৯ খ্রীঃ অব্দে কৃষ্ণচন্দ্র রামপ্রসাদকে জমি দান করিয়া যে দলিল সম্পাদন করেন, তাহাতে এই কবিরঞ্জন উপাধি দেখা যায় না। মনে হয় কালীকীর্তন এই তারিখের পরে রচিত।[৪৬]

কবি এই 'কালীকীর্তনে' উমার বাল্যকৈশোর লীলা কিছুটা আখ্যানের ঢঙে, কিছুটা গীতিরসের সাহায্যে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রারম্ভ ভাগে গিরিরাণীর বিখ্যাত উক্তি "গিরিবর আর আমি পারিনে হে প্রবোধ দিতে উমারে" সংযোজিত হইয়াছে। শিশুকন্যা উমা চাঁদ ধরিবার বায়না লইয়াছেন, কিছুতেই শান্ত হইতেছেন না। তাই গিরিরাণী দুধের কন্যাকে স্বামীর কাছে

---

৪৫. তিনি কালীকীর্তনের ভণিতায় এইভাবে রাজকিশোরের উল্লেখ করিয়াছেন :

শ্রীরাজকিশোর দাসে শ্রীকবিরঞ্জন।
রচে গান মহা অন্ধের ঔষধ॥

৪৬. কবিরঞ্জন উপাধি সম্বন্ধে রামপ্রসাদের বিদ্যাসুন্দর প্রসঙ্গে আলোচনা করা হইয়াছে।

আনিয়াছেন। গিরিরাজ গৌরীকে কোলে লইয়া হাতে একখানি মুকুর দিলেন :

আনন্দে কহিছে হাসি ধর মা এই লও শশী
মুকুর লইয়া দিল করে॥

দেবী মুকুরে কোটিশশধর বিনিন্দিত নিজ মুখচন্দ্র দেখিয়া তবে শান্ত হইলেন :

মুকুরে দেখিয়া মুখ উপজিল মহাসুখ
বিনিন্দিত কোটি শশধরে।

ক্রমে জগন্মাতা ঘুমাইয়া পড়িলে গিরিরাজ তাঁহাকে পালঙ্কে শোয়াইয়া দিলেন। শাক্তপদাবলীর বাৎসল্য রসের যদি কোন একটি পদকে সর্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিতে হয়, তবে আমাদের মতে রামপ্রসাদের এই পদটির সেই গৌরব প্রাপ্য। স্নিগ্ধ বাৎসল্য রস, সুকুমারী উমার চাঁদ ধরিবার জন্য বায়না, গিরিরাজ কর্তৃক মুকুরে দেবীর কোটিচন্দ্রোপম মুখসৌন্দর্য দেখানো, মুকুরের মধ্যে নিজ মুখকেই চাঁদ বলিয়া দেবীর শিশুসুলভ ব্যবহার—সর্বোপরি গিরিরাণীর ব্যাকুলতা ও গিরিরাজের শান্ত প্রসন্ন গার্হস্থ্য জীবনচিত্র যে কোন প্রথম শ্রেণীর কবির পরম কাম্য।

পরে কাব্যটিতে উমার বাল্যলীলা বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙে বর্ণিত হইয়াছে। ইহার খানিকটা কবির উদ্ভট কল্পনাপ্রসূত, খানিকটা পুরাণানুযায়ী। দেবী উমা গোপবালকদের মতো ধেনু লইয়া গোষ্ঠে চলিলেন গোচারণে। 'গোপবধূবেশে' ('গিরিশ গৃহিণী গৌরী গোপবধূবেশে') একাম্রকাননে গিয়া তিনি গোরু চরাইতে লাগিলেন এবং কৃষ্ণের মতোই বেণু বাজাইয়া গোরুগুলিকে ডাকিতে লাগিলেন, তাহারাও দেবীর চারিদিকে ঘিরিয়া দাঁড়াইল :

মা ডাকিছে আয়রে সুরভি।
নবনব তৃণ তটিনীজল শীতল দূরে ধায়ত কাছে আয় রে সুরভি॥
উমার মধুর বেণু শুনিয়া শ্রবণে।
সারি সারি নিকটে দাঁড়াল ধেনুগণে॥
ঊর্ধ্ব মুখে বিধুমুখী নিরখিয়া থাকে।
দুনয়নে প্রেম ধারা হাম্বা রবে ডাকে॥

বৈষ্ণবপদাবলীর কৃষ্ণের গোষ্ঠলীলার পদ উমার উপরে প্রয়োগ হাস্যকর হইয়াছে। এই বিষয়ে আজু গোঁসাইয়ের তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গোক্তি নিতান্ত অন্যায় হয়

নাই। কালীকীর্তনে কবি আবার উমার রাসলীলাও বর্ণনা করিয়াছেন।[৪৭] অবশ্য শুধু দেবীর যৌবনলাবণ্য বর্ণনা করিয়াই কবি রাসলীলার ইতি করিয়াছেন। কারণ দেবীর রাসলীলা গোষ্ঠলীলা অপেক্ষাও হাস্যকর হইত। কবি বৈষ্ণবপদাবলীর ঢঙে দেবীর নৃত্যও বর্ণনা করিয়াছেন :

রাণী বলে আমি সাধে সাজাইলাম বেশ বানাইলাম
উমা একবার নাচ গো।
একবার নেচেছ ভবে তেমনি করে আবার নাচিতে হবে
নূপুর দিয়েছি পায় সুমধুর ধ্বনি তায় গো॥

এ সমস্ত বর্ণনা বৈষ্ণব পদাবলীর ব্যর্থ অনুকরণ মাত্র। কবি পুষ্পকাননে হরপার্বতীর মিলন ও আলাপ বর্ণনা করিয়াছেন :

প্রেয়সীর প্রেমরসে গদগদ তনু বশে
খসিছে কটির বাঘাম্বর।
শিরে সুরতরঙ্গিণী কুলু কুলু উঠে ধ্বনি
সঘনে গরজে বিষধর॥

তাঁহাকে মন্দাকিনী তীরে ভ্রমণরত দেখিয়া ব্যাকুল মহাদেব নন্দীকে প্রশ্ন করিলেন :

নন্দি একি রূপমাধুরী আহা মরি মরি
গঠিল সে যে কেমন বিধি।
চঞ্চল মনোমীন হৃদি সরোবর ত্যজি
প্রবেশিল লাবণ্য জলধি॥

তারপর কবি আভাসে হরপার্বতীর মিলন বর্ণনা করিয়া কালীর শতনাম উচ্চারণের পর কালীকীর্তন সমাপ্ত করিয়াছেন।

গীতে এই কাব্যের কিঞ্চিৎ মূল্য থাকিলেও সাধারণভাবে ইহাতে বিশেষ কোন শিল্পলক্ষণ পাওয়া যায় না। মাঝে মাঝে এত বেশী অসঙ্গতি আছে যে, ইহার কাব্যরস প্রায় কোথাও জমিতে পায় নাই। অথচ দেখিতেছি, সে

৪৭. কাহারও কাহারও মতে প্রাচীন সাহিত্যে (রাজশেখরের 'কর্পূরমঞ্জরী' নাটক) হরপার্বতীর রাসলীলা বা হিন্দোললীলা প্রচলিত ছিল। রামপ্রসাদ এই আদর্শেই 'কালীকীর্তনে' উমার রাসলীলা বর্ণনা করিয়াছেন। (দ্রষ্টব্য: অধ্যাপক জাহ্নবীকুমার চক্রবর্তী প্রণীত 'শাক্ত পদাবলী ও শক্তি সাধনা' পৃ. ২৪৮—৪৯) কিন্তু প্রাচীন সাহিত্যে যাহাই থাকুক না কেন, বাংলাদেশে ভগবতীর রাসলীলা প্রচলিত নাই। ইহা রামপ্রসাদের বৈষ্ণব ভাবের বশে রচনা।

যুগের সমালোচকগণ এই কাব্যের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন।[৪৮] ইহার দুই একটি পদ ব্যতীত আর সমস্তই কাব্যাংশে অতি নিকৃষ্ট, রচনার মধ্যে কোনও প্রকার গ্রন্থন-কৌশল নাই। গান ও তত্ত্বকথা একসঙ্গে মিশিয়া গিয়া জগাখিচুড়ির আকার ধারণ করিয়াছে। ভাষা, শব্দপ্রয়োগ এবং ছন্দ এত দুর্বল যে, ইহা যে শাক্ত-সাধক রামপ্রসাদের রচনা তাহা মনে হয় না। অথচ কবি পরিণত পরিপক্ক বয়সে এই কাব্য লিখিয়াছিলেন। কবি এই কাব্যে বৈষ্ণব ও শাক্তভাব মিলাইতে গিয়া যে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হইয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। অথচ শাক্ত পদে তিনি শ্যাম ও শ্যামার চমৎকার সমন্বয় করিয়াছেন। উৎকট অদ্ভুত নূতনত্ব এবং গীতিরসের জন্য একদা এই কাব্য গায়ক ও শ্রোতার মধ্যে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল, কিন্তু গানের আবেদন সরাইয়া রাখিলে ইহার কঙ্কালসার দুর্বল মূর্তি বাহির হইয়া পড়ে।

ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের জীবনী ও কাব্য-কবিতা সংগ্রহ করিতে গিয়া কৃষ্ণকীর্তন নামীয় একখানি কৃষ্ণলীলাবিষয়ক পুঁথি পাইয়াছিলেন, কিংবা কাহারও মুখ হইতে উহা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ১২৬০ সালের পৌষ সংখ্যার 'সংবাদ প্রভাকরে' ঈশ্বর গুপ্ত এই কৃষ্ণকীর্তন সম্বন্ধে বলেন, "এই মহাশয় যে কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিয়াছেন তাহা বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম—।" মনে হয় গুপ্তকবি কৃষ্ণকীর্তনের সবটাই সংগ্রহ করিতে পারিয়াছিলেন। কিন্তু তখনই যে ঐ কাব্য লুপ্ত হইতে বসিয়াছিল, তাহাও তিনি বলিয়াছেন, "গায়কের অভাবে ইদানীং কালীকীর্তন,

৪৮. ঈশ্বর গুপ্তের মতো তীক্ষ্নবুদ্ধির কবিও বলিয়াছেন, "কালীকীর্তন ও কৃষ্ণকীর্তন বিদ্যাসুন্দরের অপেক্ষা অনেক উত্তম!" হরিমোহন মুখোপাধ্যায় ('কবিচরিত') এই কাব্য সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ইহাতে কবিরঞ্জন অদ্ভুত কবিত্বশক্তির পরিচয় দিয়াছেন।" অবশ্য শেষে তিনিও স্বীকার করিয়াছেন, "গ্রন্থখানি এতাদৃশ প্রশংসার যোগ্য হইলেও তাহার রচনাপ্রণালীর দোষ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবেক।" 'প্রসাদ-প্রসঙ্গে'র লেখক দয়ালচন্দ্র ঘোষ আরও সুর চড়াইয়া বলিয়াছেন, "রামপ্রসাদের সর্বশ্রেষ্ঠ কাব্য কালীকীর্তন।" ইদানীং যোগেন্দ্রনাথ গুপ্তও বলিয়াছেন, "কালীকীর্তনের সুমধুর পদাবলী এক সময়ে বাঙালীর ঘরে ঘরে মধু বর্ষণ করিত" (সাধককবি রামপ্রসাদ)। ইঁহারা বিষয়গৌরবকে কবিত্ব বলিয়া মনে করিয়াছেন। তাই কবিত্ববর্জিত বিচিত্র বিষয়পূর্ণ কালীকীর্তনের অজস্র প্রশংসা করিয়াছেন। কিন্তু কাব্য-ধর্মের দিক হইতে কালীকীর্তন বিচার করিলে রামপ্রসাদের নামে প্রচারিত এই গীতাত্মক আখ্যান-কাব্যকে কোন প্রকারেই সার্থক কাব্য বলা যাইবে না।

কৃষ্ণকীর্তন ও বিদ্যাসুন্দর—এই তিনখানি গ্রন্থ কেবল লিখিত হইয়াছিল, আর কিছুই লিপিবদ্ধ ছিল না।” ইহাতে মনে হইতেছে কৃষ্ণকীর্তনের পুরা রূপ সংগৃহীত হইয়াছিল। কিন্তু ‘সংবাদ প্রভাকরে’ ঈশ্বর গুপ্ত ইহা হইতে শুধু একটি পদ উদ্ধৃত করিয়াছিলেন :

প্রথম বয়স রাই রসরঙ্গিণী।
ঝলমল তনুরুচি স্থির সৌদামিনী।
রাই বদন চেয়ে ললিতা বলে।
রাই আমার মোহনমোহিনী। ইত্যাদি

এই সমস্ত রচনা প্রকৃতই রামপ্রসাদের রচিত কিনা বলা যায় না। ভাষা ও রীতি পারিপাট্যের মধ্যে এমন কোন রামপ্রসাদী ভাব নাই, যাহাতে ইহাকে সহজেই রামপ্রসাদের বলিয়া চিনিতে পারা যায়। গুপ্তকবি রামপ্রসাদের ভণিতাযুক্ত কৃষ্ণের নৌকালীলার একটি গানও উদ্ধার করেন :

ও নৌকা বাও হে ত্বরা নূতন কাণ্ডারী
রঙ্গে ব্রজবধূর সঙ্গে।
আতপ লাঘবে হেতু তরুণী ভরা তরণী
চালন কর মনের রঙ্গে।

‘সীতার বিলাপোক্তি’ শীর্ষক কবিতায় ‘প্রসাদ কহিছে শুন মা জানকী’ এইরূপ ভণিতা আছে বলিয়া ইহাকে ঈশ্বর গুপ্ত রামপ্রসাদের রচনার অন্তর্ভুক্ত করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালের গবেষকগণও এই ধরনের কবিতায় রামপ্রসাদের ভণিতায় (অথবা শুধু প্রসাদ ভণিতা) দেখিয়া ইহাদিগকে শাক্ত-কবি রামপ্রসাদ সেনের রচনা মনে করিয়াছেন। কিন্তু ‘সীতার বিলাপোক্তি’ এই রামপ্রসাদের রচনা নহে। খুব সম্ভব কবিওয়ালা রামপ্রসাদই ইহার রচয়িতা। এইরূপ একটি দৃষ্টান্ত উল্লেখ করা যাইতেছে :

অভাগিনি ডাকে উঠ না তুরিতো,
শুনিয়া না শুনো এ কোন উচিতো,
কমলনয়নে চাহ না চকিতো
বিদরে পরাণো করুণা স্থকিতো
প্রবোধ দেহ না উঠিয়া হে।

ইহা স্পষ্টতঃই কোন কবিওয়ালার রচনা। ইহার শব্দবিন্যাস, ছন্দ এবং বিশেষ ধরনের শব্দ ব্যবহার (তুরিতো, উচিতো, চকিতো, পরাণো, স্থবিতো)

পুরাপুরি কবিগানের বৈশিষ্ট্য। সুতরাং আমাদের সিদ্ধান্ত, এই ধরনের অধিকাংশ পদ বা গান রামপ্রসাদ সেনের রচিত নহে। 'শিবসঙ্গীতে'র—

বৃষভ চলিছে থিমিকি থিমিকি,
বাজয়ে ডমরু ডিমিকি ডিমিকি,
ধরত তাল দ্রিমিকি দ্রিমিকি
হরি গুণে হর নাচিয়া।

ইহাও কোন কবিওয়ালার রচনা বলিয়া মনে হইতেছে। আর ইহা যদি রামপ্রসাদ সেনের রচনা বলিয়াই প্রমাণিত হয়, তাহা হইলেও কবিকে ইহার জন্য ধন্য-ধ্বনির দ্বারা অভিনন্দিত করিবার প্রয়োজন নাই—কারণ কাব্য-বিচারে এ সমস্ত অকিঞ্চিৎকর রচনা উল্লেখযোগ্য নহে। রামপ্রসাদের প্রধান পরিচয়—তাঁহার শাক্তপদাবলী। অতঃপর আমরা তাঁহার পদাবলীর সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া এই কবিপ্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব।

রামপ্রসাদের শাক্তপদাবলী—রামপ্রসাদ 'বিদ্যাসুন্দরে' বলিয়াছেন, "গ্রন্থ যাবে গড়াগড়ি গানে হব ব্যস্ত"। বাস্তবিক, তাঁহার শাক্তপদে গ্রন্থলব্ধ পাণ্ডিত্যের যাবতীয় সংস্কার দূর হইয়া যায়। আমরা যেন আদিম পৃথিবীর ভয়াতুর নৈশান্ধকারে ফিরিয়া যাই, যে অন্ধকারে স্নেহব্যাকুল জননী কোল পাতিয়া আমাদের জন্য অপেক্ষা করিতেছেন। রামপ্রসাদ দেবী কালিকার রূপক প্রতীকের আড়ালে বিশ্বজননীকে লুকাইয়া রাখিয়াছেন—আমরা মাতার বরাভয় লাভ করিয়া অভীঃ হই, অনাবৃত শিশুর বেশে তাঁহার কোলে ঝাঁপাইয়া পড়ি। সাধক-কবি কবিরঞ্জন আমাদের জন্য এই আশ্বাস ও সান্ত্বনা তাঁহার গানে সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন। বাহিরের প্রতিকূল শক্তি যত দুর্মদ হউক না কেন, জননী কালিকার স্নেহধন্য আশ্রয় পাইলে আমরা যমরাজকে অবহেলা করিতে পারি। রামপ্রসাদ আদিম অন্ধকারের মধ্যে আশার বর্তিকা জ্বালাইয়াছেন। মায়ের কৃপা পাইলে ব্রহ্মপদও তুচ্ছ হইয়া যায়। রামপ্রসাদ সেই আলোকতীর্থের মশালবাহী। তাই তিনি শুধু কবি বা গায়কমাত্র নহেন। মানুষের ত্রিতাপদগ্ধ জীবনে তিনি স্নেহের প্রলেপ দিয়াছেন।

ঈশ্বর গুপ্ত লিখিয়াছেন, "এমত জনরব যে কবিরঞ্জন একলক্ষ কবিতা রচনা করিয়াছিলেন।" স্বয়ং রামপ্রসাদ বলিয়াছেন, "লাখ উকিল করেছি

খাড়া, সাধ্য কি ইহার বাড়া মা গো।" ইহাতে কেহ কেহ মনে করেন, কবি লক্ষ গান রচনা করিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য অনুমান মাত্র। তিনি বহু পদ লিখিয়াছিলেন; পূর্ববঙ্গের দ্বিজ রামপ্রসাদ এবং কলিকাতার কবিওয়ালা রামপ্রসাদের অনেক গান তাঁহার গানের সঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে তাহাও ঠিক। আর তাহা ছাড়া তিনি "বাল্যকাল হইতে মৃত্যুর দিবস পর্যন্ত পদবিন্যাসে বিরত হয়েন নাই" (ঈশ্বর গুপ্ত)। সে যাহা হউক, তাঁহার পদসমূহ তাঁহার জীবিতকালে লোকের মুখে মুখে ফিরিত, তিনি বোধ হয় বিদ্যাসুন্দরের পুঁথির মতো কোন পুঁথিতে পদ সংগ্রহ করিয়া যান নাই। ফলে যাহার কাছে তাঁহার পদ ছিল, তিনি তাহা গোপনে রক্ষা করা পবিত্র কর্তব্য বলিয়া মনে করিতেন। ঈশ্বর গুপ্ত বহু চেষ্টা করিয়াও সেই সমস্ত ভক্তদের কব্জা হইতে রামপ্রসাদের পদ বাহির করিতে পারেন নাই। তবে তিনি 'সংবাদ প্রভাকরে' প্রকাশিত পদগুলির অধিকাংশই গায়কদের কণ্ঠ এবং কথক ও পাঁচালী-কারদের খাতা হইতে লিখিয়া লইয়াছিলেন। ইহার সংখ্যা মোট ৯১। নিশ্চয় রামপ্রসাদ ইহার অনেক বেশী পদ লিখিয়াছিলেন, যাহার যৎসামান্য লোকমুখে, পথভিখারী ও কালীকীর্তন-গায়কদের নিকট রক্ষিত ছিল।[৪৯] এখন যে সমস্ত প্রসাদপদাবলী মুদ্রিত হইতেছে, তাহাতে প্রায় তিনশত পদ পাওয়া যায়। তাহার সবগুলিই রামপ্রসাদ সেনের রচনা নহে। দ্বিজ রামপ্রসাদ, কবি-ওয়ালা রামপ্রসাদ এবং আরও কয়েকজন শাক্তপদকার 'রামপ্রসাদ' ভণিতা সহ পদ রচনা করিয়া প্রসাদ-পদাবলীর সংখ্যা আরও বাড়াইয়া দিয়াছেন।[৫০]

রামপ্রসাদের সাধনসঙ্গীতের পটভূমিকায় যে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের বাংলাদেশের অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিবেশের প্রভাব রহিয়াছে তাহা

৪৯. "রামপ্রসাদ জীবন ভরিয়া বহু সহস্র গান রচনা করিয়াছিলেন, যাহার শতাংশও রক্ষা পায় নাই।"—ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্য (সাধক কবি রামপ্রসাদ)

৫০. কেহ কেহ ('প্রসাদ-পদাবলী'র সম্পাদক কালীপ্রসন্ন কাব্যবিশারদ) মনে করেন, রামপ্রসাদ ভণিতাযুক্ত যে সব পদে আপীল, ডিক্রী, ডিসমিস, প্রভৃতি ইংরাজী শব্দ আছে সেগুলি পরবর্তী কালের কবিওয়ালা রামপ্রসাদ চক্রবর্তীর রচনা। কারণ কবিরঞ্জনের পক্ষে ইংরাজী শব্দ ব্যবহার সম্ভব ছিল না। এ যুক্তি মানিয়া লইতে বাধা নাই। কিন্তু রামপ্রসাদ স্বয়ং জমিদারী সেরেস্তায় কাজ করিতেন, তখন ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর রাজস্ব ব্যবস্থা চালু হইতেছিল, দেওয়ানী ব্যাপারে ইংরাজের হস্তক্ষেপ শুরু হইয়া গিয়াছিল। কাজেই সমসাময়িক কবির পক্ষে এইরূপ শব্দের ব্যবহার নিতান্ত অসম্ভব ব্যাপার নহে।

অস্বীকার করা যায় না। তখন সবেমাত্র ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শাসন স্থাপিত হইয়াছে, বর্গীর হাঙ্গামা, মুসলমান শাসনের বিশৃঙ্খলা, দুর্ভিক্ষ, লুঠতরাজ প্রভৃতি নানা প্রকার অত্যাচারে বাঙালীর মনে শান্তি ছিল না, সমাজেও বিশৃঙ্খলা ছিল না। কাজেই রামপ্রসাদের পদে সেই দারিদ্র্য, অনাচার-অবিচার-অত্যাচারের প্রতীক ব্যবহৃত হইয়াছে—কবির ব্যক্তিগত জীবনও তাঁহার ভজনগীতিকে কম প্রভাবিত করে নাই। বস্তুতঃ তাঁহার পদের কাব্যসৌন্দর্য ও ভক্তিতত্ত্ব ছাড়িয়া দিলেও ইহা অবলম্বনে তৎকালীন বাংলাদেশের দৈনন্দিন জীবনের বাস্তবধর্মী চিত্র পাওয়া যায়।

বিষয় ধরিয়া প্রসাদ-পদাবলীকে অনেক সংগ্রাহক নানা নামে ও শ্রেণীতে বিভক্ত করিয়াছেন।[৫১] আভ্যন্তরীণ বিষয়ের ভাব অনুসারে উপচ্ছেদে ভাগ করিলে অসংখ্য শ্রেণী-উপশ্রেণীর সারি দিয়া সাজানো যায়। সুতরাং অনাবশ্যক জটিলতার মধ্যে না গিয়া প্রসাদ-পদাবলীকে এই ভাবে বিভক্ত করা যায়:—উমা-বিষয়ক (আগমনী ও বিজয়া), সাধন-বিষয়ক (তন্ত্রোক্ত-সাধনা), দেবীর স্বরূপ-বিষয়ক, তত্ত্বদর্শন ও নীতি-বিষয়ক এবং কবির ব্যক্তিগত অনুভূতি-বিষয়ক।

রামপ্রসাদের আগমনী ও বিজয়া গানের সংখ্যা নগণ্য, কাব্যোৎকর্ষও এমন কিছু প্রশংসনীয় নহে। বৎসরান্তে উমার হিমাচল ভবনে আগমনে চারিদিকে যখন আনন্দের স্রোত বহিতেছে তখন কন্যার দারিদ্র্যের কথা স্মরণ করিয়া গিরিরাণী বলেন:

> বলে জনক তোমার গিরি পতি জনমভিখারী
> তোমা হেন সুকুমারী দিলাম দিগম্বরে।

আনন্দের হাটে মেনকার এই মনোবেদনা কবি বেশ আন্তরিকভাবেই ফুটাইয়াছেন। তবে পরবর্তী কবিসাধক ও গায়কগণ, বিশেষতঃ কবিওয়ালাগণ এই পর্যায়ের পদে অধিকতর নিপুণতা দেখাইয়াছেন।

রামপ্রসাদ স্বয়ং তন্ত্রসাধক ছিলেন। এই সাধনায় তিনি সিদ্ধিলাভ

---

৫১. কৈলাসচন্দ্র সিংহ 'সাধক-সঙ্গীতে' প্রসাদ-পদাবলীকে এইভাবে বিভক্ত করিয়াছেন: (১) প্রার্থনা, স্তুতি ও অভিমান ইত্যাদি, (২) মৃত্যুর প্রাক্কালে সঙ্গতি, (৩) ষট্‌চক্র বর্ণন, (৪) ষট্‌চক্রভেদ, (৫) শব সাধনা, (৬) সময়বিষয়ক, (৭) আগমনী, (৮) বিজয়া। ইহার উপরে যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত ('সাধককবি রামপ্রসাদ') আরও কয়েকটি উপবিভাগের কল্পনা করিয়াছেন। যথা—সংসার বিতৃষ্ণা, আত্মনির্ভরতা, বৈরাগ্য ইত্যাদি।

করিয়াছিলেন, এইরূপ নানা গল্পকাহিনী প্রচলিত আছে। তাঁহার গ্রামে এখনও তাঁহার সাধন-ধামের ধ্বংসাবশেষ লক্ষ্য করা যায়। তাঁহার দীক্ষা-গুরুর নাম নিশ্চিতরূপে জানা যায় না বটে,[৫২] তবে কবি তন্ত্রসাধনায় বীরাচারী সাধক ছিলেন। 'পঞ্চ মকার' সাধনা ও পঞ্চমুণ্ডি আসন প্রতিষ্ঠা প্রভৃতির কথা তাঁহার পদে পাওয়া যায়। তন্ত্রোক্ত সাধনা মূলতঃ সাধকের দেহকেন্দ্রিক সাধনা কবি বহু পদে সেই সমস্ত তত্ত্বকথা এবং সেই তত্ত্ব বিষয়ক কথা বলিয়াছেন। নিম্নে তাঁহার তন্ত্রসাধনার উপলব্ধি সংক্রান্ত কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে :

(১) আমার মনের বাসনা জননি।
ভাবি ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রারে হ, ল, ক্ষ, ব্রহ্মরূপিণী॥
মূলে পৃথ্বী ব, স, অন্তে চাবি পত্রে মায়া ডাকিনী।
সার্ধ ত্রিবলয়াকারে শিরে ঘেরে কুণ্ডলিনী॥

(২) বর্ণরূপা তুমি বটে ব, স, ব, ল, ড, ফ, ক, ঠ[৫৩]
ষোল স্বর কণ্ঠায় বিহরে।
হ, ক্ষ আশ্রয়ভুরু নিতান্ত কহিলা গুরু
চিন্তা এই শরীর ভিতরে॥

(৩) হৃৎকমল মঞ্চে দোলে করালবদনী শ্যামা।
মনপবনে দুলাইছে দিবসরজনী ও মা॥
ইড়া পিঙ্গলা নামা সুষুম্না মনোরমা
তার মধ্যে গাঁথা শ্যামা ব্রহ্মসনাতনী ও মা॥

(৪) তীর্থগমন মিথ্যা ভ্রমণ মন উচাটন করো না রে।
ও মন ত্রিবেণীর ঘাটেতে বৈসে শীতল হবে অন্তঃপুরে॥

৫২. কবি কোন কোন পদে শ্রীনাথ দত্তের উল্লেখ করিয়াছেন বলিয়া ("শুনেছি শ্রীনাথের কথা বটে চতুর্বর্গদাতা", "আছে শ্রীনাথ দত্ত পটলসত্ত্ব মধ্যে মধ্যে ঐটি চাবা") তাঁহাকেই কবির তন্ত্রদীক্ষার গুরু বলা হয়। কেহ বলেন, তাঁহার অপর নাম 'কৃপানাথ' (হারাণচন্দ্র রক্ষিত— 'ভিক্টোরিয়া যুগের বাংলা সাহিত্য')। কিন্তু এ বিষয়ে নিশ্চয় করিয়া কিছু বলা যায় না।

৫৩. তন্ত্রে বিভিন্ন চক্রে বিভিন্ন পদ্ম পরিকল্পিত হইয়াছে, সেই পদ্মের দলে বিভিন্ন মাতৃকা শক্তি বিরাজ করেন। তাঁহাদিগকে অক্ষরপ্রতীকে চিহ্নিত করা হইয়াছে। যথা—সুষুম্না নাড়ীর মুখে প্রস্ফুট পদ্মের নাম 'আধার' পদ্ম। ইহার চারি দলে চারিটি মাতৃকা—ব, শ, ষ, স। নাভিমূলে 'মণিপুর' পদ্ম। ইহার দশদলে দশটি মাতৃকাবর্ণ—ড, ঢ, ণ, ত, থ, দ, ধ, ন, প, ফ। এই পদ্মদলে ইষ্টদেবীকে বসাইয়া ধ্যান আরাধনা করিতে হয়। এখানে রামপ্রসাদ সেই সমস্ত অক্ষর-প্রতীকের ইঙ্গিত করিয়াছেন।

তিনি যে তান্ত্রিক গ্রন্থাদি অবলম্বনে ও গুরুনির্দেশে তন্ত্রসাধনা করিতেন, তাহার নানা ইঙ্গিত এই সমস্ত সাধনভজন-সংক্রান্ত পদে আছে। এই পথের পথিকদের নিকট ইহার তাৎপর্য বিশেষ মূল্যবান হইলেও সাহিত্যের ইতিহাসে ও কাব্যরস বিচারে ইহাদের বিশেষ মূল্য আছে বলিয়া মনে হয় না। কেবল যেখানে সাধ্যসাধন তত্ত্বকথা কবির ব্যক্তিগত অনুভূতিকে স্পর্শ করিয়াছে সেখানেই কিঞ্চিৎ শিল্পরসের উদ্ভব হইয়াছে। কবি যখন বলেন :

কে জানে গো কালী কেমন।
ষড়্‌দর্শনে না পায় দরশন।
কালী পদ্মবনে হংস সনে হংসীরূপে করে রমণ।
তাঁরে মূলাধারে সহস্রারে সদা যোগী করে মনন॥

তখন তাহা তত্ত্বকথা হইয়াও বিচিত্র রসরূপ সৃষ্টিতে সার্থক হইয়া ওঠে।

রামপ্রসাদ কোন কোন পদে দেবীর স্বরূপ অবধারণ করিতে গিয়াছেন। সন্তান যেমন মাকে খুঁজিয়া বেড়ায় তিনিও তেমনি তাঁহাকে নানাভাবে সন্ধান করিয়াছেন। কবি কখনও কালিকার রণরঙ্গিণী মূর্তি দেখিয়া সন্ত্রস্ত হইয়া প্রশ্ন করেন, "ঢলিয়ে ঢলিয়ে কে আসে, গলিত চিকুর আসব আবেশে।" অসুরযুদ্ধে কালিকার কালো অঙ্গে রাঙা রক্ত লাগিয়াছে, কবি দেখিতেছেন—"কালিন্দীর জলে কিংশুক ভাসে"—এ বর্ণনা সংযত, গম্ভীর এবং বিষয়বস্তুর সম্পূর্ণ উপযুক্ত। শেষ পর্যন্ত কবি বলিয়াছেন, "ব্রহ্মময়ীরে করুণাময়ীরে বল জননী।" কবি বিশ্বমাতাকে নিজের মা বলিয়া চিনিতে পারিয়া আশ্বস্ত হইলেন। কখনও-বা কবি দেখিতেছেন—"মহাকাল কানু, শ্যামা শ্যামতনু একই সকল বুঝিতে নারি।" কবির উদার চিত্তের কাছে শাক্ত বৈষ্ণবের ভেদ সম্পূর্ণ তিরোহিত হইয়া যায়। কবি বেদ-পুরাণে কত সন্ধান করিলেন, কিন্তু শেষপর্যন্ত দেখিলেন, "সকল আমার এলোকেশী।" তিনিই কৃষ্ণ, তিনিই শিব, তিনিই রাম। তাই কবি বহু বিচিত্রের মধ্যে পরম এককে উপলব্ধি করিয়া ধন্য হইলেন—"আমার ব্রহ্মময়ী সর্বঘটে, পদে গয়া গঙ্গা কাশী।"[৫৪] এই দিক দিয়া তিনি জননীকে যে

৫৪. কবি একাধিক পদে বাহ্যিক মূর্তি, পূজা, উপাসনা, বলি উপচারের প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেন নাই। একটি পদে তিনি বলিয়াছেন :

ওরে ত্রিভুবন যে মায়ের মূর্তি জেনেও কি তাই জান না ?
মাটির মূর্তি গড়িয়ে মন করতে চাও তাঁর উপাসনা॥

আদ্যাশক্তিরূপে উপলব্ধি করিয়াছেন, তাহা ব্রহ্মতত্ত্বেরই অনুরূপ। কবি দেখেন, সমস্ত ভুবন জুড়িয়া ক্ষেপা মায়ের খেলা চলিয়াছে—"এ সব ক্ষেপা মায়ের খেলা।" এই ক্ষেপার খেলায় রামপ্রসাদও যোগ দিয়া প্রবহমান বিশ্বার্ণবে ভেলা ভাসাইয়া নিশ্চিন্ত মনে বসিয়া আছেন :

প্রসাদ বলে, থাকো বসে ভবার্ণবে ভাসিয়ে ভেলা।
যখন আসবে জোয়ার উজিয়ে যাবে, ভাঁটিয়ে যাবে ভাঁটার বেলা॥

কবি তীর্থদর্শন কামনা করেন না ('আর কাজ কি আমার কাশী'), কারণ "মায়ের পদতলে পড়ে আছে গয়াগঙ্গাবারাণসী।" কাশীধামে মোহমুক্তি হয়। কিন্তু কবি তো মোক্ষ-মুক্তির অভিলাষী নহেন—মাতা-পুত্রের বাৎসল্য লীলার স্নিগ্ধমধুর ভাবই তাঁহার কাম্য। তাঁহার সেই বিখ্যাত উক্তি— "চিনি হওয়া ভাল নয় মা, চিনি খেতে ভালবাসি।" ব্রহ্মময়ীর সাযুজ্য লাভ নহে, তাঁহার সঙ্গে লীলারসই তাঁহার একান্ত কামনা।

কবি যেমন শাক্ততন্ত্রের সাধ্যসাধনতত্ত্বের বাতায়ন হইতে আদ্যাশক্তির লীলামাহাত্ম্য দর্শন করিয়াছেন, তেমনি আবার জীবন, নীতি ও ধর্মসাধনার কেন্দ্র হইতেও অনেক পদ রচনা কবিয়াছিলেন। তবে এগুলি ইংরেজ 'মেটাফিজিকাল' কবিদের মতো নিছক তত্ত্বদর্শন নহে, কবিমানসের উন্নয়নই এই নীতিমার্গীয় গানগুলির প্রধান উদ্দেশ্য। কবি বুঝিয়াছেন, চিত্তবৃত্তির স্বাভাবিক প্রবণতা বিদূরণ তন্ত্রসাধনার প্রথম সোপান। অথচ মানুষের মন নিত্যই বিষয়াসক্ত। এই বিষয়বাসনা হইতে বিষয়ীর মুক্তি যেন কিছুতেই করায়ত্ত হয় না। তাই কবি অবাধ্য অবশ মনকে তত্ত্বের কশাঘাতে শাসন করিতে চাহিয়াছেন। বিষয়রসে আকণ্ঠমগ্ন পার্থিব মনকে সম্বোধন করিয়া কবি বলিয়াছেন, "ও তোর ঘরে চিন্তামণি নিধি দেখিস না রে বসে বসে।" কখনও কবি বলেন :

মন ভুলো না কথার ছলে।
লোকে বলে বলুক মাতাল ব'লে॥

কখনও নিজের মনকে সান্ত্বনা ও সাহস দিয়া তাহাকে সজাগ করিয়া দেন :

আর একটি পদে বলিয়াছেন :

ধাতু পাষাণ মাটির মূর্তি কাজ কি রে তোর সে গঠনে।
তুমি মনোময় প্রতিমা করি, বসাও হৃদিপদ্মাসনে॥

মন কেন রে ভাবিস এত—
যেমন মাতৃহীন বালকের মত।
ভবে এসে ভাবছ বসে কালের ভয়ে হয়ে ভীত।
ওরে কালের কাল মহাকাল সে কাল মায়ের পদানত॥

কখনও বিষয়াসক্ত মনকে কবি ভৎর্সনা করিয়া বলেন :

রইলি না মন আমার বশে।
ত্যজে কমলদলের অমল মধু মত্ত হলি বিষয়রসে॥

অবশ্য মনের অধোগতির জন্য মনকে দায়ী না করিয়া কবি শ্যামা মায়ের প্রতিই অনুযোগ করেন :

মন-গরীবের কি দোষ আছে।
তুমি বাজিকরের মেয়ে শ্যামা যেমনি নাচাও তেমনি নাচে॥

এমনি করিয়া অশান্ত দুর্বশ মনকে শ্যামা মায়ের চরণে সঁপিয়া দিয়া কবি নিশ্চিন্ত হইয়াছেন।

একটু অবহিত হইয়া আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, কবি যে একটি বিশেষ সামাজিক উৎক্রান্তির মুখে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন তাহা তিনি গোপন করেন নাই। জমিজমা তাঁহার নিতান্ত মন্দ ছিল না, আর্থিক অনটন হইবারও কথা নহে। কিন্তু বিষয়বুদ্ধিতে অপটু এবং বাস্তবজীবনে উদাসীন কবির অর্থকৃচ্ছ্রতা কোনদিন ঘুচে নাই। তাই তাঁহার সাধকজীবনে বাস্তব-জীবনের নানা চিত্র প্রতীকরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। তিনি জমিদারী সেরেস্তার খাতায় দেবী কালিকার কাছে 'তবিলদারী' চাহিয়া পদ লিখিয়াছিলেন। তাহার আধ্যাত্মিক অর্থ কবির উদ্দিষ্ট হইলেও তাঁহার বাস্তবজীবনের চিত্রও ইহাতে স্পষ্টতর হইয়াছে। তিনি যখন বলেন :

আমার কপাল গো তারা
ভাল নয় মা, ভাল নয় মা, ভাল নয় মা কোনকালে॥

কিংবা

আমি তাই অভিমান করি।
আমায় করেছ গো মা সংসারি॥
অর্থ বিনা ব্যর্থ যে এই সংসার সবারি।

কখনও-বা তিনি সান্ত্বনা পাইয়া বলিয়াছেন, "তুমি এ ভাল করেছ মা আমায় বিষয় দিলে না।" কখনও সংসারের দুঃখে ব্যথিত কবি বলেন, "এই সংসারে

সং সাজিতে সার হলো গো দুঃখের ভরা।" কোন কোন সময় তিনি প্রত্যক্ষভাবেই বাস্তব দুঃখদুর্দশার কথা তোলেন :

দুঃখের কথা কই গো তারা, মনের কথা কই।
কে বলে তোমারে তারা দীন দয়াময়ী॥
*   *   *   *
কারও অঙ্গে শাল দো-শালা ভাতে চিনি দই।
আবার কারও ভাগ্যে শাকে বালি ধানে ভরা খই॥

তাই কবি আর্তনাদ করিয়া বলিয়াছেন :

কেন আসার আশা ভবে আসা আসা মাত্র হলো।
যেমন চিত্রের পদ্মেতে পড়ে ভ্রমর ভুলে রইল॥
মা নিম খাওয়ালে চিনি বলে কথায় করে ছলো।
ওমা মিঠার লোভে তিত মুখে সারা দিনটা গেল॥

কবির দীর্ঘ জীবনটা মিঠার লোভ করিয়াছিল, শেষ পর্যন্ত দুঃখের তিক্ততায় সারা জীবন কাটিয়া গেল। কিন্তু "এবার বাজি ভোর হলো।" এখন জীবনপ্রান্তে পৌঁছাইয়া কবি কি করিবেন? "এখন সন্ধ্যাবেলায় ঘরের ছেলে ঘরে নিয়ে চল।" রামপ্রসাদ কোলের সন্তান হইয়া বিশ্বজননীর স্নেহাঞ্চলে ঠাঁই চাহিয়াছেন, অভাব-অভিযোগ দূর হইয়াছে, মৃত্যুভীতিও বিদায় লইয়াছে—"যা রে শমন যা রে ফিরি।"

সারা দেশে রামপ্রসাদের জনপ্রিয়তার একটা কারণ, বাস্তব দুঃখকে তিনি বৈষ্ণবপদাবলীর মতো সূক্ষ্ম রসে পরিণত করেন নাই; তাহাকে স্বীকার করিয়া তাহা হইতে মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন। দুঃখবেদনা হইতে পলায়ন নহে, তাহার দ্বারা আচ্ছন্ন হইয়াও নহে—আদ্যাশক্তির কৃপায় কবি সমস্ত সুখ-দুঃখ ত্যাগ করিয়া মুক্তির পথ খুঁজিয়াছেন। তখন কবি বলেন :

আমি কি দুঃখেরে ডরাই।
ভবে দাও দুঃখ মা আর কত চাই॥
আগে পাছে দুখ চলে মা যদি কোন খানেতে যাই।
তখন দুখের বোঝা মাথায় নিয়ে দুখ দিয়ে মা বাজার মিলাই॥
*   *   *   *
প্রসাদ বলে ব্রহ্মময়ী বোঝা নাবাও ক্ষণেক জিরাই।
দেখ সুখ পেয়ে লোক গর্ব করে আমি করি দুখের বড়াই॥

কবি দুঃখের আঘাতে আরও নিবিড় করিয়া জননীকে চিনিয়া লইয়াছেন—

এই জন্যই দুঃখ লইয়া তাঁহার বড়াই, শ্যামার দেওয়া দুঃখ তাঁহাকে অগ্নিশুদ্ধ স্বর্ণের মতো বিশুদ্ধি দান করিয়াছে। কবি দেখিয়াছেন, দুঃখ হইতে একমাত্র পরিত্রাণের পথ—শ্যামার চরণে আশ্রয় গ্রহণ, এক যুগের বাঙালী এ কথায় বড়ো সান্ত্বনা পাইয়াছিল। তদানীন্তন কুশাসন, অর্থনৈতিক বিপর্যয়, নিত্য দারিদ্র্য—ইহা হইতে মুক্তির পথ কোথায়? সেই পথই রামপ্রসাদ দেখাইয়া দিয়াছেন। কাজেই তাঁহার গানের মধ্যে দুঃখবেদনার কথা থাকিলেও সেই দুঃখবেদনা প্রসাদী সঙ্গীতের ফলশ্রুতি নহে—বাস্তব দুঃখ হইতে সাধনার চিদানন্দময়লোকে উত্তরণই কবির অভিপ্রেত—সাধারণ গৃহী মানুষ ইহা হইতে আশার আলোক লাভ করিয়াছে, মুমুক্ষু ইহা হইতে মুক্তিমোক্ষের এষণা লাভ করিয়াছে, লীলারসিক এই সমস্ত গানে মাতাপুত্রের বাৎসল্যরসের সম্পর্ক দেখিয়া তৃপ্ত হইয়াছে। এইজন্যই বাঙালী জাতির বিশেষ ঐতিহাসিক ক্ষণের সঙ্গে রামপ্রসাদের পদাবলী জড়াইয়া গিয়াছে।

রামপ্রসাদের পদের অনেক স্থলে অলঙ্কৃত বাক্‌রীতি থাকিলেও [৫৫] কবি সাদা সুরে সহজ ভাষায় অধিকাংশ গান রচনা করিয়াছিলেন। সাধারণ মানুষের অভিজ্ঞতাই তাঁহার অবলম্বন, দৈনন্দিন জীবিকার প্রতীকই তাঁহার তত্ত্বকথার বাহন হইয়াছে। যখন তিনি প্রশ্ন করেন :

বল্ দেখি ভাই কি হয় ম'লে।
এই বাদানুবাদ করে সকলে।

তখন স্বয়ং কবিই তাহার জবাব দেন :

প্রসাদ বলে যা ছিলি ভাই তাই হবি রে নিদানকালে।
যেমন জলের বিম্ব জলে উদয়, জল হয়ে সে মিশায় জলে।

৫৫. কয়েকটি অলঙ্কৃত বাক্‌রীতির দৃষ্টান্ত :

(১) তনু দলিতাঞ্জন শরদ সুধাকরমণ্ডল বদনী রে।
কুন্তল বিগলিত শোণিত শোভিত
তড়িত জড়িত নবঘন ঝলকে রে।

(২) ওকে ইন্দীবর নিন্দি কান্তি বিগলিত বেশ
বসনবিহীনা কে রে সমরে।
মদনমথন উরসি রূপসী হাসি হাসি বামা বিহরে।
প্রলয়কালীন জলদ গর্জে তিষ্ঠ তিষ্ঠ সতত তর্জে
জগমনোহরা শমন সোদরা গর্ব খর্ব করে।

সহজ উপমা-রূপকে তিনি যেভাবে তত্ত্বকথার নির্দেশ দান করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার কবিত্বের বিশেষ প্রশংসা করিতে হয়। অবশ্য বৈষ্ণব পদকারের মতো ভাষা ও ছন্দের ঝঙ্কার এবং কল্পনার সূক্ষ্মতা তাঁহার রচনায় ততটা পাওয়া যায় না, রূপক-প্রতীকের সাহায্যে কবি তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিলেও তাহা বহু-স্থলেই শিল্পরূপ লাভ করিতে পারে নাই। অবশ্য ইহা শুধু তাঁহার একার ক্রটি নহে, সমস্ত শাক্তপদাবলীরই ইহা একটা সাধারণ লক্ষণ। কবিগণ মূলতঃ সাধক ছিলেন বলিয়া তত্ত্বের দিকেই অধিক গুরুত্ব আরোপ করিয়াছেন —ফলে কাব্যকলার কিঞ্চিৎ খর্বতা ঘটিয়াছে। রামপ্রসাদ সম্বন্ধেও সে কথা কিয়ৎপরিমাণে সত্য। তাঁহার কয়েকটি পদের রচনাকৌশল, সংযত বাক্‌মূর্তি ও ভাবাবেগ অতি প্রশংসনীয় মনে হইলেও বহু স্থলেই পদগুলি নিতান্ত গতানু-গতিক, কৃত্রিম ও রসবর্জিত হইয়াছে। তথাপি এই পদে ত্রিতাপজর্জর মানুষের সান্ত্বনার বাণী আছে বলিয়া ইহার কাব্যমূল্য যেমনই হোক না কেন, বাঙালী-মানসে ইহার বিশেষ প্রভাব ও চিরকালীন আবেদন অস্বীকার করা যায় না।

২. সাধক-কবি কমলাকান্ত ॥

জীবনকথা—বাংলা শাক্তপদসাহিত্যে আর একজন কবি ও সাধক রামপ্রসাদের তুল্য গৌরব লাভ করিয়াছেন। তিনি বর্ধমানের সুবিখ্যাত কমলাকান্ত ভট্টাচার্য (বন্দ্যোপাধ্যায়)। রামপ্রসাদের মতোই তাঁহার জীবনকে কেন্দ্র করিয়া নানা অলৌকিক গল্প প্রচলিত হইয়াছে, সাধনমার্গেও তিনি রামপ্রসাদের মতো সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন। অবশ্য কবিরঞ্জনের অধিকতর জনপ্রিয়তার ফলে কমলাকান্তের খ্যাতি কিছু সঙ্কুচিত হইয়া পড়িয়াছে—যদিও তাঁহার অনেক শাক্তপদ কাব্যগুণে রামপ্রসাদ অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই ন্যূন নহে। বর্ধমান রাজবংশের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ছিল বলিয়া তাঁহার তিরোধানের পর বর্ধমানরাজের উদ্যোগে জীবনীসহ তাঁহার সমগ্র পদাবলী ('শ্যামাসঙ্গীত'—১৮৫৭) মুদ্রিত হইয়াছিল।[৫৬] ইহার তিন চারি

৫৬. ইহাই আখ্যাপত্রটি এইরূপ :

শ্রীশ্রীকালীশরণং / শ্যামাসঙ্গীত। / অধুনা / শ্রীলশ্রীযুক্ত বৰ্দ্ধমানাদি মহামহীশ্বর / চতুৰ্দ্দশ-ভূপতির / আজ্ঞানুসারে ও ব্যয়দ্বারা / শ্রীনবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কর্তৃক / সংগৃহীত / এবং / শ্রীযুক্ত দ্বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্য্যের দ্বারা / সংশোধিত হইয়া / কলিকাতা / ভাস্কর যন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইল। / সন ১২৬৪। ইংরাজী ১৮৫৭ সাল। / শকাব্দ ১৭৭৯। / ২২ ভাদ্র।

বৎসর পূর্বে ঈশ্বর গুপ্ত 'সংবাদ প্রভাকরে' (১২৬০) রামপ্রসাদের সঙ্গীত ও জীবনী সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কিন্তু কমলাকান্ত সম্বন্ধে তিনি কৌতূহলী হন নাই কেন, তাহা বুঝা যাইতেছে না। ১৯২০ সালে কমলাকান্তেব জীবনীকার অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায় স্বয়ং কবির জন্মস্থান, জীবনকথা ও সাধনস্থান সম্বন্ধে প্রচুর অনুসন্ধান করিয়া যৎসামান্য তথ্য উদ্ধার করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তিনি বর্ধমান রাজগ্রন্থাগারেও কমলাকান্ত-সংক্রান্ত কোন পুঁথি বা সঙ্গীত সংগ্রহ দেখিতে পান নাই।[৫৭] তাঁহার কমলাকান্তের জীবনী ১৩৩২ সালে প্রকাশিত হয়। ঐ একই বৎসরে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ হইতে কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক তন্ত্রসাধনা-বিষয়ক বাংলা কাব্য প্রকাশিত হয়। উভয় গ্রন্থেই কবিব সংক্ষিপ্ত জীবনকথা স্থান পাইয়াছে। কিন্তু তথ্যেব অভাবে উক্ত গ্রন্থে জনশ্রুতি ও গালগল্পের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দেওয়া হইয়াছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশক পর্যন্ত যিনি জীবিত ছিলেন, যিনি রাজবংশের গুরু বলিয়া গৃহীত হইয়াছিলেন এবং জীবিতকালেই মহাসাধক বলিয়া যাঁহাব নাম প্রচারিত হইয়াছিল, তাঁহার জন্ম-মৃত্যু ও অন্যান্য ঘটনা সম্বন্ধে বিশেষ কোন তথ্য পাওয়া যায় নাই—ইহা অত্যন্ত পরিতাপের বিষয়।

কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জনে'র সমাপ্তির দিকে এইভাবে আত্মপরিচয় দিয়াছেন :

> অতঃপর কহি শুন আত্মনিবেদন।
> ব্রহ্মকুলে উপনীত স্বামী নারায়ণ ॥
> জন্মভূমি অম্বিকা নিবাস বর্ধমান।
> শ্রীপাট গোবিন্দমঠ গোপালের স্থান ॥
> প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
> তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ ॥
> নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
> তাবা পুত্রে বিরচিল সাধক রঞ্জন ॥

কবির এই উক্তি, অন্যান্য স্থান হইতে সংগৃহীত তথ্য, 'সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের বিবরণ এবং বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাধকরঞ্জনে'র মুখবন্ধ হইতে দেড় শতাব্দী পূর্বে আবির্ভূত কমলাকান্তের জীবনী সম্বন্ধে আন্দাজী রকমের তথ্য জানা যায়।

৫৭. অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়—সাধক কমলাকান্ত, পৃ. ৩৫

তাঁহার আদিনিবাস কালনার অন্তর্গত অম্বিকা গ্রাম। পিতার নাম মহেশ্বর ভট্টাচার্য, মাতার নাম মহামায়া। তাঁহার দুই সহোদর, তন্মধ্যে তিনি জ্যেষ্ঠ। অম্বিকা-কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় রায় বংশে তাঁহার জন্ম হয়। তাঁহাদের কৌলিক উপাধি খুব সম্ভব বন্দ্যোপাধ্যায়। কিন্তু তাঁহার পিতা ও তিনি 'ভট্টাচার্য' উপাধির দ্বারাই পরিচিত হইয়াছিলেন। কালনার বিদ্যাবাগীশ পাড়ায় এখনও কমলাকান্তের বাস্তুভিটার চিহ্ন আছে। বাল্যবয়সে কবি স্থানীয় টোলে সংস্কৃত অধ্যয়ন করেন। বাল্যকালে পিতৃবিয়োগ হইলে তিনি মাতার সহিত মাতুলালয় চান্নাগ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন। এই চান্নাগ্রাম বর্ধমান জেলার থানা জংসনের নিকটবর্তী একখানি ছোট গ্রাম। এখানে বিশালাক্ষী বা বাসুলির মন্দির ও মূর্তি আছে। স্থানীয় প্রবাদানুসারে কবি এই মন্দিরেই সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন। কমলাকান্তের মাতুলের নাম নারায়ণচন্দ্র ভট্টাচার্য। কবির মাতুল-ভিটার চিহ্ন এখনও আছে। কবির সঙ্গে বর্ধমান রাজবংশের শ্রদ্ধাপ্রীতির সম্পর্ক ছিল। কালনায় বাস করিবার সময়েই উক্ত রাজবংশের সঙ্গে তাঁহার পরিচয় হয়। মহারাজাধিরাজ তেজচন্দ্র বর্ধমানের নিকটবর্তী কোটালহাটে কবির জন্য একটি বাটী নির্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন। শুনা যায়, কবিকে নাকি বর্ধমান রাজসরকার হইতে মাসিক দুই শত টাকা বৃত্তি দেওয়া হইত।[৫৮] পরবর্তী কালে মহারাজাধিরাজ প্রতাপচন্দ্র হইতে বিজয়চন্দ্র প্রভৃতি রাজা ও রাজকুমারেরা এই মহাসাধকের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। মহারাজ তেজচন্দ্র কমলাকান্তকে সভাপণ্ডিতের গৌরবজনক পদ দিয়াছিলেন। এমন কি, পুত্র প্রতাপচন্দ্রের শিক্ষাদীক্ষার ভারও তিনি কমলাকান্তের উপর দিয়াছিলেন। কমলাকান্ত ও প্রতাপচন্দ্রের মধ্যে সুগভীর বন্ধুত্বের সম্পর্ক গড়িয়া ওঠে। কমলাকান্তের সঙ্গে রাজা প্রতাপচন্দ্রের বন্ধুত্বের সম্পর্ক লইয়া পরবর্তী কালে মহারাজাধিরাজ বিজয়চন্দ্র মহাতাব বাহাদুর 'কমলাকান্ত' শীর্ষক একখানি নাটিকাও লিখিয়াছিলেন (১৩২০)। বস্তুতঃ বর্ধমান রাজবংশ কমলাকান্তের স্মৃতিকে পরম ভক্তিভরে রক্ষা করিয়াছেন। ১৮৫৭ সালে মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ বাহাদুর 'শ্যামাসঙ্গীত' নামক কাব্যে কমলাকান্তের যাবতীয়

৫৮. অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৪৭ (পাদটীকা)

পদাবলী প্রকাশ করেন। পরবর্তী কালে কমলাকান্তের যত পদসংগ্রহ প্রকাশিত হইয়াছে, সবই ঐ 'শ্যামাসঙ্গীত' অবলম্বনে সঙ্কলিত হইয়াছে।

কমলাকান্তের দুই বিবাহ ছিল শুনা যায়। তাঁহার সম্বন্ধে নানা অলৌকিক গল্পকাহিনী এখনও বর্ধমান অঞ্চলে প্রচলিত আছে। দেবী কালিকা যেমন রামপ্রসাদের কন্যারূপে বেড়া বাঁধিতে সাহায্য করিয়াছিলেন বলিয়া গল্প শুনা যায়, তেমনি কমলাকান্তের মাহাত্ম্য বর্ধনের জন্য ঐরূপ একটি অলৌকিক গল্প প্রচলিত আছে। স্বয়ং কালিকা বাগদিনী বেশে আসিয়া কবিকে মাছ জোগাইয়াছিলেন, এ গল্প এখনও স্থানীয় প্রবাদবাক্যের আকারে প্রচলিত আছে। আর একটি গল্প—একবার রাত্রিতে তিনি চান্নাগ্রামের নিকটবর্তী ডাকাইত-অধ্যুষিত বিস্তীর্ণ প্রান্তর 'ওড়গাঁয়ের ডাঙা' দিয়া আসিতেছিলেন। তখন ডাকাইতেরা তাঁহাকে ধরিয়া টাকাকড়ি কাড়িয়া লইয়া মারিয়া ফেলিতে উদ্যত হইলে তিনি মায়ের নামগান আরম্ভ করিলেন :

আর কিছু নাই শ্যামা তোমার কেবল দুটি চরণ রাঙা।
শুনি তাও নিয়েছেন ত্রিপুরারি, অতেব হলেম সাহস-ভাঙা॥
জ্ঞাতিবন্ধু সুতদারা সুখের সময় সবাই তারা
কিন্তু বিপদকালে কেউ কোথা নাই ঘরবাড়ী ওড়গাঁয়ের ডাঙা॥

এই গান শুনিয়া দস্যুগণ অনুতপ্ত চিত্তে পাপ ব্যবসায় পরিত্যাগ করিয়া কমলাকান্তের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন।[৫৯] পত্নীর মৃত্যু হইলে কমলাকান্ত জলন্ত চিতার সম্মুখে দাঁড়াইয়া গান ধরিয়াছিলেন :

কালি সব ঘুচালি লেঠা।

দুঃখে রাখ সুখে রাখ করব কি আর দিয়ে খোঁটা॥
আমি দাগ দিয়ে পরেছি আর পুছতে নারি সাধের ফোঁটা।

কবির মৃত্যুকালে তেজচন্দ্র বাহাদুর তাঁহাকে গঙ্গাতীরে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইয়া গাহিয়াছিলেন :

কি গরজ কেন গঙ্গাতীরে যাব।
আমি কেলে মায়ের ছেলে হয়ে বিমাতার কি শরণ লব॥

ধর্মমতে তিনি কৌলসাধক ছিলেন, মদ্যপানাদি করিতেন। তাহার জন্য তেজচন্দ্র গুরুর কাছে ঈষৎ অনুযোগ করিতেন। বোধহয় কুমার প্রতাপ-

---

৫৯. ময়মনসিংহ গীতিকার দস্যু কেনারামের পালাও কতকটা এই প্রকার।

চন্দ্রও কমলাকান্তের সাহচর্যে কৌলধর্ম ও 'কারণে' বিশেষ আসক্ত হইয়াছিলেন। এইজন্য তেজচন্দ্র মাঝে মাঝে গুরুর নিকটে অনুযোগ করিতেন। অবশ্য প্রথম জীবনে কমলাকান্ত বোধহয় বৈষ্ণব গোস্বামীর শিষ্য ছিলেন। তাঁহার 'সাধকরঞ্জনে'র সমাপ্তিতে দেখা যাইতেছে :

প্রভু চন্দ্রশেখর গোস্বামী মহাধন।
তার পদরেণু যার মস্তকভূষণ॥

কবি কিছু বৈষ্ণব পদও রচনা করিয়াছিলেন। এই জন্য মনে হয়, প্রথমজীবনে কালনায় থাকিবার সময় তিনি বৈষ্ণব প্রভাবে আসিয়াছিলেন। কিন্তু মাতুলালয়ে আসিয়া তিনি শাক্ত মত গ্রহণ করিয়া সিদ্ধি লাভ করেন। অবশ্য তাই বলিয়া তিনি বৈষ্ণব মত পুরাপুরি ত্যাগ করেন নাই, কারণ কয়েকটি শাক্তপদে কবি কৃষ্ণ ও কালীকে অভিন্ন বলিয়াছেন।[৬০]

কমলাকান্তের তিরোধান সম্বন্ধে গবেষকগণ অনুমান করেন, সাধককবি উনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়-তৃতীয় দশকের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ বৎসর বয়সে কোটালহাটের আশ্রমে নশ্বর দেহ পরিত্যাগ করেন। কমলাকান্ত প্রিয় রাজবন্ধু প্রতাপচন্দ্রের মৃত্যুর (১৮২০ খ্রীঃ অঃ) পরে বেশী দিন জীবিত ছিলেন না, এইরূপ শুনা যায়।[৬১] জীবিতকালেই কবি সাধকরূপে বর্ধমানের চতুষ্পার্শ্বে খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। স্বগ্রামে তিনি একটি টোল প্রতিষ্ঠা করিয়া সংস্কৃত শিক্ষা দান করিতেন। কবি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কোন পুঁথিতে কিছু কিছু পদ লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। তাঁহার ভণিতায় 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক তন্ত্রসাধনা-সম্পর্কিত যে পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, প্রথমে তাহার পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

সাধকরঞ্জন—কমলাকান্ত তন্ত্রসাধনা সম্পর্কে বাংলা পয়ার ত্রিপদীতে 'সাধকরঞ্জন' শীর্ষক একখানি তত্ত্বগ্রন্থ লিখিয়াছিলেন—এইরূপ শুনা যায়। কিন্তু ১৯১৮ সালের পূর্বে ইহার চাক্ষুষ প্রমাণ পাওয়া যায় নাই। বর্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশিত কমলাকান্তের গীতসংগ্রহের ('শ্যামাসঙ্গীত') প্রথম সংস্করণ (১৮৫৭) ভূমিকায় এ বিষয়ে কোন উল্লেখ ছিল না, কলিকাতা হইতে

৬০. পরে আলোচিতব্য।

৬১. অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৭৬

প্রকাশিত ইহার দ্বিতীয় সংস্করণেও (১২৯২) 'সাধকরঞ্জন' সম্বন্ধে কোন ইঙ্গিত ছিল না। ১৯১৮ সালে বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় শ্রীমৎ নিরালম্ব স্বামীর সঙ্গে তাঁহার বাসভূমি চান্নাগ্রামে বেড়াইতে যান। সেখানে তিনি সাহিত্যপরিষদের জন্য পুঁথি সন্ধান করিতেছেন বলিয়া স্থানীয় বিশালাক্ষী দেবীর জনৈক পূজারী যোগেশ্বর ভট্টাচার্য কমলাকান্তের 'সাধকরঞ্জনে'র পুঁথিখানি প্রকাশের জন্য চট্টোপাধ্যায় মহাশয়কে অর্পণ করেন। পুঁথিটির নাম যে 'সাধকরঞ্জন' তাহা উহার সমাপ্তির দিকে কমলাকান্ত নিজেই বলিয়াছেন :

নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।
ভাষাপুঞ্জে বিরচিল সাধকরঞ্জন॥

এই পুঁথির লিপিকার শিবরামও এই নামই স্বীকার করিয়া পুঁথির পুষ্পিকায় বলিয়াছেন :

সাধকের প্রতি হয় চক্ষের অঞ্জন।
অতএব লেখিলেক সাধকরঞ্জন॥

অথচ দেখা যাইতেছে নিরালম্ব স্বামী ১৯২০ সালে 'সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুলচন্দ্র মুখোপাধ্যায়কে যে চিঠি দিয়াছিলেন তাহাতে ইহাকে 'সাধক পঞ্চক' বলিয়াছিলেন—"কমলাকান্তের স্বহস্ত লিখিত পুস্তিকাখানির নাম 'সাধকপঞ্চক"।[৬২] 'সাধকরঞ্জনে'র পুঁথি সাহিত্য পরিষদের গ্রন্থাধ্যক্ষ প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের নিকট অনেক দিন ছিল, তারপর তাহা সাহিত্য পরিষদ পুঁথিশালায় প্রদত্ত হয়। অতঃপর তাহা ১৩৩২ সালে বসন্তরঞ্জন বিদ্বদ্বল্লভ ও অটল বিহারী ঘোষের সম্পাদনায় প্রবোধচন্দ্রের মুখবন্ধ সহ পরিষদ হইতে প্রকাশিত হয়। এদিকে 'সাধক কমলাকান্তে'র লেখক অতুলচন্দ্র বহু চেষ্টার পর ১৩২৭ সালে (১৯২১), পরিষদে রক্ষিত 'সাধক-রঞ্জনে'র একখানি নকল সংগ্রহ করেন এবং তাহা 'সাধক কমলাকান্তে'র শেষাংশে মুদ্রিত করেন। তাঁহার উক্ত গ্রন্থ কমলাকান্তের যাবতীয় পদাবলী ও 'সাধকরঞ্জন' সহ ১৯২৬ সালে প্রকাশিত হয়। সাহিত্য পরিষদের পুস্তিকাও ('সাধকরঞ্জন') ঐ একই বৎসরে প্রকাশিত হয়। যাহা হউক, প্রথম দিকে অতুলচন্দ্র যখন প্রবোধচন্দ্রের কক্ষ হইতে কমলাকান্তের পুঁথিখানি বাহির

৬২. অতুলচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ.

করিতে পারিলেন না, তখন অন্যত্র তাহার কোন নকল আছে কিনা সন্ধান করিতে লাগিলেন। তিনি শুনিলেন কাশীবাসী রাসবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিকট উহার একখানি নকল আছে, কিন্তু ইহার অতিরিক্ত আর কোন তথ্য তিনি পাইলেন না। পরে তিনি শুনিলেন, বর্ধমানের রাখরাম ভট্টাচার্যের শাশুড়ীর নিকট কমলাকান্তের 'লতাসাধন' শীর্ষক একখানি তন্ত্রগ্রন্থ আছে। বহু চেষ্টা করিয়াও তিনি সেই বৃদ্ধার নিকট হইতে পুঁথিটি সংগ্রহ করিতে পারিলেন না। আমাদের অনুমান উক্ত 'লতাসাধন'ই "সাধকরঞ্জন"। যাহা হউক এই সমস্ত সংবাদ হইতে মনে হইতেছে এই পুস্তিকাটি কোন কোন মহলে নিতান্ত অপরিচিত ছিল না।

'সাধকরঞ্জনে' শিবসংহিতা, ঘেরণ্ডসংহিতা, চক্রনিরূপণ, হঠযোগ-প্রদীপিকা প্রভৃতি তন্ত্র, যোগ ও হঠযোগ অনুসারী শাক্তসাধনার সূক্ষ্মতত্ত্ব ও প্রক্রিয়া সরল বাংলা পয়ার-ত্রিপদী ছন্দে বর্ণিত হইয়াছে। কবি যে তন্ত্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করিয়াছিলেন তাহা সুবিদিত ঘটনা। শ্রীমৎ চিদানন্দ 'সাধকাষ্টক' গ্রন্থে কমলাকান্তের বীরভূমে তারাপীঠে গিয়া সস্ত্রীক কৌলমন্ত্রে দীক্ষাগ্রহণের কথা বলিয়াছেন। অতঃপর তিনি গৃহে ফিরিয়া পঞ্চবটী বনে পঞ্চমুণ্ডি আসনে কুলাচারপদ্ধতিতে সস্ত্রীক সাধনা আরম্ভ করেন এবং ক্রমে সিদ্ধিলাভ করেন। শ্রীমৎ চিদানন্দের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে কবি পঞ্চমুণ্ডি আসনে সাধনা করিলেও শবসাধনা করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। শুধু জপধ্যানের দ্বারাই তিনি দেবীর কৃপালাভ করেন।

এই পুস্তিকায় কবি কৌল শাস্ত্রানুসারে অন্তর্যাগ, সাধনার বাল্যভাব, মধ্যভাব, উত্তমভাবের বর্ণনার পরে তন্ত্রোক্ত নাড়ী বর্ণনা, ষট্‌চক্রবর্ণনা (মূলাধার, স্বাধিষ্ঠান, মণিপুর, অনাহত, বিশুদ্ধ, আজ্ঞা), তারপর কুল-কুণ্ডলিনীর জাগরণ এবং মূলাধার হইতে ক্রমে ক্রমে শিরঃস্থিত সহস্রারে উঠিয়া শিবের সহিত সামরস্যসম্ভূত চিদানন্দ লাভের বর্ণনার পর যোগের বিভিন্ন আসন, মুদ্রা, বায়ু, ইড়া-পিঙ্গল-সুষুম্নার উল্লেখ এবং তাহার পর স্বদেহেই সাধকের মোক্ষ লাভ বর্ণনা করিয়াছেন। ইহা তন্ত্রসাধনার গ্রন্থ, সুতরাং পারিভাষিক শব্দ ও দুর্জ্ঞেয় তত্ত্বে পূর্ণ হইবে তাহাতে আর বিস্ময়ের কি আছে? বিশুদ্ধ কাব্যরস কবির অভিপ্রেত ছিল না তাহা মনে রাখিতে হইবে। তবে কবি সাধনমার্গের তত্ত্বকথাও কবিত্বের ঝঙ্কার দিয়া বলিতে

পারিয়াছেন—ইহাও কম প্রশংসার বিষয় নহে। সাধকের সমাধির সময় কবি কুলকুণ্ডলিনীর শিবের সঙ্গে মিলন যাত্রার বর্ণনায় বৈষ্ণবপদাবলীর শ্রীরাধার অভিসারের রূপক গ্রহণ করিয়াছেন :

চঞ্চল চপলা জিনিয়ে প্রবলা
অবলা মৃদুমধু হাসে।
সুমণি উন্মনা লইযে সঙ্গিনী
ধাইল ব্রহ্মনিবাসে॥
উন্মত্তবেশা বিগলিত কেশা
মণিময় আভরণ সাজে।
তিমির বিনাশী বেগে ধায় রূপসী
ঝুনু ঝুনু নূপুর বাজে॥

কুলসাধনা করিতে গিয়া কবি নিজের ব্যক্তিগত জীবনের বিড়ম্বনার কথা বলিতে সঙ্কোচ বোধ করেন নাই :

যে জনা এ পথে চলে সকলে অকৃতী বলে
বনিতা না কহে প্রিয়বাণী।
দেখিয়া তাহার মুখ দুখেতে ভাবিয়া সুখ
বড় খুসি আপনা আপনি॥
পরিহরি পরিবার কামিনী করিব সার
একে একে সব তেয়াগিব।
বিষয় ভরম গেছে গিয়েছে না যেতে আছে
তথাপি না তাহারে ছাড়িব॥
আমার চরিত্র দেখি সকলের রাঙ্গা আঁখি
বাতুল বলিয়ে করে রোষ॥
একথা বুঝাব কারে স্বভাবে সকল করে
নতুবা আমার কিবা দোষ।

কবি সাধনতত্ত্ব বলিতে গিয়া নিজের কথাও কিছু বলিয়াছেন, ইহাই আমাদের উপরি লাভ। যাহা হউক মধ্যযুগে সহজিয়া মার্গের সাধনভজনসংক্রান্ত অনেক পুস্তিকা রচিত হইলেও বাংলা সাহিত্যে কবিতার দ্বারা তন্ত্ররহস্যের ব্যাখ্যার চেষ্টা একটু অভিনব বটে—এবং নিছক তত্ত্বকাব্য হইলেও ইহার কোন. কোন স্থানে কিছু কবিত্বও আছে। সেইজন্য 'সাধকরঞ্জন' বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে আলোচনার যোগ্য।

কমলাকান্তের পদাবলী—রামপ্রসাদের মতো কমলাকান্তেরও শ্রেষ্ঠ পরিচয় তাঁহার পদাবলীতে নিহিত আছে। কবি বহু সঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন, কিছু কিছু পুঁথিতে লিখিয়াও রাখিয়াছিলেন। বর্ধমান রাজবাটী হইতে ১৮৫৭ সালে তাঁহার 'শ্যামাসঙ্গীত' নামে যে পদসঙ্কলন মহারাজাধিরাজ মহাতাবচন্দ্রের দ্বারা প্রকাশিত হয়, তাহাতে কবির স্বহস্ত লিখিত পুঁথির পদ গৃহীত হইয়াছিল। ১৮৫৭ সালের কিছু পূর্বে মহাতাবচন্দ কমলাকান্তের পদাবলী প্রকাশের ইচ্ছায় কবির বাটী হইতে "সুজীর্ণ অতি মলিনবর্ণ গীতপুস্তকদ্বয়" সংগ্রহ করেন এবং বিপ্রদাস তর্কবাগীশ ভট্টাচার্যের দ্বারা তাহা সংশোধন করাইয়া লন। সম্পাদক নবীনচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কমলাকান্তের বাটীতে প্রাপ্ত দুইখানি পুঁথি এবং লোকমুখে ও শিষ্যদের মধ্যে প্রচলিত কবির গীত অবলম্বনে প্রায় পৌনে তিনশত শাক্ত ও বৈষ্ণবপদাবলী প্রকাশ করেন। সম্পাদক যে মূল পুঁথির কিছু কিছু শব্দ পরিবর্তিত করিয়াছিলেন তাহা তিনি ভূমিকায় স্বীকার করিয়াছেন, "যে পুস্তক সন্দর্শনপূর্বক এই সঙ্গীতগ্রন্থ সংগৃহীত হইয়াছে তাহার জীর্ণতা জন্য অনেক শব্দের পরিবর্তন ও নিতান্ত দেশ্যভাষার কতিপয় শব্দ রূপান্তরিত হইল, কিন্তু তাহাতে রচকের প্রকৃত ভাবের বৈলক্ষণ্য হইবার সম্ভাবনা নাই।" সুতরাং দেখা যাইতেছে মূল পুঁথি দুইখানি জীর্ণ হইয়া গিয়াছিল বলিয়া সম্পাদক যে শব্দ বুঝিতে পারেন নাই, সেখানে নিজের মনোমত শব্দ বসাইয়া দিয়াছেন, এবং স্থানীয় গ্রাম্য শব্দ সকল বাতিল করিয়া কমলাকান্তের ভাষাকে কিছুটা সভ্যভব্য করিয়া তুলিয়াছেন। ১২৯২ বঙ্গাব্দে শ্রীকান্ত মল্লিক যে 'কমলাকান্ত পদাবলী' প্রকাশ করেন, তাহারও মূল উপাদান বর্ধমান রাজবাটীর ১৮৫৭ সালের প্রথম সংস্করণের 'শ্যামাসঙ্গীত'। কিন্তু মল্লিক মহাশয়ও পদগুলিতে হস্তক্ষেপের ত্রুটি করেন নাই—"আমি উক্ত পুস্তক (রাজবাটীর 'শ্যামাসঙ্গীত') দৃষ্টে ভট্টাচার্য মহাশয় কৃত পদসমূহের পাঠ শোধন করিয়াছি। এই পদাবলীর পাঠ শোধনের উপায়ান্তর না থাকায় এইরূপ করিতে বাধ্য হইয়াছি।"[৬৩] সুতরাং প্রচলিত মুদ্রিত পদাবলীতে যে মূল কমলাকান্তীয় ভাষার অনেক পরিবর্তন হইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই। কমলাকান্তের পদাবলীর ভাষা

৬৩. অতুলচন্দ্রের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৬৮

রামপ্রসাদ অপেক্ষা মার্জিত, তাহার একটা কারণ—পদাবলীর সম্পাদকের দ্বারা পুনঃ পুনঃ পাঠসংস্কার বা পরিবর্তন।

বর্ধমান রাজবাটী প্রকাশিত কমলাকান্তের পদাবলী সংগ্রহে ('শ্যামাসঙ্গীত') মোট ২৬৯টি পদ ছিল, তন্মধ্যে ২৪৫টি শ্যামাবিষয়ক এবং ২৪টি বৈষ্ণবভাবাপন্ন রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক পদ। কবি যে প্রথম জীবনে বৈষ্ণবধর্মের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন, তাহা 'সাধকরঞ্জন' হইতে বুঝা যায়। তাঁহার গুরু চন্দ্রশেখর গোস্বামী শ্রীপাট গোবিন্দ মাঠের গোপালমন্দিরের মঠাধীশ ছিলেন। এই গোবিন্দমাঠ কোথায় অবস্থিত তাহা লইয়া নানা আলোচনা হইয়াছে। দেখা যাইতেছে, বর্ধমানের গুস্করা স্টেশনের নিকটে আউসগ্রামে এই গোবিন্দমাঠ অবস্থিত। উক্ত গোবিন্দমাঠের গোপালমন্দিরে এখনও গোপালবিগ্রহের পূজা হয়, গোবিন্দমেলা বসিয়া থাকে। উক্ত মন্দিরের ঠাকুরদাস গোস্বামীই বোধহয় কমলাকান্তের গুরু চন্দ্রশেখর গোস্বামী হইবেন। কবি বৈষ্ণবভাবের বশে প্রথম জীবনে অনেকগুলি বৈষ্ণব পদ লিখিয়াছিলেন। তাঁহার এই ধরনের অধিকাংশ বৈষ্ণবপদই কবিত্ববর্জিত, শুধু গৌরচন্দ্রিকার পদে কিঞ্চিৎ প্রতিভার পরিচয় পাওয়া যায়। যথা:

আমার গৌর নাচে রে যাচে হরিনাম
সংকীর্তন রস প্রকাশে।
হরি হরি বলি দেয় করতালি
কলিকলুষ নাশে॥
তড়িতপুঞ্জ জড়িতকায় শরত ইন্দু বদন তায়
একি আনন্দ ভকতবৃন্দ মগন প্রেমপাশে॥

রাধার জবানীতে কবি যে-সমস্ত বিরহ ও মান অভিমানের পদ লিখিয়াছেন তাহা নিতান্তই গতানুগতিক হইয়াছে, অধিকাংশ স্থলে কবিওয়ালা ও টপ্পা গায়কদের ঢঙ অনুসৃত হইয়াছে। যথা:

ইহারি কারণে সঁপিলাম যৌবনজীবনপ্রাণ।
পুরুষরতন তুমি রসিক সুজন॥
কঠিন হৃদয় যার সদাই চাতুরী তার
চিরদিন নাহি রয় কুজনে মিলন॥

কৃষ্ণের উক্তি:

কি লাগিয়ে প্রাণপ্রিয়ে মানিনী হয়েছ।
ও বিধুবদনি কেন মুখ মলিন করেছ॥

চাতক ত্যজিয়ে ঘন করে রস আরাধন
চকোরনিকর শশী ত্যাগি কি দেখেছ।

এই পর্যায়ের দুই একটি পদ মন্দ নহে। যেমন—শ্রীরাধার আক্ষেপোক্তি :

রতন বলিয়ে সখি যতন করিলাম তারে।
কে জানে পাষাণ হবে দিন দুই তিন পরে।

যাহা হউক একথা স্বীকারে বাধা নাই যে, কমলাকান্তের রাধাকৃষ্ণ পদগুলিতে আন্তরিকতা ও শিল্পকৌশল কোনটাই প্রশংসনীয় নহে। কমলাকান্তের বৈষ্ণবপদের ঘোর বিরোধী কৈলাসচন্দ্র সিংহ এই জাতীয় পদ সম্পর্কে ঈষৎ বিদ্রূপের ছলে বলিয়াছিলেন, "ভট্টচার্য মহাশয় কৃষ্ণপ্রেমবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া রাধিকার প্রেমের কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন।"[৬৪] এই মন্তব্য অযৌক্তিক নহে। বাস্তবিক এই সমস্ত পদ 'কাঁদুনি'তেই পর্যবসিত হইয়াছে, মাঝে মাঝে ভাবে ভাষায় কবির অক্ষমতা চরমে উঠিয়াছে। মনে হইতেছে, কবি যেন প্রথা পালনের জন্য বৈষ্ণবপদ ফাঁদিয়াছিলেন; ইহার মূলে তাঁহার অন্তরের স্পর্শ পাওয়া যায় না। ইহার কারণস্বরূপ কেহ কেহ অনুমান করেন, "হয়ত দীক্ষাগুরুর আজ্ঞায় এবং স্থানীয় বৈষ্ণবমতাবলম্বী ব্যক্তির প্রীতির জন্য তিনি এই সমস্ত পদ রচনা করিয়াছিলেন।"[৬৫] অর্থাৎ এই জাতীয় রচনার পশ্চাতে কবিহৃদয়ের সাগ্রহ ব্যাকুলতা ছিল না। এই অনুমান যুক্তিসঙ্গত। তাঁহার গোটাকয়েক শিবসঙ্গীতও পাওয়া গিয়াছে। তাহাতে সংস্কৃত বিভক্তির ছিটেফোটা ভিন্ন আর কোন বৈশিষ্ট্য নাই। যথা :

মন্মথমথনং ভূতেশং সদা শশিশেখরং ভজে।
ত্রিগুণাকরং ত্রিলোচন সুন্দরং হরং
গঙ্গাধরং গুরুং গিরিজাবরং ভজে।

তিনি 'সাধকরঞ্জনে'র শেষে আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "নামেতে কমলাকান্ত ভাবি ত্রিলোচন।" এইজন্য যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি মনে করিয়াছিলেন, "কমলাকান্ত শৈব ছিলেন? সম্ভবতঃ শৈবতান্ত্রিক।"[৬৬] কিন্তু তাঁহার শাক্তপদাবলী ও 'সাধকরঞ্জনে'র তত্ত্বকথা ধরিলে তাঁহাকে

৬৪. সাধকসঙ্গীত, পৃ. ৩০০

৬৫. সাহিত্য পরিষদ প্রকাশিত 'সাধকরঞ্জনে' প্রবোধচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিত 'মুখবন্ধ', পৃ. ।০

৬৬. অতুলচন্দ্রের পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৩৯০

শাক্ত তান্ত্রিকই বলিতে হইবে। অবশ্য কৌলশাস্ত্রাদিতে শিব-শক্তি এক হইয়া গিয়াছেন, ব্রহ্মনাড়ীতে প্রসুপ্তা কুলকুণ্ডলিনীকে (শক্তি) শিরঃস্থিত শিবের সঙ্গে সঙ্গত করাই তো তন্ত্রসাধনার মূল্য লক্ষ্য। সুতবাং শৈব তান্ত্রিক ও শাক্ত তান্ত্রিক বহু স্থলেই এক হইয়া গিয়াছেন। আরও একটা কথা, সাধকরঞ্জনের গোড়াতেই কবি বলিয়াছেন,

> তে কারণে কামিনী করিয়া নিরঞ্জনে।
> বর্ণিব বৃত্তান্ত কথা ব্রহ্মনবণনে ॥

'সাধকরঞ্জনে'র অন্যতম সম্পাদক প্রসিদ্ধ তন্ত্রবিদ অটলবিহারী ঘোষ এইভাবে ইহার ব্যাখ্যা করিয়াছেন, "অর্থাৎ ব্রহ্মের শক্তিস্বরূপ লক্ষ্য করিয়া, ব্রহ্মকে কুণ্ডলিনীস্বরূপ জানিয়া।" অর্থাৎ কবির মতে শক্তিই ব্রহ্ম। এই বিষয়ে নূতন তাৎপর্যের ইঙ্গিত দিয়া যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি বলিয়াছেন, "এ পুথীতে (অর্থাৎ 'সাধকরঞ্জন') একটা নূতন কথা দেখিলাম। নিরঞ্জনকে কামিনী কল্পনা করা হইয়াছে। কুলকুণ্ডলিনী শক্তিকে শিবের কামিনী বলা হইয়া থাকে। কিন্তু শিবশক্তির উর্ধ্বে যে নিরঞ্জন ব্রহ্ম, তাঁহাকে আকারা কামিনী কল্পনা গুরুভেদে হইয়া থাকিবে।"[৬৭] সুতরাং কবিকে শৈব তান্ত্রিক না বলিয়া শাক্ত তান্ত্রিক বলাই শ্রেয়, তাঁহার শাক্তপদাবলীও তাহার সাক্ষ্য দিতেছে।

তাঁহার ভণিতায় প্রায় তিনশত শাক্তপদ পাওয়া গিয়াছে। তন্মধ্যে আগমনী ও বিজয়ার গান অতি উৎকৃষ্ট। তাহাতে মাতৃহৃদয়ের বেদনা আশা-আকাঙ্ক্ষা কবি চমৎকাব ফুটাইয়াছেন। মাতা মেনকা স্বপ্নে উমাকে দেখিয়া গিরিরাজকে বলেন :

> আমি কি হেরিলাম নিশি স্বপনে।
> গিরিরাজ অচেতন কত না ঘুমাও হে ॥
> এই এখনি শিয়রে ছিল গৌরী আমার কোথায় গেল
> হে, আধ আধ মা বলিয়ে বিধুবদনে ॥

উদাসীন স্বামীর প্রতি অনুযোগ করিয়া মেনকা বলেন :

> যাবে যাবে বল গিরিরাজ গৌরীরে আনিতে।
> ব্যাকুল হৈয়াছে প্রাণ উমারে দেখিতে হে ॥

৬৭. অতুলচন্দ্রের উল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ ৩১১

গৌরী দিয়ে দিগম্বরে আনন্দে রয়েছ ঘরে
কি আছে তব অন্তরে না পারি বুঝিতে।
কামিনী করিল বিধি তেঁই হে তোমারে সাধি
নারীর জনম কেবল যন্ত্রণা সহিতে॥

তারপর গিরিরাজ কৈলাসে গিয়া কন্যাকে আনিয়া গিরিরাণীর কোলে অর্পণ করিয়া বলেন :

গিরিরাণী, এই নাও তোমার উমারে
ধর ধর হরের জীবনধন।

দেবীকে কোলে লইয়া মা মেনকা বলিয়া ওঠেন :

ভাল হল এলে তুমি আর না পাঠাব আমি
বুঝি বিধি প্রসন্ন হৈল গো।
আপনার অঞ্চলে রাণী মুছায়ে চাঁদ মুখখানি
প্রাণ উমা কোলেতে লইল গো॥

কিন্তু কন্যাকে তিনি কয়দিনই-বা ধরিয়া রাখিতে পারিবেন? নবমী নিশি অবসান হইলেই তো ভোলামহেশ্বর আসিয়া গৌরীকে আবার কৈলাসে লইয়া যাইবেন। তাই রাণী আকুল প্রার্থনা জানান: "ওরে নবমী নিশি, না হৈও রে অবসান।" কিন্তু কাল কাহারও জন্য অপেক্ষা করে না, নবমী নিশিরও অবসান হয়, ভোলানাথের ডম্বরু বাজিয়া ওঠে :

কি হলো নবমীনিশি হৈল অবসান গো।
বিশাল ডমরু ঘনঘন বাজে শুনে ধ্বনি বিদরে প্রাণ গো।

উমার তো থাকিবার উপায় নাই, তাঁহাকে তো হিমাচলগৃহ আঁধার করিয়া কৈলাসে চলিয়া যাইতে হইবে। তাই মাতা মেনকার শুধু বিলাপই সম্বল। তিনি কাঁদিয়া বলেন :

ফিরে চাও গো উমা তোমার বিধুমুখ হেরি
অভাগিনী মায়েরে বধিয়া কোথা যাও গো।

এইখানে দাঁড়াও উমা বারেক দাঁড়াও মা
তাপের তাপিত তনু ক্ষণেক জুড়াও গো॥

এই সমস্ত আগমনী-বিজয়ার পদে বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও

আন্তরিকতা ও মানসিক আবেগের জন্য এগুলি এখনও দুর্গোৎসবের পূর্বে বাংলা দেশের পথভিখারীর কণ্ঠে গীত হয়।

কমলাকান্তের কয়েকটি শ্যামাসঙ্গীত শাক্ত সাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। তাঁহার কোন কোন পদ কবিত্বের দিক দিয়া রামপ্রসাদ অপেক্ষাও উৎকৃষ্ট। আবেগ, শিল্পরূপ তাত্ত্বিকতা প্রভৃতি গুণগুলিকে তিনি কয়েকটি পদে চমৎকার মিলাইয়াছেন। নিম্নে এইরূপ কয়েকটি পদ হইতে উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে :

(১) সদানন্দময়ী কালী মহাকালের মনোমোহিনী গো মা,
তুমি আপন সুখে আপনি নাচ আপনি দাও মা করতালি।
আদিভূতা সনাতনী শূন্যরূপা শশীভালী
যখন ব্রহ্মাণ্ড ছিল না মা মুণ্ডমালা কোথায় পেলি।

শেষ পংক্তিটি তত্ত্ব ও কাব্যের অপরূপ সমন্বয়ে বিচিত্র মানসিকতা ফুটাইয়াছে।

(২) তাই শ্যামারূপ ভালোবাসি।
কালী মনোমোহিনী এলোকেশী।
তোমায় সবাই বলে কালো কালী আমি দেখি অকলঙ্ক শশী।

(৩) শুকনো তরু মঞ্জুরে না, ভয় লাগে মা ভাঙে পাছে।
তরু পবনবলে সদাই দোলে প্রাণ কাঁপে মা থাকতে গাছে।
বড় আশা ছিল মনে ফল পাব মা এই তরুতে
তরু মুঞ্জরে না শুকায় শাখা ছটা আগুন বিগুন আছে।

ইহার সাধনতত্ত্বগত গুহ্যার্থ যাহাই হোক না কেন, কিন্তু পংক্তি কয়টির নিখুঁত ছন্দ, প্রতীক প্রভৃতি এবং কবির হতাশা ইহাতে আন্তরিকতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে।

(৪) আদর করে হৃদে রাখ আদরিণী শ্যামা মাকে।
তুমি দেখ আমি দেখি আর যেন ভাই কেউ না দেখে।

(৫) আপনারে আপনি দেখ যেও না মন কারু ঘরে।
যা চাবে এইখানে পাবে খোঁজ নিজ অন্তঃপুরে।
পরমধন পরশমণি যে অসংখ্য ধন দিতে পারে।
এমন কত মণি পড়ে আছে চিন্তামণির নাচদুয়ারে।

(৬) মন-গরিবের কি দোষ আছে।
তারে কেন নিন্দা কর মিছে।
বাজিকরের মেয়ে তারে যেমন নাচায় তেমি নাচে।

এই সমস্ত পদের মার্জিত সংযত ভাষাভঙ্গিমার মধ্য দিয়া কবি যে সমস্ত

তত্ত্বকথা বলিয়াছেন, তাহার গূঢ় তাৎপর্য সাধকের কাছে পরম আদরের বস্তু, কিন্তু সাধারণ রসিক পাঠকের নিকট ইহার কাব্যমূল্যও অল্প নহে। কবি যখন বলেন :

ইন্দীবর জিনি তনু সজল জলদ জিনি কায়া।
নীলাম্বুজ নীল মরকত হিমকর দিনকর কিবা পুরজায়া।
অঞ্জন গলিত স্খলিত জঘনা
যেন অপরা কুসুম সময় নীল কায়া॥

তখন তাহার সংযত বাক্‌রীতি বিশেষ উপভোগ্য হইয়া ওঠে। তাঁহার দুই একটি গান শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতারূপে বাংলা দেশে চিরদিন শ্রদ্ধা লাভ করিবে। সাঙ্গরূপক ঢঙে রচিত এই গানটির কবিত্ব বিচার-বিতর্কের অপেক্ষা রাখে না :

মজিল মনভ্রমরা কালীপদ নীলকমলে।
যত বিষয়মধু তুচ্ছ হৈল কামাদি কুসুম সকলে॥
চরণ কালো ভ্রমর কালো কালোয় কালো মিশে গেল
দেখ সুখদুঃখ সমান হল আনন্দসাগর উথলে।

কমলাকান্ত একটি পদে বৈষ্ণব ও শাক্তের দ্বন্দ্ব দূর করিতে গিয়া শ্যাম-শ্যামাকে যেভাবে এক করিয়াছেন তাহাতে তাঁহার উদার মনোধর্ম ও সূক্ষ্ম বাক্‌রীতি অতিশয় বিস্ময়কর মনে হইবে :

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥
হয়ে এলোকেশী করে লয়ে অসি
দনুজতনয়ে করে সভয়।
কভু ব্রজপুরে আসি বাজাইয়ে বাঁশী
ব্রজাঙ্গনার মন হরিয়ে লয়॥
ত্রিগুণ ধারণ করিয়ে কখন
করয়ে সৃজন পালন লয়।
কভু আপনার মায়ায় আপনি বাঁধা
যতনে এ ভবযাতনা সয়॥
যেরূপে যে জনা করয়ে ভাবনা
সে রূপে তার মানসে রয়॥

বাংলা শাক্ত সাহিত্যে বহু সাধক, ভক্ত ও কবির আবির্ভাব হইয়াছে,

তাঁহাদের রচিত শ্যামাসঙ্গীতের সংখ্যাও নিতান্ত অল্প নহে। কিন্তু রামপ্রসাদ ও কমলাকান্ত এই বিপুলায়তন পদসাহিত্যের মধ্যেও আপন আপন স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিয়াছেন। রামপ্রসাদের কবিত্ব ও সাধকত্ব একসূত্রে মিলিয়া গিয়াছে, তাই তাঁহার বাণীমূর্তি অনেক সময় নিরাভরণ, চলতি গ্রাম্যজীবনেরই প্রতিচ্ছবি। তিনি প্রতিদিনের বিবর্ণ জীবনযাত্রার রূপকেই তত্ত্বকথার ব্যঞ্জনা দিয়াছেন; কিন্তু কমলাকান্ত এক মার্গের পথিক হইলেও তাঁহার পদে সচেতন রচনাশক্তির মার্জিত বাগ্‌রীতি অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে। অবশ্য কমলাকান্তের মৌখিক গানের ভাষা বোধ হয় রামপ্রসাদের মতোই স্বাভাবিক জীবনের ছায়ারূপেই উদ্গীত হইত। পরে বর্ধমানের মহারাজের উদ্যোগে মুদ্রণের সময় সম্পাদক মহাশয় কমলাকান্তের গ্রাম্য ও আঞ্চলিক শব্দ বদলাইয়া তাঁহার মনোমত শব্দ বসাইয়া দেন—কমলাকান্তের 'শ্যামাসঙ্গীতে'র সম্পাদক তাহা অসঙ্কোচেই স্বীকার করিয়াছেন। সেই জন্যই কমলাকান্তের গানের ভাষায় ঈষৎ পাণ্ডিত্যের গন্ধ রহিয়াছে এবং ভাষা ও ছন্দ অনেকটা নিখুঁত হইয়াছে। রামপ্রসাদের গান সুরের আশ্রয় না পাইলে যেন দাঁড়াইতে পারে না, কিন্তু কমলাকান্তের গানের অনেক স্থলে বিশুদ্ধ লীরিক রূপটি রক্ষিত হইয়াছে—তাঁহার পদ গান না করিলেও চলে, শুধু পাঠে বা আবৃত্তিতে ইহার রস ধরা পড়ে। সে যাহা হউক, সাধনা ও কবিত্বে রামপ্রসাদ-কমলাকান্ত ভক্তির আকাশে যুগ্ম তারা রূপেই বিরাজ করিতেছেন। বাঙালীর মনোভঙ্গীর কোন উৎকট পরিবর্তন না হইলে তাঁহারা চিরদিন স্বমহিমায় প্রতিষ্ঠিত থাকিবেন।

কয়েকজন অপ্রধান শাক্তপদকার—অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে যে বেশ কয়েকজন শাক্ত পদকার পদরচনা করিয়া শাক্ত গীতিসাহিত্য ও শাক্ত সাধনাকে জনপ্রিয় করিয়াছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই। সর্বাতিশায়ী বৈষ্ণবপ্রভাব, বিশেষতঃ বৈষ্ণব গুরুবাদ ও সহজিয়া বৈষ্ণবদের রহস্যময় রসের সাধনার প্রতিষেধক হিসাবেও অষ্টাদশ শতাব্দীর সাধারণ সমাজে ও অভিজাত বংশে শাক্ত পদচর্চার বিশেষ বাহুল্য দেখা যায়। ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, ষোড়শ শতাব্দীতে রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলার জন্য উৎপীড়িত জনচিত্তে সর্বশক্তিময়ী মঙ্গলকাব্যের দেবীদের পরিকল্পনা হইয়াছিল, তাঁহাদের

মহিমাজ্ঞাপক পুরাণধর্মী কাহিনী-কাব্যও রচিত হইয়াছিল। সেই উপদ্রুত রাজনৈতিক জীবনে দেবীর বরাভয় জনচিত্তকে সঙ্কটমুহূর্তে আত্মরক্ষা করিতে প্রেরণা জোগাইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মাঝামাঝি হইতে বাংলা দেশে আবার রাষ্ট্রসঙ্কট মাথা তুলিল; রাষ্ট্রের পেষণযন্ত্রে ধনি-দরিদ্র, রায়ত-জমিদার, প্রজা-ভূস্বামী সকলেই সমবেতভাবে পিষ্ট হইতে লাগিল। সেই বাস্তব ভৌম যন্ত্রণা ভুলিয়া মানসিক মুক্তির উদার আসনে শ্যামামাতার স্নেহাঞ্চলে ভক্তের দল শিশুর বেশে মিলিত হইলেন। তাই দেখা যাইতেছে মধ্যযুগের বৈষ্ণব পদাবলী অপেক্ষা অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর শাক্তপদাবলীতে তদানীন্তন জীবনের বাতাবরণ অধিকতর স্পষ্ট হইয়াছে। কারণ গৌড়ীয় বৈষ্ণবসাধনা একপ্রকার সূক্ষ্ম সাঙ্কেতিক রসের লীলা, যাহার সঙ্গে পরিপার্শ্বের বিশেষ যোগ নাই। মুঘল-পাঠানের বিরোধে যখন দেশ উৎসন্নে যাইতেছিল, তখনই বৈষ্ণব পদ-সাহিত্য ও জীবনী-সাহিত্যের শ্রেষ্ঠ ফুলগুলি অপার্থিব গন্ধমাধুরী লইয়া ভাবাকাশে ফুটিয়া উঠিয়াছিল। বৈষ্ণবের লীলাবাদের অর্থ অপ্রাকৃত লীলা। ভৌম-বৃন্দাবন অপেক্ষা ভাব-বৃন্দাবনই বৈষ্ণবের অধিকতর কাম্য। অপর দিকে শাক্ত পদসাহিত্যের মাতাপুত্রের লীলা একেবারে প্রাকৃত স্নেহ-রসের দ্বারা পরিবেষ্টিত; আদিম পৃথিবীর বুকে চোখ চাহিয়া মানুষ, কে জানে, কাহার কাছে বরাভয় চাহিয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর উপদ্রুত বাঙালী আদ্যাশক্তির অঞ্চলতলে আশ্রয় মাগিয়াছিল, মহাকালিকার উদ্যত খড়্গের সম্মুখে নিজেকে অসহায়ের মতো সঁপিয়া দিয়াছিল—তাই খড়্গ-খর্পরধারিণী মহাকালী সব ঐশ্বর্য লুকাইয়া মাটির মায়ের স্নেহে সাধকদের কোলে তুলিয়া লইয়াছেন। শাক্তপদে বাৎসল্য রসই স্থায়ী রস, শ্রেষ্ঠ রস—আর মর্ত্যচেতনাই বাৎসল্যরসের প্রাণ। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর অব্যবস্থিত সমাজ-পরিপ্রেক্ষিত শাক্তপদসাহিত্যের বিকাশে এত সাহায্য করিয়াছে। অবশ্য শাক্তপদসাহিত্যেও তন্ত্রসাধনার নানা জটিল উল্লেখ আছে, এবং অনেক কবি মূলতঃ তন্ত্রসাধক ছিলেন। কিন্তু শাক্তপদে রসের সাধনা ও তত্ত্বের সাধনা একে অপরের উপর ততটা নির্ভরশীল নহে। রামপ্রসাদ কমলাকান্ত প্রভৃতি শ্রেষ্ঠ শাক্তসাধকগণ তন্ত্রের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম তত্ত্ব, কৃত্য প্রভৃতি লইয়া অনেক পদ লিখিয়াছিলেন—কিন্তু তাহার বাহিরে তাঁহারা বাৎসল্যরসের যে সমস্ত পদ

লিখিয়াছিলেন কাব্যের দিক দিয়া তাহার মূল্যই বিশেষভাবে স্বীকার্য। কমলাকান্ত 'সাধকরঞ্জনে' কিরূপ সূক্ষ্মভাবে তন্ত্রসাধনার বর্ণনা করিয়াছেন তাহা আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু তাঁহার পদাবলী যত জনপ্রিয়, 'সাধকরঞ্জন' ততটা নহে। কারণ পদসাহিত্য সাধারণ-অসাধারণ সকলেরই প্রাণের সামগ্রী, কিন্তু তন্ত্রকথা-সংক্রান্ত গূঢ় সাধনায় সাধকের প্রয়োজন থাকিলেও ত্রিতাপদগ্ধ সাধারণ মানুষের তাহাতে বিশেষ আকর্ষণ নাই। আরও একটি কথা, এই শাক্ত পদকারগণ বাৎসল্যরসকে ভিত্তি করিয়াছিলেন বলিয়া পদাবলীতে বিশুদ্ধ শিল্পলক্ষণ অনেক সময় অনুপস্থিত থাকিলেও ইহার কোনও প্রকার বিকৃতি দেখা দেয় নাই। সুপেয় রসও কালবৈগুণ্যে অমেধ্য সুরায় পরিণত হয়, গৌড়ীয় বৈষ্ণব পদাবলীর সূক্ষ্ম 'উজ্জ্বলরস' শেষের দিকে যে 'গৌড়ী সুরা'য় পরিণত হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। অপ্রাকৃত রাধা-কৃষ্ণলীলা পরবর্তী কালে (সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী) 'আরোপ'-সিদ্ধির খিড়কিপথে যে কিরূপ কলুষিত হইয়াছিল, তাহা এই দুই শতাব্দীর বৈষ্ণব-সমাজকথা আলোচনা করিলেই দেখা যাইবে। ইহার কারণ আদিরসের সাধনায় অধিকারী-ভেদ আছে, অনধিকারীর পক্ষে এ সাধনা বড়ই বিপদ-সঙ্কুল। ক্রমে ক্রমে এই ধরনের অতীন্দ্রিয় আদিরস-অনুশীলন দেহপ্রমাথী নিছক কামচর্যায় পরিণত হয়—বৈষ্ণব সহজিয়া ও তাঁহাদের পদাবলী-সাহিত্য এবং সাধনভজন-সংক্রান্ত পুঁথিপত্রে তাহার পরিচয় পাওয়া যাইবে। কিন্তু মাতাপুত্রের স্নেহরসের সম্পর্ক কোন কারণেই বিষাইয়া উঠিতে পারে না। তাই পরবর্তী কালের বাড়াবাড়ির ফলে শাক্তপদে স্বতঃস্ফূর্তি ক্ষুণ্ণ হইলেও ইহাতে কোন বিকার প্রবেশ করে নাই।

একথা বোধহয় নিশ্চিন্ত হইয়া বলা যাইতে পারে যে, শাক্তপদসাহিত্য অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ব্যাপার হইলেও ইহা যেভাবে সম্প্রদায়-উপসম্প্রদায় নির্বিশেষে সকলকেই আশ্বাস ও সান্ত্বনা দিয়াছে, মানুষের বাস্তব সুখদুঃখের সঙ্গে জড়াইয়া গিয়াছে, তাহাতে মধ্যযুগীয় গীতিসাহিত্যে তাহার তুলনা বিরল। শ্যাম-শ্যামাকে এক ভাবিতে তাই শাক্তপদকারদের সঙ্কোচ বোধ হয় নাই। সাধক কমলাকান্ত অসঙ্কোচেই রসরঙ্গিণী রাধার পদ লিখিয়া গিয়াছেন।[৬৮] অষ্টাদশ শতাব্দীর নৈতিক অস্বাস্থ্যের মধ্যে শাক্ত সাধকগণ

৬৮. অবশ্য সেকালের কবিগণ যেরূপ অসাম্প্রদায়িক উদার মনের পরিচয় দিয়াছেন,

যে এইরূপ ঔদার্য রক্ষা করিতে পারিয়াছিলেন তাহার জন্য তাঁহারা প্রশংসার যোগ্য।

অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীতে অনেক শাক্ত সাধকের কণ্ঠে ভক্তির গান উচ্ছ্বসিত হইয়াছিল, আর সেই গান সমগ্র দেশেই ছড়াইয়া পড়িয়াছিল। এই সমস্ত গানের একটা সাধনাগত সূক্ষ্ম তাৎপর্য আছে যাহা ঐ বিশেষ পথের পথিকগণই অবধারণ করিতে পারিবেন। কিন্তু দুঃখহত সাধারণ মানুষ এই সমস্ত গান গাহিয়া ও শ্রবণ করিয়া মানসিক শান্তি পাইয়াছিল, শোকে দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিয়াছিল, দৈব, প্রাকৃতিক ও রাষ্ট্রিক উৎপাত নিরুদ্বেগে সহিবার মতো মানসিক প্রেরণার অধিকারী হইয়াছিল—সমাজের দিক হইতে এ কথাটাও স্মরণযোগ্য। হয়তো অধিকাংশ শাক্ত পদে কবিত্ব অপেক্ষা তত্ত্বকথা প্রাধান্য পাইয়াছে, একই ধরনের চিত্রকল্প উপমারূপক-প্রতীক ব্যবহারে পদগুলি উজ্জ্বলতা হারাইয়া ফেলিয়াছে। তবু অষ্টাদশ শতাব্দীর কৃত্রিম কাব্যকলার যুগে ভক্তিরসের শাক্তপদ বাঙালীর নীতিভ্রষ্ট ও অবক্ষয়প্রাপ্ত জীবনে প্রলেপের কাজ করিয়াছিল।

শাক্ত পদকর্তাদের মধ্যে অনেকেই রাজবংশোদ্ভূত ও ভূস্বামিসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, কেহ-বা দেওয়ান প্রভৃতি উচ্চ অভিজাত রাজকর্মচারীও ছিলেন

একালের সমালোচকগণ সেরূপ মানসিক ঔদার্যের ধারা রক্ষা করিতে পারেন নাই। 'সাধক সঙ্গীতের' সম্পাদক কৈলাসচন্দ্র সিংহ মহাশয় শাক্ত কমলাকান্ত-রামপ্রসাদের বৈষ্ণবপদ সহ্য করিতে পারেন নাই। তাঁহার মতে শাক্ত সাধককে শুধু কালিকায় ভজনা করিতে হইবে—অন্য দেবতার আশ্রয় লওয়া মানসিক দুর্বলতার চিহ্ন। রামপ্রসাদ সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য কৌতুকজনক, "ইঁহার সাধনা পূর্ণতা প্রাপ্ত হয় নাই। ইঁহার মধ্যে কিয়ৎপরিমাণে ব্যবসাদারী ছিল; নচেৎ তিনি কৃষ্ণকীর্তন রচনা করিতে পারিতেন না।" (পৃ. ৪৭) তাঁহার কমলাকান্ত-সংক্রান্ত উক্তি অধিকতর হাস্যকর। "ভট্টাচার্য মহাশয় কৃষ্ণ প্রেমবিষয়ক সঙ্গীত রচনা করিয়া রাধিকার প্রেমের কাঁদুনি কাঁদিয়াছেন। আমরা শক্তি সাধকের মুখে এই সকল কাঁদুনি শ্রবণ করিতে ইচ্ছা করি না।" (পৃ. ৩০১) এই জাতীয় সমালোচকদের কমলাকান্তেরই বাণী স্মরণ করাইয়া দেওয়া যাইতে পারে:

জান না রে মন পরম কারণ
কালী কেবল মেয়ে নয়।
সে যে মেঘের বরণ করিয়ে ধারণ
কখন কখন পুরুষ হয়॥

তাহা আমরা পূর্বে বলিয়াছি। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর শোষণনীতি এবং কর্নওয়ালিস-ওয়েলেসলির রাজস্ব ও জমিজমাঘটিত চণ্ডনীতির ফলে সম্পন্ন ভূস্বামীরাও যে রাতারাতি দেউলিয়া হইয়া গিয়াছিলেন তাহা ইতিহাসের দিক দিয়া সত্য। এইরূপ মানসিক বিপর্যয় হইতেই হউক, বা যে-কোন কারণেই হউক বাংলার অনেক জমিদার ও দেওয়ান বংশে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে একাধিক শাক্ত পদকারেব আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহাদের কেহ কেহ তন্ত্রানুমোদিত সাধনাতেও আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। কেহ কেহ জমিদারী পরিচালনায় উদাসীন হইয়া সাধনভজন লইয়াই ব্যস্ত থাকিতেন। বোধহয় তৎকালীন জমিদার শ্রেণী ও তাঁহাদের দেওয়ানদের শাক্ত পদ রচনা একটা প্রথায় পরিণত হইয়াছিল। তা না হইলে অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর অধিকাংশ জমিদার ও দেওয়ান বংশে এতগুলি শাক্ত পদকারের আবির্ভাব হইবে কেন?

নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগর, নাটোর, বর্ধমান, কুচবিহার প্রভৃতির জমিদার ও সামন্তবর্গের অনেকেই অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর মধ্যে অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শাক্তপদ রচনা করিয়াছিলেন। নবদ্বীপ-কৃষ্ণনগরের মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের বংশ বিশেষভাবে শাক্ত বলিয়া পরিচিত ছিলেন। রামপ্রসাদের প্রভাবেই হোক, বা কুলধর্মানুসারেই হোক, স্বয়ং কৃষ্ণচন্দ্র এবং তাঁহার দুইপুত্র মহারাজ শিবচন্দ্র, কুমার শম্ভুচন্দ্র, ঐ বংশের কুমার নরচন্দ্র প্রভৃতি রাজপরিবারভুক্ত কয়েকজন ভক্ত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট শ্যামাসঙ্গীত রচনা করিয়াছিলেন। মহারাজ কৃষ্ণচন্দ্রের নামে "অতি দুরারাধ্যা তারা ত্রিগুণা রজ্জুরূপিণী" গানটি[৬৯] শাক্ত পদসংগ্রহে স্থান পাইয়াছে। পুত্র শম্ভুচন্দ্রের এই গানটি সুপরিচিত:

> চিন্তাময়ী তারা তুমি আমার চিন্তা করেছ কি?
> নামে জগৎ-চিন্তাময়ী, ব্যাভারে কই তেমন দেখি?
> প্রভাতে দাও বিষয়চিন্তে, মধ্যাহ্নে দাও জঠরচিন্তে
> ওমা শয়নে দাও সর্ব্ব চিন্তে, বল্ মা তোরে কখন ডাকি?

এই রাজবংশের ভক্ত-কবিদের মধ্যে কুমার নরচন্দ্র বাস্তবিক কবিত্বপ্রতিভার

৬৯. পূর্বে উল্লেখ করা হইয়াছে।

অধিকারী ছিলেন। মাতার সঙ্গে সন্তানের এমন শুচিস্নিগ্ধ সম্পর্ক রাম-প্রসাদকেই স্মরণ করাইয়া দেয়। কবি যখন জগন্মাতার প্রতি সাভিমানে বলেন :

যে ভালো করেছ কালী আর ভালোতে কাজ নাই।
ভালোয় ভালোয় বিদায় দে মা আলোয় আলোয় চলে যাই॥
মা তোমার করুণা যত বুঝিলাম অবিরত
জানিলাম শত শত কপাল ছাড়া পথ নাই॥

তখন যেন কবির অভিমান-স্ফীত ওষ্ঠাধরও প্রত্যক্ষ হইয়া ওঠে—বাৎসল্যরসের এমন চমৎকার মানবরসপূর্ণ ব্যঞ্জনা শাক্তপদসাহিত্যেও বড় বেশী নাই। তাঁহার এইরূপ অভিমানের আর একটি পদেও আন্তরিকতা চমৎকার ফুটিয়াছে :

মা বলে ডাকিস না রে মন, মাকে কোথা পাবি ভাই।
থাকলে আসি দিত দেখা, সর্বনাশী বেঁচে নাই॥
শ্মশানে মশানে কত পীঠস্থান ছিল যত
খুঁজে হলাম ওষ্ঠাগত কেন আর যন্ত্রণা পাই।
গিয়ে বিমাতার তীরে কুশপুত্তল দাহন করে
অশৌচান্তে পিণ্ড দিয়ে কালাশৌচে কাশী যাই॥

মহাদেবের শিরোধার্যা গঙ্গাদেবীর প্রতি মাতা দুর্গার কিঞ্চিৎ ঈর্ষা থাকিলেও থাকিতে পারে; কিন্তু মাতার সন্তানেরা যে বিমাতার (গঙ্গা) প্রতি একটু তাচ্ছিল্যভাব প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। মুমূর্ষু কমলাকান্ত 'কেন গঙ্গাতীরে যাব' বলিয়া ভাগীরথী নীরে প্রাণত্যাগ করিতে ঘোরতর আপত্তি করিয়াছিলেন। যাহা হউক কুমার নরচন্দ্রের অভিমানের পদগুলি আন্তরিকতায় আধুনিক পাঠকেরও হৃদয় স্পর্শ করে।

বর্ধমানের রাজবাটীতে সাধক কমলাকান্তের প্রভাবে ঐ রাজবংশের কেহ কেহ শাক্ত ভক্ত হইয়াছিলেন। তন্মধ্যে কমলাকান্তের সুহৃদ কুমার প্রতাপচন্দ্র শাক্ত সাধনাও করিয়াছিলেন। তেজচন্দ্রের দত্তকপুত্র মহারাজাধিরাজ মহাতাবচাঁদ অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের ব্যক্তি। কিন্তু তাঁহার অন্তরটি সাধক ভক্তের মতোই ছিল। তিনিই উদ্যোগী হইয়া কমলাকান্তের পদাবলীর প্রথম সংস্করণ বর্ধমান রাজবাটী হইতে প্রকাশ করেন। তাঁহার ভণিতায় দশমহাবিদ্যা বিষয়ক অনেকগুলি পদ শাক্ত পদসাহিত্যে সঙ্কলিত হইয়াছে। কুচবিহাররাজ হরেন্দ্রনারায়ণ ভূপবাহাদুর এবং সুপ্রসিদ্ধ মহারাজ নন্দকুমারের

ভণিতায় অষ্টাদশ শতাব্দীতে কয়েকটি শাক্ত পদ পাওয়া গিয়াছে। মহারাজ নন্দকুমার নিজেও তন্ত্রসাধক ছিলেন। নানা রাজবংশের কবিদের মধ্যে নাটোরের সুবিখ্যাত সাধক রাজা রামকৃষ্ণের নাম এই প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ইতিপূর্বে এই প্রসঙ্গে গোড়ার দিকে আমরা রামকৃষ্ণের কালীসাধনার কথা বলিয়াছি। তিনি রাণীভবানীর দত্তকপুত্র। বিরাট ভূস্বামী হইয়াও তিনি রাজকার্য পরিত্যাগ করিয়া দিবারাত্র কালিকার ধ্যানসাধনা লইয়াই ব্যাপৃত থাকিতেন, পঞ্চমুণ্ডি আসনে বসিয়া তন্ত্রোক্ত সাধনাদি করিতেন। ফলে তাঁহার জমিদারী নিলামে উঠিয়া যায়। ইহাতে তিনি বিষয়বন্ধন হইতে মুক্তি লাভ করিয়া বরং আনন্দিতই হইয়াছিলেন। তাঁহার কালীসাধনা, গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে তনুত্যাগ প্রভৃতি নানা গল্পকাহিনী এখনও সুবিদিত। তাঁহার গানগুলি কবিত্বের দিক দিয়া গতানুগতিক। কিন্তু তাহা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কবি একজন সিদ্ধপুরুষ ছিলেন।

বর্ধমানরাজের দেওয়ান ব্রজকিশোর রায় এবং তাঁহার পুত্র নন্দকুমার (নন্দকিশোর) রায় ও রঘুনাথ রায় অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধের মধ্যে অনেকগুলি শাক্ত পদ লিখিয়াছিলেন। তন্মধ্যে রঘুনাথের কয়েকটি গান কাব্যগুণে শাক্ত-পদ-সাহিত্যে স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। তাহার দুই চারি পংক্তি প্রশংসার যোগ্য। যথা—

পড়িলে ভবসাগরে ডুবে মা তনুর তরী।
মায়া-ঝড় মোহ-তুফান ক্রমে বাড়ে গো শঙ্করী॥

ত্রিপুরারাজের দেওয়ান ও প্রসিদ্ধ ভক্ত ও কবি রামদুলাল নন্দী ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগ পর্যন্ত জীবিত ছিলেন। তাঁহার কয়েকটি পদে ভক্তিসাধনার সঙ্গে আধুনিক মনোভাবও মিশ্রিত হইয়াছে। ইতিপূর্বে আমরা তাঁহার প্রসিদ্ধ পদ 'জেনেছি জেনেছি তারা তুমি জান ভোজের বাজি' পদটি উদ্ধৃত করিয়াছি। তাঁহার ভণিতায় আর একটি পদ শাক্ত সাহিত্যে সুপরিচিত, বাংলা সাহিত্যেও অতিশয় প্রসিদ্ধ :

সকলি তোমারি ইচ্ছা, ইচ্ছাময়ী তারা তুমি,
তোমার কর্ম তুমি কর মা লোকে বলে করি আমি।
পঙ্কে বদ্ধ কর করী পঙ্গুরে লঙ্ঘাও গিরি
কারে দাও মা ইন্দ্রত্ব পদ কারে কর অধোগামী॥

যে বোল বোলাও তুমি সেই বোল বলি আমি
তুমি যন্ত্র তুমি মন্ত্র তন্ত্রসারের সার তুমি ॥৭০

রাজবংশ বা দেওয়ান বংশাদি সামন্তশ্রেণী ও অভিজাত বংশ ছাড়িয়া দিলেও অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালেও কয়েকজন সাধক-কবির শাক্তপদ শাক্তসাহিত্যে গৃহীত হইয়াছে। গোবিন্দ চৌধুরী (বগুড়া), মহেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য (প্রেমিক), নীলাম্বর মুখোপাধ্যায়, রামলাল দাস প্রভৃতি শাক্ত কবিদের নাম উল্লেখ করা যায়। ইঁহাদের মধ্যে নীলাম্বর মুখোপাধ্যায় ও রামলালের অনেক গান এখনও পথভিখারীরা গাহিয়া থাকে। নীলাম্বরের নির্বেদ-বৈরাগ্যমূলক 'তারা কোন্ অপরাধে এ দীর্ঘ মেয়াদে সংসারগারদে থাকি বল' এবং রূপকধর্মী 'কালীপদ আকাশেতে মনঘুড়িখান উড়তেছিল' এবং রামলালের ঃ

শ্মশান ভালো বাসিস বলে শ্মশান করেছি হৃদি।
শ্মশানবাসিনী শ্যামা নাচবি বলে নিরবধি ॥
আর কোন সাধ নাই মা চিতে,
চিতার আগুন জ্বলছে চিতে
ওমা চিতাভস্ম চারিভিতে রেখেছি মা আসিস যদি ॥

প্রভৃতি গানগুলির সরল আন্তরিক সুরে চিত্ত দ্রবীভূত হইয়া যায়।

অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীর হরুঠাকুর, নীলুঠাকুর, এ্যান্টনী ফিরিঙ্গী প্রভৃতি কবিওয়ালা এবং নিধুবাবু, কালী মির্জা, শ্রীধরকথক প্রভৃতি টপ্পা-গায়ক এবং দাশরথি রায়, রসিক রায় প্রভৃতি পাঁচালী গায়কেরা শ্যামাবিষয়ক সঙ্গীতাদি রচনা করিয়াছিলেন। তবে এই সমস্ত রচনার অধিকাংশই উনবিংশ শতাব্দীর পর্যায়ভুক্ত বলিয়া বর্তমান প্রসঙ্গে শুধু ইঁহাদের নামোল্লেখ করিয়া ক্ষান্ত হইতেছি।[৭১]

বাংলার শাক্তপদসাহিত্য যুগপৎ কাব্য ও সাধনার মুক্তবেণী রচনা

৭০. এই গানটি 'সঙ্গীত-সন্দর্ভে' নরচন্দ্রের বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে। অনেক শাক্ত পদে ভণিতা নাই বলিয়া একের পদ অন্যের নামে চলিয়া গিয়াছে। সরলভাষা ও রচনার উৎকর্ষের জন্য ইহা নরচন্দ্রেরও হইতে পারে।

৭১. বিভিন্ন শাক্তপদাবলী ও কবির বিস্তারিত পরিচয়ের জন্য অধ্যাপক শ্রীজাহ্নবীকুমার চক্রবর্তীর 'শাক্তপদাবলী ও শক্তিসাধনা' দ্রষ্টব্য।

করিয়াছে। বৈষ্ণবপদের তুলনায় এই সমস্ত পদে সূক্ষ্ম কল্পনার কারিগরি, ভাবাবেগের রোমান্টিক উৎসার, বাগ্‌ভঙ্গিমার চমৎকারিত্ব প্রভৃতি প্রথমশ্রেণীর কাব্যগুণ ততটা নাই। অনেক পদ নিছক তন্ত্রসাধনার মুষ্টিযোগে পর্যবসিত হইয়াছে। কোনটিতে সংসারদগ্ধ জীবের দুঃখ হইতে মুক্তিলাভের বাসনা অধিকতর প্রাধান্য পাইয়াছে, রূপকপ্রতীকের ফাঁসে কোন কোন সময়ে কবিত্ব যে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মরিয়াছে তাহা অস্বীকার করা যায় না। তবু এই শাক্ত-পদাবলী অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের গতানুগতিকতা ভঙ্গ করিয়াছে। সাহিত্যের স্বাদবৈচিত্র্য ফিরাইবার জন্য এই পদগুলির প্রয়োজনীয়তা সাহিত্যের ইতিহাসে স্বীকৃতিলাভের যোগ্য।

২

বা উ ল গা ন

একজন বাউল গাহিয়াছেন :

ফুলের বনে কে ঢুকেছে সোনার জহরী।
নিকষে ঘষয়ে কমল আ মরি মরি॥

পুঁথিপত্র ঘাঁটিয়া পাণ্ডিত্যের অণুবীক্ষণ যন্ত্র মানসনেত্রে চড়াইয়া বাউলগানের তত্ত্বসন্ধানকে বাউলকবি নিকষপাথরে কমল যাচাই করিবার মতো বিড়ম্বনা বলিয়া মনে করেন। তিনি তো সারা জীবন ধরিয়া অধরার সন্ধানে ফিরিয়াছেন :

আমার মনের মানুষ যে রে,
আমি কোথায় পাব তারে,
হারায়ে সেই মানুষে দেশবিদেশে
বেড়াই ঘুরে ঘুরে॥

বিশ্বসংসার ঢুঁড়িয়া সেই 'মনের মানুষ'কে কি পাওয়া যায়? "কভু মিলে, কভু না মিলে দৈবের লিখন" (চৈতন্যচরিতামৃত)। বাউলসাধক ও কবিগণ নিজ নিজ সাধনার দ্বারা সেই দুরায়ত্ত দৈবকেই করায়ত্ত করিয়াছেন। তাই বাংলার বাউলগান যেমন একদিকে শিল্পরসের বিচারে বিচিত্র গীতিরসসিক্ত ও প্রতীকধর্মী বলিয়া উচ্চ প্রশংসা দাবি করিতে পারে, তেমনি ইহার পশ্চাদপটে একপ্রকার বিশেষ ধরনের আচার-আচরণমূলক কৃত্য ও সাধনা

আছে এবং সেই সাধনার মূলতত্ত্ব যোগতান্ত্রিক দর্শনের উপর প্রতিষ্ঠিত। বাংলা দেশে ভ্রাম্যমাণ বাউল গায়ক-গায়িকাদের এখনও পথে পথে গান করিয়া ভিক্ষা করিতে দেখা যায়, দুই-এক শতাব্দী পূর্বে আরও অধিকসংখ্যায় দেখা যাইত। এই বিশেষ ধর্মসম্প্রদায়ভুক্ত সাধকগণ ব্যক্তিগত জীবনযাপনে এমন কতকগুলি বিচিত্র পন্থা অবলম্বন করিত, পারিবারিক জীবনসম্বন্ধে এত উদাসীন ছিল এবং বিশেষ ধরনের ধ্যানধারণা উপলব্ধি লইয়া এত ব্যস্ত ছিল যে, ইহারা বড় একটা বাহিরের সংবাদ রাখিত না, উচ্চশ্রেণীর ভদ্রসমাজ ইহাদের সম্বন্ধে কিছু কৌতূহল প্রকাশ করিলেও রহস্যময় সাধনা ও জীবনের জন্য ইহাদের নিকট হইতে দূরে দূরে থাকিত। উনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বাউলদের গভীর অর্থবহ অধ্যাত্ম সঙ্গীতের প্রতি শিক্ষিত সমাজের সর্বপ্রথম দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়—যদিও এই সম্প্রদায়ের সাধনভজনের গূঢ়তত্ত্ব সম্বন্ধে নব্যসমাজ বিশেষ কোন সংবাদ রাখিতেন না।

বাউলসাধনার স্বরূপ ॥

বাতুল, ব্যাকুল, আউল (আরবি), বাউর (হিন্দী)—যে শব্দ হইতেই বাউল শব্দের উৎপত্তি হোক না কেন, ইহারা যে দলছাড়া, সাধারণ সমাজের বহির্ভূত, অদ্ভুতপন্থার পথিক—তাহা ইহাদের পদ হইতেই বুঝা যাইবে। চৈতন্যচরিতামৃতে 'বাউ' ও 'বাউল্যা' শব্দ দুইটি দুই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে। ঈশ্বর প্রেমে মাতাল, বাস্তবজ্ঞানবর্জিত, উদাসীন ভক্ত—এই অর্থে কৃষ্ণদাস কবিরাজ চৈতন্যচরিতামৃতের একাধিক স্থানে বাউল শব্দ ব্যবহার করিয়াছেন। যথা :

(১) কহিবারে যোগ্য নয় তথাপি বাউলে কয়
কহিলে বা কেবা পাতিয়ায় ?

(২) আমি তো বাউল আন্ কহিতে আন্ কহি।
কৃষ্ণের মাধুর্য স্রোতে আমি যাই বহি॥

(৩) বাউলকে কহিও লোকে হইল আউল।
বাউলকে কহিও হাটে না বিকায় চাউল॥

কিন্তু চৈতন্যচরিতামৃতে শিথিল, বুদ্ধিহীন—এইরূপ একটা ঊনার্থক ইঙ্গিতেও 'বাউল' শব্দের ব্যবহার আছে :

(১) গোবিন্দেরে আজ্ঞা দিল—ইহা আজি হৈতে।
বাউল্যা বিশ্বাসেরে না দিবে আসিতে।

(২) স্থির হঞা ঘরে যাও না হও বাউল।
ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধুকূল।

এই সমস্ত উক্তি হইতে মনে হয়, চৈতন্য-সমসাময়িক কালে বাস্তবজীবনে উদাসীন, বাহিরের দিক হইতে অসম্বদ্ধ—এমন এক ঈশ্বরভক্ত সম্প্রদায় সমাজে বাউল নামে পরিচিত হইয়াছিল। অদ্বৈতপ্রভু শান্তিপুর হইতে পুরীধামে চৈতন্যদেবকে যে আর্যা পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে তিনি মহাপ্রভুকে 'বাউল' আখ্যা দিয়াছিলেন। মহাপ্রভুও চৈতন্যচরিতামৃতে ঈশ্বরভক্ত অর্থে বাউলশব্দ একাধিকবার ব্যবহার করিয়াছেন। বাহিরের দিকে আচার-আচরণ ধর্ম-কর্মাদি অসঙ্গতিপূর্ণ ও রহস্যময় হইলেও অন্তরে অন্তরে যাঁহারা যথার্থ ঈশ্বর-ভাবরসে মাতাল হইয়া থাকিতেন, তাঁহারাই বাহিরের লোকের নিকট বাতুল অর্থাৎ বাউল বলিয়া অভিহিত হইতেন। পরবর্তী কালে, বিশেষতঃ সহজিয়া পদেও এইরূপ বিশিষ্ট ধরনের সাধককে বুঝাইতে বাউল শব্দ ব্যবহৃত হইত। বাতুল, বাউল, বাউর—সবই বায়ুরোগগ্রস্ত ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। ইহার সঙ্গে স্থফী 'ওয়ালী' (নিকট) শব্দের বহুবচন 'ওয়ালীয়া' (অর্থাৎ ঈশ্বরসান্নিধ্যে অবস্থিত ভক্তগণ) শব্দটি আউল-আউলিয়া শব্দগঠনে সাহায্য করিয়াছে। আকুল হইতে আউল—অথবা 'ওয়ালীয়া' হইতে আউল, যে শব্দ হইতেই হোক না কেন, একদা মুসলমান ঈশ্বরভক্ত যে আউলিয়া নামে পরিচিত ছিলেন তাহাতে সন্দেহ নাই।

আমরা ইতিপূর্বে সহজিয়া সম্প্রদায় সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া দেখিয়াছি, সপ্তদশ শতাব্দীতে হিন্দুসমাজবহির্ভূত সহজিয়া তান্ত্রিক বৌদ্ধগণ বীরচন্দ্র কর্তৃক বৈষ্ণবসমাজে গৃহীত হইবার পর তাঁহারা সাধারণতঃ সহজিয়া বৈষ্ণব নামে উল্লিখিত হইতেন। কিন্তু তাঁহারা দেহমানসিক সাধনার ধারা সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ না করিয়া চৈতন্যচরিতামৃত-ব্যাখ্যাত অনুরাগ-তত্ত্ব (রাগানুগা সাধনা), পরকীয়াবাদ এবং শ্রীখণ্ডসম্প্রদায় প্রচারিত গৌরনাগর ভাবের ধারা-উপধারাকে নিজেদের ধর্মাচার ও চিন্তার সঙ্গে মিলাইয়া যে বিচিত্র সাধনপ্রণালী গড়িয়া তোলেন, তাহাই সপ্তদশ-উনবিংশ

শতাব্দী পর্যন্ত বাংলা দেশে চণ্ডীদাসের সহজিয়া পদে এবং বৈষ্ণব সাধকদের নামে প্রচারিত কড়চাগ্রন্থে নানা ইঙ্গিত ও প্রহেলিকায় ব্যাখ্যাত হইয়াছে। এই সহজিয়া সম্প্রদায় হইতেই বাউলসম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয় বলিয়া অনেকে অনুমান করেন।

বৈষ্ণব সহজিয়া সম্প্রদায়, সুফী আউলিয়া সম্প্রদায় এবং শৈব নাথধর্ম, যোগতন্ত্র, হঠযোগ প্রভৃতি ধর্ম ও উপধর্মের 'কায়াসাধনা' তত্ত্ব অবলম্বনে এই বাউল সম্প্রদায় একপ্রকার অধ্যাত্মতত্ত্ব ও ক্রিয়াকর্ম অনুশীলন করিত, এখনও করে। বস্তুতঃ বাউলসম্প্রদায়ে জাতিপাঁতির ভেদ না থাকিলেও সহজিয়া পন্থী হিন্দু বাউল এবং সুফী পন্থী মুসলমান ফকির বাউল (আউলিয়া)—এইরূপ দুইটি সাধনপ্রণালী লক্ষ্য করা যায়। অবশ্য অধিকাংশ স্থলে হিন্দু বাউল ও মুসলমান বাউলের সম্প্রদায়গত বিশেষ কোন পার্থক্য নাই; হিন্দু বাউলও সুফী সাধনার শব্দাদি ব্যবহার করেন, মুসলমান ফকির বাউলও হিন্দুর যোগতন্ত্রঘটিত শারীরতত্ত্ব স্বীকার করিয়া হিন্দুর পারিভাষিক শব্দ যথেচ্ছা ব্যবহার করিয়াছেন।

বাংলার বাউলদের যথার্থ আত্মীয়তার যোগ বৈষ্ণব সহজিয়াদের সঙ্গে। বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে ইঁহাদের প্রত্যক্ষতঃ কোন যোগাযোগ নাই বলিয়া প্রাচীন বৌদ্ধ সহজিয়াদের সঙ্গে ইঁহাদের ধর্মাচারের তুলনামূলক আলোচনার প্রয়োজন নাই। বৈষ্ণব সহজিয়াগণ সাধক-সাধিকার দেহে শ্রীরাধাকৃষ্ণতত্ত্ব আরোপ করিয়া অনন্ত প্রেমরস ('সহজ-ধর্ম') আস্বাদন করিতে চাহেন। অর্থাৎ নরনারীর পিণ্ডদেহকে পক্ক দেহে পরিণত করিয়া সীমার মারফতে অসীম প্রেমরস উপলব্ধি—ইহাই তাঁহাদের মূল লক্ষ্য। কিন্তু তাহা মূল লক্ষ্য হইলেও সহজিয়ারা মানুষকে ভুলিতে পারেন না। বস্তুতঃ বাস্তব মানুষই তাঁহাদের প্রেমসাধনার মূল উপাদান।[৭২] প্রাকৃত মানুষের উপর রাধাকৃষ্ণত্ব আরোপ করিয়া উভয়ের সামরস্যসম্ভূত অদ্বৈতানুভূতিই তাঁহাদের মোক্ষ-সাধনা। কিন্তু

৭২. ডঃ শশিভূষণ দাশগুপ্তের *Obscure Religious Cults as the Background of Bengali Literature* দ্রষ্টব্য। ডঃ দাশগুপ্ত ইহাকে "the most perfect form of human love" বলিয়াছেন।

বাউলগণ সহজিয়াদেয় ছাড়াইয়া আর এক ধাপ অগ্রসর হইয়াছেন।[৭৩] তাঁহারা প্রেমসত্তাকে পুরুষ-প্রকৃতি, রাধাকৃষ্ণ, নারী-নর—এই রূপ দ্বৈতভাবে না দেখিয়া, নূতন দৃষ্টিকোণ হইতে অভিনব সাধনপ্রণালী অনুসরণ করিয়াছেন। তাঁহাবা বলেন, এই দেহের মধ্যেই মনের মানুষ, সাঁই। (স্বামী), অচিনপাখী, অধরমানুষ আছেন। সেই অধরাকে ধরাই ভক্ত, সাধক, বাউলের একমাত্র লক্ষ্য। অর্থাৎ জড়জীবী ব্যক্তিসত্তা এবং চিদানন্দময় ভাগবতসত্তার অদ্বৈত মিলনরস তাঁহাদের কাম্য। আমাদের সীমাবদ্ধ সত্তাকে সেই ভাগবতসত্তায় মিলাইয়া দিবার জন্য সাধক দেহ-'ত্রিবেণী'র ঘাটে বসিয়া থাকেন। 'ত্রিবেণী'তে জোয়ার আসিলে তিনি মাছ ধরিবেন। এই মীন 'জোয়ারে'র জলে ভাসিয়া আসে। জোয়ারের 'গোন' চলিয়া গেলে সাধক আর মাছ ধরিতে পান না। ইহার সরলার্থ—দেহের মধ্যে যে ক্ষুদ্র 'আমি' আছে, তাহাকে অসীম অখণ্ড 'আমি'র সঙ্গে মিলিত করাই বাউলের লক্ষ্য। অবশ্য এই সাধনপ্রণালী ভারতবর্ষের চিরাচরিত কায়াসাধনারই আর একটি

৭৩. সহজিয়াদেব ব্যবহৃত সাধন-সঙ্কেত—রূপ, স্বরূপ, রসরতি, প্রবর্ত, সাধকসিদ্ধ প্রভৃতি শব্দ বাউলরাও ব্যবহার করিয়াছেন, একাধিক বাউলপদে ইহার উল্লেখ আছে। যথা:

ব্রজপুরে রূপনগরে যাবি যদি মন
তবে করগে যা স্বরূপ সাধন।
স্বরূপের রূপ রূপেব স্বরূপ
স্বরূপ দেহে হয় মিলন।

(ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যেব 'বাংলার বাউল ও বাউল গান' হইতে উদ্ধৃত।)

বাউলেরা সহজিয়াদেব প্রেমতত্ত্বের 'সমর্থা, সমঞ্জসা ও সাধারণী'—এই তিনটি শব্দও গ্রহণ করিয়াছেন। 'উজ্জ্বলনীলমণি'তে এই তিনপ্রকার রতির বর্ণনায় বলা হইয়াছে—সাধারণী রতির নায়িকা নিজ আকাঙ্ক্ষার তৃপ্তির জন্য প্রিয়ের সঙ্গে মিলিত হয়, সমঞ্জসা রতির নায়িকা দয়িতের সঙ্গে মিলনে সমান রসভোগ করিতে চাহে, আর সমর্থারতির নায়িকা শুধু প্রিয়ের তৃপ্তির জন্যই মিলন চাহে, নিজের কোন কামনা তাহার থাকে না। বলা বাহুল্য ইহাই সর্বোৎকৃষ্ট প্রেমসাধনা। বাউল কবিও ইহার আদর্শে গাহিয়াছেন:

সাধারণের ভাটির কারণ
সামঞ্জসার হয় যে মরণ
সমর্থার রয় গো উজল
আধরতি প্রেম গোপিকারে।

(ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থের ২য় খণ্ডের ২৯৭ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)

বিচিত্র শাখাপথ মাত্র। সহজিয়া বৈষ্ণব ও বাউলদের তত্ত্বকথা দাদু, কবীর, নানক, রুইদাস, রজ্জব প্রভৃতি উত্তরাপথের মধ্যযুগীয় সাধকদের দোঁহা ও গীতাবলীতেও পাওয়া যাইবে। এই জাতীয় সন্তসাধনা ও বাউলসাধনার মূল কথা—মানুষের দেহের মধ্যে যে পরম সত্য বা সত্তা রহিয়াছেন, তাঁহাকে উপলব্ধি করিতে হইবে। তাই এই সমস্ত অর্ধ-লোকযানে শ্রেণী-সম্প্রদায়, গ্রন্থ-পাণ্ডিত্য, ধর্মসংস্কারকে ছাড়িয়া অন্তরের সত্যের দিকে অধিকতর দৃষ্টি দেওয়া হইয়াছে।

বাউল সম্প্রদায়ের সঙ্গে 'বে-শরা' সুফী সাধকদেরও অন্তরের সংযোগ লক্ষ্য করা যায়। এক সম্প্রদায়ের দ্বারা অপর সম্প্রদায় স্বাভাবিক ভাবেই প্রভাবিত হইয়াছে। পূর্ব হইতেই সুফী মতের সঙ্গে বাউল মতের সাদৃশ্য আছে—এ সাদৃশ্য অবশ্য প্রভাবজনিত নহে। এই ধরনের অধ্যাত্ম সাধনা, যাহা শুধু হৃদয়কেই স্বীকৃত দেয়—সমাজসংস্কার নহে, তাহা প্রায় সমস্ত ধর্মের মধ্যে কোথাও প্রত্যক্ষভাবে, কোথাও-বা পরোক্ষভাবে প্রচলিত আছে, অতীতেও ছিল। সুফীদের সঙ্গে বাংলার বাউলদেরও কোন কোন বিষয়ে বিশেষ সাদৃশ্য আছে—সে সাদৃশ্য খানিকটা আচার-আচরণমূলক, খানিকটা-বা তত্ত্বদর্শনগত। বাংলা দেশ একদা সুফীসাধনার কেন্দ্রে পরিণত হইয়াছিল, তাহা আমরা ইতিপূর্বে সপ্তদশ শতাব্দীর মুসলমান কবি প্রসঙ্গে দেখিয়াছি। সুফীদের সম্প্রদায় সাতভাগে বিভক্তঃ সুহ্‌রাবর্দি, চিশ্‌তি, কাদাদরি, মাদারি, অধমি, কিদোয়ারি, নক্‌শবন্দি, কাদিরি। প্রায় দ্বাদশ শতাব্দী হইতে এদেশে উক্ত বিভিন্ন সুফীসম্প্রদায়ের প্রভাব স্থাপিত হয়। ধর্মান্তরিত মুসলমানদের উপর এই সমস্ত সুফীসম্প্রদায়ের বিশেষ প্রভাব ছিল, কারণ বাংলার ধর্মান্তরিত মুসলমানের অধিকাংশই হিন্দুসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এবং হিন্দুর কোন কোন শাখার সঙ্গে সুফীমতের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে। যাহা হউক, সহজিয়া বৈষ্ণব বাউল ও সুফী মতের মধ্যে মিলন হইতে বিলম্ব হয় নাই। বাউলদের নৃত্যগীতের সঙ্গে সুফীদের 'সমা' (দরবেশের নৃত্যগীত) তুলনীয়। সুফীদের 'ফানা' অনেকটা বাউলদের 'জ্যান্তে মরা'র সমতুল্য। উপরন্তু সুফীগণ বাউলের মতোই গুরুবাদী। বাউলের গুরুশিষ্যের সম্পর্কের মতো সুফীরাও মুর্শিদ-মুরিদের[৭৪] সম্পর্কে বিশ্বাসী। মুসলমান বাউলদের

৭৪. মুর্শিদ—গুরু, মুরিদ—শিষ্য

মুর্শিদা গানে এই গুরুশিষ্যসম্পর্ক চমৎকার ফুটিয়াছে। মুর্শিদের কৃপাতেই মুরিদ সাধনায় সিদ্ধিলাভ করেন। তাই স্বফী বাউল গাহিয়াছেন:

উনুর ঝুনুর বাজে নাও আমার নিহাইল্যা বাতাসে রে
আমি রইলাম তোর আশে।
পশ্চিমে সাজিল ম্যাঘ রে ভাওয়ায় দিল রে ডাক,
আমার ছিঁড়িল হালের পানস নৌকায় খাইল পাক
মুর্শিদ, রইলাম তোর আশে॥

আর এক হিন্দুবাউল গাহিয়াছেন:

গুরু বলে কারে প্রণাম করবি মন?
তোর অঠিক গুরু পথিক গুরু গুরু অগণন।
গুরু যে তোর বরণডালা গুরু যে তোর মরণজ্বালা
গুরু যে তোর মনের ব্যথা (যে) ঝরায় দু'নয়ন॥

আবার এক শ্রেণীর হিন্দু-মুসলমান বাউল গুরূপদেশ তুচ্ছ করিয়া বলিয়াছেন:

তোমার পথ ঢেকেছে মন্দিরে মসজেদে।
তোমার ডাক শুনে সাঁই চলতে না পাই
রুইখ্যা দাঁড়ায় গুরুতে মুরশেদে॥

কেহ বলিয়াছেন:

আমার নাই মন্দির কি মসজিদ,
নাই পূজা কি বকরিদ,
তিলে তিলে মোর মক্কাকাশী
পলে পলে সুদিনা॥

কেহ কেহ মনে করেন বাউল সম্প্রদায়ের মধ্যে একদল ছিলেন গুরুবাদী, তাঁহারা 'পুথ্যা' ('পুঁথিয়া'), অর্থাৎ যাঁহারা গুরু, গ্রন্থ ও মন্ত্রতন্ত্রে বিশ্বাসী; আর একদল ছিলেন 'তথ্যা', অর্থাৎ প্রকৃত বাউল—যাঁহারা কোন নিয়ম-নিগড় মানিতেন না, কোন মর্ত্যব্যক্তির শাসন স্বীকার করিতেন না।[৭৫] ইঁহারা গাহিয়াছেন:

আছে হেথায় মনের মানুষ মনে সেকি জপে মালা।
অতি নির্জনে বসে বসে দেখছে খেলা॥
কাছে রয় ডাকে তারে উচ্চ স্বরে কোন্ পাগেলা॥

সুফী মতাবলম্বী মুসলমান বাউলগণ হিন্দু বাউলদের মূল আদর্শ স্বীকার করিয়াছেন, অনেকেই শ্রীচৈতন্যকে আদি বাউল বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।

৭৫. ক্ষিতিমোহন সেন—বাংলার বাউল

কিন্তু ইহারা পারিভাষিক শব্দ প্রসঙ্গে ইসলামি শব্দও প্রচুর ব্যবহার করিয়াছেন। ইহাদের মতে আল্লাহের পরম জ্যোতি মর্ত্যে নবীদের মধ্যে প্রকাশ পায়—সকল মানবের মধ্যেই আল্লাহের অস্তিত্ব আছে—নবী ও সাধারণ মানুষ—প্রত্যেকের মধ্যেই তিনি আছেন। অবশ্য সাধারণ মানুষের সাধনার অভাবের জন্য আল্লাহের প্রকাশ কিছু আচ্ছন্ন থাকে, আর নবীদের মধ্যে তাঁহার স্বরূপ পূর্ণরূপে প্রকাশিত হয়। তিনি 'মনের মানুষ', তিনিই 'মাশুক'। যাহারা 'মজ্জুব' (ঈশ্বর প্রেমে মাতোয়ারা) ও 'দিওয়ানা' (পাগল), তাঁহারাই শুধু তাঁহাকে লাভ করেন।[৭৬] বাহিরের মক্কামদিনার কীই-বা প্রয়োজন? কারণ—"আছে আদি মক্কা এই মানবদেহে"। ইহারা ইসলামি শব্দ যোগে এইভাবে গূঢ় তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিয়াছেন:

মন রে আত্মতত্ত্ব না জানিলে সাধন হবে না
পড়বি রে গোলে।
আগে জানগে কালুল্লা আনাল হক আল্লা
যারে মানুষ বলে॥[৭৭]

একটি পদে লালন ফকির ইসলামি মতে বাউলতত্ত্বের সুন্দর ইঙ্গিত দিয়াছেন,

জান গে নূরের[৭৮] খবর যাতে নিরঞ্জন ঘেরা।
নূর সাধিলে নিরঞ্জনকে যাবে রে ধরা॥
নূরে নবীর[৭৯] জন্ম হয় নূর গঠনে অটলময় কান্দরা।
নূরেতে মোকামমঞ্জিল উজল করা॥

---

৭৬. ইসলাম ধর্মের সাধনায় চারিটি স্তর লক্ষ্য করা যায়—(১) 'শরীয়ত'—অর্থাৎ ইসলাম ধর্মের বৈধমার্গে যে সমস্ত আচারানুষ্ঠান স্বীকৃত হয়, তাহার সতর্ক অনুশীলন, (২) 'তরীক'—অর্থাৎ বৈধমার্গ ছাড়াও অন্য পথ কোন কোন সদ্ধর্মবিশ্বাসী অনুষ্ঠান করিয়াছেন, অনেকটা ব্যক্তিগত সাধনভজনের পথ, যাহাতে মুর্শিদ (গুরু) মুরিদকে (শিষ্য) উপদেশ দিয়া থাকেন, (৩) 'হকিক'—অর্থাৎ ঈশ্বরের প্রকৃত সত্তা। অতীন্দ্রিয়বাদী অধ্যাত্মপন্থী সাধকেরাই এই পন্থা জানেন, (৪) 'বেদাতী'—অর্থাৎ যাঁহারা শরীয়তের শাসন অস্বীকার করিয়া নূতন পন্থা অবলম্বন করেন। ইহারাই বে-শরা পন্থী বেদাতী ফকির। বাংলার বাউল সাধনায় ইহাদের দান যথেষ্ট।

৭৭. কালুল্লা—ঈশ্বরের বাণী
আনাল হক আল্লা—আমিই ঈশ্বর, অর্থাৎ আমার মধ্যেই ঈশ্বরের লীলা চলিতেছে।

৭৮. নূর—আল্লাহের জ্যোতি

৭৯. নবী—অবতার

কবি আর এক পদে সুফীতত্ত্বকে বাউলতত্ত্বের সঙ্গে গূঢ়ভাবে মিলাইয়া দিয়াছেন :

ফানা-কিস-শেখ বাকা ফানা,
ফানা ফেল্লা ফানা-ফের-রসুল,
এই চার ঘরেতে লালন মুরশিদ ভজ রে অতি গোপনে।

এখানে ব্যক্তিসত্তাকে ধ্বংস করিয়া '(ফানা)' ঈশ্বর-সাযুজ্য ('বাকা') লাভের কথা বলা হইয়াছে। সুফী মতে চারিপ্রকার সাধনা নির্দিষ্ট হইয়াছে। ফানা-কিস-শেখ—অর্থাৎ গুরুর মধ্যে বিলীন হওয়া, ফানা-ফের-রসুল—ঈশ্বর অবতারের মধ্যে বিলীন হওয়া, ফানা-ফিস-আল্লা, অর্থাৎ ঈশ্বরের মধ্যে বিলীন হওয়া এবং সর্বোচ্চ স্তর—বকাবিল্লা অর্থাৎ ঈশ্বরের সঙ্গে একাত্ম হইয়া যাওয়া। বাউলও অদ্বৈত 'বকাবিল্লা'-ই উপলব্ধি করিতে চাহে। এই সমস্ত মুসলমান সুফী বাউল ইসলামি শব্দ ব্যবহার করিলেও বৈষ্ণব বাউলদের আদর্শ ও শব্দের প্রতি তাঁহাদের বিশেষ আকর্ষণ দেখা যায়।

সাধনার দিক হইতে বাউলগণ ভারতের অধ্যাত্ম সাধনাকেই একটু নূতন দিক হইতে দেখিতে চাহিয়াছেন। পুঁথিপত্র বিলাইয়া দিয়া শুধু অন্তরের আলোকে সাঁইকে চিনিয়া লইতে হইবে[৮০], মানুষ জন্মসূত্রে যে অনন্তের শরীক হইয়া আসে, গুরুমুর্শিদের উপদেশে বা নিজ সাধনার দ্বারা সেই অনন্তকে উপলব্ধি করিলেই সাধকের চূড়ান্ত লক্ষ্য সিদ্ধ হইবে। এই কথাটা বৈষ্ণব বাউল ও সুফী বাউল, 'তথ্যা' বাউল ও 'পুথ্যা' বাউল, আউলিয়া-নেড়া-সহজী কর্তাভজা-সাঁই-দরবেশী— সকলেই বিভিন্ন ভাষা ও প্রতীকের দ্বারা ইঙ্গিতে ব্যক্ত করিয়াছেন। ভারতবর্ষে এই প্রকার অনেক সম্প্রদায় এখনও আছেন যাঁহাদের কিছুমাত্র আক্ষরিক বিদ্যা নাই, পুঁথির জ্ঞান হইতে তাঁহারা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। কিন্তু উচ্চস্তরের অধ্যাত্ম সাধনা তাঁহাদের নখদর্পণে, সূক্ষ্ম তত্ত্বকথা

৮০. দাদু তাঁহার 'কায়াবেলী'তে এই বিষয়ে বলিয়াছেন, "কায়া মাহি হৈ সো নিধি জানে নাঁহি।" অর্থাৎ কায়ার মাঝেই তিনি (কর্তা) রহিয়াছেন, কেহ সেই নিধিকে চিনিতে পারিল না। কবীরের প্রসিদ্ধ উক্তিও এই কথারই ইঙ্গিত দিয়াছে :

পুরব দিসা হরীকা বাসা পছিম অলহ মুকামা।
দিলহী খোজী দিলৈ দিল ভিতরি ইহা রাম-রহিমানা।

—পূর্ব দিকে হরির বাস, পশ্চিমে আল্লাহের মোকাম, অন্তরের মধ্যেই খুঁজিয়া দেখ, এখানেই রহিয়াছেন রাম-রহিম।

তাঁহাদের হস্তামলক। বহু প্রাচীন কাল হইতে এই ধরনের রহস্যময় সাধনার ধারা ভারতে চলিয়া আসিতেছে—ব্রাহ্মণ্য, বৌদ্ধ, জৈন, নানা, লোকযান, সুফী ধারা—সমস্ত ইহাতে আসিয়া মিলিত হইয়া একপ্রকার অদ্বয় সাধনার জন্ম দান করিয়াছে।

বাউলগানের স্বরূপ ॥

বাউল সাধনার তত্ত্ব, কাব্য ও সাধনক্রিয়া—তিনটি দিক আছে, তিনটিই পরস্পর-নির্ভরশীল। বাংলাদেশের শিক্ষিত সমাজে বাউলগানের যে আলোচনা হয়, তাহা প্রধানতঃ তত্ত্ব ও কাব্যধর্মের আলোচনা। মনের মানুষের সন্ধান, মানুষের মধ্যে প্রচ্ছন্ন অমৃতত্বকে জাগ্রত করা এবং ক্ষুদ্রের মধ্যে বৃহৎ সত্তাকে উপলব্ধি করা—মোটামুটি ইহাই বাউলসাধনার নির্যাস, তাহা আধুনিক কালের শিক্ষিত সম্প্রদায় জানেন। বাংলাদেশে ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে নব্য বাউলতন্ত্রের যে জাগরণ হয় তাহার পুরোধা ছিলেন শিক্ষিত সম্প্রদায়। কাঙাল হরিনাথ মজুমদার, কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী এবং হরিনাথের শিক্ষিত তরুণ শিষ্যেরা পুরাতন বাউল ঢঙে অনেক গান লিখিয়াছিলেন।

আধুনিক বাউলগানের আদিগুরু হরিনাথ মজুমদার (১৮৩৩-৯৬), যিনি কাঙাল হরিনাথ বা ফিকির চাঁদ বাউল নামে পরিচিত, তাঁহাকে কেন্দ্র করিয়াই আধুনিক বাউলগান ও সম্প্রদায়ের উৎপত্তি হয়। নদীয়া জেলার কুমারখালী গ্রামে এক সম্ভ্রান্ত তিলি পরিবারে হরিনাথের জন্ম হয়। নানা ভাগ্যবিপর্যয়ের পর তিনি স্বগ্রামে একটি আদর্শ বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। সেকালে এই বিদ্যালয়ের খুব খ্যাতি ছিল। অত্যন্ত অর্থকৃচ্ছ্রতার মধ্যে পড়িয়াও তিনি বিচলিত হন নাই; স্কুল পরিচালনা, সমাজসেবা এবং 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা' (১৮৬৩) নামে একখানি মাসিক ও পাক্ষিক পত্রিকা সম্পাদনা করেন—গ্রাম হইতেই তাহা প্রকাশিত হইত। তাঁহার সাত্ত্বিক আদর্শ চরিত্রের প্রতি আকৃষ্ট হইয়া অনেকে তাঁহার সান্নিধ্য কামনা করিতেন। হরিনাথ কাজকর্মের ফাঁকে ফাঁকে সাধন-ভজন করিতেন। জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি তরুণের দল তাঁহাকে সর্বক্ষণ ঘেরিয়া থাকিতেন। একদিন তাঁহার বাটীতে লালন ফকির কয়েকটি বাউলগান গাহিয়া

গিয়াছিলেন। জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি হরিনাথের অনুরাগী তরুণেরা সেই ভাবে বাউলগান রচনা করিয়া তাহাতে স্বর সংযোগ করিয়া গ্রাম প্রদক্ষিণ করিয়া আসিলেন। তাঁহাদের অনুরোধে হরিনাথ বাউলগান রচনা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার প্রথম গানের একটু দৃষ্টান্ত :

আমি করব এ রাখালী কতকাল,
পালের ছটা গোরু ছুটে করছে আমায় হালবেহাল॥

তাঁহার শিষ্য প্রফুল্লচন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায় ও প্রসন্নকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়—যাঁহারা 'গ্রামবার্তা প্রকাশিকা'র সঙ্গে জড়িত ছিলেন, তাঁহারাও হরিনাথের বাউল-গানের দলে যোগ দিলেন, কেহ-বা নিজেই বাউলগান রচনা শুরু করিলেন। হরিনাথ 'ফিকিরচাঁদ' এই ভণিতায় অনেক বাউলগান লিখিয়াছেন। বাংলা ১২৮৭ সালে কুমারখালী গ্রামে হরিনাথের বন্ধু ও শিষ্যগণ 'ফিকিরচাঁদ ফকিরের দল' নামে বাউল-সঙ্ঘ স্থাপন করেন। ১২৯৩ হইতে ১৩০০ বঙ্গাব্দের মধ্যে হরিনাথ রচিত বাউলগানসমূহ খণ্ডে খণ্ডে প্রকাশিত হয়। মৃত্যুর পর তাঁহার যাবতীয় বাউলগান 'কাঙ্গাল ফিকিরচাঁদ ফকিরের বাউল-সঙ্গীত' (১৯০৪) নামে প্রকাশিত হয়। একদা পথভিখারীরা তাঁহার গান গাহিয়া ভিক্ষা করিত। বাউলের সাধনপ্রক্রিয়া বাদ দিলে আধুনিক কালে বাউলগানকে আর কেহ এরূপ নিপুণভাবে অনুকরণ করিতে পারেন নাই। কাঙালের দুই একটি সুপরিচিত বাউলগানের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

(১) ওহে, দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার কর আমারে।
তুমি পারের কর্তা শুনে বার্তা ডাকছি হে তোমারে॥
আমি আগে এসে ঘাটে রইলাম বসে
(ওহে, আমায় কি পার করবে নাহে আমায় অধম বলে)
যারা পাছে এল, আগে গেল, আমি রইলাম পড়ে॥

(২) অরূপের রূপের ফাঁদে পড়ে কাঁদে প্রাণ আমার দিবানিশি ;
কাঁদলে নির্জনে বসে আপনি এসে দেখা দেয় সে রূপরাশি।
সে যে কি অতুল্যরূপ নয় অনুরূপ শত শত সূর্যশশী॥

(৩) শূন্যভরে একটি কমল আছে কি সুন্দর।
নাই তারে জলে গোড়া আকাশ জোড়া সমানভাবে নিরন্তর॥
কমলের সহস্রেক দল।
তাও বিরাজ করে সোনার মানিক কিবা সে উজ্জ্বল॥

তারে যে জেনেছে যে পেয়েছে সেই হয়েছে দিগম্বর।
কমলের ডাঁটাতে কাঁটা;
আবার চয়টা সাপে জড়িয়ে ধরে করেছে লেঠা;
কেবল পায় যে দেখা যারা বোকা সাপের ফণা ভয়ঙ্কর।

এই সমস্ত গানে কবি বাউলসাধনার অধ্যাত্ম ইঙ্গিত দিয়াছেন, কিন্তু বাউল সাধনার ক্রিয়াক্রম সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

কবি বিহারীলাল চক্রবর্তী ১২৯৪ সালে 'কল্পনা' পত্রিকায় কয়েকটি বাউলগান প্রকাশ করেন। এগুলি (২০টি) ১৩০৭ সালে প্রকাশিত বিহারী-লাল গ্রন্থাবলীতে 'বাউল-বিংশতি' নামে মুদ্রিত হইয়াছিল। বিহারীলালও বাউলগানের তত্ত্বকথার ইঙ্গিত দিয়াছিলেন, কিন্তু মূল সাধনা সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই। তাঁহার বাউলগানের একটু দৃষ্টান্ত ঃ

এ কেমন ভালোবাসা।
বল কোন্ ভাবেতে মন ভুলাতে দেখা দিয়ে ছল্‌তে আসা।

কিংবা

এ চাঁদ কোথায় পেলে।
বল এ চাঁদ কোথায় পেলে।
ত্রিভুবন আলো করে পদ্মফুলে খেলা করে সোনার ছেলে।

পুরাতন বাউলগানের কবিত্ব, অধ্যাত্মসাধনা ও মিস্টিক রস যে অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তিকে[৮১] প্রভাবিত করিয়াছিল—উল্লিখিত গানগুলিই তাহার প্রমাণ। কিন্তু বাউলগান ব্যাপক প্রচার লাভ করিয়াছে রবীন্দ্র-নাথের দ্বারা। নদীয়া জেলার শিলাইদহে জমিদারী পরিদর্শনের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথ কিছুকাল সেই অঞ্চলে ছিলেন। তাহার নিকটবর্তী নদীয়া জেলার কুষ্টিয়া মহাকুমায় সেঁউড়িয়া গ্রামে লালন ফকিরের আশ্রম ছিল। রবীন্দ্রনাথ বাউল ফকিরের মুখে এই সমস্ত গান শুনিয়া ইহার গভীর তাৎপর্য ও কবিত্বের

৮১. শুনা যায় ঈশ্বরচিন্তায় উদাসীন প্রখর কর্মযোগী বিদ্যাসাগরও শেষ জীবনে মানসিক অশান্তির মধ্যে পড়িলে অখিল উদ্দিন নামক এক মুসলমান বাউলকে বাসায় আনাইয়া তাঁহার দেহতত্ত্ব বিষয়ক গান শুনিয়া তৃপ্তি লাভ করিতেন। বিদ্যাসাগরের জীবনীকার বিহারীলাল সরকার তাঁহার গ্রন্থে, ('বিদ্যাসাগর') অখিল উদ্দিনের অনেকগুলি গানের নমুনা দিয়াছেন। অখিল উদ্দিনের গানে 'গোঁসাই চাঁদ' ভণিতা আছে। গোঁসাই চাঁদ নামে একাধিক বাউলের গান পাওয়া গিয়াছে। দ্রষ্টব্য—ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ।

প্রতি বিশেষভাবে আকৃষ্ট হন। বিশেষতঃ বাউল আদর্শের সঙ্গে তাঁহার মনের মিল হওয়াতে তিনি লালন ফকিরের অনেক গান সংগ্রহ করেন। ১৩২২ সালের (শ্রাবণ) 'প্রবাসী' পত্রে তাঁহার সংগৃহীত কুড়িটি বাউলগান প্রকাশিত হয়। লালনের 'খাঁচার ভিতর অচিন পাখী কমনে আসে যায়' গানটির সঙ্গে তাঁহার অন্তর-বাণীর বিশেষ সাদৃশ্য ছিল। কবিগুরুর সংগৃহীত বাউলগানের মোট সংখ্যা—২৯৮, বিশ্বভারতীর 'রবীন্দ্রসদনে' এখনও এই গানগুলির নকল আছে। পরে ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী বহু বাউলগান সংগ্রহ করেন, কিন্তু তাহার অতি অল্পই প্রকাশিত হইয়াছে। সম্প্রতি ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় দীর্ঘকাল ধরিয়া সংগৃহীত বাউলগান ও বাউলতত্ত্ব সম্পর্কে 'বাংলার বাউল ও বাউলগান' নামে যে বিশাল গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে তিনি রবীন্দ্রনাথ ও ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত বাউল গানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ সংশয় প্রকাশ করিয়াছেন। তাঁহার মতে, রবীন্দ্রনাথ তাঁহাদের জমিদারীর এক কর্মচারীর (বামাচরণ ভট্টাচার্য) দ্বারা লালনের মূল খাতা হইতে অনেকগুলি গান নকল করাইয়া লন এবং "পরে উহা হইতে শুদ্ধ করিয়া কতকগুলি গান প্রবাসীতে প্রকাশ করেন।"[৮২] ইহার কারণ ডঃ ভট্টাচার্যের মতে, "বাগ্‌ধারা ও অনেক ক্রিয়াপদ কুষ্ঠিয়া অঞ্চলের সাধারণের চলিত ভাষার অনুরূপ। অজ্ঞতার জন্য যে শব্দগুলি বিকৃতভাবে উচ্চারিত বা লিখিত হইয়াছে, সেইগুলি সেইরূপ রাখা অর্থহীন। সেই জন্যই বোধ হয় রবীন্দ্রনাথ ঐ গানগুলি শুদ্ধ উচ্চারণ অনুযায়ী বানান ঠিক করিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন।"[৮৩] অর্থাৎ ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে রবীন্দ্রনাথ সংগৃহীত গানের ভাষাতে হস্তক্ষেপ না করিয়া শুধু বানান শুদ্ধ করিয়া এবং আঞ্চলিক শব্দগুলিকে শুদ্ধ উচ্চারণের রীতিতে ছাপাইয়াছিলেন। কিন্তু আচার্য ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানগুলির প্রামাণিকতা সম্পর্কে ডঃ ভট্টাচার্য একটু অভিযোগ আনিয়াছেন। তাঁহার মতে ক্ষিতিমোহন সংগৃহীত গানের নিম্নোদ্ধৃত পংক্তিগুলি কোন অশিক্ষিত বাউলের রচনা হইতে পারে না :—

(১) নিঠুর গরজী, তুই কি মানসমুকুল ভাজবি আগুনে ?

(২) সহজধারা আপনহারা তার বাণী শুনে।

৮২. ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য—বাংলার বাউল ও বাউল গান, পৃ. ৫

৮৩. ঐ

(৩) হৃদয়কমল চলতেছে ফুটে কত যুগ ধরি।

(৪) আমি মজেছি মনে—
না জানি মন মজল কিসে আনন্দে কি মরণে।
ওগো এখন আমায় ডাকা মিছে,
আনন্দে এই মন নাচিছে
তার নূপুর বাজে রাত্রিদিনে।[৮৪]

(৫) আমার ডুবল নয়ন রসের তিমিরে—
কমল যে তার গুটালো দল আঁধারের তীরে।
গভীর কালো যমুনাতে চলছে লহরী,
রসের লহরী।
ও তার জলে ভাসে কানে আসে রসের বাঁশরী,
সাঁইয়ের বাঁশরী।
আমি বাইরে ছুটি বাউল হয়ে সকল পাসরি
ঘর ছাড়িয়ে।
শুধু কেঁদে মরি—ভাসাই কুম্ভ রসের নীরে,
আমার চোখ ডুবেছে রসের তিমিরে।

এই গানগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে ডঃ ভট্টাচার্যের সংশয় নিশ্চয় সুধীজনের চিন্তা উদ্রেক করিবে—"এইরূপ বাক্‌চাতুর্য ও কল্পনা আধুনিক কালের কবিদের রচনা ছাড়া বর্তমান বাউলদের গানে মিলে না, তাহা এই পনের ষোল বছর ধরিয়া প্রায় দেড় সহস্র বাউলগান সংগ্রহ ও পর্যালোচনায় অভিজ্ঞতার ফলে বুঝিয়াছি।"[৮৫] অবশ্য অবিশেষজ্ঞ হইয়াও বলিতে বাধা নাই যে, উল্লিখিত চার ও পাঁচ সংখ্যক গান দুইটির ভাব, ভাষা ও প্রকাশ-ভঙ্গিমা আধুনিকমনা সুশিক্ষিত ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হইতেছে। সে যাহা হউক, রবীন্দ্রনাথ যে বাংলার বাউলগানকে দেশে-বিদেশে[৮৬] জনপ্রিয় করিয়াছেন, এই অশিক্ষিত সাধনসঙ্গীতের প্রতি বিশ্বের বিদ্বজ্জনের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন তাহাতে সন্দেহ নাই। তাঁহার

৮৪. এ ভাষা একেবারে শিক্ষিত কবির ভাষা, ইহাকে অশিক্ষিত গ্রাম্য বাউলের রচনা বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

৮৫. ঐ, পৃ. ৭৯

৮৬. রবীন্দ্রনাথ প্রদত্ত হিবার্ট বক্তৃতামালার অন্তর্ভুক্ত *Religion of Man*-এ বাউল-সঙ্গীতের অধ্যাত্মসাধনা পাশ্চাত্য দেশে সর্বপ্রথম প্রচারিত হয়।

সাধনায় যেমন বাউল তত্ত্বের প্রভাব আছে, তেমনি গানেও বাউলসঙ্গীতের ছাঁদটা অনেকটা রক্ষিত হইয়াছে। এখানে কবিগুরুর একটি সুপরিচিত বাউল ঢঙের গানের কয়েকছত্র উদ্ধৃত হইতেছে, যাহা হইতে তাঁহাকে সহজেই বাউলদের দোসর বলিয়া চিনিয়া লওয়া যাইবে—যদিও ভাবে ভাষায় ইহা রবীন্দ্রনাথের মানসিকতা হইতে উদ্ভূত। গ্রাম্য বাউলদের কল্পনা এতটা সূক্ষ্ম ও রোমান্টিক হইতে পারে না।

আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে।
এ জীবন পুণ্য করো দহন দানে।
আমার এই দেহখানি তুলে ধরো,
তোমার ঐ দেবালয়ের প্রদীপ করো,
নিশিদিন আলোকশিখা জ্বলুক গানে।
আগুনের পরশমণি ছোঁয়াও প্রাণে॥

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে বিংশ শতাব্দীতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত বাউলগানের যে আলোচনা ও অনুকরণ হইয়াছে, তাহার অনেকটাই কবিত্ব ও অধ্যাত্মতত্ত্বের আলোচনা। অবশ্য একথা সত্য যে, অশিক্ষিত বাউলদের কয়েকটি গান যে-কোন প্রথমশ্রেণীর গীতিকবিতার সমকক্ষ। লালনের 'আমার ঘরের চাবি পরের হাতে', 'যে জন হাওয়ার ঘরে ফাঁদ পেতেছে', 'ওগো রাইসাগরে নামল শ্যামরায়' প্রভৃতি গানের[৮৭] কবিত্ব ও অধ্যাত্মরস প্রমাণের অপেক্ষা রাখে না। ফকির পাঞ্জ শাহ্, মদন বাউল প্রভৃতি বাউল-সাধকদের নামও উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের বাউলগানে ভাষা, ছন্দ, ভাব, রূপকপ্রতীক প্রভৃতির সুকৌশল প্রয়োগ হইতে ইঁহাদিগকে আদৌ অশিক্ষিত বলিয়া মনে হয় না। হাউড়ে গোঁসাই নামক প্রসিদ্ধ বাউলসাধক সংস্কৃত সাহিত্য ও দর্শনে সুপণ্ডিত ছিলেন। পাঞ্জ শাহ্ ও অন্যান্য মুসলমান ফকির ও বাউল ইসলামি মরমীসাধনা ও হিন্দুর যোগতন্ত্রে বিশেষ অভিজ্ঞ ছিলেন। অবশ্য আমরা যে সমস্ত বাউলগানে মুগ্ধ হই তাহার অধিকাংশই ঊনবিংশ—এমন কি বিংশ শতাব্দীর রচনা। রবীন্দ্রনাথ যথার্থই বলিয়াছেন, "অধিকাংশ আধুনিক বাউলের গানের অমূল্যতা চলে গেছে, তা চলতি হাটের শস্তা দামের জিনিষ হয়ে পথে পথে বিকোচ্চে। তা' অনেক স্থলে বাঁধি বোলের

৮৭. ডঃ মতিলাল দাস ও পীযুষ মহাপাত্র সম্পাদিত 'লালন গীতিকা', পৃ. ১০০, পৃ. ১০৬, পৃ. ২৩০

পুনরাবৃত্তি এবং হাস্যকর উপমাতুলনার দ্বারা আকীর্ণ।" আধুনিক কালে কোন কোন অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত গ্রাম্য বাউল বক্তব্য বিষয়কে মনোহারী ও চটকদারী করিবার জন্য আধুনিক জীবন হইতে তুলনা-উপমা সংগ্রহ করিয়াছেন। এখানে এইরূপ আধুনিক বাউলরূপকের দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে ঃ

(১) আইন-আদালতের রূপক—

ওরে মন আমার হাকিম হতে পার এবার।
মন যদি হও হাকিম আমি হই চাপরাশি,
কনস্টেবল হয়ে হাজির হই হুজুরি,
তোমার হুকুম জোবে আইন জারি করে
আনব চোরকে ধরে করে গ্রেফতার। (হারামণি—১ম)

(২) রেলগাড়ীর রূপক—

যাচ্ছে গৌর প্রেমের রেলগাড়ী।
তোরা দেখসে আয় তাড়াতাড়ি॥
*   *   *
গার্ড হয়েছেন নিতাই আমার,
শ্রীঅদ্বৈত ইঞ্জিনীয়ার,
এবার ভবে ভাবনা কিরে আর
মুখে হরি হরি গৌর হরি
করবেন টিকিট মাস্টারি॥ (হারামণি—১ম)

(৩) হাসপাতালের রূপক—

তোরা আয় কে যাবি রে
গোরাচাঁদের হাসপাতালে নদীয়া পুরে।
আর কেন ভাই যাতনা পাই
কলিকালের ম্যালেরিয়ার জ্বরে।
*   *   *
নিতাইবাবু সিভিল সার্জন,
য়্যাসিসটাণ্ট অদ্বৈত হল রে
নেটিভ শ্রীবাস আর শ্রীনিবাস হরিদাস
আছে কম্পাউণ্ডার রে॥
নিতাই বাবুর সুযশ ভালো   জগাই মাধাই রোগী ছিল
তাদের বৈষম্যজ্বর ছেড়ে গেল একটি মিকচারে।
পথ্য বলে দিচ্ছেন বাবু সাধুবাদ দুগ্ধ সাবুরে॥ (হারামণি—১ম)

(৪) বাইসাইকেলের রূপক—

মন যদি চড়বি রে সাইকেল।
আগে দে কপ্‌নি এঁটে অকপটে সাচ্চা কর্‌ দেল॥
ফুটপিনে দিয়ে পা হপিং করে এগিয়ে যা
পিনের পরে উঠে দাঁড়া বেদবিধি হবি ছাড়া
সামনে কর নজর চড়া আগাগোড়া ঠিক রাখিস হ্যাণ্ডেল॥
সীটের পরে বসে মন ব্যালেন্স ধরবি কষে,
যাবি উর্ধ্বশ্বাসে কুম্ভক শ্বাসে
চাস না আশেপাশে, ছয় আর দশে
মূলমন্ত্রে কর প্যাডেল॥
(ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্কলন)

(৫) বৈদ্যুতিক আলোর রূপক—

মরি কি কলের বাতি দিবারাত্তি জ্বলচে এ শহরে।
লণ্ঠনের মধ্যে পোরা দেখগে তোরা
ঝড় বাতাসে নেভে না রে॥
টিপ দিলে বাত্তির কলে বাতি জ্বলে বিনা তৈলে
সে ধরম জানে যারা জ্বালায় তারা
অন্যে কি জ্বালাতে পারে॥ (ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ)

(৬) ব্যাঙ্কের রূপক—

গুরুমহাজনের চেক সাধুর ব্যাঙ্কে নাও ভাঙায়ে।
নিত্যপ্রেম-পরমার্থ-তত্ত্ব আস্বাদন মোহর করিয়ে॥ (ঐ সংগ্রহ)

আধুনিক জীবনের রূপকে বাউল কবিগণ এই যে পদ রচনা করিয়াছেন তাহাতে দেখা যাইতেছে, তাঁহারা তত্ত্বরস ব্যাখ্যায় অতি-আধুনিক জীবনকেও গ্রহণ করিয়াছেন। তবে এ সমস্ত রচনা ভক্তসাধকের কাছে কিরূপ লাগে জানি না, কিন্তু আমাদের মতো 'অব্যাপারীর' নিকট ইহা হাস্যরসের খোরাক জোগাইয়া থাকে।

যাহা হউক আধুনিক যুগে ইংরাজী-শিক্ষিত মহলেও যে বাউলগানের কদর হইয়াছে তাহার কারণ, এই সমস্তগানে সাদা প্রাণের এবং অনাবৃত হৃদয়াবেগের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কোন কোন পদে জীবনেশ্বরের সঙ্গে সাধকের নিবিড় মিলনের ইঙ্গিত রহিয়াছে, মাঝে মাঝে আশ্চর্য কবিত্বের দ্বারা অন্তর্গূঢ় মিস্টিক রস উপচিত হইয়াছে, এবং তাহার আবেদনে আধুনিক মনও সাড়া দিয়াছে।

শাক্তপদের তান্ত্রিক তাৎপর্য ছাড়িয়া দিলেও ইহার মধ্য হইতে যেমন বাৎসল্যরসের নিবিড় স্বাদ পাওয়া যায়, তেমনি বাউলপদেও আমরা বিশাল উপলব্ধির দ্বারে আসিয়া দাঁড়াই, তুচ্ছের মধ্যেও চিরজ্যোতির্ময়কে দেখিয়া বিস্মিত হই, আমাদের হারানো অর্ধ খণ্ডকে এই সমস্ত পদের গভীর তাৎপর্যের মধ্যে সন্ধান করিয়া ধন্য হই। সুতরাং বাউলগান আধ্যাত্মিক গীতিগুচ্ছ হইলেও ইহার সঙ্গে একটি নিবিড় মর্ত্য আবেগ ও সৌন্দর্যবোধ অনুস্যূত হইয়া আছে বলিয়া অশিক্ষিত বাউলগায়কদের কয়েকটি পদে শ্রেষ্ঠ গীতিকবিতারই সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। কিন্তু তাই বলিয়া বাউলগানের সাধন সংক্রান্ত বিশিষ্ট আচরণপদ্ধতিকেও ভুলিয়া থাকা যায় না। বস্তুতঃ বাউল-সাধকদের নিকট কৃত্য ভিন্ন বাউলগানের কোন সার্থকতাই নাই। অর্থাৎ বাউলের তত্ত্বকথা শুধু মস্তিষ্ক দিয়া উপলব্ধি করার জিনিষ নহে, ইহাতে একপ্রকার গুহ্যধরনের এমন সাধন-প্রকরণ আছে যাহা উক্ত সম্প্রদায় ভিন্ন অন্যত্র তাহার তাৎপর্য বুঝা যায় না। কাঙাল হরিনাথ হইতে রবীন্দ্রনাথ পর্যন্ত—অনেকেই বাউলগানের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবিত হইয়াছেন বটে, কিন্তু সে প্রভাব শুধু সাধারণভাবে শিল্প ও সৌন্দর্য-বোধের প্রভাব, এবং বিশেষভাবে অধ্যাত্মচেতনার আকর্ষণ। কিন্তু এই সম্প্রদায়ের ভিতরে প্রবেশ করিলে, আখড়ায় প্রবেশাধিকার লাভ করিতে পারিলে ইহাদের একপ্রকার বিচিত্র 'কায়াসাধনা'র কথা জানা যাইবে। অবশ্য দেহাশ্রিত সাধ্য-সাধনার আদর্শ বহু পূর্ব হইতে এদেশে প্রচলিত আছে। ইহারা সেই কায়সাধনাকে নানা রূপক-প্রতীকে আকারে ইঙ্গিতে বলিয়াছেন—যাঁহারা এই পথের পথিক, তাঁহারা ঐ আভাস-ইঙ্গিত হইতেই সাধ্যসাধনার পথ খুঁজিয়া পাইবেন—ইহাই ছিল বাউলসাধক ও গুরুদের উদ্দেশ্য। এখন সংক্ষেপে ইহাদের সাধনপ্রক্রিয়ার কথা আলোচনা করা যাক।

বাউলসাধনার মূল তত্ত্ব ॥

বাউলসাধনা 'প্রকৃতি' লইয়া সাধনা, নরনারীর যুগনদ্ধলীলাই তাহার প্রধান উপাদান। বাউল সাধক শুধু গীতিকবিতা রচনা করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, তাঁহারা শ্রেণীসম্প্রদায় নির্বিশেষে একপ্রকার প্রাকৃত দেহচর্যার কথা বলিয়াছেন—যাহা ক্রমে ক্রমে সূক্ষ্মতম মোক্ষানন্দে পৌঁছাইয়া দেয়। নরনারীর বাস্তব দেহকে রাধাকৃষ্ণের অপ্রাকৃত দেহরূপে কল্পনা করিয়া

উভয়ের অপার্থিব মিলনের মধ্য দিয়া জীবনের সারমর্ম উপলব্ধি করিতে হইবে। একদল বাউল হিন্দুর যোগতন্ত্র অনুসরণ করিয়া নিজ দেহেই রাধাকৃষ্ণ বা শিব-দুর্গার সামরস্যসম্ভূত স্বর্গীয় মিলনানন্দ ভোগ করিতে চাহে—ইহাই মোক্ষের প্রধান সোপান। আর একদল বাউল স্ত্রীপুরুষে মিলিয়া কামকে প্রেমে পরিণত করে। এই অপার্থিব প্রেম উপলব্ধির জন্য পার্থিব দেহকে আধার স্বরূপ চাই। এই দেহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ, সাঁই বা 'আলেখ নূর' (জ্যোতি) বাস করেন। জড় দেহের মধ্যে কিভাবে চিদানন্দময় অনন্তের স্বাদ পাওয়া যায় বাউলগণ তাহারই সন্ধান করিয়াছেন। ইহার জন্য এমন সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার ব্যবস্থা আছে যাহা আধুনিক ব্যক্তির নিকট বীভৎস মনে হইতে পারে।

বাউলদের এক প্রকার বিচিত্র ধরনের দেহ-দর্শন আছে। নারী দেহকেই তাঁহারা মুক্তির সোপান বলিয়া মনে করেন।[৮৮] তাঁহাদের দেহতত্ত্বের মতে, স্ত্রীধর্মের তিনটি দিনে নারীদেহে 'সহজ মানুষ', 'মনের মানুষ' বা 'অধর চাঁদে'র আবির্ভাব হয়। চতুর্থ দিনেই মনের মানুষ পলাইয়া যায়। সাধক নারীদেহ অবলম্বন করিয়া তিন দিন ধরিয়া 'ত্রিবেণী' ধারায় বসিয়া মনের মানুষরূপী মৎস্য শিকার করিবেন। সহজ অর্থে, স্ত্রীধর্মের বিশেষ দিনে স্ত্রীপুরুষে বিশেষ দৈহিক প্রক্রিয়ার দ্বারা সঙ্গত হইলে বাউল সাধনার সিদ্ধি নিকটতর হইবে। "এই তিন দিনেই বাউলের সাধনার প্রশস্ত সময়। ইহাই 'মানুষ' ধরার সময়। এই তিন দিনের শেষে পূর্ণভাবে সহজ মানুষের আবির্ভাব হয়। ইহা সাধকের অনুভূতি-সাপেক্ষ। এই সহজ মানুষের স্বরূপের অনুভূতি শৃঙ্গারে অচঞ্চল বীজোদ্ভূত আনন্দানুভূতি। এই আনন্দানুভূতিকে যোগক্রিয়ার দ্বারা ক্রমাগত উর্ধ্বমুখী করিয়া দ্বিদলপদ্ম পর্যন্ত

৮৮. পাঞ্জুশাহ্ 'মেয়ে'র গৌরব ঘোষণা করিতে গিয়া বলিয়াছেন:

ভজন সাধন করবি রে মন কোন্ রাগে।
আগে মেয়ের অনুগত হও গে॥
জগৎ জোড়া মেয়ের বেড়া রে কেবল একপতি সাঁইজী জাগে॥
মেয়ে সামান্য ধন নয়,
জগৎ করেছে আলোময়,
কোটি চন্দ্র জিনি কিরণ আছে মেয়ের পায়।
মেয়ে ছাড়া ভজন করা রে তা হবে না কোনো যোগে॥

আর এক বাউল গাহিয়াছেন—"মেয়ে ভজতে পারলে পারে যাওয়া যায়।"

(উদ্ধৃতিগুলি ডঃ ভট্টাচার্যের সঙ্কলন হইতে গৃহীত)

উঠাইলে অটলবীজরূপী ঈশ্বররূপের সঙ্গে শৃঙ্গারলীলাময় সহজমানুষ রূপের মিলনে নিরন্তর অপরিসীম শৃঙ্গারানন্দের অনুভূতি জাগে। মূলতঃ পরমতত্ত্বের স্বরূপই এই প্রকৃতিপুরুষের মিথুন-ঘটিত মহোল্লাসময় অবস্থা। এই অবস্থা লাভই বাউলের সাধনার চরম লক্ষ্য। ইহাই তাহার আত্মোপলব্ধি—সহজ অবস্থা লাভ।"[৮৯] এইরূপ সহজ অবস্থার জন্য নানাপ্রকার দৈহিক, যৌগিক, তান্ত্রিক প্রক্রিয়া আছে, যাহার খোলাখুলি বর্ণনা বর্তমান প্রসঙ্গে নিষ্প্রয়োজন।[৯০] লালন, পাঞ্জশাহ্ প্রভৃতি বাউল গুরুগণ তাঁহাদের গানে ত্রিবেণীর ঘাট, অধর মানুষ (মীন), জোয়ার, জোয়ারের জলে মীনরূপী অধর-মানুষ বা সহজমানুষের ভাসিয়া আসা, সময় থাকিতে থাকিতে তিন দিনের মধ্যেই সাধক কর্তৃক সাধিকার দেহতীর্থ হইতে সাধনামৃত লাভ—প্রভৃতি গূঢ় ব্যাপারের ইঙ্গিত দিয়াছেন। বাউলগানের কাব্যধর্ম ও অধ্যাত্মব্যঞ্জনা যেমন আধুনিক রুচির নিকট অতিশয় বিস্ময়কর মনে হয়, তেমনি ইঁহাদের অনেক গানে এমন সমস্ত দৈহিক প্রক্রিয়ার কথা আভাসে ব্যক্ত হইয়াছে যে, বর্তমান কালে ও আধুনিক সমাজে তাহার ব্যাখ্যা বিশ্লেষণে অনেকেই সঙ্কুচিত হইবেন। লালনের এই পদটিতে সেই রহস্যাচারের কিছু ইঙ্গিত আছে:

সময় গেলে বে ও মন সাধন হবে না।
দিন ধরিয়ে তিনের সাধন কেনে করলে না॥
জানো মন থালে বিলে মীন থাকে না জল শুকালে
কি হয় তারে জাঙালে[৯১] দিলে শুকনো মোহানা॥

৮৯. ডঃ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৩৭২—৭৩

৯০. এ বিষয়ে ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য দীর্ঘদিন ধরিয়া বাউলসম্প্রদায়ের মধ্য ঘুরিয়া তাহাদের নিকটসাহচর্যে আসিয়া উহাদের 'কায়াসাধনা'র মোটামুটি পরিচয় উদ্ধার করিয়াছেন। স্ত্রীলোকের 'নীর' (অর্থাৎ রজ:) এবং পুরুষের 'ক্ষীর' (অর্থাৎ শুক্র)—এই নীবে ক্ষীরের মিলিত সত্তার নাম সহজ সত্তা। নীরে কামের অধিকার, ক্ষীরে প্রেমের অধিকার। সাধককে প্রক্রিয়া-বিশেষের সাহায্যে 'নীর' হইতে 'ক্ষীর' বাহির করিয়া লইতে হইবে, অর্থাৎ স্ত্রীপুরুষের দৈহিক আসক্তিকে প্রেমের দ্বারা জয় করিতে হইবে। এই সাধনায় 'চারিচন্দ্র ভেদের' প্রথা, পানপ্রথা' প্রভৃতি কোন কোন সম্প্রদায়ে গোপনে অনুষ্ঠিত হয়। ইহার বর্ণনা আধুনিক সমাজে নিতান্ত ঘৃণাব্যঞ্জক অঘোর পন্থা বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাতে বিবমিষা বোধ করিবেন। এই প্রসঙ্গে একটি প্রসঙ্গের অবতারণা করা যাইতেছে। কয়েকবৎসর পূর্বে আমাকে কয়েকদিনের জন্য কুষ্টিয়ায় লালন শাহের মাজারে অনুষ্ঠিত বাউল সম্মেলনে যোগ দিতে হইয়াছিল। সেখানে প্রবীণ বাউলগণ আমাকে বলেন যে, পণ্ডিত-গবেষকেরা তাঁহাদের গ্রন্থে বাউল সাধাসাধনা সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন, তাহার সহিত তাঁহাদের সাধনার কোন যোগাযোগ নাই। এই সমস্ত গ্রন্থের অধিকাংশই লেখকদের স্বকপোলকল্পিত ব্যাপার।

৯১ ইহা বোধ হয় 'বাঁধাল' (অর্থাৎ বাঁধ) হইবে।

ফকির পাঞ্জ শাহ্‌ও ত্রিবেণীর ঘাটে বসিয়া সহজ মানুষ ধরিতে নির্দেশ দিয়াছেন :

ত্রিবেণীর তীরধারে সুধারে জোয়ার আসে।
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে।
উথলে সুধাসিন্ধু সুধারে সুধার বিন্দু
সুখময় সিন্ধু জলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥[৯২]

এই যে নরনারীর শারীর মিলনের মধ্যে দিয়া 'অধর মানুষ'কে ধরা, ইহা তথাকথিত কায়াবাদী হিন্দু তন্ত্র, বৌদ্ধতন্ত্র, নাথধর্ম—এমন কি সুফীমতেও স্বীকৃতিলাভ করিয়াছে। অবশ্য সাধনার উচ্চ স্তরে উঠিয়া সাধক আর 'প্রকৃতি'র সাহায্য গ্রহণের প্রয়োজন বোধ করেন না,[৯৩] নিজ দেহেই 'আজ্ঞাচক্র' পর্যন্ত অনুভূতিকে উঠাইয়া সেখানে শিব-শক্তির[৯৪] মিলনজনিত পরমানন্দ উপলব্ধি করেন—ইহাই 'মনের মানুষ' ধরা।

এই সমস্ত বাউলসম্প্রদায়ের মধ্যে হিন্দু, মুসলমান, শৈব, শাক্ত প্রভৃতি মতাবলম্বীরা আছেন—কিন্তু মূল তত্ত্বে সকলেই এক। মেছের শা ফকির ইসলামি তত্ত্ব ও পারিভাষিক শব্দের সাহায্যে বাউলসাধনার ইঙ্গিত দিয়াছেন :

জপ রে তার নামের মালা হয় না যেন ভুল
গাঁথ না নাম আপন গলায়।
দূরে যাবে দুঃখ জ্বালা অন্ধকারে হব উজালা
এই দুনিয়ার মূল।

৯২. অন্য কোন নির্দেশ না থাকিলে উদ্ধৃত বাউল গানগুলি ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ হইতে গৃহীত বুঝিতে হইবে।

৯৩ ডঃ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৮৪—৮৫

৯৪ বাউলগণ শাক্ত প্রতীকশব্দও ব্যবহার করিয়াছেন :

ভজরে ভজরে ও মন শক্তিমূলাধারে।
শক্তি বিনা মুক্তিপদ এ ভবে কেউ দিতে পারে॥

(ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থ, পৃ ৩৪১)

বাউলপন্থী কর্তাভজা সম্প্রদায়ও শক্তিপূজার প্রতীক স্বীকার করিয়াছেন :

অলসে মাকে পূজিল না কেনে।
সে যে আদ্যাশক্তি, পূজ শক্তি দশ ভুজা
যথাশক্তি আয়োজনে॥ (ঐ, পৃ. ৩৫৯)

তুমি লা এলাহা ইল্লাল্লা বল[২৫]
এই আঁধার কাটে চক্ষু মেল,
অই ভবের হাট ভুলো নারে মহম্মদ রছুল।
গুহ্-অল এছাবং[২৬] নফুয়ল নবি[২৭],
ও তোমার ফানাফাল্লা[২৮] যখন হবি
মেছের শা কয় তবে হবি আল্লার মকবুল।[২৯]

মুসলমান বাউল আবার বৈষ্ণব পন্থাকেও সাধনপন্থা রূপে গ্রহণ করিয়া লিখিয়াছেন :

ওগো রাইস গংে নামলো শ্যামরায়।
তোরা ধর্ গো হবি ভেসে যায়। (লালন)

কেহ-বা হরপার্বতী ও রাধাকৃষ্ণকে ত্রিবেণী তীর্থে অবতারণা করিয়াছেন :

ত্রিদলে ত্রিবেণী-মহাতীর্থধামে
শশাঙ্কশেখর গৌরী লয়ে বামে
নিরখি নয়নে সেই রাধাশ্যামে
আনন্দ সলিলে ভাসে অনুগণ। (ডঃ ভট্টাচার্যের সংগ্রহ)

যাহা হউক বাউলপদের মধ্যে কোন কোন স্থলে তত্ত্বের অতিরিক্ত একটি চমৎকার কাব্যসৌন্দর্য আছে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। উহার অন্তর্নিহিত দেহমানসিক গূঢ় সাধনক্রম ছাড়িয়া দিলেও গভীর হৃদয়ানুভূতি, অনন্ত ভগবানের সঙ্গে ভক্তের মিলনলীলা প্রভৃতি উচ্চতর চিত্তমর্ম রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি আধুনিক মনীষীদের প্রভাবিত করিয়াছে। রবীন্দ্রনাথের অধ্যাত্ম-সাধনা, কাব্যরূপ, হৃদয়াবেগ, রূপনির্মিতি, সঙ্গীতপ্রতিভা অনেক সময় বাংলার বাউলদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াছে তাহা তিনি নিজেই স্বীকার করিয়াছেন। বাউলদের সূক্ষ্ম অধ্যাত্ম সাধনাও কবিগুরুকে নূতন ভাবলোকে লইয়া গিয়াছে, বাউলসঙ্গীতের সাদা সুরও রবীন্দ্রনাথের বহু গানে অনুসৃত

২৫. আল্লাহ্ ব্যতীত অন্য উপাস্য নাই।

২৬. আল্লাহের দ্বারা নিজ অস্তিত্ব প্রমাণ করা এবং সর্বত্র সেই অনাদি শক্তির অসীম সত্তা উপলব্ধি করা।

২৭. হজরত মুহম্মদের ধ্যান করিতে করিতে আত্মবিস্মৃত হইয়া সমগ্র জগতে শুধু তাঁহারই বিকাশ উপলব্ধি করা।

২৮. ক্ষুদ্র অহংকে ত্যাগ করিয়া 'আনাল হক' বা আমিই ব্রহ্ম—এইরূপ উপলব্ধি।

২৯. প্রিয় ব্যক্তি (হারামণি, ১ম, পৃ. ৭৮—৮০ দ্রষ্টব্য)

হইয়াছে। তাই বর্তমান শতাব্দীতে বাউলদের অধ্যাত্ম দর্শনের প্রতি শিক্ষিত সম্প্রদায়ের যে শ্রদ্ধামিশ্রিত কৌতূহল ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা রবীন্দ্রনাথের দান। অশিক্ষিত বাউলরাও অনেক সময় 'রবিঠাকুর বাবুমশায়'-কে নিজেদের ভাবাদর্শের আত্মীয় বলিয়াই মনে করেন।[১০০] বাউল সাধনার গুহ্য চর্যা সম্প্রদায়ের বাহিরে যাইতে দেওয়া হয় না। প্রকৃতি লইয়া সাধনভজন বলিয়া বাউল-আচার্যেরা এই সাধন প্রণালী গোপনে রাখাই কর্তব্য মনে করেন। শিক্ষিত সম্প্রদায়ের মধ্যে বাউলগানের কাব্যত্ব ও উচ্চ ধর্মভাব শ্রদ্ধা জোগাইলেও ইহাদের চারচন্দ্র সাধন, বিন্দু পান, ত্রিবেণীতে মৎস্য শিকার, উল্টাসাধন, রসের ভিয়ান বা রসের পাক, নীরক্ষীর তত্ত্ব, অমৃতরস, বাণক্রিয়া, 'জেন্তে মরা' প্রভৃতি গূঢ় আচরণের তাৎপর্য জানিলে আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইহাকে উদ্দাম রিপুর অবাধ চর্চা বলিয়া নাসিকা কুঞ্চিত করিতে পারেন।[১০১] এমন কি 'ভারতবর্ষীয় উপাসক সম্প্রদায়ে'র মনীষী-লেখক অক্ষয়কুমার দত্ত লোকযান সম্বন্ধে অনেক মূল্যবান তথ্য সংগ্রহ করিলেও বাউলদের সাধনভজন সম্বন্ধে অজ্ঞতার পরিচয় দিয়া ফেলিয়াছেন। তাঁহার মতে, "এই সম্প্রদায়ের মধ্যে নরমাংসভোজন (মৃতদেহ) এবং শবের বস্ত্র সংগ্রহ করিয়া পরিধান করা প্রচলিত আছে।" তিনি বোধ হয় বীভৎস-আচারী অঘোরপন্থী ও বাউলদিগকে গুলাইয়া ফেলিয়াছেন। এ-বিষয়ে বাউল-গবেষক ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মহাশয়ের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ তথ্য প্রামাণিক বলিয়া গ্রহণ করা যাইতে পারে, "আমাদের কল্পনায় বাউলনামে এক অদ্ভুত জীব বাস করে এবং এই কল্পনার উপর নির্ভর করিয়াই এতদিন আমাদের বর্ণনায় বেশ খানিকটা রঙ চড়ানো হইয়াছে। বর্তমানে সারা

১০০. ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের 'বাংলার বাউল ও বাউলগান', ২য় খণ্ড, পৃ. ১

১০১. অবশ্য বাউল সাধনা অনধিকারীর হাতে পড়িয়া যে, কোন কোন ক্ষেত্রে কুৎসিত ব্যভিচারে পরিণত হয় নাই তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। 'প্রকৃতি' লইয়া দৈহিক সাধনায় পদস্খলনের সম্ভাবনা তো পদে পদে আছেই। রবীন্দ্রনাথ শিলাইদহে বহু বাউলের সাহচর্যে আসিয়াছিলেন, তিনিও এই সম্প্রদায়ের মধ্যে কোন কোন ক্ষেত্রে অনাচার লক্ষ্য করিয়াছিলেন। এ বিষয়ে তিনি খোলাখুলিভাবেই বলিয়াছেন, "একদা পাড়াগাঁয়ে যখন বাস করতুম তখন সাধুসাধকের বেশধারী কেউ কেউ আমার কাছে আসত, তারা সাধনার নামে উচ্ছৃঙ্খল ইন্দ্রিয়চর্চার সংবাদ আমাকে জানিয়েছে। তাতে ধর্মের প্রশ্রয় ছিল। এই প্রশ্রয় সুরঙ্গপথে শহর পর্যন্ত গোপনে শিষ্যে প্রশিষ্যে শাখায়িত।" (শিক্ষা—শিক্ষার বিকিরণ)

বাংলায় যাহা দেখিতেছি, তাহাদের মধ্যে অদ্ভুতত্ব বা বীভৎসতা কিছুই নাই। অতি নিরীহ, শান্ত, সংযত, সর্বদা আত্মগোপনশালী, সাংসারিক ভোগবিলাসে-উদাসীন, ভাবের ঘোরে আত্মসমাহিত ও অন্যমনস্ক এক সম্প্রদায়,—প্রবল দারিদ্র্য ও নানা সামাজিক নির্যাতন সহ্য করিয়াও নীরবে এবং স্থির বিশ্বাসে আপন ধর্ম সাধন করিতেছে।"[১০২] অতঃপর দুই-একজন বাউল গায়কের পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

কয়েকজন বাউলের পরিচয়॥

এই গ্রন্থে বাউল পদকর্তা সম্বন্ধে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করিবার অবকাশ নাই, প্রয়োজনও নাই। কারণ যে সমস্ত বাউলের পদাবলী সংগৃহীত হইয়া মুদ্রিত হইয়াছে, শিক্ষিত সম্প্রদায় যে সমস্ত পদে মুগ্ধ, সেগুলির অধিকাংশই আধুনিক কালের রচনা। ঊনবিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে বাউল গান সংগ্রহের চেষ্টা আরম্ভ হয়। যাঁহাদের পদ আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইয়াছে, তাঁহাদের প্রায় সকলেই ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে এবং বিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্তমান ছিলেন। গুরুপরম্পরাক্রমে তাঁহারা সাধনভজন করিয়া আসিলেও তাঁহাদের পদের ভাষা ও প্রতীকে আধুনিক কালের স্পর্শ লাগিয়াছে—তাহা আমরা পূর্বে দেখাইয়াছি। সুতরাং আধুনিক কালে সংগৃহীত বাউলগান আধুনিক কালের সামগ্রী ও আধুনিক যুগের সাধকের রচনা। তবে সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দী হইতে বৈষ্ণব সহজিয়াদের সাধন-ভজনের মধ্যে প্রচ্ছন্নভাবে বাউল সাধনা বর্তমান ছিল, কিছু কিছু বাউল-সম্প্রদায়ও গড়িয়া উঠিয়াছিল, তাহাদের সঙ্গে বে-শরা-পন্থী মুসলমান ফকিরও যোগ দিয়াছিলেন। রবীন্দ্রনাথের পূর্বে বাউলগানকে সাংস্কৃতিক মর্যাদা দিয়া সংগ্রহের চেষ্টা দেখা যায় না।[১০৩] গত তিন-চার

১০২. ডঃ ভট্টাচার্যের উক্ত গ্রন্থ, পৃ. ৫৯

১০৩ রবীন্দ্রনাথের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া অধ্যাপক মুহম্মদ মনসুরউদ্দিন, ক্ষিতিমোহন সেনশাস্ত্রী প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যামোদিগণ কিছু কিছু বাউলগান সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ আরম্ভ করেন। গবেষকের দৃষ্টি লইয়া এবং ইহার প্রতি শ্রদ্ধা রাখিয়া ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য অনেক আখড়া অঞ্চলে ঘুরিয়া নানা ধরনের বাউলগান সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে' প্রকাশ করিয়াছেন। সম্প্রতি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ডঃ মতিলাল দাস এবং ডঃ পীযুষকান্তি মহাপাত্রের সম্পাদনায় 'লালনগীতিকা' প্রকাশিত হইয়াছে। এই সম্পর্কে প্রতিবেশী রাষ্ট্র বাংলাদেশে অনেক গবেষণা হইতেছে।

দশক ধরিয়া গবেষকগণ এই সাধনা ও সাহিত্য লইয়া নানা সন্ধান-অনুসন্ধান করিতেছেন, বাংলার বিভিন্ন বাউল আখড়ার সঙ্গে যোগাযোগ করিয়াছেন —বাউল সাধকেরাও আর ততটা মন্ত্রগুপ্তির পক্ষপাতী নহেন। কেঁদুলী, প্রেমতলী, রাজশাহী, রঙপুরের বাউলকেন্দ্র, শ্রীহট্ট, ঢাকাজেলার নরসিংদি, নারায়ণগঞ্জ, মুন্সীগঞ্জ, নবদ্বীপের বনচারীর বাগান (বাউল চণ্ডীদাস গোঁসাইয়ের আশ্রম), বর্ধমান জেলার বেতালবন (নিতাই বাউলের আশ্রম) প্রভৃতি বাউল কেন্দ্রগুলিতে কোন কোন উৎসাহী গবেষক যাতায়াত শুরু করিয়া দিয়াছেন, কেঁদুলিতে জয়দেব মেলায় সমাগত বাউল সম্মেলনে আজকাল শিক্ষিত সমাজের অনেকেই যোগ দিয়া থাকেন, দৈনিক পত্রিকার বিশেষ সংবাদদাতারাও এই সমস্ত অনুষ্ঠানের বিবরণ প্রকাশ করিতেছেন। আজকাল আবার কলিকাতার নাগরিক সমাজে, তথাকথিত সাংস্কৃতিক সম্মেলনে, লোকসাহিত্যের আসরে পল্লীঅঞ্চলের বাউলদের আনাইয়া তাঁহাদের নৃত্যগীতের আয়োজন করা হইতেছে। বাউল বলিয়া পরিচিত কোন কোন ব্যক্তি বাউল ঢঙের গানে আধুনিক শ্রোতার রুচির উপযোগী সুরবিন্যাস করিয়া নাগরিক জীবনে গ্রামীণ রসের স্বাদ বিতরণ করিতেছেন। কিন্তু পল্লীর আবহাওয়া হইতে ছিঁড়িয়া আনিয়া বাউলেব 'আলেকলতাকে' ড্রয়িংরুমের ফুলের টবে বাঁচাইয়া রাখা যায় কিনা সন্দেহ। লালন ফকির গাহিয়াছেন :

হীরেলাল মতির দোকানে গেলে না।
সদাই কিনলি রে সব পিত্তল দানা॥

বর্তমান কালধর্মে গিল্টিকরা পিতলদানাই 'হারামণি'র দামে বিকাইতেছে। উপরন্তু নাগরিক সমাজে বাউল গানের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধির ফলে ইহার সঙ্গে অর্থাদির প্রলোভনও জড়াইয়া গিয়াছে—ফলে এই গোপনচারী সাধকসম্প্রদায়ের আত্মগুপ্তি বেশীদিন বজায় থাকিবে বলিয়া মনে হয় না।

বাউলসাধকদের কোন ইতিহাস বা জীবনকথার প্রামাণিক সংগ্রহ নাই, কোন তথ্যসম্মত আলোচনাও হয় নাই। পত্র-পত্রিকায় মাঝে মাঝে যে দু-একটি আলোচনা প্রকাশিত হয় তাহার মধ্যে অনেক অযথার্থ কথা থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দী দ্বিতীয়ার্ধের পূর্ববর্তী কোন বাউলের জীবনকথা জানিবার

উপায় নাই। লালন শাহ, পাঞ্জ্ শাহ্, মদন বাউল প্রভৃতি বিখ্যাত বাউল-সাধক ও বাউল গীতিকারেরা উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে বর্তানম ছিলেন। এখানে এইরূপ দুই একজন বিখ্যাত বাউলের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া যাইতেছে।

লালন শাহ্ ফকির—প্রথমে শ্রেষ্ঠ বাউল সাধক ও গীতিকার লালন শাহ্ বা লালন ফকিরের জীবনকাহিনী আলোচনা করা যাক। রবীন্দ্রনাথ লালন ফকিরের বাউল গান অত্যন্ত ভালবাসিতেন, তাঁহার জন্যই লালনের গান সম্বন্ধে আধুনিক কালের শিক্ষিত সমাজ কৌতূহলী হইয়া উঠেন। ১৩২২ সালের 'প্রবাসী'-তে (আশ্বিন-মাঘ) কবিগুরু 'হারামণি' শীর্ষক সংগ্রহে লালনের কুড়িটি গান প্রাকাশ করেন, তাহাব পর হইতেই শিক্ষিত সমাজ বাউল গানের প্রতি কৌতূহলী হইয়া উঠেন। খুব সম্ভব রবীন্দ্রনাথ লালনকে চোখে দেখেন নাই, কারণ জমিদারী কর্মোপলক্ষে তাঁহার শিলাইদহে যাইবার পূর্বেই লালনের তিরোধান হয়।

লালন ফকির সম্বন্ধে নানারূপ জনশ্রুতি আছে—কারণ কুষ্ঠিয়া ও তাহার চতুষ্পার্শ্বে তাঁহার বহু হিন্দু-মুসলমান শিষ্য আছে। এখনও অম্বুবাচিতে লালনের আশ্রম সেঁউড়িয়া গ্রামের আখড়ায় তাঁহার উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। তাঁহার মৃত্যুর সংবাদ ও অন্যান্য তথ্য কুষ্ঠিয়া হইতে প্রকাশিত পাক্ষিকপত্র 'হিতকবী'তে (১২৯৭) প্রকাশিত হয়। ইহাতে দেখা যাইতেছে ১৮৯১ খ্রীঃ অব্দে লালন দেহরক্ষা করেন। 'হিতকরী'র মতে এবং স্থানীয় প্রবাদানুসারে লালনের মৃত্যুর সময় ১১৬ বৎসর বয়স হইয়াছিল। এত বৃদ্ধ বয়সেও তিনি একটি ছোট ঘোড়ায় চড়িয়া নানা গ্রামে গিয়া নিজ ধর্ম প্রচার করিতেন। অনুমান তাঁহার জন্ম হইয়াছিল ১৭৭৫ খ্রীঃ অব্দে। তিনি কুষ্ঠিয়ার কুমারখালী থানার অন্তর্ভুক্ত গোরাই নদীর তীরে ভাঁড়রা গ্রামে কায়স্থ করবংশে জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যেই তাঁহার মনে ধর্মভাব উদিত হইয়াছিল। কেহ কেহ মনে করেন, তিনি নিরক্ষর ছিলেন, ভাবের আবেশে গান বলিয়া যাইতেন বা গাহিতেন—ভক্তেরা সঙ্গে সঙ্গে লিখিয়া লইতেন। কিন্তু তাঁহার পদে হিন্দু ও ইসলাম ধর্মসংক্রান্ত যে সমস্ত ইঙ্গিত ও উল্লেখ আছে, তাহাতে তাঁহাকে একজন মনীষী পণ্ডিত ব্যক্তি বলিয়াই বোধ হয়। যাহা হউক প্রথম জীবনে বিবাহের পর কবি সঙ্গীসাথীদের সঙ্গে পায়ে হাঁটিয়া পুরীধামে যাত্রা করেন,

কিন্তু পথিমধ্যে বসন্তরোগাক্রান্ত হইলে সঙ্গীরা তাঁহাকে সেই অবস্থায় ফেলিয়া গন্তব্য পথে চলিয়া যায়। এক নিঃসন্তান মুসলমান দম্পতী তাঁহাকে ঘরে লইয়া গিয়া বহু সেবাযত্ন ও চিকিৎসার পর তাঁহাকে আরাম করিয়া তোলেন। ঐ মুসলমান ব্যক্তিটির নাম সিরাজ, তিনিও সাধক ফকির ছিলেন। নিদারুণ মারীগুটিকার আক্রমণে লালনের একটি চক্ষু বরাবরের জন্য নষ্ট হইয়া গিয়াছিল। পরে সুস্থ হইয়া গ্রামে ফিরিয়া তিনি নিজের আত্মীয়স্বজনের নিকট মুসলমান দম্পতী কর্তৃক প্রাণরক্ষার কথা বলেন। এই সংবাদে তাঁহার মাতাপিতা তাঁহাকে ঘরে ঠাঁই দিতে চাহিলেন না, এমন কি তাঁহার স্ত্রীও যবনসংস্পর্শদোষের জন্য স্বামীর সঙ্গে যাইতে অসম্মত হইলেন। ইহার পর লালন নিজ সমাজ ও আত্মীয়দিগকে পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার জীবনদাতা ও প্রতিপালক সিরাজ ফকিরের কাছেই ফিরিয়া যান এবং তাঁহার নিকট ফকিরী ধর্ম বা বাউল-সাধনা গ্রহণ করেন। প্রায় পদেই কবি শ্রদ্ধার সঙ্গে এই সিরাজকে 'সিরাজ সাঁই' বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কাহারো মতে সিরাজ ফকির নাকি পাল্কী বেহারা ছিলেন, অবসর সময়ে সাধনভজন করিতেন। যাহা হউক ইঁহার নিকট লালন দীক্ষা লাভ করেন এবং লালন শাহ্ বা লালন ফকির নামে পরিচিত হন। লালন নাম তাঁহার প্রকৃত লৌকিক নাম, অথবা বাউল ফকিরী দীক্ষা লাভের পর তিনি এই নামে পরিচিত হন, তাহা জানা যাইতেছে না। অতঃপর বাউল আদর্শ প্রচারার্থে তিনি বহু স্থলে পরিভ্রমণ করিতে থাকেন। তিনি আত্মীয়স্বজনের দ্বারা পরিত্যক্ত হইলেও গ্রামের মায়া কাটাইতে পারেন নাই। ১২৩০ সালের দিকে লালন গোরাই নদীর তীরে নিজ গ্রামের নিকট মুসলমান মোমিন সম্প্রদায়ের (জোলা) দ্বারা অধ্যুষিত সেঁউড়িয়া গ্রামে আশ্রম নির্মাণ করিয়া সাধন ভজন করিতে থাকেন এবং এইখানেই কোন এক মোমিন-কন্যাকে বিবাহ করিয়া গৃহী-জীবন আরম্ভ করেন। এই মোমিন শ্রেণীর মুসলমানেরা তাঁহার প্রতি আকৃষ্ট হইয়া তাঁহার অনুরাগী হইয়া পড়েন, কিন্তু শরিয়তপন্থী রক্ষণশীল মুসলমানদের ভয়ে প্রকাশ্যে তাঁহার প্রতি আনুগত্য দেখাইতে তাঁহারা সাহস করিতেন না। এই সময়ে বাউলপন্থী মুসলমান ফকিরগণ 'নেড়া ফকির' নামে অভিহিত হইতেন। এইরূপ বহু 'নেড়া ফকির' ও গৃহীভক্ত শিষ্য হইয়াছিলেন—তাঁহার অনেক হিন্দু শিষ্যও ছিল। তিনি শরিয়তী বিধানে

ইসলাম ধর্মে দীক্ষা লইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। কারণ মুসলমান ফকির ও বাউলেরা হিন্দু মুসলমান কোন ধর্মেরই অনুষ্ঠান মানিতেন না—যদিও সাধন-ভজনে অনেক সুফী শব্দ ও কোরানশরিফের নির্দেশ ব্যবহার করিতেন। লালন বাহ্যতঃ মুসলমান ফকিরবৎ আচরণ করিলেও খুব সম্ভব আনুষ্ঠানিকভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেন নাই, করিলে হিন্দুসমাজে তিনি এতটা শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারিতেন না। তাঁহার গান শুনিয়াই হরিনাথ মজুমদার (কাঙাল হরিনাথ বা ফিকিরচাঁদ বাউল), জলধর সেন, অক্ষয়কুমার মৈত্রেয় প্রভৃতি দেশবরেণ্য ব্যক্তিগণ বাউলগানের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁহার ঢঙে গান রচনায় মনোনিবেশ করেন।[১০৪] যাহা হউক এই উচ্চমার্গের সাধক ও প্রথম শ্রেণীর গীতিকবি ধর্মমতেও অসাধারণ ঔদার্যের পরিচয় দিয়াছেন। তিনি যেমন সুফী সাধনার শব্দ ও কোরানের তত্ত্বকথা বাউলপদে ব্যবহার করিয়াছেন, তেমনি বহু পদে বৈষ্ণব ধর্মের আদর্শ, রাধাকৃষ্ণের যুগল রূপ ও চৈতন্যদেবের বন্দনা করিয়া অধ্যাত্মমার্গের পদ রচনা করিয়াছিলেন। তবে সাধারণ হিন্দুসমাজে এবং শরিয়তী মুসলমানদের নিকট এই সমস্ত বে-শরা ফকিরীপন্থী নিন্দিত হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যেরা 'প্রকৃতি' লইয়া সাধন ভজন করিতেন বলিয়া শিক্ষিত সমাজের কেহ কেহ এই সব ব্যাপারকে সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না। লালনের তিরোধানের পর 'হিতকরী' পত্রে তাঁহার সম্বন্ধে যে সংবাদ বাহির হয়, তাহাতে প্রকাশ্যেই বলা হইয়াছিল যে, তাঁহার শিষ্যেরা সাধনার নামে স্ত্রীলোক লইয়া ব্যভিচার করে। শরিয়তপন্থী রক্ষণশীল মুসলমান, যাঁহারা বিশুদ্ধ আরবি 'তমদ্দুনে' বিশ্বাসী ছিলেন, তাঁহারা এই ধরনের 'বেদাতী' ফকিরী সাধনাকে বরদাস্ত করিতে পারিতেন না—এখনও করেন না। তাঁহারাই অধিকাংশ সময়ে তাঁহার এবং তাঁহার শিষ্যদের বিরুদ্ধে এই সব অলীক কথা রটাইতেন। যাহা হউক দীর্ঘজীবী লালন শাহ, বাংলার নানা জেলায় বহু শিষ্যের ভক্তি ও আনুগত্য লাভ করিয়াছিলেন। স্থানীয় শিক্ষিত অশিক্ষিত সকলেই তাঁহাকে আধ্যাত্মিক ক্ষমতাসম্পন্ন দিব্যপুরুষ বলিয়া মনে করিতেন। তাঁহার স্বহস্তলিখিত কোন গানের খাতা বা পুঁথি পাওয়া যায় না। আশ্রমের শিষ্যগণ গুরুর মুখনিঃসৃত যে সমস্ত গান খাতায় টুকিয়া রাখিতেন, তাহার কিছু কিছু রবীন্দ্রনাথ

১০৪. জলধর সেন প্রণীত 'কাঙাল হরিনাথ' দ্রষ্টব্য।

তাঁহার এক কর্মচারীর দ্বারা নকল করাইয়া লন। সেই নকল এখনও বিশ্বভারতীর রবীন্দ্রসদনে সংরক্ষিত আছে। সম্প্রতি সেগুলি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত 'লালনগীতিকা'য় স্থান পাইয়াছে। কুষ্টিয়ার মুন্সেফ ডঃ মতিলাল দাস মহাশয় লালনের আশ্রমের পুরাতন খাতা • দেখিয়া ৩৭১টি গান নকল করাইয়া লিলন। রবীন্দ্রসদনে রক্ষিত নকলের সহিত এই সমস্ত পদের সাদৃশ্য আছে, কয়েকটি নূতন পদও আছে। মতিলাল ও রবীন্দ্রসংগ্রহে আরও ৮৯টি নূতন গান পাওয়া যায়। অর্থাৎ এ পর্যন্ত সাড়ে চারি শতেরও অধিক পদ মুদ্রিত হইয়াছে। ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যও ফকিরদের নিকট লালনের আরও কিছু নূতন গাম সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'বাংলার বাউল ও বাউল গানে'র অন্তর্ভুক্ত করিয়াছেন।

লালনের পদে কখনও ইসলামি স্ফী পারিভাষিক শব্দের দ্বারা, কখনও-বা হিন্দুর যোগতন্ত্রাদি হইতে সাধনপ্রক্রিয়ার ধারা অনুসৃত হইয়াছে, কোথাও-বা চৈতন্যদেবেরও সশ্রদ্ধ উল্লেখ আছে। কবি আবার ভাগবতোক্ত কৃষ্ণলীলার আদর্শে কয়েকটি চমৎকার পদ লিখিয়াছিলেন। যথা:

কোথা কানাই গেলি রে প্রাণের ভাই।
একবার এসে দেখা দে রে প্রাণ জুড়াই॥
শোকে তোর পিতা নন্দ
কেঁদে কেঁদে হল অন্ধ
আবও সবে নিরানন্দ ধেনু গাই।

এখানে বৈষ্ণবপদাবলীর সখ্যরসেব চমৎকার চিত্র পাওয়া যাইতেছে। ইসলামি রীতির গানে কবি কিন্তু পুরাপুরি ইসলামি পরিভাষা ব্যবহার করিয়াছেন:

নবীর অঙ্গে জগৎ পয়দা হয়।
সেই যে আকার কি হল তার কে করে নির্ণয়॥
আবদুল্লার ঘরে বলো
সেই নবীর জন্ম হলো
মূল দেহ তার কোথায় রইল শুধাবো কোথায়॥
কিরূপে নবী জান সে
যুক্ত হয় রাগের বীজে
আব-হায়াত যার নাম লিখেছে হাওয়া নাই সেথায়॥

গৌরাঙ্গবিষয়ক গানেও তিনি নদীয়ানাগরীভাবের (লোচন দাসের ধামালির

আদর্শে) ধারা অনুসরণ করিয়াছিলেন। তন্মধ্যে দুই একটি গান যেন শ্রীখণ্ডগোষ্ঠীর রচনা বলিয়া মনে হয়। যথা—

ও গৌরের প্রেম রাখিতে সামান্যে কি পারবি তোরা।
কুলশীল ত্যাগ করিয়ে হতে হবে জ্যান্তে মরা॥
থেকে থেকে গোরার হৃদয়
কত ভাব হয় গো উদয়
ভাব জেনে ভাব দিতে সদায়
জানবি কঠিন কেমন ধারা॥

দুই একটি পদের ভাবভঙ্গী লোচন দাস ও নরহরি সরকার ঠাকুরের ,পদের কথা মনে করাইয়া দেয়। যথা—

গোল করো না ও নাগর, গোল করো না গো।
দেখি দেখি ঠাউরে দেখি কেমন গোরাচাঁদ॥
সাধু কি ও যাদুকর
এসেছে এই নদে পুরী
খাটবে না হেথা জারিজুরি তাই কি ভেবেছ॥

কবি ও সাধক লালন সূক্ষ্ম ইঙ্গিত, রহস্যময় প্রতীক প্রভৃতির সাহায্যে যেমন বাউল সাধনার গূঢ় রহস্যের আভাস দিয়াছেন, তেমনি সাধনরসকে কাব্য-রসেও পরিবর্তিত করিয়াছেন। কবি যখন গাহেন :

বল কি সন্ধানে যাই সেখানে মনের মানুষ যেখানে।
(ওরে) আঁধার ঘরে জ্বলছে বাতি দিবারাতি নাই সেখানে॥
কত ধনীর ভরা যাচ্ছে মারা পড়ে নদীর তোড় তুফানে।
ভবে রসিক যারা পার হয় তারা তারাই নদীর ধারা চিনে।

আবার যখন বলেন :

চেয়ে দেখ্ না রে মন দিব্য নজরে।
চারি চাঁদ দিচ্ছে ঝলক মণিকোঠার ঘরে॥
হলে সে চাঁদের সাধন
অধর চাঁদ হয় দরশন
আবার চাঁদেতে চাঁদের আসন রেখেছে ঘিরে॥

তখন তাহার অন্তরালে বাউল সাধনার প্রক্রিয়ার ইঙ্গিত থাকিলেও ইহার কাব্যরসও অতি উপাদেয় হইয়া ওঠে। যাহা হউক লালন ফকিরের বহু গানে যেমন বিশুদ্ধ কাব্যরস রক্ষিত হইয়াছে, তেমনি আবার তাহার পশ্চাতে

বাউল সাধনাও স্থকৌশলে মিশিয়া গিয়াছে। এই দুইটি বৈশিষ্ট্য লালনের অধিকাংশ গানে মিলিয়াছে বলিয়া তাঁহাকে এক বিচিত্র প্রতিভাধর সাধক ও কবি বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে।

শাহ্ বাউল—লালনের মৃত্যুর পর পাঞ্জ শাহ্ বাউল অধ্যাত্ম-মার্গে বিশেষ প্রসিদ্ধি অর্জন করিয়াছিলেন। তাঁহার দ্বারা লালনের শূন্যস্থান অনেকটা পূরণ হইয়াছিল। সারা বাংলাদেশেই তাঁহার অসংখ্য শিষ্য (হিন্দু-মুসলমান) ছিল। তাঁহার গানগুলিও ভক্তি, অধ্যাত্মচেতনা, বাউলের গূঢ় সঙ্কেত ও কবিত্বরসে লালনের অপেক্ষা কোন দিক দিয়াই ন্যূন নহে। তাঁহার পুত্র রফিউদ্দিন খোন্দকার শিক্ষিত ব্যক্তি; তিনি পিতার জীবনী, গান প্রভৃতি সযত্নে রক্ষা করিয়াছেন। তাঁহার বিবরণী হইতে জানা যায়, ১২৫৮ সনের শ্রাবণ মাসে (১৮৫১) ফকির পাঞ্জ শাহ্ যশোহর জেলার শৈল-কুপা গ্রামে প্রসিদ্ধ মুসলমান বংশে জন্মগ্রহণ করেন। ইঁহার পিতার নাম খাদেম আলি খোন্দকার। বিরোধী ব্যক্তিদের দ্বারা উৎপীড়িত হইয়া খাদেম আলি যশোহর জেলার আর একখানি গ্রাম হরিশপুরে উঠিয়া আসেন এবং এখানে সম্ভ্রান্ত মুসলমান পরিবারের সাহায্যে বসবাস করিতে থাকেন। তিনি অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে ইসলামি আচার বিচার পালন করিতেন, এবং ইসলামি 'তমদ্দ্ন' ভালোভাবে আয়ত্ত করিবার জন্য পুত্র পাঞ্জকে শুধু আরবি ফারসি-উর্দূ ভাষা শিখাইয়াছিলেন। কিন্তু পাঞ্জ বাংলা ভাষার প্রতি অনুরাগবশতঃ গোপনে বাংলাভাষাও শিক্ষা করেন। হরিশপুর গ্রামে অনেক হিন্দু মুসলমান বাউল-সাধক বাস করিতেন, তন্মধ্যে কেহ কেহ লালনের শিষ্য ছিলেন, কেহ-বা স্থফী সাধনা করিতেন। বৈষ্ণব সাধক ও হিন্দু বৈদান্তিক পণ্ডিতগণ গ্রামের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। পাঞ্জ শাহ্ বাল্য হইতেই পিতাকে লুকাইয়া এই সমস্ত ফকির সাধু-সন্তদের সঙ্গ করিতেন। কিন্তু পিতা জানিতে পারিলে তাঁহাকে অত্যন্ত লাঞ্ছিত করিতেন।

১৮৭৮ খ্রীঃ অব্দে পিতার লোকান্তর হইতে পাঞ্জ শাহ্ যথারীতি খেলাপত অর্থাৎ ফকিরের বৈরাগ্যবস্ত্র ধারণ করিয়া সাধনভজনে প্রস্তুত হন। ইতিপূর্বে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল—তিনি সাধনায় লিপ্ত হইলেও গৃহধর্মকে অবহেলা করেন নাই। আনুষ্ঠানিকভাবে তিনি হরিশপুরের এক স্থফীসাধক

হেরাজতুল্লা খোন্দকারের নিকট দীক্ষিত হন। অতঃপর তাঁহার মহৎ চরিত্র ও অধ্যাত্ম শক্তির কথা চারিদিকে প্রচার লাভ করে, এবং তাঁহার বয়স যখন ৩৩-৩৪, তখনই তাঁহার শিষ্য সংখ্যা বাড়িতে আরম্ভ করে। তিনি 'ইস্কি ছাদেকী সহর' নামে একখানি সুফীসাধনার পুস্তক মুদ্রিত করিয়া প্রচার করিয়াছিলেন। ইহার পূর্বেই তিনি সুফী ও বাউলসাধনা সম্পর্কিত অনেকগুলি উৎকৃষ্ট গান লিখিয়াছিলেন, ক্রমে ক্রমে সেগুলি তাঁহার শিষ্যদের দ্বারা দূর-দুরান্তরে প্রচারিত হয়। গানগুলির ভাব, ভাষা ও তাৎপর্য লালন ফকিরের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। এই সমস্ত গান এখনও আউল-বাউল-ফকির সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পাঞ্জ শাহ্ ইসলামী শাস্ত্রে অতিশয় অভিজ্ঞ ছিলেন, কিন্তু ব্যক্তিগত জীবনে শাস্ত্রের বিধিনিষেধ অপেক্ষা অন্তরের বাণীর অধিক মূল্য দিতেন বলিয়া "কাঠমোল্লাদের কাছে ইনি 'নাড়ার ফকির' বলিয়া উপেক্ষিত হন।"[১০৫] কবি কোন নিন্দা গ্রাহ্য করিতেন না। ব্যক্তিগত জীবনে তিনি অতিশয় সাত্ত্বিক-ভাব অবলম্বন করিয়াছিলেন। প্রথম বয়স হইতেই তিনি আমিষ আহার সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। তামাকু ব্যতীত তাঁহার আর কোন ব্যাপারে কোনও প্রকার আসক্তি ছিল না, শেষ জীবনে তিনি তাহাও ত্যাগ করিয়াছিলেন। তাঁহার এইরূপ আচার ব্যবহার ও সাত্ত্বিক প্রকৃতির জন্য সাধারণ মুসলমানগণ তাঁহাকে হিন্দু বৈরাগী বলিয়াই মনে করিত।[১০৬] তিনি অধিকাংশ সময় সাধনভজন লইয়া থাকিতেন, অবসর সময়ে সাধুসজ্জন দীন-দরিদ্রের সেবা করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিতেন। ১৯১৪ সালে পাঞ্জ শাহ্ সাধনোচিতধামে প্রস্থান করেন। তাঁহার কয়েকটি গান বাংলা বাউল সাহিত্যের সম্পদ বলিয়া গণ্য হইবার যোগ্য। আমরা লালনগীতিকার উচ্চ কাব্যধর্ম সম্বন্ধে অবহিত, কিন্তু পাঞ্জ শাহের গান যে লালন হইতে কোন দিক দিয়াই নিকৃষ্ট নহে, বরং রচনার দিক হইতে অধিকতর পরিপক্ব ও

১০৫. ডঃ ভট্টাচার্যের গ্রন্থে মুদ্রিত কবিপুত্র খোন্দকার রফি উদ্দিনের বিবরণী দ্রষ্টব্য। ('বাংলার বাউল ও বাউল গান', ২য় খণ্ড, পৃ. ১৮৫)

১০৬. কবি বোধ হয় তথাকথিত 'কাঠমোল্লা'দের দ্বারা উত্যক্ত হইয়াই লিখিয়াছিলেন—

জেতের বড়াই কি।
ইহকাল পরকালে জেতের বড়াই কি।
আমার মন বলে, অগ্নি জ্বেলে দিই জেতের মুখি॥

কাব্যগুণান্বিত তাহা স্বীকার করিতেই হইবে। তাঁহার এই পদটির মতো উচ্চশ্রেণীর বাউল পদ বাংলা সাহিত্যে বড় বেশী নাই :

শুধু কি আল্লা বলে ডাকলে তারে পাবি ওরে মন-পাগেলা।
যে ভাবে আল্লাতালা বিষম লীলা ত্রিজগতে করছে খেলা॥
কত জনে জপে মালা তুলসী তলা,
হাতে ঝোলে মালার ঝোলা,
আর কত জন হরি বলে মারে তালি, নেচে গেয়ে হয় মাতেলা॥
কত জন হয় উদাসী তীর্থবাসী মক্কাতে দিয়াছে মেলা।
কেউবা মসজিদে বসে তার উদ্দেশে সদায় করে আল্লা আল্লা॥
স্বরূপে মানুষ মিশে স্বরূপদেশে বোবায় কালায় নিত্যলীলা।
স্বরূপের ভাবনা জেনে চামর কিনে হচ্ছে কত গাজীর চেলা॥

কবি কখনও কখনও আকুল হৃদয়ে তাঁহার 'সাঁই'-কে ডাক দিয়া বলিয়াছেন :

আমারে দেও চরণতরী।
তোমার নামের জোরে পাষাণ গলে অপারের কাণ্ডারী॥

কখনও-বা আর্তনাদ করিয়াছেন :

গুরু দয়া কর মোরে গো, বেলা ডুবে এল।
তোমার চরণ পাবার আশে রইলাম বসে, সময় বয়ে গেল॥

কখনও বাউলসাধনার নিগূঢ় তত্ত্ব রূপকের ছলে বলিয়াছেন :

ত্রিবেণীর তীরে ধীরে সুধাবে জোয়ার আসে।
সুখসাগরে মানুষ খেলে বেহাল বেশে॥
উথলে সুধাসিন্ধু
সু-ধারে সুধার বিন্দু
সুখময় সিন্ধুজলে ছলে ছলে সাঁতার খেলে।
জীব নিস্তারিতে জোয়ার এসে অধর মানুষ যায় গো ভেসে॥

এই সমস্ত পদে বাউল সাধনাবিষয়ক গূঢ় সঙ্কেত আছে বটে, কিন্তু তাহার অতিরিক্ত একটা স্নিগ্ধ গীতিমাধুর্য এই তত্ত্বকথাকে শিল্পরূপ দান করিয়াছে। কবির অসাম্প্রদায়িক মন আশ্চর্য ঔদার্য অবলম্বন করিয়া গাহিয়াছে :

দয়া কর নিমাইরূপী,
আর আছে হজরত নবী,
নিমাই-হজরত একে ভিন্ন ছবি সাঁই একা একেশ্বর॥[১০৭]

১০৭. পাঞ্জু শাহের গানগুলি ডঃ উপেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের সঙ্কলন হইতে গৃহীত।

সব দিক দিয়া বিচার করিলে ফকির পাঞ্জ শাহ্‌কে লালন ফকিরের পার্শ্বেই স্থান দিতে হইবে।

ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগ হইতে এদেশে বহু হিন্দু-মুসলমান বাউল-সাধকের আবির্ভাব হইয়াছে, ইঁহাদের গীতাবলী বাউল ও ফকিরের আখড়ায় এখনও প্রচলিত আছে। হাউড়ে গোঁসাই (ব্রাহ্মণ), গোঁসাই গোপাল (ব্রাহ্মণ), চণ্ডীদাস গোঁসাই (নবদ্বীপের নমঃশূদ্র), এরফান শাহ, মদন বাউল প্রভৃতি অনেক বাউলকবি ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে অনেক উৎকৃষ্ট বাউলগান লিখিয়াছিলেন। হাউড়ে গোঁসাই, গোঁসাই গোপাল প্রভৃতি আধুনিক যুগের বাউলগণ উচ্চশিক্ষিত, হিন্দুর যোগতন্ত্রাদিতে অতিশয় অভিজ্ঞ—অনেক আধুনিক শিক্ষিত ব্যক্তি ইঁহাদের শিষ্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। অজ্ঞাতনামা বাউলও কিছু কিছু উৎকৃষ্ট গান লিখিয়া গিয়াছেন। উদাহরণস্বরূপ এইরূপ একটি গানের কয়েক ছত্র উদ্ধৃত হইতেছে :

> তত্ত্ব করে আঁধার ঘরে সে ধন কি যায় রে চেনা।
> আঁধারে খুঁজলে পরে পড়বি ফেরে, সে ধন হাতে আর পাবে না॥
> যেখানে আছে সে ধন মাণিক রতন, যতন বিনা যায় কি জানা।
> জ্বালায়ে রঙের বাতি তড়িৎভাতি চিনে নে রাঙ কি সোনা॥

বাউল গানের ধারা গ্রামাঞ্চলে বৈষ্ণব বৈরাগীর আখড়ায় ও ফকির-মুর্শিদের আস্তানায় এখনও বহমান। তবে আধুনিক ভাবধারার স্রোতে এই বিচিত্র ধর্মসাধনা ও সাধনসঙ্গীত কতদিন অটুট থাকিবে বলা যায় না। কারণ ইতিমধ্যেই এই সাধনার মন্ত্রগুপ্তি চলিয়া গিয়াছে। গবেষকগণ এই সমস্ত লোকযান, লোকসাহিত্য, গূঢ়চারী সাধনপ্রণালী লইয়া যেরূপ সতর্ক অনুসন্ধান শুরু করিয়াছেন, তাহাতে ক্ষুদ্র উপদল ও ব্যক্তিগত রহস্যময় সাধনার রহস্য ঘুচিয়া গিয়া ক্রমেই প্রকাশ্য সভার আলোচনার বস্তু হইয়া উঠিবে। সে যাহা হউক, বাউলগান আধুনিক কালে লিখিত হইলেও ইহা যে অষ্টাদশ শতাব্দীর অবশেষ তাহা স্বীকার করিতে হইবে। এই জন্য আমরা মধ্যযুগীয় সাহিত্যশাখার শেষ পর্বে ইহার স্থান নির্দেশ করিয়াছি।

৩

গা থা সা হি ত্য

মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের উপসংহার প্রসঙ্গে আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করিয়া আমরা বর্তমান আলোচনা সমাপ্ত করিব। ইতিপূর্বে আমরা মধ্য-যুগের সাহিত্য আলোচনা কালে দেখিয়াছি, অলৌকিকতা ও দেবদেবীর প্রাধান্য পুরাতন বাংলা সাহিত্যের একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য। লৌকিক জীবন, স্থানীয় পরিবেশ, ঐতিহাসিক ঘটনা—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পটভূমিকায় এই প্রভাব কার্যকরী হইলেও কবিগণ দেবায়তনের বাতায়ন হইতেই কাব্য-সাহিত্যকে প্রত্যক্ষ করিয়াছেন। পাঠক ও শ্রোতারাও সেই মানসিক পরিবেশের মধ্যে বর্ধিত হইয়া কাব্যে দেবদেবীর কথাই শুনিতে চাহিত। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুর্বিপাকের মধ্যে পড়িয়াও বাঙালী পাঠক দৈবকৃপাকেই ত্রাণকর্তা বলিয়া মনে করিত। মঙ্গলকাব্যাদিতে বাস্তব বাংলাদেশের স্থানকালের প্রভাব থাকিলেও তাহা হইতে দেবপ্রাধান্য লোপ পায় নাই, বরং বর্ধিতই হইয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজনৈতিক কারণে জনসাধারণের দৃষ্টিভঙ্গী ক্রমেই মাটির প্রতি নিবদ্ধ হইল। ঢাকা, রাজমহল, মুর্শিদাবাদে নাগরিক সভ্যতার পত্তন হইলে বিলাসকলাকুশল ইসলামি জীবনাদর্শের প্রতিও সাধারণ বাঙালী হিন্দু আকৃষ্ট হইল, উপরন্তু পাশ্চাত্ত্য বণিকদের নিত্য যাতায়াত ও বিকিকিনির ফলে স্থানীয় জন-সাধারণের দৃষ্টি ক্রমেই দূরে-দূরান্তরে প্রসারিত হইতে লাগিল—এবং সেই নূতন দৃষ্টিভঙ্গিমা ও যুগের অস্পষ্ট চিহ্ন এই-সময়ে-রচিত কয়েকটি পুঁথি-পাঁচালীর মধ্যে ফুটিয়া উঠিল। অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয়, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রায় মধ্যভাগ হইতেই বাংলাদেশে লৌকিক জীবন ও তাহার সমস্যা লইয়া দুই চারিটি পুঁথি রচিত হইয়াছে—যাহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও বাংলা সাহিত্যের দিক্‌নির্দেশক হিসাবে তাহার উল্লেখ করা প্রয়োজন। অবশ্য এই শতাব্দীতেও দেবদেবী ও পীর মাহাত্ম্যবিষয়ক প্রচুর পুঁথি রচিত হইয়াছে। যোগাদ্যা দেবীর বন্দনা, তারকেশ্বর বন্দনা, জগন্নাথ বন্দনা, শিববন্দনা প্রভৃতি লৌকিক দেবদেবী-সংক্রান্ত বন্দনাগানের দুই-চারি পাত্‌ড়ার যে সমস্ত পুঁথি পাওয়া গিয়াছে, তাহা এতই অকিঞ্চিৎকর

যে, সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার উল্লেখ না করিলেও চলে। কৃষ্ণলীলা-বিষয়ক কিছু কিছু পুঁথিও রচিত হইয়াছিল—উনবিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধ পর্যন্ত তাহাব জের চলিয়াছিল, রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবত ও মঙ্গলকাব্যের নীরস পুনরাবৃত্তিও নিতান্ত মন্দ হয় নাই। কিন্তু তাহাতে শুধু পুঁথির জঞ্জাল বাড়িয়াছে, সাহিত্যের কোন দিক দিয়াই লাভ হয় নাই। অবশ্য সম্পূর্ণ ভিন্ন গোত্রের বিষয় লইয়া যে কয়টি পুঁথি রচিত হইয়াছে, যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে লোকমুখে ছড়া পাঁচালী-পালাগান প্রচলিত হইয়াছে তাহার ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক মূল্য তুচ্ছ করা যায় না।

লৌকিক ও ঐতিহাসিক ছড়াপাঁচালী ॥

হিন্দী-গুজরাটী-মারাঠী প্রভৃতি সাহিত্যের মধ্যযুগীয় পর্বে লৌকিক জীবন, বীররসাত্মক যুদ্ধবিগ্রহ প্রভৃতি লইয়া অনেক কাহিনীকাব্য রচিত হইলেও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস-চেতনা বাঙালী কবিকে বিশেষ প্রভাবিত বা প্রবুদ্ধ করে নাই, তাহা আমরা ইতিপূর্বে দেখিয়াছি। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে স্থানীয় ঘটনাকাহিনী জনসাধারণের মনকে যে উত্তেজিত করিতেছিল, রাজনৈতিক বিশৃঙ্খলা, সামাজিক শিথিলতা, নানা-প্রকার আধিভৌতিক দুর্যোগের আঘাতে যে জনমানস সাড়া দিয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। উনবিংশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে সম্পূর্ণ নূতন দিকে পরিবর্তন হইল, তাহার আভাস অষ্টাদশ শতাব্দীর লৌকিক ছড়াপাঁচালীতে লক্ষ্য করা যায়। উনবিংশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের মূল প্রেরণা—মানবতন্ত্রবাদ, এবং লৌকিকতাই সেই মানবতন্ত্রবাদের নিয়ামক শক্তি। সেই লৌকিকতার অর্থ—ইহলোক, বাস্তব পরিবেশ ও পার্থিব সুখদুঃখ সম্বন্ধে কবিদের সচেতন উপলব্ধি। পুরাতন ধারার শেষ সক্ষম কবিদ্বয় রামেশ্বর ও ভারতচন্দ্রের রচনার মধ্যে সেই বাস্তব চিত্র উঁকি দিলেও তাঁহারা ভাগবত সত্তাকে সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করিয়া লোকজীবনের মধ্যে পুরাপুরি অবতীর্ণ হইতে পারেন নাই। ভারতচন্দ্রের রচনাভঙ্গিমা ও মনোভাবের মধ্যে পরিবেশ-চেতনা ও বাস্তববোধ অতি তীক্ষ্ণ হইলেও তিনি পুরাদস্তুর মানবরসের কবি নহেন। মঙ্গলকাব্য, শাক্ত পদাবলী, বাউল গান—এ সমস্তই পুরাতন ধারার শেষ চিহ্ন। অবশ্য তাহাতে ব্যাস্তবমুখিতা,

দেবচরিত্রে মানবীয়তা প্রভৃতি আধুনিক কালের কিছু কিছু লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু ভারতচন্দ্র, রামপ্রসাদ, কমলাকান্ত, বাউল গায়ক—ইহাদের মনের সূত্র মধ্যযুগের ভাবাদর্শের সঙ্গেই গ্রন্থিবদ্ধ। তবে অপেক্ষাকৃত আধুনিককালে ভূমিষ্ঠ হওয়ার জন্য ইহাদের মনোভঙ্গিমা ও রচনাতে কিঞ্চিৎ পরিমাণে লোকজীবনের সংস্পর্শ ঘটিয়াছে। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে স্থানীয় ঘটনা অবলম্বনে যে সমস্ত ছড়াপাঁচালী ধরনের রচনা লোকের মুখে মুখে ফিরিয়াছে, তাহার মূল লোকজীবনেই প্রোথিত। এগুলির বিশেষ কোন কাব্যমূল্য নাই, অনেক ছড়াপাঁচালী নিতান্ত স্থানীয় ব্যাপার হইয়া রহিয়াছে, ক্ষুদ্র গ্রামের সীমা ইহারা কদাচিৎ পার হইতে পারিয়াছে। কোন কোনটি আবার শুধু মৌখিক আকারেই বাঁচিয়া আছে, লেখার মধ্যে স্থায়িত্ব লাভ করিতে পারে নাই। তথাপি এই সমস্ত পুঁথিপত্র হইতে বুঝা যাইতেছে, পরবর্তী কালের বাংলা সাহিত্যে বাস্তব জীবন ও লৌকিক দৃষ্টি-ভঙ্গী প্রধান হইয়া উঠিবে। এখানে এইরূপ দুই একটা ছড়াপাঁচালীর উল্লেখ করা যাইতেছে।

ঐতিহাসিক ছড়া—অষ্টাদশ শতাব্দীর রাষ্ট্রসঙ্কট ও সমাজ বিশৃঙ্খলা, রাজসভাজীবী বিলাসী নাগরিকতা, অর্থনৈতিক শোষণ, বিদেশী বণিকের শনৈঃ শনৈঃ অনুপ্রবেশ প্রভৃতি কারণের ফলে বাস্তব ব্যাপারে উদাসীন জনচিত্তে সর্বপ্রথম ইতিহাসের ঘটনাবলীর প্রভাব সূচিত হয়। ইতিপূর্বে তখ্‌ত্‌ লইয়া পাঠানে-মুঘলে হানাহানি চলিতে থাকিলেও সাধারণ লোকে তাহার দ্বারা বিশেষ প্রভাবিত হয় নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীতে মুঘল-শাসনের দুর্বলতা, বাংলার মসনদ লইয়া বিশৃঙ্খলা, বর্গীর হাঙ্গামা, মুর্শিদাবাদ নবাববংশের অধঃপতন, ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর প্রাধান্য বিস্তার, দুর্ভিক্ষ, অনাচার, সামন্ততন্ত্রের ভঙ্গুর অবস্থা জনসাধারণকে বিশেষভাবে প্রভাবিত করিয়াছিল। ফলে সাহিত্যেও তাহার কিঞ্চিৎ প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত হইয়াছিল। ইতিপূর্বে ভারতচন্দ্র প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, ঐতিহাসিক সঙ্কটের বিশৃঙ্খলা সম্বন্ধে রায়গুণাকরও অবহিত ছিলেন। তাঁহার পূর্বে বাংলা সাহিত্যে অল্পস্বল্প ঐতিহাসিক বিষয়ের উল্লেখ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে ইতিহাস প্রত্যক্ষভাবে বিশেষ কোন প্রভাব বিস্তার

করিতে পারে নাই। দুই একটি বৈষ্ণবগ্রন্থ[১০৮], মঙ্গলকাব্য[১০৯], অনুবাদ সাহিত্য[১১০], নানা ছড়াপাঁচালী[১১১], ইসলামি কাব্যাদি[১১২] এবং ত্রিপুরা-রাজবংশমালায় সমকালীন রাজবংশ ও স্থানীয় ঐতিহাসিক ঘটনার উল্লেখ আছে। তন্মধ্যে শায়েস্তা খাঁয়ের অত্যাচার সংক্রান্ত 'মদনের গান' বা মদনপালার পুঁথিটি উল্লেখযোগ্য।

উল্লিখিত 'মদনের গান' পুঁথিটির রচনাকারের নাম পাওয়া যায় না। তবে কাব্যারম্ভে 'শ্রীশ্রীখোদা'র উল্লেখ আছে বলিয়া ইহা কোন মুসলমান কবির রচনা মনে হইতেছে। চব্বিশপরগণার জমিদার মেদনমল্ল বাকি-খাজনার দায়ে শায়েস্তা খাঁয়ের দ্বারা উৎপীড়িত হইলে বড় খাঁ গাজী পীরের কৃপায় উদ্ধার পান—ইহাই সংক্ষিপ্ত ঘটনা। বলা বাহুল্য ইহা মুসলমান সমাজে প্রচলিত পীরমাহাত্ম্যবিষয়ক কাব্য। কিন্তু ইহাতে মুসলমান কবি মুসলমান সুবাদার শায়েস্তা খাঁয়ের হিন্দু জমিদার দলনের নির্মম ঘটনা বর্ণনায় সঙ্কুচিত হন নাই। লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত ছড়াপাঁচালীতে বিশেষ কোন কাব্যগুণ না থাকিলেও ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে ইহার

১০৮ জয়ানন্দের চৈতন্যমঙ্গলে আছে, চৈতন্যের পূর্বপুরুষ রাজা ভ্রমরের ভয়ে উড়িষ্যা ত্যাগ করিয়া শ্রীহট্টে পলায়ন করেন। অবশ্য এই তথ্য সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে। গোপীজন-বল্লভের 'রসিকমঙ্গলে' (১৬৫২ খ্রীঃ অব্দের পরে রচিত) জমিদারের প্রতি মেদিনীপুরের শাসক আহম্মদী বেগের অত্যাচারের বর্ণনা আছে।

১০৯. মুকুন্দরামের আত্মপরিচয় প্রসঙ্গে মুঘল-পাঠানের বিরোধের ঐতিহাসিক চিত্র অতি নিপুণতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। ধর্মমঙ্গলেও নানা প্রকার স্থানীয় শাসন-সংক্রান্ত বিশৃঙ্খলার উল্লেখ আছে।

১১০. শ্রীকরনন্দীর মহাভারতে চট্টগ্রামের শাসনকর্তা ছুটি খাঁয়ের সঙ্গে ত্রিপুরাধিপতির যুদ্ধের কথা আছে। তাহাতে দেখা যাইতেছে, ছুটি খাঁয়ের ভয়ে ত্রিপুরাধিপ "পর্বতগহ্বরে গিয়া করিল প্রবেশ।" অবশ্য ছুটি খাঁয়ের সভাকবির এই বর্ণনা কতদূর সত্য তাহা চিন্তার বিষয়।

১১১. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রক্ষিত 'মদনপালা' শীর্ষক ছড়াগানে (পুঁথি—৯৩৪) শায়েস্তা খাঁ কর্তৃক জমিদারের উপর অকথ্য অত্যাচারের কথা আছে।

১১২. নিজ জীবনকথা বর্ণনা প্রসঙ্গে 'পদ্মাবতীর' কবি সৈয়দ আলাওল কিছু কিছু স্থানীয় ঐতিহাসিক তথ্যের ইঙ্গিত দিয়াছেন, বিশেষতঃ পর্তুগীজ জলদস্যুদের অত্যাচারের কাহিনী উল্লেখযোগ্য। মহম্মদ খাঁয়ের 'মুক্তাল হোসেনে' (১৭শ শতাব্দী) চট্টগ্রামের শাসনকর্তা সাতুর খাঁ কর্তৃক ত্রিপুররাজের পরাজয়ের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে।

কিছু মূল্য আছে। শায়েস্তা খাঁ জমিদারদের বাকি খাজনার দায়ে কিরূপ শাস্তি দিতেন তাহার কিঞ্চিৎ নমুনা :

কারে কারে ইটের উপরে করে রেখেছে খাড়া।
চাবুকের চোটে কার পোস্ত দিচ্ছে নাড়াচাড়া
কারু কারু ফেলে রেখেছে সিংহমাছের গাড়।
পিষ্ট তুলে মারে জোড়া বেতের বাড়ি॥

* * * *

তামাক পোয়ে শুল কারু চাপা ধরে গায়।
লঙ্কামরিচের ধোঁয়া কারু নাকে দেয়॥

শায়েস্তা খাঁয়ের অত্যাচার কোন কোন লোককবিকে ছড়াপাঁচালী রচনায় উদ্বুদ্ধ করিলেও ইহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য নাই। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি ঐতিহাসিক ছড়াপাঁচালীর উল্লেখ করা যায়। গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ ও আলিবর্দির সংঘর্ষ, পলাশীতে সিরাজের পতন এবং মিরকাশিমের সঙ্গে ইংরাজের মনান্তর ও যুদ্ধাদি সম্পর্কেও অনেক অখ্যাতনামা কবি মুখে মুখে ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। লোকসাহিত্য ও স্থানীয় ইতিহাসের উপাদান হিসাবে তাহার কিছু মূল্য আছে। নিম্নে এইরূপ কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া যাইতেছে :

গিরিয়ার প্রান্তরে সরফরাজ ও আলিবর্দির যুদ্ধ :

সহর হইতে নবাব হইল বাহির সহর করে খালি।
দিনে দিনে সোণার বরণ হয়ে গেল কালি॥
মারামারি লেগে গেল গিরিয়ার ময়দানে।
কান্দে বাঙ্গালার সুবাদার হাপুস নয়নে॥
পূর্বেতে করিল মানা জাফর খাঁ নানা।
ভালমন্দ হলে নবাব সহর ছেড় না॥

* * * *

পড়িল নবাবের তাম্বু ব্রাহ্মণীর স্থানে।
আলিবর্দ্দির তাম্বু পড়ে গিরিয়ার ময়দানে॥

কোন এক ছড়াকার মীরকাশিমের সঙ্গে ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সংঘর্ষেরও বর্ণনা করিয়াছিলেন :

বাঙ্গালামুখী করে পানসী ভরে দেখতে লাগে ভালো।
সাজিল তেলেঙ্গা গোরা কুর্তি লালে লাল॥

শোন শোন একভাবে কাব্যরসের কথা।
নবাব লুঠিল কুঠী সহর কলকাতা" [১১৩]
সামনে গুলুকি গেড়ে ধরল তেড়ে যত তেলেঙ্গা গোরা।
লড়াই দিতে পালিয়ে গেলে মামুদ তকীর ঘোড়া॥
ফিরিল মামুদ তকী তাহা দেখি দাঁতে কাটে ঘাস।[১১৪]
বাবুজান একটি চাকব তেরা নকব গায়ে ভরা মাস।

কিন্তু রচনাব আন্তরিকতায় পলাশীর যুদ্ধ এবং সিরাজের অন্তিম পরিণাম বর্ণনা বাস্তবিক প্রশংসার যোগ্য :

কি হল রে জান।
পলাশীর ময়দানে নবাব হারাল প্রাণ।
তির পড়ে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি পড়ে রয়ে।
একলা মীরমদন সাহেব কত নিবে সযে।
*　　*　　*　　*
নবাব কান্দে সিপাই কান্দে আব কান্দে হাতী
কলকেতায় বসে কান্দে মোহনলালের পুতি।
দুধে ধোয়া কোম্পানীর উড়িল নিশান।
মীরজাফরের দাগাবাজিতে গেল নবাবের প্রাণ।
ফুলবাগে মলো নবাব খোসবাগে মাটি।
চান্দোয়া খাটায়ে কান্দে মোহনলালের বেটী।[১১৫]

এই ছড়ায় দেখা যাইতেছে মীরজাফরের 'দাগাবাজিতে' সিরাজ পরাজিত ও নিহত হইয়াছিলেন তাহা ছড়াকার জানেন। তবে 'মোহনলালের বেটী' সিরাজের উপপত্নীস্বরূপ ছিল কিনা জানা যায় না। লোকমুখে প্রচারিত নানারূপ অতিরঞ্জিত ঘটনা ছড়াতে স্থান পাইয়াছে। এই ছড়াটির সরল সহজ সুরের মধ্যে যে করুণরসের স্পর্শ রহিয়াছে তাহার কিঞ্চিৎ কাব্যমূল্য স্বীকার করিতে হইবে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সমসাময়িক ঐতিহাসিক, সামাজিক ও প্রাকৃতিক

১১৩. মীরকাশিম কলিকাতা লুঠেন নাই, সিরাজ লুঠ করিয়াছিলেন। ছড়াকার ভ্রমবশতঃ মীরকাশিমের উপর তাহা আরোপ করিয়াছেন।

১১৪. এখানে বীরভূমের নিকট ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সহিত মীরকাশিমের সেনাপতি মহম্মদ তকি খাঁয়ের যুদ্ধের কথা বর্ণিত হইয়াছে।

১১৫. এই ছড়াগুলি সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১২, ১ম সংখ্যা) প্রকাশিত মোক্ষদাচরণ ভট্টাচার্যের 'নিরক্ষর কবি ও গ্রাম্যকবিতা' হইতে গৃহীত হইয়াছে।

দুর্যোগ প্রভৃতি সম্বন্ধে কিছু কিছু ছড়াপাঁচালী, পুঁথিপুস্তিকা রচিত হইয়াছিল যাহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও সমসাময়িক জীবনের চিত্র হিসাবে সেগুলি মূল্যবান। যেমন বিজয়রাম সেন বিশারদের 'তীর্থমঙ্গল'। ১৭৬৮-৬৯ সালে খিদিরপুরের ভূস্বামী কৃষ্ণচন্দ্র ঘোষাল নৌকাযোগে কাশী-যাত্রা করিলে ভাজনঘাট নিবাসী কবিরাজ বিজয়রাম সেন তাঁহার সঙ্গী হন। কৃষ্ণচন্দ্রের অনুরোধে কবিরাজ মহাশয় তীর্থযাত্রার যে বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন তাহাই 'তীর্থমঙ্গল' (নগেন্দ্রনাথ বসু সম্পাদিত)। কাব্যটি ১৭৭০ খ্রীঃ অব্দে সম্পূর্ণ হয়।[১১৬] কবি তীর্থযাত্রা প্রসঙ্গে বহু গ্রামজনপদ, লোকজীবন, তীর্থমাহাত্ম্য, রাজনৈতিক জীবন, পথঘাটের যে সমস্ত বর্ণনা দিয়াছেন সমসাময়িক চিত্র হিসাবে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য স্বীকাব করিতে হইবে। পরবর্তীকালে রচিত জয়নারায়ণ ঘোষালের 'কাশীপরিক্রমা'য় কাশীধামের অনেক বিবরণ আছে। এই ধারা পরবর্তী শতাব্দীতেও অনুসৃত হইয়াছিল। 'বরদামঙ্গলকাব্য', 'গোঁসানীমঙ্গল কাব্য' প্রভৃতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র লোককাব্যে সমসাময়িক অনেক ঘটনার বর্ণনা আছে। দামোদর ও ময়ূরাক্ষীর বন্যা, সাঁওতাল বিদ্রোহ, দুর্ভিক্ষ, ঘূর্ণিবাত্যা, ভূমিকম্প প্রভৃতি সমসাময়িক ঘটনা অবলম্বনে অনেক ছোটখাট ছড়াপাঁচালী রচিত হইয়াছিল—যাহার কাব্য-মূল্য না থাকিলেও সমসাময়িক ঘটনা হিসাবে উল্লেখযোগ্য। এই সমস্ত ছড়ার অধিকাংশই ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা। অবশ্য ঊনবিংশ শতাব্দীর রচনা হইলেও এগুলি গ্রামীণ সংস্কৃতি হইতে জন্ম লাভ করিয়াছে বলিয়া এখানে তাহার সংক্ষিপ্ত উল্লেখ করা যাইতেছে।

১২৬২ সালে বীরভূমে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে রচিত এই ছড়াটি উল্লেখযোগ্য:

> শুন ভাই বলি তাই সভাজনের কাছে।
> সুভবাবুর[১১৭] হুকুম পেয়ে সাঁওতাল জুঝেছে॥
> বেটারা কোক ছড়িল জড় হইল হাজার হাজার।
> কখন এসে কখন লোটে থাকা হল ভার॥

১১৬. এইভাবে কাবরাজ মহাশয় কাব্যরচনার সন তারিখ উল্লেখ করিয়াছেন:

> সাতাত্তরি সনেতে আর ভাদ্র মাসে।
> বিশারদে কহে পুথি কৃষ্ণচন্দ্রাদেশে॥

১১৭. বিদ্রোহী সাঁওতালদের নেতা।

হল সব দুর্ভাবনা রায় কান্দনা সবাই ভাবে বসে।
ঘড়া ঘট মাটিতে পোঁতে কখন নিবে এসে ॥
বলে ভাই রাখব কোথা হেথা সেথা এই কথা শুনি।
বাখতে মুলুক সলা সুলুক ভাবতেছে কোম্পানি ॥
বেটাদের শক্তি শুনে প্রজাগণে কৈছে ধীরে ধীরে।
জিনিষ ছেড়ে পালাও না ভাই সবাই থাক ঘরে ॥[১১৮]

১২৬২ সালে সাঁওতাল বিদ্রোহ উপলক্ষে রাইকৃষ্ণদাস এই ছড়া রচনা করেন ইহাতে সাঁওতালদিগকে অত্যাচারী রূপেই বর্ণনা করা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ উল্লেখযোগ্য। রতিরাম দাস নামে এক রাজবংশী কবি সম্ভবতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষের দিকে 'জাগগান' শীর্ষক যে ছড়া লিখিয়াছিলেন তাহাতে এই ব্যাপারের বিস্তারিত বর্ণনা আছে। ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর ইজারাদার দেবীসিংহের অত্যাচার, রংপুরের কালেকটার গুডল্যাড সাহেব কর্তৃক তাঁহাকে অন্যায়ভাবে রক্ষা, দেবীসিংহের বিরুদ্ধে স্থানীয় জমিদারদের উত্থান প্রভৃতি ঘটনা কবি অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। ইজারাদারের অত্যাচারে প্রজাদের কিরূপ অবস্থা হইয়াছিল তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া যাইতেছে :

রাইয়ৎ প্রজানা সবে থাকে খাড়া হইয়া।
হাত জুড়ি চক্ষু জলে বক্ষ ভাসাইয়া ॥
পেটে নাই অন্ন তাদের পৈবানে নাই বাস।
চামে ঢাকা হাড় কয়খানা করি উপবাস ॥[১১৯]

এই ঘটনায় দেখা যাইতেছে স্থানীয় জমিদার ও প্রজারা সমবেতভাবে অত্যাচারের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছিলেন এবং অন্যায়ের প্রতিকার করিতে কথঞ্চিৎ সমর্থ হইয়াছিলেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে বর্ধমানের রাজকুমার প্রতাপচাঁদকে কেন্দ্র করিয়া পারিবারিক চক্রান্তের ফলে জাল প্রতাপচাঁদের মামলা হয়; আইনে অপরাধী সাব্যস্ত প্রতাপচাঁদ কীভাবে সর্বত্র ধর্মগুরুরূপে পূজা লাভ করেন তাহা লইয়া বর্ধমান অঞ্চলে অনেক ছড়া-

১১৮. বীরভূম, ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা (শিবরতন মিত্র সংগৃহীত ছড়া)
১১৯. রঙ্গপুর সাহিত্যপরিষদ পত্রিকা, ১৩১৭

পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। তবে তাহা পরবর্তী কালের রচনা বলিয়া এখানে শুধু তাহার উল্লেখ করা হইল।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে সন্ন্যাসী ও ফকিরদের অত্যাচার লইয়া কিছু কিছু ছড়া পাঁচালী রচিত হইয়াছিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগ মজনু শাহ্ নামে উত্তর প্রদেশের এক ফকির বাংলায় আসিয়া দলবল জুটাইয়া বাঙালী হিন্দুর উপর অত্যন্ত অত্যাচার করিয়াছিল। সেই ঘটনা লইয়া ১৮১৩ সালে পঞ্চানন দাস 'মজনুর কবিতা' নামক এক দীর্ঘ ছড়া রচনা করিয়াছিলেন। এই ফকির রাজসিক কায়দায় ঘোরাফেরা করিত, যথেচ্ছ আগ্নেয়াস্ত্র ব্যবহার করিত—অত্যাচারটা হিন্দুর উপরেই বেশী হইত, হিন্দুনারী হরণে তাহার অনুচরবর্গের বড়ই প্রীতি ছিল। ইহারা বুরহানা সম্প্রদায়ের মাদারী শ্রেণীভুক্ত মসলমান। ইহাদের আক্রমণপদ্ধতি কতকটা এইরূপ ছিল—হিন্দুর গ্রামে গিয়া ইহারা বন্দুকের আওয়াজ কবিত, তাহা শুনিয়া ভয়ে হিন্দুগণ গ্রাম ছাড়িয়া পলাইয়া গেলে তাহারা নিশ্চিন্তমনে রহিয়া বসিয়া গ্রাম লুঠ করিত। ১৭৬০ হইতে ১৭৬৮ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত মজনু শাহ্ ও তাহার দলবল সারা বাংলাদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছিল। ১৭৮৬ সালে বগুড়ার ইস্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সিপাহীদের সঙ্গে সংঘর্ষে ফকির পরাজিত হইয়া কানপুরের অন্তর্গত মাখনপুর গ্রামে (তাহাদের প্রধান আড্ডা) পলাইয়া যায়। সেখানে ১৭৮৬ খ্রীঃ অব্দে ফকির সাহেবের মৃত্যু হয়। হিন্দু ছড়াকার এই ফকিরকে অপভাষায় নিন্দা করিয়া ছড়া বাঁধিয়াছিলেন:

> শুন সভে একভাবে নৌতুন রচনা।
> বাঙ্গালা নাশের হেতু মজনু বারণা॥
> কালান্তক সম বেটাকে কে বলে ফকির।
> যার ভয়ে রাজা কাঁপে প্রজা নহে স্থির॥

মজনু ফকির সাহেব-সুবার মতই জাঁকজমকের সহিত চলিত ("সাহেব সুভার মত চলন সুঠাম"), ঘোড়ায় চড়িয়া যখন সে সদলবলে যাইত তখন তাহাকে 'মরদ গাজি' বলিয়াই মনে হইত:

> চৌদিকে ঘোড়ার সাজ তীর বরকন্দাজি।
> মজনু তাজির পর যেন মরদ গাজি॥

মৃত্যুর পর এই অত্যাচারী ব্যক্তিকে তাহার শিষ্যের দল অতি শ্রদ্ধাসহকারে

কবরস্থ করে।[১২০] তাহার অত্যাচার-সংক্রান্ত এই ছড়াতে এই যুগের তরল রাষ্ট্র ব্যবস্থার চিত্র ধরা পড়িয়াছে।

উনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে চব্বিশ পরগণা-যশোহর-নদীয়া জেলায় তিতুমীরের অত্যাচার সংক্রান্ত দুই চারিটি ছড়া রচিত হইয়াছিল। ১৭৭২ খ্রীঃ অব্দে চব্বিশ পরগণার হায়দারপুর গ্রামে তিতুমীরের জন্ম হয়। তিতু প্রথম জীবনে দুর্দান্ত লাঠিয়াল ছিল, গুণ্ডামির অপরাধে তাহার কয়েকমাস 'শ্রীঘর' বাসও হইয়াছিল। তাহার পরে মক্কায় তীর্থ করিতে গিয়া তিতু আরবের 'ওয়াহবি' সম্প্রদায়ের নেতা সৈয়দ আহমদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে। সারা দুনিয়ায় ধর্মযুদ্ধের দ্বারা পবিত্র ইসলাম ধর্ম প্রচার এই ধর্মান্ধ উপ-সম্প্রদায়ের মূলমন্ত্র হইল। ১৮২৯ সালে মক্কা হইতে ফিরিয়া তিতু ঐ মত প্রচার করিতে থাকে, অনেক নিম্নশ্রেণীর মুসলমান তাহার সম্প্রদায়ে যোগ দেয়, ক্রমে তাহার বিশেষ শক্তিবৃদ্ধি হয়। হিন্দু এবং তাহার মতে অবিশ্বাসী মুসলমানদের প্রতিও সে অত্যাচার শুরু করে। তাহার নির্দেশে তাহার শিষ্যেরা একটা বিশেষ মাপের দাড়ি রাখিত, মাথার মধ্যস্থল কামাইয়া ফেলিত। পুঁড়া-খোড়গাছি গ্রামের হিন্দু জমিদার ইহাদের শক্তিবৃদ্ধিতে শঙ্কিত ও বিরক্ত হইয়া প্রত্যেকের দাড়ি পিছু আড়াই টাকা কর ধার্য করেন। এই কর আদায় করিতে গিয়া তাঁহার লোকজনের সঙ্গে তিতুমীরের ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। তিতু নারিকেলবেড়িয়া গ্রামে বাঁশ পুতিয়া কেল্লা বানাইয়া তাহার মধ্যে তাহার দলবলকে আশ্রয় দেয়। এক ফকিরের নির্দেশেই সে চালিত হইত। যাহা হউক নদীয়া ও বারাসতে তাহার অত্যাচার চূড়ান্তরূপ ধারণ করে, তাহার এক অনুচর প্রবল প্রতাপশালী জমিদার দেবনাথ রায়ের মাথা কাটিয়া লয়, দারোগাকে হত্যা করে—নীলকুঠির সাহেব কুঠিয়াল কোনও প্রকারে পলাইয়া গিয়া প্রাণ রক্ষা করেন। কলিকাতা হইতে প্রথম দিকে যে সৈন্য ও অধিনায়ক প্রেরিত হন, তাঁহারাও তিতুর কাছে পরাভূত

---

১২০. "Majnu Shah died in March or May, 1787 (according to different report) at Makhanpur and his remains were carried to a famous burial place in the country of Mewaat lying to the southwards of Dholly."—J.M. Ghosh—*Sannyasi Fakir Raiders in Bengal* (সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায় 'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা' কাব্য হইতে উদ্ধৃত।

ও বন্দী হন, তাঁহাদের কেহ কেহ তিতুর হাতেই মারা পড়েন। গভর্নর জেনারেল লর্ড বেন্টিংকের আদেশে প্রেরিত নদীয়ার ম্যাজিস্ট্রেটও যখন প্রাণ লইয়া পলাইতে বাধ্য হইলেন তখন কলিকাতা হইতে কামান ও সৈন্য পাঠাইতে হইল। কামানের গোলার মুখে তিতুমীরের নারিকেলবেড়িয়ার বাঁশের কেল্লা ধূলিসাৎ হইল, ঘটনা-স্থলেই সে গুলি খাইয়া মরিল, তাহার বহু অনুচর মারা পড়িল, কাহারও ফাঁসি, কাহারও বা দীর্ঘ মেয়াদী কারাবাস হইল। তখন অত্যাচারিত হিন্দু জনসাধারণ ও হিন্দু জমিদার কিঞ্চিৎ সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষবশতঃ তিতুর অবশিষ্ট অনুচরদের ব্যঙ্গ বিদ্রূপ ও অত্যাচার করিয়া পূর্ব লাঞ্ছনার শোধ লইতে লাগিল। তিতুর আমীর হইবার দিবাস্বপ্নের চিরসমাধি হইল, গাজি বনিবার পবিত্র ইচ্ছাও পূরিল না। এই ব্যাপার লইয়া কিছু কিছু মুসলমান ছড়াকার তিতুকে প্রায় বাদশা বানাইয়া ছড়া রচনা করিয়াছিল :

তিতুমীর বাদশা হল হুকুম দিল উজিরের তরে।
মৈজুদ্দি উজির হয়ে হুকুম জারি করে।[১২১]

কিন্তু অত্যাচারিত হিন্দুরাই অধিকতরই তীক্ষ্ণ ভাষায় তিতুকে ব্যঙ্গ করিয়া অনেক ছড়া রচনা করিয়াছিল—এই ব্যঙ্গের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে সাম্প্রদায়িকতা আসিয়া গিয়াছিল।* তিতুমীরের ধ্বংসের পর তাহার অনেক অনুচর অত্যাচারিত হইবার ভয়ে দাড়ি কাটিয়া ফেলিয়াছিল, এই লইয়া ছড়াকার ব্যঙ্গ করিয়া গাহিয়াছিল :

উত্তরে এক গ্রাম ছিল নামে নারিকেলবেড়ে
তাতে হাজার দুই নেড়ে।
ওরে বুড়ো, ওরে বুড়ি আজকে গাঁয়ের হাট।
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট।
তিতুমীর বলে আল্লা বানাইলাম বাঁশের কেল্লা।
তাতে আমার নেই হেল্লা।
যেমন মাঠে ধান ছিল তেমনই হল মাঠ।
কেস্তে দিয়ে দাড়ি কাট।

আমরা বাল্যকালে নারিকেলবেড়িয়া, পুঁড়ো, খোড়গাছি, লাউঘাটি প্রভৃতি

১২১. বিহারীলাল সরকারের 'তিতুমীর' গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত।

* একালে রাজনৈতিক দলবাজির ফলে তিতুকে প্রথম শহিদ বানাইবার চেষ্টা হইয়াছে। ১৯৭২ সালের আনন্দবাজার পত্রিকায় (২৫ ডিসেম্বর) উমাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় সঙ্গতভাবেই এই সম্পর্কে প্রশ্ন তুলিয়াছেন। ১৯৭৩ সালের ৬ জানুয়ারির আনন্দবাজারে কওসর জামাল তাহার যে জবাব দিয়াছেন তাহা যথেষ্ট যুক্তিসঙ্গত ও প্রমাণসহ নহে।

গ্রামে গ্রাম্য ছড়াকারদের মুখে এইরূপ 'দাড়িকাটা'র রঙ্গ-রসাত্মক অনেক ছড়াগান শুনিতাম। তাঁহার দুই-এক পংক্তি এখনও স্মরণে আছে :

ঘেরলে রে নারকেলবেড়ে যত ত্যাংল্যায়।
এবার হাঁদু বলে দাড়ি ফেলে যদি রক্ষে পাই।

যাহা হউক একদা এইরূপ স্থানীয় উৎপাত ইত্যাদি লইয়া কিছু কিছু ছড়াপাঁচালী রচিত হইয়াছিল, ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত তাহার জের চলিয়াছিল। ইহার বিশেষ কোন কাব্যমূল্য না থাকিলেও সমাজজীবনের অনেক মূল্যবান তথ্য ইহাতে প্রচ্ছন্নভাবে নিহত আছে।* সেই জন্য সাহিত্যের ইতিহাসে ইহার উল্লেখ প্রয়োজন। এবার আমরা যথার্থ ইতিহাস বিষয়ক দুইখানি গ্রন্থের আলোচনা করিব—ত্রিপুরা রাজবংশের বিবরণী 'রাজমালা' এবং গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ'।

রাজমালা—ত্রিপুরারাজবংশের ইতিহাস 'রাজমালা' নামে একাধিকবার মুদ্রিত হইয়াছে। কিন্তু ইহার পুঁথি ও মুদ্রিত সংস্করণের মধ্যে নানা বিষয়ে বৈষম্য আছে।[১২২] ত্রিপুরারাজ কাশীচন্দ্র মাণিক্যের (১৮২৬—৩০ খ্রীঃ অঃ—রাজ্যকাল) কর্মচারী দুর্গামণি উজীর প্রাচীন রাজমালাকে ঊনবিংশ শতাব্দীর তৃতীয় দশকে কোথাও সংক্ষিপ্ত করিয়া, কোথাও-বা সম্পূর্ণরূপে অদল বদল করিয়া সম্পাদনা করেন। ১৩১১ ত্রিপুরাব্দে ইহাই ঈশানচন্দ্র ভট্টাচার্য কর্তৃক প্রকাশিত হয়। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাজমালার যে পুঁথি আছে (পুঁথি সংখ্যা—২২৫৯) তাহার লিপিকাল দুর্গামণি উজীরের নবসংস্করণের পূর্ববর্তী বলিয়া তাহা অধিকতর নির্ভরযোগ্য। ইহার সহিত দুর্গামণির গ্রন্থের তথ্যগত অনেক পার্থক্য আছে। প্রাচীন রাজমালা মোট চারিখণ্ডে বিভক্ত—প্রথম খণ্ড ত্রিপুররাজ ধর্মমাণিক্যের সময়ে (১৪৫৮—৯০), দ্বিতীয় খণ্ড অমর মাণিক্যের সময়ে (১৫৭৭—৮৬), তৃতীয় খণ্ড গোবিন্দমাণিক্যের সময়ে (১৬৩৭—৭৫) এবং চতুর্থ খণ্ড কৃষ্ণমাণিক্যের সময়ে (১৭৬০—৮৩) রচিত হইয়াছিল। কিন্তু প্রাচীন পুঁথি পাওয়া যায় নাই। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথমভাগে দুর্গামণি উজীর কর্তৃক সংশোধিত ও পরিমার্জিত

১২২. বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে রাজমালার একখানি প্রাচীন পুঁথি (পুঁ. সং—২২৫৯) আছে। ইহার সঙ্গে মুদ্রিত রাজমালার প্রচুর পার্থক্য দেখা যায়।

* দ্রষ্টব্য : পঞ্চভূত (সৌন্দর্য সম্বন্ধে সন্তোষ) "আমরা অন্তরে বাঁশের কেল্লা বাঁধিয়া তিতুমীরের মতো বহিঃ প্রকৃতির সমস্ত গোলা খা ডালা" র/র-১৪/পৃ. ৬৯৪

রাজমালাই আধুনিক মুদ্রিত রাজমালার মূল উৎস। দুর্গামণি স্বয়ং স্বীকার করিয়াছেন :

পুরাতন রাজমালা আছিল রচিত।
প্রসঙ্গেত অলঙ্কিক ভাষা যে কুৎসিৎ॥
পূর্ব্ব প্রসঙ্গ পবে পর পূর্ব্বে কত।
সেই ত কারণে লোকে নাহি বুঝে তত॥

* * *

বারশ আটত্রিশ সন ত্রিপুরা যখনি।
তাহাকে শুধিল পুনি উজির দুর্গামণি॥

প্রাচীন রাজমালার বিশৃঙ্খলা সংশোধন করিয়া দুর্গামণি ইহাকে নূতনভাবে রচনা করেন[১২৩] ১২৩৮ ত্রিপুরাব্দে। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে সংরক্ষিত রাজমালার পুঁথি হইতে জানা যায় যে, ধর্ম্মমাণিক্যের অনুরোধে তাঁহার দুইজন সভাপণ্ডিত বাণেশ্বর ও শুক্রেশ্বর এবং রাজকুলপুরোহিত চোন্তাই-প্রধান দুর্লভেন্দ্র ধর্ম্মমাণিক্যের শাসনকাল পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজবংশের বিবরণ লিপিবদ্ধ করেন। মনে হয় রাজবংশ সম্বন্ধে অভিজ্ঞ দুর্লভেন্দ্র ঘটনা বিবৃত করেন এবং সভাপণ্ডিতদ্বয় রচনা করেন। কারণ উক্ত পুঁথিতে আছে :

আর দুর্লভেন্দ্র নাথ চোন্তাই প্রধান।
রাজবংশ কথাতে বড় সাবধান॥

দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনী রাজা অমরমাণিক্যের সেনাপতি রণচতুর নারায়ণের নামে চলিলেও, মনে হয়, অন্য কেহ ইহা রচনা করিয়া থাকিবেন। বোধ হয় প্রধান উদ্যোগী সেনাপতির নামটি প্রকৃত রচনাকারের নাম-পরিচয় গ্রাস করিয়াছে।[১২৪] তৃতীয় খণ্ড সম্পর্কে পুঁথিতে আছে :

১২৩. ডঃ সুকুমার সেনের মতে, "ইহা চোন্তাই দুর্লভচন্দ্র, পণ্ডিত শুক্রেশ্বর ও পণ্ডিত বাণেশ্বর সঙ্কলিত 'রাজরত্নাকর' ও 'রাজমালা' অবলম্বনে লেখা। বাঙ্গালা রাজমালা উনবিংশ শতাব্দের মধ্যভাগের পূর্বে রচিত হয় নাই।" (বা সা ইতি, অপরাধ, পৃ ৫১২) ডঃ সেনের এ মন্তব্য পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। কারণ সাহিত্য পরিষদেই রাজমালার প্রাচীন পুঁথি আছে।

১২৪ রাজমালার সম্পাদক কালীপ্রসন্ন সেন এই প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "সেনাপতি বিবরণ কহিলেন, একথা পাওয়া যাইতেছে। কিন্তু এই লহরের (অর্থাৎ খণ্ড) রচয়িতা কে তাহা পাওয়া যায় না। সেনাপতি স্বয়ং রচনা করিয়াছিলেন রাজমালার উক্তির দ্বারা এরূপ বুঝা যায় না। শতাধিক বৎসর বয়স্ক স্থবির সৈনিক বিভাগের কর্মচারী দ্বারা গ্রন্থ রচিত হওয়া সম্ভাব্যও নহে। রণচতুরের বর্ণনানুসারে নিশ্চয়ই কোন সভাপণ্ডিত কর্তৃক রাজমালার এই অংশ রচিত হইয়াছিল।"

গোবিন্দ মাণিক্য রাজা পুস্তক লিখাইয়া।
মন্ত্রিএ কহিল তাহা শুনিল চিত্ত দিয়া।[১২৫]

গোবিন্দমাণিক্য পুস্তক লিখাইয়া লন এবং মন্ত্রী তাহা বলিয়া যান। এখানেও প্রকৃত লেখকের নাম পাওয়া যাইতেছে না। কেবল চতুর্থ খণ্ডটির রচনাকাল ও রচনাকারের নাম পাওয়া যায়। ইহাতে দেখা যাইতেছে, কৃষ্ণমাণিক্যের নির্দেশে মন্ত্রীর উদ্যোগে বৃদ্ধ বিশ্বাসনারায়ণই অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে চতুর্থ খণ্ড রচনা করেন। যাহা হউক প্রাচীন রাজমালার কোন প্রামাণিক পুঁথি পাওয়া যায় নাই এবং মুদ্রিত রাজমালা সম্পূর্ণ নির্ভরযোগ্য নহে তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

রাজমালা ত্রিপুরা রাজবংশের বৃত্তান্ত হইলেও ইহার সঙ্গে উক্ত অঞ্চলের তদানীন্তন সমাজ ও ইতিহাসের ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ আছে। ইহার কিছু কিছু বর্ণনাও কৌতূহলোদ্দীপক। ত্রিপুরারাজের সঙ্গে পাঠান ও মুঘলের যে সমস্ত যুদ্ধ বর্ণিত হইয়াছে তাহাতে অবশ্য প্রায়ই ত্রিপুরারাজকে জয়ী বলা হইয়াছে—যাহা হয়তো ইতিহাস হিসাবে সব সময়ে সত্য নহে। তবে সেই সময়ের স্থানীয় রাজনীতি ও ইতিহাসের উপাদান হিসাবে এই ইতিহাস-কাব্যের মূল্য স্বীকার করিতে হইবে। এখানে এইরূপ দুই একটি বৈশিষ্ট্যের উল্লেখ করা যাইতেছে। ত্রিপুরারাজবংশে সেনাপতিদের বিশেষ প্রাধান্য ছিল, কারণ রাজারা অনেক সময়ে সেনাপতিদের সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করিতেন। ফলে কোন কোন রাজা সেনাপতির হাতের পুতুলে পরিণত হইতেন। রাজা বিজয়মাণিক্যের সেনাপতি দৈত্যনারায়ণ এতটা প্রবল হইয়াছিলেন যে রাজা সক্ষোভে বলিয়াছিলেন, "আমার নহে এ রাজ্য দৈত্যনারায়ণ"। এমন কি সেনাপতি বা তাঁহার কোন আত্মীয় অতিশয় ঘৃণ্য কুকর্ম করিলেও রাজা তাহাকে শাস্তি দিতে ভয় পাইতেন। কোন কোন

---

১২৫. দুর্গামণি উজীর বলিয়াছেন, তৃতীয় খণ্ড রাজা রামমাণিক্যের দ্বারপণ্ডিত সিদ্ধান্তবাগীশ রচনা করেন:

সিদ্ধান্তবাগীশ কহে কর অবধান।
যাহা দেখি শুনিয়াছি বলিব আখ্যান।

তবে দুর্গামণির এই উক্তি কতদূর বিশ্বাসযোগ্য তাহাতে সন্দেহ আছে। তৃতীয়খণ্ড রাজা গোবিন্দ মাণিক্যই উদ্যোগী হইয়া লিখাইয়াছিলেন। দ্রষ্টব্য: সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা'—পৃ. ২০—২১

সময়ে অসহিষ্ণু রাজা সেনাপতির আধিপত্য সহ্য করিতে না পারিয়া চরমপন্থা অবলম্বন করিতেন। বিজয়মাণিক্য শেষ পর্যন্ত সেনাপতি দৈত্যনারায়ণকে হত্যা করিতে বাধ্য হন। রাজমালার আরও একটি কৌতূহলজনক তথ্য—ত্রিপুরায় একদা পানাসক্তি অতি প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল; এমন কি স্ত্রীলোকেও মদ্যপান করিয়া উচ্ছৃঙ্খল আচরণ করিত। শুনা যায় ধর্মমাণিক্যের রাণী রমণীদের মদ্যপান করাইয়া তাহাদিগকে মত্ত অবস্থায় অসম্বদ্ধ আচরণ করিতে দেখিতে ভালবাসিতেন। রাজমালার বর্ণনানুসারে দেখা যাইতেছে তখন ত্রিপুরায় এক পয়সায় দুই সের মদ মিলিত। সুতরাং 'দীয়তাং পীয়তাং' যে একটু বেশী মাত্রায় চলিত তাহাতে আর সন্দেহ কি?[১২৬] ইহাতে স্থানে স্থানে অতিরঞ্জনদুষিত অপ্রামাণিক বর্ণনা থাকিলেও বাংলা সাহিত্যে ইতিহাসাশ্রিত রাজবংশমালা হিসাবে ইহার বিশিষ্ট স্থান স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু ইহার মুদ্রিত সংস্করণের রচনাভঙ্গিমা আধুনিক লক্ষণাক্রান্ত, নীরস ও কাব্যগুণবর্জিত। বিষয়গত নূতনত্ব ছাড়া ইহার আর কোন গুণ নাই।

সম্প্রতি ত্রিপুরারাজবংশ-সংক্রান্ত আর একখানির পুঁথির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। ইহায় নাম 'চম্পকবিজয়'। ইহার একখানি প্রাচীন পুঁথি ডঃ দীনেশচন্দ্র ভট্টাচার্যের নিকট আছে, আর একখানি আধুনিক নকল আগরতলার রাজগ্রন্থাগারে আছে। ইহাতে ত্রিপুরারাজ রত্নমাণিক্যের (রাজত্বকাল—১৬৮৫—১৭১০ খ্রীঃ অঃ) রাজ্যচ্যুতি নরেন্দ্রমাণিক্যের বিদ্রোহ, সেনাপতির সহায়তায় রত্নমাণিক্যের পুনরায় সিংহাসনলাভ, যুবরাজ চম্পকরায়ের বিশেষ সহায়তা এবং পরিশেষে রাজা হইতে বাসনা করিলে সৈন্যদের দ্বারা নিহত হইবাব বৃত্তান্ত বর্ণিত হইয়াছে। ক্ষুদ্র ত্রিপুরা রাজ্যে একদা সিংহাসন লইয়া যে পারিবারিক হানাহানি ঘটিয়াছিল তাহার অনেক বিবরণ এই জাতীয় রাজবংশের ইতিহাসে আছে। এই পারিবারিক কাব্যের কবির নাম সেখ মহদ্দি। কবি রাজা রত্নমাণিক্যকে অতিশয় শ্রদ্ধা করিতেন, কাব্যটির ছত্রে ছত্রে সেই শ্রদ্ধা ফুটিয়া উঠিয়াছে। মনে হয় এই কাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর গোড়ার দিকে রচিত হইয়াছিল।[১২৭] এই অকিঞ্চিৎকর ঐতিহাসিক কাব্যের পারিবারিক তথ্য ও রাজবংশের হানাহানির বর্ণনায়

১২৬. দ্রষ্টব্য: সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কাব্য, পৃ ২৪-২৫

১২৭. ঐ, পৃ ২৯

আমাদের বিশেষ প্রয়োজন নাই। কিন্তু ইহা হইতেই দেখা যাইতেছে, ত্রিপুররাজগণ ধর্মমতে কেহ শৈব, কেহ শাক্ত, কেহ বৈষ্ণব হইলেও[১২৮] তাঁহারা মুসলমান সেনাপতি, মন্ত্রী ও উচ্চ রাজকর্মচারী নিয়োগে কুণ্ঠিত হইতেন না। রাজ্যচ্যুত রত্নমাণিক্য তাঁহার সেনাপতি মির খাঁ গাজীর সাহায্যে হৃতরাজ্য পুনরুদ্ধার করেন, মির খাঁ-ই কবি সেখ মহদ্দিকে দিয়া 'চম্পকবিজয়' লিখাইয়াছিলেন। যাহা হউক এই সমস্ত ঐতিহাসিক কাব্যকাহিনীর ঐতিহাসিক মূল্য যেরূপ হউক, কাব্যমূল্য যে নিতান্তই অকিঞ্চিৎকর তাহাতে সন্দেহ নাই।[১২৯]

গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ—নানা দিক দিয়া গঙ্গারামের 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইহাই একমাত্র ইতিহাসাশ্রিত যথার্থ তথ্যকাব্য।* ইহাতে ১৮শ শতাব্দীর মধ্যভাগে বাংলাদেশের বর্গীর হাঙ্গামার কাহিনী অত্যন্ত নিপুণ বাস্তবতার সঙ্গে বর্ণিত হইয়াছে। দুই একস্থলে কিছু ইতিহাসবিরোধী কথা থাকিলেও কবি ইহার প্রায় সর্বত্র ঐতিহাসিকের বস্তুগত নিষ্ঠা রক্ষা করিয়াছেন। বর্ণনা পড়িতে পড়িতে মনে হয় যেন কবি স্বচক্ষে সমস্ত ব্যাপার দেখিয়া ইহা লিপি-বদ্ধ করিয়াছিলেন। তাই ইহাকে মধ্যযুগের একমাত্র ইতিহাস-কাব্য বলা

---

১২৮. সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে ত্রিপুরারাজগণ প্রধানতঃ শৈব ছিলেন, কেহ কেহ শাক্ত মতও গ্রহণ করিয়াছিলেন। যেমন যুবরাজ চম্পক রায় তন্ত্রমতে লক্ষ হোম করিয়াছিলেন, যুবরাজ রাজধর আবার বৈষ্ণবমত গ্রহণ করিয়াছিলেন।

১২৯ গাজীনামা (ত্রিপুরারাজ কাহিনীর অংশ বিশেষ), কান্তনামা (কাশিমবাজারের রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা কান্তবাবু এবং উক্তবংশধর রাজা হরিনাথ ও কৃষ্ণনাথের কীর্তিকথা), কুচবেহার রাণী বৃন্দেশ্বরীর 'বেহারোদন্ত' (কুচবিহার রাজবংশের কাহিনী) প্রভৃতি পারিবারিক ইতিহাস প্রায়শই সাহিত্যগুণবর্জিত বলিয়া এখানে আলোচনা করা হইল না। উপরন্তু এগুলি ১৯শ শতাব্দীর রচনা—আমাদের আলোচনার অন্তর্ভুক্ত নহে। কৌতূহলী পাঠক এবিষয়ে সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উল্লিখিত গ্রন্থ দেখিতে পারেন।

* উড়িষ্যার ঢেন্‌কানলবাসী কবি ব্রজনাথ বড়জেনা তাঁহার অঞ্চলে বর্গীর হাঙ্গামা অবলম্বনে অষ্টাদশ শতাব্দীতে ওড়িয়া ভাষায় 'সমরতরঙ্গ' শীর্ষক একখানি ঐতিহাসিক কাব্য লিখিয়াছিলেন। ইহা অবশ্য যথার্থই কাব্য হইয়াছে, গঙ্গারামের মতো শুধু কাহিনীমাত্র হয় নাই।

যাইতে পারে, যাহা ততটা কাব্যধর্মী না হইলেও ঐ সময়ের প্রকৃত ইতিহাস হইয়াছে বটে।

বাংলা ১৩১১ সনে ময়মনসিংহে যে কৃষিশিল্পপ্রদর্শনী হয় তাহাতে স্থানীয় পত্রিকা 'সৌরভে'র সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদার মহাশয় এই কাব্যের একখানি পুরাতন পুঁথি জনসাধারণের জ্ঞাতার্থে উক্ত প্রদর্শনীতে উপস্থিত করিয়াছিলেন। ইহার বছর দুই পরে সাহিত্য পরিষদের ব্যোমকেশ মুস্তাফী মহাশয় ১৩১৩ সনের সাহিত্য পরিষদ পত্রিকার ৩য় সংখ্যায় উক্ত মহারাষ্ট্র পুরাণের গোটাটা ছাপাইয়া দেন এবং খানিকটা ভূমিকা জুড়িয়া দিয়া তাহাতে কবিপরিচয় ও কাব্যে বর্ণিত ঐতিহাসিক ঘটনা সম্পর্কে আলোচনা করেন। উহাতে তিনি কবিকে পশ্চিমবঙ্গের অধিবাসী বলিয়া প্রমাণ করেন, এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন যে, ইহাতে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকিলেও কবি যথাসম্ভব ঐতিহাসিক ঘটনা অনুসরণ করিয়াছেন। ইহার প্রায় দুই বৎসর পরে কেদারনাথ মজুমদার সাহিত্য পরিষদ পত্রিকায় (১৩১৫, ৪র্থ সংখ্যা) ব্যোমকেশ মুস্তাফীর উক্ত প্রবন্ধের কোন কোন উক্তি প্রতিবাদ করিয়া বলেন যে, তিনিই (মজুমদার মহাশয়) ময়মনসিংহের গ্রাম হইতে উক্ত কাব্য আবিষ্কার করিয়াছেন এবং কবির পরিচয় সংগ্রহ করিয়া পূর্বেই 'ময়মনসিংহের বিবরণে' (তাঁহার রচিত ইতিহাস) তাহার আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়াছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে মহারাষ্ট্র পুরাণের সন তারিখযুক্ত একখানি পুঁথিও আছে (পুঁথি. সং. ১৭৮৪)। এখানে পুঁথির প্রথম পৃষ্ঠার আলোকচিত্র মুদ্রিত হইল।

গঙ্গারামের জীবনকথা সম্পর্কে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' আবিষ্কর্তা কেদারনাথ মজুমদার মহাশয়ের মতামত অধিকতর যুক্তিগ্রাহ্য বলিয়া তাঁহার প্রদত্ত তথ্য এখানে গৃহীত হইল। কেদারনাথ ১৯০৭ সালে সংবাদ পান যে, ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ মহকুমার অন্তর্ভুক্ত ধরীশ্বর গ্রামে মহারাষ্ট্র পুরাণের কবি গঙ্গারাম জন্মগ্রহণ করেন। সেই গ্রামে গিয়া কেদারনাথ কবির বংশধরের সাক্ষাৎ পাইয়া তাঁহার নিকট হইতে কবি সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগ্রহ করিলেন। তাঁহার সংগৃহীত তথ্যানুসারে দেখা যাইতেছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে ধরীশ্বর গ্রামে গঙ্গারামের জন্ম হয়। গঙ্গারামের প্রপিতামহ হরিদাস দেব অন্য কোন স্থান হইতে ধরীশ্বর গ্রামে আসিয়া বসবাস করেন। ঐ গ্রামে

বর্তমান কালে কিছু দিন পূর্বেও তাঁহার বংশধারা বর্তমান ছিল। গঙ্গারাম জঙ্গলবাড়ীর ইশা খাঁয়ের বংশধর এক মুসলমান জমিদারের সেরেস্তায় কর্ম করিতেন। তাঁহাকে মাঝে মাঝে রাজস্ব ও অন্যান্য হিসাবনিকাশের জন্য মুর্শিদাবাদে নবাব সরকারে আসিতে হইত। কেদারনাথের সংগৃহীত তথ্যাদি হইতে দেখা যাইতেছে যে, কবি যখন মুর্শিদাবাদে যাতায়াত করিতেন তখন পশ্চিমবঙ্গে বর্গীর হাঙ্গামা হয়। কবি সম্ভবতঃ তখন তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া থাকিবেন, কিংবা হয়তো মুর্শিদাবাদে কর্মসূত্রে যাতায়াত করিবার কালে তিনি স্থানীয় জনসাধারণের মুখে বর্গীর হাঙ্গামার প্রত্যক্ষ বিবরণ শুনিয়াছিলেন। কবি জঙ্গলবাড়ীর জমিদারের সেরেস্তায় দক্ষতার সঙ্গে কর্ম সম্পাদন করিয়া চৌধুরী উপাধি পাইয়াছিলেন, কায়স্থ কবির লৌকিক উপাধি ছিল 'দেব'। কবি বেশ শিক্ষিত ছিলেন, তাঁহার মার্জিত রচনাভঙ্গিমা তাহার প্রমাণ, জমিদারের সঙ্গে মতান্তরের ফলে তিনি উক্ত কর্ম ত্যাগ করেন। কেদারনাথ বাংলা ১৩০৭ সনে যখন ময়মনসিংহের ইতিহাসের উপাদান সংগ্রহের জন্য ধরীশ্বর গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন কবির বংশধরের নিকট গঙ্গারাম (গঙ্গানারায়ণ) রচিত 'শুকসংবাদ', 'লবকুশের চরিত্র', ও 'ভাস্করপরাভব' অর্থাৎ মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ইহার চারি বৎসর পরে ১৩১১ সনে ময়মনসিংহে অনুষ্ঠিত কৃষিশিল্প প্রদর্শনীতে মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথিটি উপস্থাপিত হইয়াছিল।[১৩০]

ব্যোমকেশ মুস্তাফী সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩, ৩য় সংখ্যা) এই পুঁথিটি মুদ্রিত করেন। ইহাতে যে টিপ্পনী ও ভূমিকা যোগ করিয়াছিলেন তাহাতে তিনি কবি সম্বন্ধে বিশেষ কোন সংবাদ দিতে পারেন নাই। তবে তিনি স্বীকার করিয়াছিলেন যে, পুঁথিটি পূর্ববঙ্গের কোন লিপিকারের দ্বারা নকল করা হইয়াছিল বলিয়া ইহাতে এত পূর্ববঙ্গীয় শব্দ স্থান পাইয়াছে।

১৩০. ডঃ সুকুমার সেনের মতে উক্ত পুঁথিটি নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহ। "পুঁথি নগেন্দ্রনাথ বসুর সংগ্রহ, সুতরাং দক্ষিণরাঢ় অথবা মল্লভূম হইতে পাওয়া বলিয়া অনুমান হয়" (বা. সা. ইতি, অপরার্ধ, পৃ ৫০৬, পাদটীকা)। কিন্তু এ অনুমান পুরাপুরি গ্রহণ করা যায় না। কারণ কেদারনাথ মজুমদার সাহিত্যপরিষদ পত্রিকায় প্রকাশিত প্রবন্ধে ('কবি গঙ্গারাম ও মহারাষ্ট্র পুরাণ'' সা-প-প, ১৩১৫।৪) স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, তিনি ময়মনসিংহ হইতেই মহারাষ্ট্র পুরাণের পুঁথি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুঁথিটিতে (পুঁ. সং. ১৭৮৪) প্রচুর পূর্ববঙ্গীয় শব্দ আছে। সুতরাং পুঁথিটি এবং কবিকে পূর্ববঙ্গেরই বলিতে হইবে।

তিনি গঙ্গারামকে রাঢবাসী মনে করিয়াছিলেন, কারণ পুঁথিতে কিছু কিছু অনুনাসিক স্বরের প্রয়োগ আছে। ইহার অনেক দিন পরে অধ্যাপক রমেশ-চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ১৩৪৬ সনের শ্রাবণ সংখ্যা 'ভারতবর্ষে' "যশোহরের অখ্যাতনামা কবি গঙ্গারাম দত্ত" শীর্ষক প্রবন্ধে বলিয়াছেন যে, যশোহর নড়াইলের কবি গঙ্গারাম দত্ত রামায়ণ, 'সুদামাচরিত্র', 'উষাহরণ', 'সত্যনারায়ণের কথা' রচনা করিয়াছিলেন। 'সুদামাচরিত্রে'র পুষ্পিকা হইতে জানা যায় যে, এই কবি সিরাজদ্দৌলার সময় বর্তমান ছিলেন। অধ্যাপক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতে, "এই গঙ্গারামই মহারাষ্ট্র পুরাণ রচয়িতা।" প্রবন্ধকার নড়াইলের কবি গঙ্গারাম দত্তের পূর্ব-পরিচয়ও সংগ্রহ করিয়া-ছিলেন। এই দত্তবংশ হাওড়া শহরের নিকটবর্তী বালিগ্রামে বাস করিতেন। পরে বর্গীর উৎপাতের সময়ে তাঁহারা প্রথমে মুর্শিদাবাদ এবং সেখান হইতে নড়াইলে গিয়া বসবাস করিতে থাকেন। কিন্তু নড়াইলের গঙ্গারাম দত্ত এবং মহারাষ্ট্র পুরাণের গঙ্গারাম যে এক ব্যক্তি, অধ্যাপক রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কেদারনাথ মজুমদার সংগৃহীত তথ্য হইতে গঙ্গারামকে পূর্ববঙ্গের কবি বলিয়া মনে হইতেছে—অবশ্য জমিদারী কর্মোপলক্ষে তিনি ময়মনসিংহ হইতে মুর্শিদাবাদ যাতায়াত করিতেন। তাঁহার কাব্যে এত অধিক পূর্ববঙ্গীয় শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে যে, (কইরা, গুইলা অর্থাৎ গুলিয়া, ধইরা, ছাইরা, আইসতে, সুইনা, আইসা ইত্যাদি) কবিকে রাঢ়বাসী বলিতে দ্বিধা হয়।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে রক্ষিত মহারাষ্ট্রপুরাণের পুঁথিতে কাব্যরচনার সন এইভাবে উল্লিখিত হইয়াছে—"ইতি মহারাষ্ট্র পুরাণে প্রথম কাণ্ডে ভাস্করপরাভব শকাব্দ ১৬৭২ সন ১১৫৮ সাল তারিখ ১৪ই পৌষ রোজ শনিবার।" অর্থাৎ এই কাব্য ১৭৫১ খ্রীঃ অব্দে রচিত হয়। প্রাপ্ত পুঁথিটির লিপিও বোধহয় ঐ একই কালের। এই পুষ্পিকা হইতে অনুমান হয়, কবি মহারাষ্ট্র পুরাণের শুধু প্রথম কাণ্ডটি ('ভাস্করপরাভব') রচনা করিয়া-ছিলেন—যাহার সমাপ্তিতে বর্গী নেতা ভাস্করপণ্ডিতের হত্যাকাণ্ড বর্ণিত হইয়াছে। বোধহয় বর্গীর হাঙ্গামার পরবর্তী বিবরণ দেওয়াও তাঁহার অভিপ্রেত ছিল—হয়তো পরবর্তী কাণ্ডে তিনি অন্যান্য বিবরণ লিপিবদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু প্রথম কাণ্ডটি ব্যতীত মহারাষ্ট্রপুরাণের আর

কোন কাণ্ডের পুঁথি পাওয়া যায় নাই—মনে হয় তিনি আর কোন কাণ্ড রচনা করেন নাই।

বর্গীর হাঙ্গামা একদা সমগ্র পশ্চিমবঙ্গের ধনেপ্রাণে সর্বনাশ করিয়াছিল। সেই ব্যাপক ক্ষতি ও অত্যাচারের ক্ষতচিহ্ন বাঙালী কোন দিনই ভুলিতে পারে নাই, নর-নারী-শিশু—সকলেরই চিত্তে সেই দুঃস্বপ্নের স্মৃতি পুরুষানুক্রমে চলিয়া আসিতেছে। একদা যেমন ইংলণ্ডের মাতারা দুষ্ট শিশুকে নেপোলিয়নের ভয় দেখাইয়া ঘুম পাড়াইত, তেমনি বাংলাদেশেও বহু দিন 'বর্গী এলো দেশে' এই ছড়া গাহিয়া মায়েরা শিশুদের শান্ত করিত। বস্তুতঃ অর্থনৈতিক, সামাজিক, নৈতিক,—সব দিক দিয়াই বর্গীর অভিযান বাঙালীর মনে তীব্র ঘৃণা-বিতৃষ্ণা ও প্রচণ্ড সন্ত্রাস সৃষ্টি করিয়াছিল। ইতিপূর্বে এই পর্বের প্রারম্ভে রাজনৈতিক ইতিহাস আলোচনার সময় আমরা দেখিয়াছি যে, ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দ হইতে ১৭৪৯ খ্রীঃ অব্দ পর্যন্ত—প্রায় সাত বৎসর ধরিয়া পশ্চিম বাংলায় মারাঠা লুঠেরা বর্গী অমানুষিক অত্যাচার চালাইয়া এদেশে কৃষি-ব্যবস্থা নষ্ট, ব্যবসাবাণিজ্যের অপূরণীয় ক্ষতিসাধন এবং হত্যা, ধর্ষণ ইত্যাদি নারকীয় ব্যাপারের অনুষ্ঠান করিয়া সমগ্র পশ্চিম-বঙ্গকে শ্মশানভূমিতে পরিণত করিয়াছিল। বহু সংঘর্ষ ও দুঃখলাঞ্ছনার পর শেষ পর্যন্ত আলিবর্দি মারাঠা নেতা রঘুজীকে বার লক্ষ টাকা চৌথ দিতে স্বীকৃত হন। ইহার পর উড়িষ্যা ও মেদিনীপুরের উত্তরাংশ দীর্ঘকালের জন্য মারাঠাদের অধিকারে চলিয়া যায়। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দের শীতকালে বাংলায় মারাঠাদের প্রথম অত্যাচার শুরু হয়, ১৭৪৩ সালে দ্বিতীয় অভিযান এবং ১৭৪৪ সালে তৃতীয় অভিযানে বর্গীর নেতা ভাস্করপণ্ডিত এদেশে অবর্ণনীয় অত্যাচার চালাইয়াছিলেন। অবশ্য এই অভিযানে বর্গীরা প্রচুর লুঠতরাজ করিলেও ভাস্করপণ্ডিত দুইবার বিতাড়িত হইয়া প্রচুর ক্ষতির সম্মুখীন হইয়াছিলেন। বিশেষতঃ প্রথম বার তিনি যখন কাটোয়ায় মহাসমারোহে দুর্গাপূজা করিতেছিলেন তখন আলিবর্দির অতর্কিত আক্রমণে অষ্টমী পূজার রাত্রে প্রতিমা ফেলিয়া পলাইতে বাধ্য হন। দ্বিতীয় অভিযানে আলিবর্দির সঙ্গে পেশোয়া বালাজী রাওয়ের সন্ধি হইলে[১৩১] বালাজীর প্রতিযোগী রঘুজী ও সহচর ভাস্করপণ্ডিত তাঁহার

১৩১ দ্বিতীয় অভিযানে এই মর্মে সন্ধি হয় যে, আলিবর্দি মারাঠারাজ সাহুকে রাজস্বের এক চতুর্থাংশ (চৌথ) দিবেন। তিনি সৈন্যদের ব্যয়নির্বাহের জন্য পেশোয়া বালাজী রাওকে বাইশ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন।

দ্বারা আক্রান্ত হইয়া বাংলা হইতে বিতাড়িত হন—তাঁহাদিগকে প্রভূত ক্ষতি স্বীকার করিতে হয়। তৃতীয় অভিযানে (১৭৪৪) ভাস্কর পণ্ডিত শক্তিবৃদ্ধি করিয়া পুনরায় বাংলার অভিযান শুরু করেন এবং প্রচণ্ডতম অত্যাচার চালাইতে থাকেন। হৃতসর্বস্ব আলিবর্দি তখন দেওয়ান জানকীরাম ও সিপাহশালার মুস্তাফা খাঁয়ের কৌশলে ভাস্কর ও তাঁহার মুষ্টিমেয় অনুচরকে নিরস্ত্র অবস্থায় মানকরার শিবিরে লইয়া আসেন এবং সানুচর ভাস্করকে হত্যা করিয়া (৩১ মার্চ, ১৭৪৪) বাংলাকে কিছু দিনের জন্য মারাঠা লুঠেরাদের অত্যাচার হইতে রক্ষা করিতে সমর্থন হন।

গঙ্গারাম তাঁহার 'মহারাষ্ট্র পুরাণে'র প্রথমকাণ্ডে ('ভাস্কর পরাভব') ভাস্কর পণ্ডিতের বাংলায় আগমন এবং আলিবর্দি কর্তৃক নিহত হইবার কাহিনী বর্ণনা করিয়াছেন। অবশ্য ১৭৪২ হইতে ১৭৪৩ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে প্রেরিত তিনটি বর্গী অভিযানের মধ্যে দ্বিতীয় অভিযান সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তাহার কাব্য হইতে মনে হয় ভাস্কর পণ্ডিত পর পর দুই অভিযানের শেষে নিহত হইয়াছিলেন। ইতিহাসে দেখা যাইতেছে, দ্বিতীয় অভিযানের (যাহার সম্বন্ধে কবি কিছু বলেন নাই) নেতৃত্ব করিয়াছিলেন নাগপুরের রঘুজী ভোঁশলা, ভাস্কর তাঁহার অনুচর রূপেই উপস্থিত ছিলেন এবং পেশোয়া বালাজী বাজী রাও-ই তাঁহাকে বাংলা হইতে বিতাড়িত করিয়া আলিবর্দির সঙ্গে সন্ধি সূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিলেন। তাই বোধ হয় কবি দ্বিতীয় অভিযান সম্বন্ধে কিছু বলেন নাই।

গঙ্গারাম মহারাষ্ট্র পুরাণের আরম্ভ ও সমাপ্তিতে পুরাণের আদর্শ অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু এই সামান্য অংশ বাদ দিলে কাব্যটিতে যে তথ্য বিবৃত হইয়াছে, মারাঠা বর্গীর অভিযান সম্পর্কে তদপেক্ষা সমসাময়িক নির্ভরযোগ্য উপাদান পাওয়া যায় না। কবি ইহাতে অনেকটা আধুনিক ঐতিহাসিকের মতো অতি সতর্কতার সঙ্গে ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহ করিয়াছেন। সে যুগের গমনাগমনের অসুবিধা ও উপাদান সংগ্রহের পরিবেশের অভাব সত্ত্বেও দেশীয়-মতে-শিক্ষিত এই পূর্ববঙ্গের কবি পশ্চিমবঙ্গের দুঃস্মরণীয় ঐতিহাসিক ঘটনা বর্ণনায় যেরূপ বস্তুগত দৃষ্টিভঙ্গিমার পরিচয় দিয়াছেন তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে।

কাব্যটি এইভাবে শুরু হইয়াছে। মর্ত্যে অত্যাচার-অনাচার দেখিয়া মহাদেব অনুচর নন্দীকে* বলিলেন :

নন্দীকে দেখিয়া শিব বলিছে বচন।
দক্ষিণ শহরে তুমি জাহ ততক্ষণ॥
সাহুরাজা নামে এক আছে পৃথিবীতে।
অধিষ্ঠান হও যাইয়া তাহার কণ্ঠেতে॥
বিপরীত পাপ হৈল পৃথিবী উপরে।
দূত পাঠাঞা জেন পাপিলোকে মারে॥

এই আদেশ পাইয়া নন্দী সাহুরাজাকে অনুরূপ কথা জানাইলে রাজা তাঁহার অনুচর রঘুরাজাকে বলিলেন :

সাহুরাজা বোলে তবে রঘুরাজার তবে।
অনেক দিন হৈল বাঙ্গালার চৌত না দেয় মোরে॥
দুত পাঠাঞা দেঅ বাদশার স্থানে।
বাঙ্গালার চৌথাই না দেএ কিসের কারণে॥

ইতিহাস হইতে দেখা যাইতেছে শিবাজীর পৌত্র সাহুজী বালাজী বিশ্বনাথ নামক এক ব্রাহ্মণের উপদেশে সাতারার রাজা হইয়া (১৭০৮) বসেন এবং বিশ্বনাথকে প্রধানমন্ত্রী বা পেশোয়ার পদে নিযুক্ত করেন (১৭১৪)। ১৭১৯ খ্রীঃ অব্দে বালাজী বিশ্বনাথ দিল্লীশ্বর ফারুকসায়রের নিকট হইতে সাহুর নামে ফারমান আনয়ন করেন এবং দাক্ষিণাত্যের ছয়টি সুবা হইতে 'চৌথ' (এক-চতুর্থাংশ রাজস্ব) ও 'সরদেশমুখী' (একদশমাংশ) আদায়ের অনুমতি লাভ করেন। সরফরাজ নিধনের পর বাংলাদেশে আলিবর্দি নবাব হইয়া প্রায় দুই বৎসর দিল্লীতে কোন রাজস্ব পাঠান নাই। ১৭৪০ সালে মারাঠারা দিল্লীর বাদশাহের নিকট বাংলার চৌথ দাবি করিলে বাদশাহ তাঁহাদিগকে আলিবর্দির নিকট হইতে চৌথ আদায় করিবার অনুমতি দিলেন। সাহু চৌথ আদায়ের ভার দিলেন নাগপুরের রঘুজী ভোঁসলের উপর। রঘুজীর সঙ্গে যোগ দিল মির হাবিব নামে আলিবর্দির এক অসন্তুষ্ট কর্মচারী। তখন রঘুজী তাঁহার অনুচর ভাস্কররাম বা ভাস্করপণ্ডিতের সহায়তায় উড়িষ্যা ও বাংলা অভিযানে সঙ্কল্প করিলেন। ১৭৪১ সালে পূজার সময় বিজয়াদশমী

---

* ১৭৫২-৫৩ খ্রীঃ অব্দে সমাপ্ত অন্নদামঙ্গলেও ভারতচন্দ্র বর্গীর হাঙ্গামা প্রসঙ্গে মহাদেব-নন্দী ঘটিত কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিয়াছেন।

দিবসে ('দশেরা') ভাস্করের নেতৃত্বে দশ হাজার অশ্বারোহী সৈন্যসহ রঘুজী যাত্রা করিলেন। গঙ্গারামের ঐতিহাসিক কাহিনী এইস্থান হইতে শুরু হইয়াছে। কবির বর্ণনায় দেখা যাইতেছে সাহুজী বাংলার চৌথ আদায়ের ভার দিলেন রঘুরাজার উপর, রঘু সে ভার দিলেন ভাস্করপণ্ডিতের উপর। ভাস্কর সাতারা ছাড়িয়া বিজাপুর হইয়া নাগপুরে পৌঁছিলেন এবং বাংলার আলিবর্দি-সংক্রান্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া বীরভূম বামে বাখিয়া গোপভূমের পার্শ্ব দিয়া গোপনে সসৈন্যে বর্ধমানের নিকট উপস্থিত হইলেন। সেখানে রাণীদীঘির পাড়ে পূর্বেই আলিবর্দি অবস্থান করিতেছিলেন। ১৭৪২ খ্রীঃ অব্দের (১১৪৯ বঙ্গাব্দ) ১৯শে বৈশাখ তারিখে সংঘর্ষ শুরু হইল :

বৈশাখের উনিশায় বর্গী আইলা তায়
মহা আনন্দিত হৈয়া মনে।

আলিবর্দি সংবাদ পাইলেন যে, চৌথ আদায় করিবার জন্য সাহুরাজার হুকুমে ভাস্করপণ্ডিতের নেতৃত্বে মারাঠা বর্গীরা বাংলায় হাজির হইয়াছে। তিনি উকিল দিয়া ভাস্করকে বলিয়া পাঠাইলেন, তিনি দিল্লীতেই রাজস্ব দেন, মারাঠারা সেখান হইতে চৌথ লউক। কিন্তু ভাস্কর জবাব পাঠাইলেন, দিল্লীশ্বরের কথামতোই তাঁহারা বাংলায় চৌথ আদায় করিতে আসিয়াছেন, চৌথ না পাইলে দেশ ছারখার করিয়া দিবেন। এই সংবাদে দুই দলের মধ্যে সাজ-সাজ রব পড়িয়া গেল, ভাস্কর সাত দিন ধরিয়া নবাবের শিবির অবরোধ করিয়া রাখিলেন। নবাব ও সেনাবাহিনী অন্নাভাবে মৃতপ্রায় হইয়া পড়িল। সেই সঙ্কটের সময় বাস্তব দুরবস্থার চিত্র গঙ্গারাম অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে অঙ্কিত করিয়াছেন :

মুদি বানিঞা যত যারাইতে নারে।
লুট কাটে মারে চমুক্তে পায় যারে॥
বরগীর তরাসে কেহ বাহির না হয়।
চতুর্দ্দিকে বরগীর ডরে রসদ না লয়॥

এই দুর্যোগের সময় আলিবর্দি সৈন্য-সেনাপতি সহ দারুণ বিপদে পড়িলেন—সকলে শুধু মাত্র কলার এঁটে খাইয়া উদরপূর্তি করিতে লাগিলেন :

কলার আইঠা যত আনেন তুলিয়া।
তাহা আনি সব লোক খাএ সিজাইয়া॥

* * *

বিষম বিপত্য বড় বিপরীত হইল।
অন্ত পরে কা কথা নবাব সাহেব খাইল।

সেনাপতি মুস্তাফা খাঁয়ের বুদ্ধি কৌশলে আলিবর্দি কোনও প্রকারে কাটোয়ায় উপস্থিত হইলেন। শিকার পলাইয়াছে দেখিয়া ক্রুদ্ধ ভাস্কর নির্বিচারে লুঠতরাজ ও ধ্বংসের আদেশ দিলেন, বর্গী সৈন্যেরা[১৩২] নির্মমভাবে অত্যাচার ও লুঠ করিতে করিতে অগ্রসর হইল। স্ত্রীলোকের উপর অত্যাচার ইহাদের স্বভাবধর্মে পরিণত হইয়াছিল। অতঃপর তাহারা বর্ধমান ধ্বংস করিয়া হুগলীতে আসিয়া পৌঁছিল। এখানেও তাহারা অত্যাচারের চূড়ান্ত করিয়া ছাড়িল, ভীত জনসাধারণ ও জমিদারদের নিকট হইতে বলপূর্বক রাজস্ব আদায় করিতে লাগিল। ভাস্কর পণ্ডিতের প্রায়-বর্বর বর্গী লুঠেরাগণ রাঢ়ের বর্ধমান, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম ও হুগলীজেলার বহু গ্রাম জালাইয়া পুড়াইয়া নরহত্যা ও নারীধর্ষণ করিয়া পশুত্বের ঘৃণ্যতম পরিচয় দিল। এখানে গঙ্গারাম অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে বিধ্বস্ত গ্রামের আনুপূর্বিক বিবরণ দিয়াছেন। তাহার পর বর্গীরা মুর্শিদাবাদের জেমোকান্দী ও ডাহাপাড়া গ্রাম পুড়াইয়া হাজিগঞ্জের ঘাট পার হইয়া রাজধানী মুর্শিদাবাদে উপস্থিত হইল। তখনও আলিবর্দি মুর্শিদাবাদে পৌঁছাইতে পারেন নাই। বর্গীরা মুর্শিদাবাদ লুঠপাট করিয়া জগৎশেঠকে বেকায়দায় ফেলিয়া তাঁহার নিকট হইতে তিন লাখ টাকা আদায় করিয়া শহর জ্বালাইয়া পুড়াইয়া নারকীয় কাণ্ড উপস্থিত করিল—শুধু নবাবের প্রাসাদ ও কেল্লা কোনও প্রকারে রক্ষা পাইল। নবাব মুর্শিদাবাদে পৌঁছাইবার পূর্বেই ভাস্কর দ্রুতগামী বর্গীসেনা-সহ মুর্শিদাবাদে ছাড়িয়া কাটোয়া পৌঁছাইয়া দাঁইহাট পর্যন্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সেনা সন্নিবেশ করিলেন। কারণ ঘোর বর্ষায় আর লুঠতরাজ চলিবে না। স্থানীয় জনসাধারণ ও জমিদারেরা ভয়বশতঃ ভাস্করকে রাজস্ব দিতে লাগিল।

১৩২. বর্গী (মূল শব্দ 'বার্গীর'—নিম্নশ্রেণীর সিপাহী) অর্থাৎ যে সমস্ত অশ্বারোহী সৈন্য ভাস্করের সঙ্গে বাংলা অভিযানে আসিয়াছিল তাহারা অতি নিম্নশ্রেণীর সিপাহী ছিল। অপেক্ষাকৃত উচ্চশ্রেণীর সৈন্যকে 'শিলাহ্‌দার' বলা হইত। তাহারা এই অভিযানে আসে নাই। তাহারা পদমর্যাদায় বর্গী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া বিবেচিত হইত। তাহাদের নিজস্ব অশ্ব ও অস্ত্রশস্ত্রাদি ছিল, কিন্তু বর্গীরা অশ্ব ও অস্ত্র সরকার হইতে পাইত। ইহারা নিম্নশ্রেণীর অশিক্ষিত ব্যক্তি ছিল বলিয়া (অনেকটা টমিদের মতো) জনসাধারণের উপর পশুবৎ অকথ্য অত্যাচার করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ বোধ করিত না।

তখন আশ্বিন মাস, বাঙালী হিন্দুর দুর্গাপূজা আসিয়া গিয়াছে। ব্রাহ্মণ ভাস্কর পণ্ডিত বাঙালী হিন্দুর রীতিতে মহাসমারোহে দুর্গাপূজার আয়োজন করিলেন। জমিদারগণ নতমস্তকে যাবতীয় খরচ যোগাইলেন।[১৩৩] কিন্তু অষ্টমীপূজার গভীর রাত্রে আলিবর্দি অতর্কিতে ভাস্করকে আক্রমণ করিলে পরাভূত বিপর্যস্ত বর্গীনায়ক লোকলস্কর সহ প্রতিমা ফেলিয়াই দ্রুত পলাইলেন, নবমীপূজা আর হইল না। কিন্তু কয়েকমাস যাইতে না যাইতেই চৈত্র মাসে ভাস্কর আবার বাংলায় হাজির হইয়া অত্যাচারের মাত্রা ভয়াবহ পরিমাণে বাড়াইয়া

১৩৩. ঐতিহাসিকের মতে, "Bhaskar was celebrating the Durga Puja at Katwa in the most lavish style with forced contribution from the Zamindars." (HOB. II, p. 458) অবশ্য গঙ্গারামের কাব্যের পুরাণ ধাঁচের বর্ণনায় দেখা যাইতেছে মহাদেব সাহুরাজাকে বাংলা হইতে পাপ দূর করিবার জন্যই নির্দেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু পরে মারাঠা বর্গীরা স্ত্রীলোক-গো-ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচার আরম্ভ করিলে দেবী পার্বতী ক্রুদ্ধ হইয়া মারাঠাদের প্রতি বিমুখ হইলেন এবং নবাবকে কৃপা করিলেন। পাপের ফলেই ভাস্কর মারা পড়েন। ইহাতে মনে হইতে পারে বর্গীর আক্রমণকে বাংলার হিন্দু জনসাধারণ প্রথমটা মনে মনে অভিনন্দিত করিয়াছিল। কিন্তু পরে ইহাদের ভয়াবহ অত্যাচারে হিন্দুদের মন বিষাইয়া যায়। এই সময়ে "The under-current of discontent amongst Hindu-subjects". (K. K. Datta—*Alivardi and His Times*, p. 58) থাকিলেও হিন্দুরা মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে বিরক্ত হইয়া মারাঠাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল এমন কোন প্রকৃষ্ট ঐতিহাসিক প্রমাণ নাই। অবশ্য ভারতচন্দ্রের অন্নদামঙ্গলেও বলা হইয়াছে, নন্দীকে মহাদেব নির্দেশ দিলেন :

আছয়ে বর্গীর রাজা গড় সেতারায়।
আমার ভকত বড় স্বপ্ন কহ তায়॥
সেই আসি যবনেরে করিবে দমন।
শুনি নন্দী তারে গিয়া কহিল তখন॥
স্বপ্ন দেখি বর্গী রাজা হইল ক্রোধিত।
পাঠাইলা রঘুরাজা ভাস্কর পণ্ডিত॥

এই সমস্ত সমসাময়িক উক্তি হইতে কেহ কেহ অনুমান করেন, মুসলমান শাসনের বিরুদ্ধে হিন্দুদের চাপা আক্রোশ ছিল, তাই তাহারা গোড়ার দিকে বর্গীর অভিযানে আশান্বিতই হইয়াছিল। কিন্তু ইহাদের অকথ্য অত্যাচারে হিন্দুদের আশা ধূলিসাৎ হইয়া যায়।—এই অনুমান মিথ্যা নাও হইতে পারে। কিন্তু সেরূপ কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ এখনও হস্তগত হয় নাই।

দিলেন—বোধহয় পূর্ব পরাজয়ের প্রতিশোধ গ্রহণ করিবার জন্য। গঙ্গারাম সেই ঘটনার যে চাক্ষুষ বর্ণনা দিয়াছেন তাহা রীতিমতো লোমহর্ষক :

মাঘে ঘেরিয়া বর্গী তবে দেয় সাড়া।
সোনারূপা লুটে নেয় আর সব ছাড়া॥
কারু হাত কাটে কারু নাক কান।
একি চোটে কারু বধএ পরাণ॥
ভাল ভাল স্ত্রীলোক যত ধইরা লইয়া যাএ।
অঙ্গুষ্ঠে দড়ি বেঁধে দেয় তার গলাএ॥
একজনে ছাড়ে তারে অন্যজনা ধরে।
রমণের ভরে ত্রাহি ত্রাহি শব্দ করে॥
এই মতে বরগি কত পাপকর্ম কইরা।
সেই সব স্ত্রীলোক জত দেয় সব ছাইড়া॥
তবে মাঠে লুটিয়া বরগী গ্রামে সাধাএ।
বড় ২ ঘরে আইসা আগুনি লাগাএ॥

* * *

কাহুকে বাঁধে বরগী দিআ পিঠমোড়া।
চিত কইরা মারে লাথি পাএ জুতা চড়া॥
রূপি দেহ ২ বলে বারে বারে।
রূপি না পাইয়া তবে নাকে জল ভরে॥
কাহুকে ধরিয়া বরগি পথইরে ডুবাএ।
ফাফর হইয়া তবে কারু প্রাণ জাএ॥

এ বর্ণনা অতি নির্মম, কিন্তু অণুমাত্রও অতিরঞ্জিত নহে।[১৩৪] কারণ সম-

১৩৪. সাহিত্য পরিষৎ পত্রিকায় (১৩১৩।৩য়) ব্যোমকেশ মুস্তাফী কিন্তু এই বর্ণনা অতিরঞ্জিত মনে করিয়াছেন—"ভাস্করের দ্বিতীয়বার আক্রমণে তাঁহা কর্তৃক গোব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব ও স্ত্রীহত্যার যেরূপ অবস্থা বর্ণনা করিয়াছেন তাহা যেন অতিমাত্র অতিশয়োক্তি বলিয়া বোধ হয়।" গঙ্গারাম লিখিয়াছেন।

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণব যত সন্ন্যাসী ছিল।
গো হত্যা স্ত্রীহত্যা শত শত কৈল॥

এ বর্ণনা অবিশ্বাস করিবার কারণ নাই। হলওয়েল *Interesting Historical Events*-এ বর্গীর হাঙ্গামার এইরূপ বর্ণনাই দিয়াছেন। সলিমুল্লাও তাঁহার 'তারিখ-ই-বাংলা'য় বলিয়াছেন যে, মারাঠাদের লোলুপ দৃষ্টি হইতে নারীর পবিত্রতা রক্ষা করিবার জন্য অনেক সম্পন্ন ব্যক্তি গঙ্গার পূর্বপারে পলাইয়া আসিয়াছিলেন—"All rich and respectable people aban-

সাময়িক ইংরাজ ও ফরাসী বণিকেরাও ইহার যে স্মৃতিচিত্র রাখিয়া গিয়াছেন তাহাতে গঙ্গারামের এই উক্তি সত্য বলিয়াই মনে হইতেছে। তারপর পুরাণের ইঙ্গিত টানিয়া আনিয়া কবি বলিয়াছেন, নারী ও ব্রাহ্মণের উপর অত্যাচারে দেবী পার্বতী ভাস্করের প্রতি রুষ্ট হইয়া নবাবের প্রতি সদয় হইলেন :

ব্রাহ্মণ বৈষ্ণবের হিংসা দেখিবারে নারি।
এতেক করিয়া তবে রুসিলা শঙ্করী॥
ভৈরবী জোগিনী যত নিকটে ছিল।
জোড়হস্ত কইরা তারা ছমুতে গড়াইল॥
তবে দুর্গা কহে শুন এতেক ভৈরবী।
ভাস্করকে বাম হইয়া নবাবকে সদয় হবি॥

অতঃপর নবাব আলিবর্দি এই নির্মম লুঠেরার আক্রমণ হইতে বাংলার জান-মান বাঁচাইবার জন্য তাঁহার হিন্দু ও মুসলমান পদস্থ কর্মচারীদের সঙ্গে গোপনে পরামর্শ করিয়া সানুচর ভাস্করকে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিলেন। তাঁহার পরামর্শে দেওয়ান জানকীরাম ও সিপাহ্‌সালার মুস্তাফা খাঁ ভাস্করের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিয়া বলিলেন যে, নবাবের সঙ্গে ভাস্কর যদি নিরস্ত্র গিয়া আলাপ-আলোচনা করেন তাহা হইলে তিনি যাহা চাহেন তাহাতে নবাব সম্মত হইবেন। জানকীরাম গঙ্গাজল ও শালগ্রাম স্পর্শ করিয়া ভাস্করের নিরাপত্তার জামিন হইলেন :

জানকীরাম কহে গঙ্গারাম সালগ্রাম লইয়া।
কিছু চিন্তা নাই তোমাকে আনিল মিলাইয়া॥

মুস্তাফা খাঁ কোরান স্পর্শ করিয়া বলিলেন :

কিছু কিন্তু জদি মনে কর তুমি।
কোরান দরমান লইয়া কিংবা খাইছি আমি॥

বিধাতা বাম হইলে লোকের বুদ্ধি লোপ পায়। ভাস্কর এই স্তোকবাক্যে

---

doned their homes and migrated to the eastern side of the Ganges in order to save the honour of their women." সমসাময়িক সংস্কৃত চম্পূকাব্য 'চিত্রচম্পূতে'ও ঐরূপ বর্ণনা আছে (দ্রষ্টব্য : সুপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়—'ইতিহাসাশ্রিত বাংলা কবিতা', পৃ. ১০-১১)। সুতরাং স্ত্রীলোকের প্রতি তাহারা যে অকথ্য অত্যাচার করিত তাহাতে কোন সন্দেহ নাই।

ভুলিয়া নিরস্ত্র অবস্থায় কিছু অনুচরসহ মানকরায় (বহরমপুর ছাউনির পূর্বে) আলিবর্দির শিবিরে যাত্রা করিলেন :

বিধাতা বিপত্যা হইলে বুধা গুইলা গেল।
হাতিয়ার থুইয়া আইসা নবাবকে মিলিল ॥

২রা বৈশাখ ১৭৪৪ সালে মানকরার নবাবশিবিরে ভাস্কর সানুচর উপস্থিত হইলেন। চৌথেব হার সম্পর্কে একটু-আধটু আলাপাদি চলিতে লাগিল। ইতিমধ্যে নবাব বাহিরে যাইবার প্রয়োজন বোধ করিলেন. সে কথা জানাইয়া মৃদু হাসিয়া তিনি শিবিরের বাহিরে 'লঘি্য'[১৩৫] করিবার জন্য গেলেন :

এতেক শুনিয়া নবাব কহিলেন হাসি।
খানিক বিলম্ব কব 'লঘি' কইরা আসি ॥

কিছুক্ষণ বসিয়া থাকিবার পর ভাস্কর যখন দেখিলেন নবাব ফিরিতে বিলম্ব করিতেছেন, তখন তিনি বোধ হয় কিছু আশঙ্কা করিয়া উঠিবার উদ্যোগ করিলেন। কিন্তু ঘোড়ায় চডিবার পূর্বেই সানুচর ভাস্কর পণ্ডিত নবাবের সংগুপ্ত সেনানায়কদের দ্বারা নিহত হইলেন। গঙ্গারাম খুব সংক্ষেপে মাত্র চারি পংক্তিতে এই গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপার বর্ণনা করিয়াছেন :

যেই মাত্র ভাস্কর ঘোড়াএ চডিতে।
তলোয়ার খুলিয়া তখন মারিলেক তাথে ॥
সেই ক্ষণে তবে খটাখট্টি হইল।
যতগুলা আইসা ছিল সবগুলা মইল ॥

কবি যদি এই 'খটাখট্টি' আর একটু বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করিতেন তাহা হইলে ইতিহাসে-অনুরক্ত আধুনিক পাঠক খুশী হইতেন।

সমগ্র মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে গঙ্গারামের মহারাষ্ট্র পুরাণ একটি বিস্ময়কর ব্যতিক্রম। সমসাময়িক ঐতিহাসিক ঘটনা, যাহা বাংলা-দেশকে দীর্ঘকাল ধরিয়া সন্ত্রস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন, 'গঙ্গারাম ঐতিহাসিকের তথ্যানুসন্ধিৎসু দৃষ্টির সাহায্যে তাহার নিপুণ বিবরণী রাখিয়া গিয়াছেন। কাব্যের প্রারম্ভে ও মধ্যের একস্থলে পুরাণের যৎসামান্য অনুসরণ আছে বটে, কিন্তু আর কোথাও পৌরাণিক প্রভাব নাই। কবি নিঃস্পৃহভাবে বর্গীর অভিযান ও অত্যাচারের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন। ভাষা ও বর্ণনায় বিশেষ কোন কবিত্বলক্ষণ না থাকিলেও কবি নির্মম বর্ণনাতেও আশ্চর্য

১৩৫. 'লঘি্য' অর্থাৎ নিজেকে লঘু করা—ইংরাজী ককনি ভাষায় যাহাকে pissing বলে।

নিরাসক্তি রক্ষা করিয়াছেন—যাহা ইতিহাস-সাহিত্যের প্রধান লক্ষণ। মারাঠা ও নবাবপক্ষীয় সেনানায়কদের পরিচয়, পথঘাট ও বর্গার গমনপথের সঙ্কেত প্রভৃতি মূল্যবান তথ্য তিনি যেভাবে ব্যবহার করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে বিশেষ প্রশংসা করিতে হইবে। দুই চারিটি ঐতিহাসিক ভ্রান্তি থাকিলেও মহারাষ্ট্র পুরাণ ইতিহাস-কাব্য হিসাবে মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অবিস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা ॥

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে কাব্যগুণের দিক হইতে না হইলেও বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্যের দিক হইতে বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে অল্পস্বল্প নূতনত্বের সঞ্চার হইয়াছিল। দেবদেবীর লীলাকথা কিছু অন্তরালে রাখিয়া সমসাময়িক ইতিহাস ও সমাজের বাস্তব চিত্রাঙ্কনে কবিগণ কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের নানা স্থান হইতে (ত্রিপুরা-নোয়াখালি-চট্টগ্রাম) যে পালাগানগুলি আবিষ্কৃত ও প্রকাশিত হইয়াছে, অনাধুনিক বাংলা সাহিত্যে তাহা এক অভিনব ব্যাপার তাহাতে সন্দেহ নাই। এই গাথা ও গীতিকা লইয়া প্রচুর আলোচনা হইয়াছে, মতান্তর সৃষ্টি হইয়াছে, সংশয়ের মেঘ ঘনাইয়াছে। বিদেশী পণ্ডিতেরাও এই সমস্ত বিতর্কে যোগ দিয়া ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ গীতিকা সম্বন্ধে ভারতের বাহিরের অনুরাগী পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন।[১৩৬] এই গাথাগীতিকা-সাহিত্যের প্রচার, ব্যাখ্যা-ব্যাখ্যান—সমস্তই একজন ব্যক্তির আপ্রাণ চেষ্টার দ্বারা সম্ভব হইয়াছে—তিনি দীনেশচন্দ্র সেন। পূর্ববঙ্গের গাথা জাতীয়

১৩৬. দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলি ইংরাজীতে অনুবাদ করিয়া *Eastern Bengal Ballads* নামে প্রকাশ করেন। পাশ্চাত্ত্যের অধিকাংশ পণ্ডিত সেই অনুবাদ হইতেই ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার আস্বাদ লাভ করিয়াছিলেন—তাঁহাদের প্রায় কেহই (গ্রীয়ার্সন বাদে) বাংলা জানিতেন না। সুতরাং দীনেশচন্দ্রের গদ্যানুবাদ ও ব্যাখ্যানের উপর তাঁহাদিগকে সম্পূর্ণ নির্ভর করিতে হইয়াছিল। সম্প্রতি প্রাগ বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দুসান জ্বাভিতেল উত্তমরূপে বাংলা ভাষা শিখিয়া *Bengali Folk-Ballads from Mymensingh* (C. U.) শীর্ষক যে আলোচনা-গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহাতে তাঁহাকে আর অনুবাদের উপর নির্ভর করিতে হয় নাই।

সাহিত্যের প্রতি তাঁহার বরাবরই মমতা ছিল। তাঁহার আগ্রহে ও প্রয়াসে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তদানীন্তন কর্ণধাব স্যর আশুতোষের আনুকূল্যের ফলে পূর্ববঙ্গের নদনদী-জলজঙ্গল-হাওড়ের এই গীতিকাগুলি আধুনিক যুগের পাঠকদের মনেও সপ্রশংস কৌতূহল সঞ্চার করিয়াছে।

গাথা ও গীতিকার কথা—পূর্ব-ময়মনসিংহ এবং পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চল হইতে সংগৃহীত গীতিকাগুলি 'ব্যালাড' (গাথা বা গীতিকা সাহিত্য) সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। ইংরাজী ballad শব্দটি প্রাচীন লাতিন ballare হইতে নিষ্পন্ন হইয়াছে, যাহার অর্থ নৃত্য। পূর্বে পাশ্চাত্ত্যে যে সমস্ত কাহিনীকে নৃত্যগীতে পরিবেশন করা হইত তাহাকে ballad বলিত। প্রথম দিকের ব্যালাডে বিশেষ কোন কাহিনী ছিল না। কিন্তু মধ্যযুগে দ্বাদশ শতাব্দীর দিকে যুদ্ধবিগ্রহ, প্রেমপ্রণয় প্রভৃতি বিষয়ে গীতিধর্মী লোককাহিনী প্রচলিত হইতে আরম্ভ করে। আদিম যুগে জনসাধারণ যে সমস্ত ঘটনা অবলম্বনে নৃত্যগীতে মত্ত হইত তাহাই ক্রমে গীতাত্মক কাহিনীর রূপ ধারণ করে। বলা বাহুল্য এই লোকসাহিত্য প্রাচীনকালে মুখে মুখে প্রচারিত হইয়াছিল। কালক্রমে এই সমস্ত লোকগাথা মহাকাব্যে রূপান্তরিত হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে ইংরাজী সাহিত্যে লোক-গাথাকাব্যকে শিক্ষিত সম্প্রদায় সংগ্রহ করিবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীতে নব্য ক্লাসিকতার কৃত্রিম শাসনে বিক্ষুব্ধ গীতিকবিরা রোমান্টিক গীতিকবিতার পুনর্জাগরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহারা (ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরীজ) কৃষকসমাজে প্রচলিত পুরাতন স্কটিশ ব্যালাডকে সর্বপ্রথম শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে দেখিতে শুরু করেন। বিশপ পার্শি *Reliques of Ancient English Poetry* (*1765*) শীর্ষক সঙ্কলনে বহু ব্যালাড সংগ্রহ করেন। এই সময় নব্য রোমান্টিক কবিগণ পুরাতন ইংরাজী ও স্কটিশ ব্যালাডের অনুসরণে আধুনিক ব্যালাড লিখিতে আরম্ভ করেন। বার্নস্‌, স্কট এবং ওয়ার্ড্‌স্‌ওয়ার্থ গোষ্ঠীর চেষ্টায় প্রাচীন ব্যালাডের আধুনিক রূপান্তর ইংরাজী গীতিকবিতার এক নূতন দিগন্ত খুলিয়া দিয়াছিল। আমাদের দেশেও ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গ-গীতিকার আদর্শে ও প্রভাবে কবি জসিমুদ্দিন আধুনিক ব্যালাড রচনা করেন, সেগুলি তাঁহার কাব্যগ্রন্থাদিতে প্রকাশিত হইয়াছে।

অতি পুরাতন যুগ হইতে জনসাধারণ যে সমস্ত কাহিনী লইয়া গান

বাঁধিত, পাঁচালী রচনা করিত, তাহার উপাদান মর্ত্যভূমি হইতেই উৎপন্ন হইয়াছিল। এগুলি লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত।[১৩৭] কোন একটি নাটকীয় ধরনের দ্রুত পরিবর্তনশীল প্রেম-প্রণয় বা দ্বন্দ্ব-কলহ-সংঘর্ষঘটিত স্থানীয় কাহিনী পুরাতন গীতিসাহিত্যের পটভূমিকা বলিয়া স্বীকৃত হইতে পারে। অবশ্য অধ্যাত্মচেতনা, অলৌকিকতা, অদ্ভুত ব্যাপারও ব্যালাড বা গীতিসাহিত্যের কলেবর বৃদ্ধি করিয়াছিল। ইংরাজী সাহিত্যে সুপরিচিত ব্যালাডের অন্তর্ভুক্ত *Thomas Rymer* গাথায় পরীস্থানের কাহিনী এবং *The Wife of Usher's Well*-এ অলৌকিক জগতের কথা স্থান পাইয়াছে। আমাদের নাথসাহিত্যের খানিকটা গাথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। সে যাহা হউক, মর্ত্যজীবনের আলো-ছায়ার লীলাই যে গাথাগীতিকা সাহিত্যের ভিত্তিভূমি তাহা স্বীকার করিতে হইবে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসে গাথা-গীতিকার যে একেবারেই উদ্ভব হয় নাই তাহা নহে। মঙ্গলকাব্যের অনেকটাই পুরাতন গাথা-সাহিত্যের ঐতিহ্য অনুসরণ করিয়াছে। কিন্তু বিশুদ্ধ গাথা-গীতিকা সাহিত্যের যথার্থ দৃষ্টান্ত মিলিয়াছে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত ও দীনেশচন্দ্র সেন সম্পাদিত 'ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা'য়। ইহার শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িকাগুলি মর্ত্যপ্রেমের অশ্রুবেদনায় ভরপুর। পুরাতন পাশ্চাত্ত্য ব্যালাডের অনেক-গুলিতে ব্যর্থ প্রেমের রক্তাক্ত প্রতিহিংসা ও জিঘাংসাই প্রধান স্থান পাইয়াছে, কিন্তু পূর্ববঙ্গের গীতিকাগুলিতে প্রেমের ত্যাগ-তিতিক্ষা ও বেদনা অধিকতর বিশিষ্টতা লাভ করিয়াছে। মধ্যযুগের উপান্তভূমিতে রচিত হিন্দু-মুসলমানের অসাম্প্রদায়িক হৃদ্‌বৃত্তির যে অপূর্ব সমন্বয় এই সমস্ত গীতিসাহিত্যে ফুটিয়া উঠিয়াছে, মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যের আর কোথাও তাহার অনুরূপ দৃষ্টান্ত খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অবশ্য প্রেম-প্রণয় ব্যতীত ঐতিহাসিক যুদ্ধ-সংঘর্ষ লইয়াও পূর্ব ও দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ হইতে কিছু কিছু গাথা আবিষ্কৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহার শিল্পমূল্য প্রেমপ্রণয়ঘটিত গাথাগুলির মতো উৎকৃষ্ট নহে।

---

১৩৭. কেহ কেহ মনে করেন, ব্যালাডে মাঝে মাঝে যেরূপ উচ্চতর কাব্যগুণ প্রকাশিত হইয়া পড়ে তাহাতে ইহাকে পুরাপুরি লোকসাহিত্য বলা যায় না। মনে হয় ইহার পশ্চাতে কোন উচ্চতর প্রতিভাসম্পন্ন কবির হস্তক্ষেপ রহিয়াছে, অন্ততঃ রবিনহুডের ব্যালাড এবং সপ্তদশ অষ্টাদশ শতাব্দীর স্কটিশ ব্যালাডের সুগঠিত শিল্পমূর্তি দেখিয়া তাহাই মনে হয়। (—*Dictionary of World Literary Terms*—Edited by J. T. Shipley, p. 34)

ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার আবিষ্কার—এখন দেখা যাক কিভাবে এই সমস্ত পূর্ববঙ্গীয় গাথা-গীতিকা আবিষ্কৃত ও প্রচারিত হইল। ১৯১২-১৩ সালের কথা। ময়মনসিংহ হইতে কেদারনাথ মজুমদারের সম্পাদনায় 'সৌরভ' নামে প্রথম শ্রেণীর একখানি মাসিক পত্রিকা প্রকাশিত হইত। উক্ত পত্রের বাংলা ১৩২০ সনের বৈশাখ সংখ্যায় (১৯১৩, এপ্রিল) চন্দ্রকুমার দে নামক কোন এক ব্যক্তি 'মালীর জোগান' নামে একটি প্রবন্ধে ময়মনসিংহে প্রচলিত অনেকগুলি কবিগান[১৩৮] মুদ্রিত করেন। ইতিপূর্বে ময়মনসিংহের সাহিত্য বা লোকসাহিত্য সম্পর্কে কলিকাতার সাহিত্যসমাজ কিছুই জানিতেন না, এমন কি শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীরাও এবিষয়ে বিশেষ কোন সংবাদ রাখিতেন না।[১৩৯] যাহা হউক, দীনেশচন্দ্র কৌতূহলী হইয়া 'সৌরভে'র পুরাতন সংখ্যা খুঁজিয়া দেখিয়া অভিলষিত বস্তু পাইয়া বিস্মিত হইলেন। ১৯১২-১৪ সালে 'সৌরভ' পত্রিকা ঘাঁটিয়া তিনি দেখিলেন, উক্ত চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত দস্যু কেনারামের পালা, কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর, চন্দ্রাবতী-সংক্রান্ত গাথার দুই-চারি পংক্তি দৃষ্টান্তের পশ্চাতে ময়মনসিংহের অজ্ঞাত-পরিচয় এক বিরাট পালাসাহিত্য উঁকি দিতেছে। তখন তিনি 'সৌরভ' সম্পাদক কেদারনাথ মজুমদারের সহায়তায় চন্দ্রকুমার দে-কে খুঁজিয়া বাহির করিলেন।

১৮৮৮ খ্রীঃ অব্দের ফেব্রুয়ারি মাসে ময়মনসিংহ জেলার অন্তর্গত কেন্দুয়া ডাকঘরের অন্তর্ভুক্ত আইথর গ্রামে অতি দরিদ্রবংশে চন্দ্রকুমার দে-র জন্ম হয়। তাঁহার পিতা রামকুমার দারিদ্র্যের জন্য পুত্রকে বিশেষ লেখাপড়া

---

১৩৮. অবিভক্ত বাংলাদেশের ময়মনসিংহে প্রচুর কবিগান প্রচলিত ছিল। হিন্দু মুসলমান —উভয়েই মহানন্দে কবির লড়াইয়ে যোগ দিত। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব তাঁহার 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গ' পুস্তিকায় এইরূপ অনেক আধুনিক কবিগানের দৃষ্টান্ত দিয়াছেন।

১৩৯. দীনেশচন্দ্র অনেক শিক্ষিত ময়মনসিংহবাসীর নিকট স্থানীয় গ্রাম্যগাথা সম্বন্ধে প্রশ্ন করিলে তাঁহারা তাচ্ছিল্যের সঙ্গে বলিয়াছিলেন, "ছোটলোকেরা, বিশেষতঃ মুসলমানেরা ঐ সকল মাথামুণ্ডু গাহিয়া যায়, আর শত শত চাষা লাঙ্গলের উপর বাহু ভর করিয়া দাঁড়াইয়া শোনে। ঐ গানগুলির মধ্যে এমন কি থাকিতে পারে যে, শিক্ষিত সমাজ তৎপ্রতি আকৃষ্ট হইতে পারেন?" এমন কি কেহ কেহ দীনেশচন্দ্রের হিতের জন্য এমন উপদেশও দিয়াছিলেন, "আপনি এই ছেঁড়া পুঁথিঘাঁটা দিন কয়েকের জন্য ছাড়িয়া দিন।" (ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, ২য় সংস্করণ, পৃ. ১/০)

শিখাইতে পারেন নাই। চন্দ্রকুমার বাল্যকালে গ্রাম্য পাঠশালায় যৎসামান্য বাংলা ব্যতীত শিক্ষা ব্যাপারে অধিকদূর অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। জমিদারের অত্যাচারে তাঁহাদেব সবেমাত্র সম্বল কয়েক বিঘা জমিও চলিয়া যায়। বাল্যেই তাঁহার মাতা-পিতা উভয়েরই মৃত্যু হয়। অতি অল্প বয়সে তাঁহাকে মাসিক একটাকা বেতনে মুদিখানার দোকানে চাকুরী লইতে হয়। কিন্তু সে কার্যে অসমর্থ দেখিয়া দোকানদার তাঁহাকে বরখাস্ত করিল। তখন তিনি বহু কষ্টে দুই টাকা মাহিনায় গ্রাম্য তহসিলদারের পদ লাভ করিলেন। এই সময়ে লোকসাহিত্যের সঙ্গে তাঁহার আশ্চর্য উপায়ে যোগাযোগ ঘটিয়া গেল। খাজনা আদায়ের অবকাশে তিনি নিরক্ষর হিন্দু-মুসলমান কৃষকদের সঙ্গে মেলামেশা করিতেন, তাহাদের বারোমাসী গান শুনিতেন, তাহারা দলবদ্ধভাবে এই গান গাহিত। যৌবনে নিজে চেষ্টা করিয়া চন্দ্রকুমার ভাল বাংলা লেখাপড়া শিখিয়াছিলেন, সাহিত্যাদিতেও তাঁহার বেশ অনুরাগ ছিল। ক্রমে তিনি স্থানীয় মাসিক পত্র 'সৌরভে' নিজ সংগৃহীত ছড়া ও পালাগান প্রকাশ করিতে লাগিলেন, কয়েকটি প্রবন্ধও লিখিলেন। 'সৌরভ' সম্পাদক কেদারনাথ চন্দ্রকুমারকে এই সমস্ত গান সংগ্রহ করিতে উৎসাহিত করিতেন। উক্ত পত্রিকায় প্রকাশিত ছড়া ও পালাগান-গুলি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের মধ্যে সর্বপ্রথম দীনেশচন্দ্রের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।[১৪০] তিনি তখন কেদারনাথের মারফতে চন্দ্রকুমারের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের চেষ্টা করিলেন। সেই সময় কিছুদিন দরিদ্র চন্দ্রকুমার মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়া বাড়ী বসিয়াছিলেন। যাহা হউক একটু সুস্থ হইয়া তিনি ১৯১৯ সালে দীনেশচন্দ্রের আহ্বানে কলিকাতায় আসিয়া তাঁহার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিলেন। দীনেশচন্দ্র তৎপর হইয়া তাঁহার চিকিৎসাদির ব্যবস্থা করিলেন। চন্দ্রকুমার উক্ত পালা গান সম্বন্ধে কিন্তু খুব উৎসাহ দেখাইলেন না। তিনি বলিলেন যে, লোকমুখে প্রচারিত এই সমস্ত পালাগান সংগ্রহ করা সহজ নহে, কারণ একজনের নিকট পুরাগান পাওয়া যায় না—"এখন একটি পালাগান সংগ্রহ করিতে হইলে বহু লোকের দরবার করিতে হয়। কাহারও একটি গান মনে আছে, কাহারও বা দুইটি,—নানা গ্রামে পর্যটন করিয়া নানা লোকের

১৪০. D. C. Sen (edited)—*Eastern Bengal Balads*, Vol. 1, Part I, Introduction, pp. XVI—XVII

শরণাপন্ন হইয়া একটি সম্পূর্ণ পালা উদ্ধার করিতে পারা যায়।"[১৪১] তাঁহার সংগৃহীত কিছু কিছু পালাগানে খুশি হইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ণধার আশুতোষের উদ্যোগে দীনেশচন্দ্র তাঁহাকে একবৎসরের জন্য বেতনভোগী পালা-সংগ্রাহকের পদে নিযুক্ত করেন। তাঁহার নির্দেশে চন্দ্রকুমার পূর্ববঙ্গের নানা অঞ্চল ঘুরিয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য পালা সংগ্রহ করিতে লাগিলেন। অবশ্য প্রথম প্রথম নিরক্ষর কৃষক-কবির মৌখিক পালাগান অপেক্ষা পুরাতন ট্র্যাডিশনের পুঁথিপত্রাদির উপর চন্দ্রকুমারের বেশী ঝোঁক ছিল। ময়মনসিংহের প্রাচীন কবি মুক্তারামের দুর্গাপুরাণ, রামকান্তের মনসার ভাসান, উমার বিবাহ, দুর্বাসার পারণ, দ্রৌপদীর বস্ত্র হরণ, নরমেধযজ্ঞ প্রভৃতি পৌরাণিক ঘটনার পুঁথি সংগ্রহের জন্য তিনি অধিকতর কৌতূহলী হইয়াছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারকে পৌরাণিক ঘটনার পুঁথিপত্রাদি ছাড়িয়া শুধু মৌখিক পালাগান সংগ্রহের উপদেশ দিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একটি কথা বলিয়া লই। চন্দ্রকুমার শুধু একজন বেতনভুক পালাসংগ্রাহকমাত্র ছিলেন না, নিজের চেষ্টায় তিনি বাংলা লেখাপড়া বেশ ভালোই শিখিয়াছিলেন। উপরন্তু তাঁহার আবার কিঞ্চিৎ সাহিত্যনিষ্ঠা ছিল, কবিপ্রতিভাও ছিল। 'সৌরভ' পত্রিকায় প্রবন্ধাদি লিখিবার জন্য সম্পাদক কেদারনাথ এই দরিদ্র সাহিত্যিক সর্বদা উৎসাহিত করিতেন। এখানে এই সংবাদটির উল্লেখের কারণ, পরে আমরা বিচার করিয়া দেখিব, কবি-প্রতিভার কিঞ্চিৎ অধিকারী চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালার ভাষা ও বর্ণনায় কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কি না। ময়মনসিংহ গীতিকার ১ম খণ্ডের ২য় ভাগের ভূমিকায় দেখা যাইতেছে, গোড়ার দিকে চন্দ্রকুমার এই পালাগানগুলি কলিকাতার শিক্ষিত সমাজের প্রীতিকর হইবে না আশঙ্কা করিয়া চিরাচরিত পৌরাণিক কাহিনীর পুঁথিপত্র সংগ্রহ করিতে চাহিয়াছিলেন। কিন্তু দীনেশচন্দ্র তাঁহাকে গতানুগতিক পুঁথি বাদ দিয়া শুধু পল্লীগীতিকা সংগ্রহের জন্যই নির্দেশ দিয়াছিলেন।[১৪২]

গীতিকাসমূহের পালাবিন্যাস—দীনেশচন্দ্রের নির্দেশে চন্দ্রকুমার দে

১৪১. দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত—ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম খণ্ড, ২য় ভাগ, পৃ. ৵৹

১৪২. সংগৃহীত মৌখিক পালাগানে চন্দ্রকুমার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা, সে বিষয়ে পরে 'গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা' শীর্ষক উপচ্ছেদে আলোচনা আছে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাসংগ্রাহকরূপে নিম্নলিখিত পালাগুলি সর্বপ্রথম সংগ্রহ করিয়াছিলেন:—(১) দ্বিজ কানাই রচিত মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) নয়নচাঁদ ঘোষ রচিত জয়চন্দ্র-চন্দ্রাবতীর পালা, (৪) দ্বিজ ঈশান রচিত কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) রঘুসুত, দামোদর, নয়নচাঁদ ও শ্রীনাথ বানিয়া রচিত কঙ্ক ও লীলা, (৭) মনসুর বয়াতি রচিত দেওয়ানা মদিনা, (৮) রূপবতী, (৯) চন্দ্রাবতী রচিত কেনারাম, (১০) কাজল-রেখা, (১১) দেওয়ান মসনদ আলি, (১২) ফিরোজ খাঁ, (১৩) ভেলুয়া সুন্দরী, (১৪) জিরালনি, (১৫) মদনকুমার ও মধুমালা, (১৬) কবি কঙ্কের বিদ্যাসুন্দর[১৪৩], (১৭) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ[১৪৪], (১৮) কবিগান, (১৯) রাধাকৃষ্ণ গীতিকা ও যাত্রাগান, (২০) অসমা সুন্দরী, (২১) সুলা গায়েন রচিত গোপিনীকীর্তন, (২২) দেওয়ান মনোহর খাঁ।

বিহারীলাল সরকার, আশুতোষ চৌধুরী, নগেন্দ্রচন্দ্র দে, মনোরঞ্জন চৌধুরী, কবি জসিমুদ্দিন প্রভৃতি সংগ্রাহকদের দ্বারা দীনেশচন্দ্র আরও অনেক পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ক্রমে ১৯২৩ হইতে ১৯৩২ সালের মধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দীনেশচন্দ্রের সম্পাদনায় বিস্তারিত ভূমিকাসহ 'ময়মনসিংহ গীতিকা' ও 'পূর্ববঙ্গ-গীতিকা' প্রকাশিত হয়। অবশ্য প্রথমে প্রতিখণ্ডের ইংরাজী অনুবাদ ও ভূমিকা প্রকাশিত হইয়াছে, তারপর বাংলা পালাগান ভূমিকাসহ প্রকাশিত হয়।

চারিখণ্ডে প্রকাশিত এই পালাসংগ্রহের প্রথম খণ্ডের প্রথম ভাগ ইংরাজীতে *Eastern Bengal Ballads—Mymensingh* (Vol. I, Part I, 1923) এই নামে প্রকাশিত হয়। ইহার বাংলা সংস্করণ 'ময়মনসিংহ গীতিকা', প্রথম খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা নামে মুদ্রিত হয় (১৯২৩)। ইংরাজী খণ্ডে দীনেশচন্দ্র মূল পালার গদ্যানুবাদ সংযুক্ত করিয়াছিলেন, বাংলা খণ্ডে মূল পালা প্রকাশিত হইয়াছিল। ইংরাজী ও বাংলা খণ্ডের ভূমিকা প্রায় এক প্রকার। প্রথম খণ্ডে মোট দশটি পালা মুদ্রিত হইয়াছিল—(১) মহুয়া, (২) মলুয়া, (৩) চন্দ্রাবতী, (৪) কমলা, (৫) দেওয়ান ভাবনা, (৬) দস্যু কেনারামের পালা, (৭) রূপবতী, (৮) কঙ্ক ও লীলা, (৯) কাজলরেখা,

১৪৩. তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে এই কাব্যের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে

১৪৪. চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পর্কে ৪৪৪—৪৪৯ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য

(১০) দেওয়ানা মদিনা। ইংরাজী খণ্ডেও এই দশটি পালার সংক্ষিপ্ত গদ্য অনুবাদ মুদ্রিত হইয়াছে। এই দশটি পালাই চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন।

পূর্ব-ময়মনসিংহবাসী দ্বিজকানাই নামে কোন এক নমঃশূদ্র-ব্রাহ্মণ-সম্প্রদায়ভুক্ত কবি নাকি তিনশত বৎসর পূর্বে যাত্রার ঢঙে মহুয়া পালা রচনা করেন।[১৪৫] তিনি দল তৈয়ারি করিয়া নাটকের আকারে অভিনয়ও করিয়াছিলেন। শুনা যায় এই দ্বিজকানাই নমঃশূদ্র জাতীয়া কন্যার প্রতি প্রণয়াসক্ত হন এবং মহুয়া পালায় বর্ণিত নদের চাঁদের মতো তিনিও দুঃখ ভোগ করেন। এই তথ্য দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। অবশ্য এই সমস্ত গালগল্পের সততা পুরাপুরি গ্রহণযোগ্য কিনা ভাবিয়া দেখিতে হইবে। মহুয়ার পালার ভাষা কিছুতেই তিনশত বৎসরের প্রাচীন হইতে পারে না। দ্বিতীয়তঃ তিনশত বৎসর পূর্বে উক্ত দ্বিজকানাই "organised a party of players and was the first to put the melodrama on the stage"[১৪৬]—ইহাও বিশ্বাসযোগ্য নহে। কারণ তিনশত বৎসর পূর্বে রঙ্গমঞ্চে অভিনয় হইত না, দর্শকদের মাঝখানে খোলা স্থানে যাত্রাভিনয় হইত। মনে হয়, আধুনিক কালের কোন দ্বিজকানাই এই পালাগান রচনা করিয়া থাকিবেন।[১৪৭] কিন্তু পালাগানের কোথাও রচনাকারের ভণিতা নাই। দীনেশচন্দ্রও স্বীকার করিয়াছেন, চন্দ্রকুমার দে নানাজনের নিকট হইতে পালাটির টুকরা টুকরা সংগ্রহ করেন, কেবল শেখ আশাকালির নিকট একটু বেশী সাহায্য পাইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রকে চন্দ্রকুমার যেভাবে পালাটি পাঠাইয়াছিলেন তাহাতে নানা বিশৃঙ্খলা ছিল।[১৪৮] মাঝে মাঝে সংলাপের ঢঙে গদ্য-উক্তিও ছিল—কিন্তু চন্দ্রকুমার

১৪৫. *Eastern Bengal Ballads*, Vol, I, Pt. I, Preface to 'Mahua the Gypsy Girl'.

১৪৬. Ibid

১৪৭. পরে প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে মহুয়ার প্রাচীনতা সম্পর্কে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৪৮. দীনেশচন্দ্র বিশৃঙ্খল পালাটিকে শৃঙ্খলার মধ্যে আনিতে গিয়া ইহাতে বেশ খানিকটা হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, *Eastern Bengal Ballads*-এ তাহা স্বীকার করিয়াছেন, "I had to take great pains to rearrange the poem by a close and careful study of the text." (Vol. I, pt. 1, p. ii)

গদ্যাংশগুলি সংগ্রহ করিতে পারেন নাই।[১৪৯] আরও জানা যাইতেছে, ইহাতে বেদিয়ার কন্যার সঙ্গে ব্রাহ্মণযুবার প্রেমের চিত্র ছিল বলিয়া নাকি হিন্দু বাড়ীতে এই গান বড় একটা অনুষ্ঠিত হইত না। তাই সাধারণতঃ মুসলমান ও নিম্নবর্ণের হিন্দু সমাজে এই পালাগান অনুষ্ঠিত হইত।[১৫০] মলুয়া (দীনেশচন্দ্রের মতে ইহা মল্লিকা শব্দের অপভ্রংশ) পালার অধিকাংশ চন্দ্রকুমার পাষাণী বেওয়া নাম্নী এক পালাগায়িকার নিকট হইতে সংগ্রহ কবেন। শেখ কাঁচা এবং নিদান ফকিরও এই পালার খানিকটা চন্দ্রকুমারকে গাহিয়া শুনাইয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রের মতে, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীব রচনা। অবশ্য এই ধরনের কোন পালার লিখিত পুঁথি পাওয়া যায় নাই; গায়ক-গায়িকাদের মুখ হইতে শুনিয়া লিখিয়া লওয়া হইয়াছে। সুতরাং ইহার রচনাকাল নির্ধারণ করা দুরূহ। তবে ইহাতে মুসলমান কাজীর যেরূপ অত্যাচার বর্ণিত হইয়াছে, তাহাতে মনে হয় এই কাহিনী সপ্তদশ না হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর হইতে পারে, তবে ভাষা প্রাচীন নহে—একেবারে হাল আমলের। কে ইহার রচনাকার তাহা জানা যায় না। প্রথমে বন্দনাংশে চন্দ্রাবতীর ভণিতা আছে দেখিয়া দীনেশচন্দ্র ইহাকে চন্দ্রাবতীর রচনা বলিয়া অনুমান করিয়াছেন—অবশ্য ইহাও অনুমান মাত্র।

চন্দ্রাবতী ও জয়চন্দ্রের কাহিনী সংবলিত পালা নয়নচাঁদ ঘোষের রচনা বলিয়া মনে হয়, কিন্তু ভণিতায় কোন নাম নাই। কমলার পালা চন্দ্রকুমার তিন চার জন স্ত্রীলোকের নিকট হইতে পাইয়াছিলেন। পালার এক স্থানে দ্বিজ ঈশান ভণিতা আছে ("দ্বিজ ঈশান কয় কিল আর তেল। একবার পড়িলেই গণ্ডগোল গেল॥")। দীনেশচন্দ্র মনে করেন, ইহা সপ্তদশ শতাব্দীর রচনা। কিন্তু রাঢ় অঞ্চলের আধুনিক কথিত ভাষার সঙ্গে এই পালার ভাষার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। যথা—

পায়ের গোলাম হইয়া শিরে উঠতে চায়।
বেঙ্গে কবে শুনেছিস পদ্মের মধু খায়॥
ইচ্ছা যদি করি তারে দিতে পারি শূলে।
কুকুরে কামড়ায় কেবা কুকুরে কামড় দিলে।

১৪৯. পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ সংগৃহীত 'বাস্তানীর গানে' এই গদ্যাংশটুকু আছে।

১৫০. পূর্ণচন্দ্র তাঁহার নিজ গ্রামের বাটীতে (ময়মনসিংহ জেলার মাসোয়া গ্রাম) ১২৯১।৯২ সালের দিকে বাস্তানীর গান শুনিয়াছিলেন। ('বাস্তানীর গান'-এর ভূমিকা দ্রষ্টব্য)

সুতরাং এ পালার ভাষায় কিছু গাঢ়তর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে তাহা স্বীকার করিতে হইবে। 'দেওয়ান ভাবনা' পালার অনেকটা চন্দ্রকুমার কৈলাসচন্দ্রের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন, বাকি অংশ নেত্রকোণা মহকুমার কেন্দুয়া গ্রাম-নিবাসী কয়েকজন পালাগায়ক মাঝিদের নিকট পাওয়া যায়। এই পালা সাধারণতঃ কৃষকসমাজেই গীত হইত। 'কেনারামের পালা' চন্দ্রাবতীর রচিত বলিয়া মনে হয়। কারণ মাঝে মাঝে চন্দ্রাবতীর ভণিতা আছে।[১৫১] কিন্তু পালাটির ভাষায় আধুনিক লক্ষণ অতি স্পষ্ট। হয়তো কালক্রমে লোকমুখে ভাষা বদলাইয়া গিয়াছে, কিংবা হয়তো আধুনিক কালের কেহ ইহাতে কিছু কিছু সংস্কার কার্য চালাইয়াছেন। 'রূপবতী' পালাটি চন্দ্রকুমার নানা স্থান হইতে সংগ্রহ করেন। ইহার পটভূমিকায় কিছু স্থানীয় ঘটনা ছিল, পালার পাত্র-পাত্রীও যথার্থ ব্যক্তি। তাই চন্দ্রকুমারের উপদেশে দীনেশচন্দ্র পাত্র-পাত্রীর নাম-ধাম পাল্টাইয়া দিয়াছেন। 'কঙ্ক ও লীলা' পালার ভণিতায় রঘুসুত, দামোদর, নয়নচাঁদ ঘোষ ও শ্রীনাথ বানিয়ার নাম পাওয়া যায়। অবশ্য ইহার অধিকাংশ রঘুসুত ও দামোদরের রচনা। পালাটির রচনা ভঙ্গিমা একটু ঝঙ্কারবহুল। পালায় বর্ণিত কঙ্কই সত্যপীরের মহিমাজ্ঞাপক বিদ্যাসুন্দর রচনা করিয়াছিলেন।[১৫২] 'কাজলরেখা'র পালাটি অনেকটা রূপকথার মতো—ইহাতে গদ্য পংক্তিও আছে। পালাটিকে এই সঙ্কলন হইতে বাদ দিলে ভাল হইত। কারণ বহু পূর্বে দক্ষিণারঞ্জন মিত্রমজুমদার তাঁহার 'ঠাকুরমার ঝুলি'তে ইহাকে রূপকথার আকারেই বিবৃত করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমার সংগৃহীত কাজলরেখার পালা গাথাসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। 'দেওয়ানা মদিনা'র পালা মনসুর বয়াতি নামক এক নিরক্ষর কৃষকের রচনা, তাই ইহাতে স্থানীয় শব্দের বিশেষ প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু ভাষার বাঁধুনি দেখিয়া ইহাকে নিরক্ষর ব্যক্তির রচনা বলিয়া মনে হয় না।

পূর্ববঙ্গগীতিকার দ্বিতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় সংখ্যায় মোট চৌদ্দটি পালা

১৫১. চন্দ্রাবতী কয় শুন গো অপুত্রীর ঘরে।
সুন্দর ছাওয়াল হৈল মনসার বরে।

১৫২. পূর্বে ১৯৬—১৯৭ পৃষ্ঠায় আলোচনা দ্রষ্টব্য।

সংগৃহীত হইয়াছে। কিন্তু ইংরাজী সংস্করণে[১৫৩] বারটি পালা আছে—নীলা, মদনকুমার-মধুমালার পালা বাদ পড়িয়াছে। এই চৌদ্দটি পালার তালিকা :—
(১) ধোপার পাট, (২) মইষাল বন্ধু, (৩) কাঞ্চনমালা, (৪) শান্তি, (৫) নীলা, (৬) ভেলুয়া, (৭) কমলারাণীর গান, (৮) মাণিকতারা বা ডাকাইতের পালা, (৯) মদনকুমার ও মধুমালা, (১০) সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়া, (১১) নেজাম ডাকাইতের পালা, (১২) দেওয়ান ইশা খাঁ মসনদ আলি, (১৩) সুরৎজামাল ও অধুয়া, (১৪) ফিরোজ খাঁ দেওয়ান।

'ধোপার পাটের' কাহিনী চন্দ্রকুমার দে ১৯২৪ সালে ময়মনসিংহের সাকুইয়াবাড়ী গ্রামের রজনীকান্ত ভদ্র, চরশম্ভুগঞ্জবাসী দীন গোপ এবং কীর্তনখোলার মধুর বাপ নামক এক পালাগায়কের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। দীনেশচন্দ্র ইহার রচনাকাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "ভাব ও রচনাভঙ্গীতে অনুমান হয়, এই কবিতাটি চতুর্দশ শতাব্দীতে রচিত হইয়াছিল।"[১৫৪] কিন্তু ইহার বিষয়-বস্তুতে চতুর্দশ শতাব্দীর কোন চিহ্ন নাই, ভাষাতেও আধুনিককালের উপভাষার প্রভাব লক্ষণীয়। সুতরাং এই পালার রচনাকাল উনবিংশ-বিংশ শতাব্দীর পূর্বে যাইতে পারে না। একটু দৃষ্টান্ত :—

> সত্য কর সুন্দর কন্যা লো সত্য কর বইয়া।
> নিশাকালে আইবা তুমি ফুলের মধু লইয়া॥
> এইখানে থাকিয়া আমি বাজাইবাম বাঁশী।
> এইখানে তোমারে লইয়া কাটাইবাম নিশি॥
> এইখানে পাতিয়া রাখ বাঁশপাতার বিছান।
> তোমারে লইয়া বুকে দেখবাম স্বপন॥ (পূ. গী. ২য়—২য়, পৃ. ৫)

ইহা কখনও চতুর্দশ শতাব্দীর ভাষা হইতে পারে না। ইহার আইবাম, বাজাইবাম, কাটাইবাম, দেখবাম—ভবিষ্যৎবাচক পূর্ববঙ্গীয় ক্রিয়াগুলি তুলিয়া দিয়া পশ্চিমবঙ্গীয় চলিত বা সাধু ক্রিয়াপদ বসাইয়া দিলে ইহাকে স্বচ্ছন্দে কবি জসিমুদ্দিন বা কবি বন্দে আলি মিয়ার রচনা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। 'মইষাল বন্ধু'র দুইটি পালা চন্দ্রকুমার সংগ্রহ করেন, তন্মধ্যে একটি ঢাকা জেলার ভাওয়াল পরগণা হইতে সংগৃহীত। 'কাঞ্চনমালা'র পালা পুরাপুরি রূপকথার ধরনে গদ্যেপদ্যে রচিত। হরচন্দ্র বর্মা ও রামকুমার

১৫৩. *Eastern Bengal Ballads*, Vol. II, pt. I

১৫৪. পূর্ববঙ্গগীতিকা, দ্বিতীয় খণ্ড, দ্বিতীয় সংখ্যা, পৃ. ১০

মিস্ত্রীর নিকট শুনিয়া চন্দ্রকুমার ইহা লিখিয়া লইয়াছিলেন। কবি জসিমুদ্দিন (তখন তিনি কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পালাসংগ্রাহক ছিলেন) ফরিদপুরের এক নিরক্ষর মুসলমানের নিকট 'শান্তি ও নীলার পালা' শুনিয়া সংগ্রহ করেন। ইহার ভণিতায় জয়ধর বাণিয়ার উল্লেখ আছে বলিয়া দীনেশচন্দ্র ইহাকেই পালার আদি-রচয়িতা বলিয়াছেন। ইতিপূর্বে এই পালার আর এক ছাপা সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। পালাটি অনেকটা বারোমাসী জাতীয়। চন্দ্রকুমার বানিয়াচঙ্গ হইতে 'ভেলুয়ার পালা' সংগ্রহ করেন। কিন্তু তাঁহার পূর্বে চট্টগ্রাম হইতে হামিদুল্লা নামে এক কবি এই কাহিনী অবলম্বনে 'ভেলুয়াসুন্দরী' কাব্য প্রকাশ করিয়াছিলেন। ইহার আরও নানা ছাপা সংস্করণ পাওয়া যায়। দীনেশচন্দ্রের মতে, মুদ্রিত পালাগান-গুলিতে লোকসাহিত্যের লক্ষণ সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হইয়াছে। 'কমলারাণী'র পালাগান চন্দ্রকুমার সবটা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, মাত্র দুইটি সর্গ সংগ্রহ করিয়াছিলেন; দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইবার সময় তিনি তাহার সারাংশ পাঠাইয়াছিলেন।[১৫৫] ইহার সরল অর্থ—চন্দ্রকুমার ইচ্ছামত পালাটি ছাঁটিয়া কাটিয়া দীনেশচন্দ্রের নিকট পাঠাইয়াছিলেন। ইহার ভণিতায় অধরচাঁদের নাম আছে। তিনি বোধ হয় আদি রচনাকার হইবেন। সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়াটি ইহাতে সন্নিবিষ্ট হইবার কোন কারণ নাই। কারণ ইহা কাব্যরস-বর্জিত ক্ষুদ্র একটি আধুনিক ছড়া, তদুপরি ইহা পশ্চিমবঙ্গের ঘটনা। দীনেশচন্দ্র ইহার সম্বন্ধে বলিয়াছেন, "এই ক্ষুদ্র ছড়াটিতে বিশেষ কবিত্ব না থাকিলেও ইহার কিঞ্চিৎ ঐতিহাসিক মূল্য আছে বলিয়া পালাটিকে 'গীতিকা'য় সন্নিবিষ্ট করিলাম।"[১৫৬] —ইহা যুক্তিসঙ্গত মনে হইতেছে না। ইতিপূর্বে এই ছড়া সম্বন্ধে আমরা আলোচনা করিয়াছি। পালাসংগ্রাহক আশুতোষ চৌধুরী 'নিজাম ডাকাইতের পালা' চট্টগ্রামের দুইজন মুসলমানের নিকট হইতে সংগ্রহ করিয়াছিলেন। ঐতিহাসিকের মতে নিজামুদ্দিন আউলিয়া ত্রয়োদশ-চতুর্দশ শতাব্দীতে দিল্লীর নিকট জন্মগ্রহণ করেন। প্রথম জীবনে তিনি দুর্দান্ত ডাকাত ছিলেন। পরে প্রসিদ্ধ পীর শেখ ফরিদের সঙ্গে সাক্ষাতের পর তাঁহার চরিত্রের আমূল পরিবর্তন হয়—তিনি সাধক ভক্তে

১৫৫. পূর্ববঙ্গগীতিকা, ২।২, পৃ. ২৪

১৫৬. ঐ, পৃ. ৩৬

পরিণত হন। এই ছড়াটিতে সেই কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্য ঘটনাটি কৃত্তিবাসী রামায়ণের রত্নাকর দস্যু ও পালাগানের কেনারাম ডাকাতের কাহিনীর আদর্শে গ্রথিত হইয়াছে। জঙ্গলবাড়ীর প্রসিদ্ধ ভুঁইয়া ঈশা খাঁ সম্বন্ধে মোট চারিটি পালাগান পাওয়া গিয়াছে। প্রাচীনতম পালাটি, দীনেশচন্দ্রের মতে সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত। কবির কোন নাম পাওয়া যায় না। দ্বিতীয় পালা কিশোরগঞ্জ গলাচিপা নিবাসী আবদুল করিম রচিত। তৃতীয় পালায় ঈশা খাঁয়ের পৌত্র মনুয়ার খাঁয়ের জীবনী বর্ণিত হইয়াছে। চতুর্থ পালার নাম 'দেওয়ান ফিরোজ খাঁয়ের গান'। এই চারিটি পালায় ঈশা খাঁ সম্বন্ধে যে সমস্ত তথ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহার পরস্পরের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে পারা যায় না, ইতিহাসের সঙ্গেও অনেক বিরোধ আছে। একদা ঈশা খাঁয়ের প্রতাপের কাহিনী এবং তাঁহার সঙ্গে কেদাররায়ের ভগিনীর (কন্যার) ঘটনা লইয়া অনেক পালা রচিত হইয়াছিল —তাহার যৎসামান্য রক্ষা পাইয়াছে। এই সমস্ত ছড়া-পাঁচালীতে ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান করা পণ্ডশ্রম মাত্র। চন্দ্রকুমার শ্রীহট্টের বানিয়াচঙ্গ হইতে ছুরত জামাল ও অধুয়াসুন্দরীর পালা সংগ্রহ করেন—ইহা অন্ধকবি বৈজু ফকির রচিত। ইহাতে বানিয়াচঙ্গের মুসলমান দেওয়ান-পরিবারের কাহিনী বর্ণিত হইয়াছে। পালাটিতে ইসলামী ও গ্রাম্যশব্দের কিছু আধিক্য দেখা যায়। ফিরোজ খাঁ দেওয়ানের পালাটি চন্দ্রকুমার কয়েকজন মুসলমান গায়েন এবং একটি অন্ধ ভিক্ষুকের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন।

পূর্ববঙ্গগীতিকার তৃতীয় খণ্ডে (দ্বিতীয় সংখ্যা)[১৫৭] মোট এগারটি পালা সংগৃহীত হইয়াছে:—(১) মাঞ্জুর মা, (২) কাফেনচোরা, (৩) ভেলুয়া, (৪) হাতীখেদা, (৫) আয়নাবিবি, (৬) কমলসদাগর, (৭) শ্যামরায়, (৮) চৌধুরীর লড়াই, (৯) গোপিনীকীর্তন, (১০) সুজাতনয়ার বিলাপ, (১১) বারতীর্থের গান।

'মাঞ্জুর মা' পালাগান নগেন্দ্রনাথ দে সংগ্রহ করিয়াছিলেন, ইহার রচনা-কারের নাম পাওয়া যায় না। তবে বর্ণিত বিষয়, ভাষা ও রচনাভঙ্গিমা

১৫৭. *Eastern Bengal Ballads*-এর তৃতীয় খণ্ডটিকে Vol. III ও Part I চিহ্নিত করা হইয়াছে। ইহাতে পূর্ববঙ্গ গীতিকার তৃতীয় খণ্ডের (দ্বিতীয় সংখ্যা) পালাগুলির সংক্ষিপ্ত অনুবাদ দেওয়া হইয়াছে।

ছিলেন। প্রায় পৌনে দুই শত বৎসর পূর্বে নোয়াখালি ও চট্টগ্রামের নিম্ন-শ্রেণীর জনসাধারণের মধ্যে 'চৌধুরী লড়াইয়ে'র খুব জনপ্রিয়তা ছিল। ইহা আগাগোড়া গান করা হইত। কিন্তু কোন কোন স্বল্পশিক্ষিত ও কবিযশঃ-প্রার্থী ব্যক্তি আধুনিক ছাঁচে ঢালিয়া এই কাব্যের মুদ্রিত সংস্করণ প্রকাশ করিয়া পালাটির জাতি মারিয়াছেন। ইঁহারা ভারতচন্দ্রাদি পাঠ করিয়া তাঁহার গুণ ছাড়িয়া শুধু অশ্লীলতাটুকু ধরিয়া রাখিয়া একাধিকবার এই পালা ছাপাইয়াছিলেন। বছনিয়া শেখ, ইয়াকুব আলী, ইয়নস মিঞা প্রভৃতি লেখকেরা আদিরসের অশ্লীল ফোড়ন ছড়াইয়া নোয়াখালির চৌধুরী-পরিবারেব পারিবারিক দুর্ঘটনা অবলম্বনে যে সমস্ত লোকরঞ্জক পালাগান মুদ্রিত করিয়াছিলেন, সাহিত্য হিসাবে তাহা অতি অপদার্থ। এমন কি কেহ কেহ এইরূপ কাহিনীতে মাত্রাতিরিক্ত পরিমাণে অশ্লীল বর্ণনা দিবার জন্য আদালতে অভিযুক্ত হইয়া কিছু গুনাহ্‌গার দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।[১৬১] যাহা হউক, যুদ্ধ সংঘর্ষ ও উৎকট আদিরসের সংমিশ্রণের জন্য চৌধুরীর লড়াইয়ের মুদ্রিত পালাগান একদা নোয়াখালী-চট্টগ্রামের মুসলমানসমাজে খুব জনপ্রিয় হইয়াছিল—যদিও কাহিনীটি হিন্দু জমিদারবংশকে কেন্দ্র করিয়াছে। নোয়া-খালির বাবুপুর-জমিদারবংশ চৌধুরীপরিবারের নায়ক রাজচন্দ্র চৌধুরীর লাম্পট্য, অত্যাচাব, নীচজাতীয়া স্ত্রীলোক লইয়া অবৈধ আচরণ, খুল্লতাত রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর প্রতিবাদ ও বিরোধিতা ইত্যাদি কাহিনী লইয়া অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি যে খুনখারাবি কাণ্ড হইয়াছিল, এই দীর্ঘ পালাগানে তাহাই বিবৃত হইয়াছে। এই পালাটি উত্তেজক কাহিনীমূলক য়ুরোপীয় ব্যালাডের অনুরূপ বলিয়া রচনাংশ উৎকৃষ্ট না হইলেও অন্যদিক দিয়া ইহার কিছু ঐতিহাসিক মূল্য আছে। এখনও ঐ অঞ্চলে সেই সমস্ত ঘটনার স্মৃতিচিহ্ন রহিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি নেত্রকোণার অন্তর্ভুক্ত ঠাকুরকোণা গ্রামের স্থলা (<স্থলক্ষণা) নাম্নী এক মহিলাকবি 'গোপিনীকীর্তন' শীর্ষক কৃষ্ণলীলা-

---

১৬১. এই কাহিনীর অন্যতম লেখক ইয়নস মিঞা এবং প্রকাশক ও মুদ্রাকর রহিম বক্‌স্ নোয়াখালির ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের আদালতে অশ্লীল গ্রন্থ রচনা ও প্রকাশের দায়ে অভিযুক্ত হইয়া দুইজনে ৪০২ টাকা হিসাবে জরিমানা দিতে বাধ্য হইয়াছিলেন। পুস্তকের সমস্ত কপি পুলিশ বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। পূ. গী, ৩।২, পৃ, ২৯৮

বিষয়ক একটি পালাগান রচনা করিয়াছিলেন। রামী ও চন্দ্রাবতীকে ছাড়িয়া দিলে সুলা মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের তৃতীয় মহিলাকবি। নমঃশূদ্র কুলে জন্মিয়া তিনি বিদ্যা, সঙ্গীত ও নৃত্যে পারদর্শিতা অর্জন করেন, অতঃপর তিনি সুলা গায়েন নামে পরিচিত হন। তাঁহার বিবাহ-জীবন সুখের হয় নাই, স্বামী তাঁহাকে পরিত্যাগ করে। তাঁহার রচনার মধ্যে ব্যক্তিগত জীবনের সেই ব্যর্থতার ইঙ্গিত আছে। নৃত্যগীতে কৃতিত্বের জন্য সুলা প্রায়ই ব্রাহ্মণ-বাড়ীতে আহূত হইতেন। তাঁহার বৈষ্ণব পালাগানটি সহজ ভাষায় রচিত —নিতান্ত মন্দ নহে। অবশ্য পল্লীগাথার মধ্যে এই বৈষ্ণব কাহিনী অন্তর্ভুক্ত না হইলেই ভালো হইত। চন্দ্রকুমার দে এই পালাগান এবং সুলা গায়েনের জীবনী ময়মনসিংহের জমিদার বিজয়নারায়ণ আচার্যের নিকট হইতে সংগ্রহ করেন। বিহারীলাল রায় ময়মনসিংহ হইতে 'বারতীর্থের গান' শীর্ষক পালাটি সংগ্রহ করিয়াছিলেন। পালাটি অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালের রচনা, সজু বয়াতি নামক এক কৃষক-কবি ১২৮০ বঙ্গাব্দে ইহা রচনা করেন। ময়মনসিংহের অন্তর্গত জোয়ানশাহীতে এই বারতীর্থের ধ্বংসাবশেষ এখনও আছে। এ সম্বন্ধে নানা পুরাতন অলৌকিক গল্প প্রচলিত থাকিলেও কাহিনীটির পশ্চাতে ঐতিহাসিক ঘটনাও আছে। উক্ত অঞ্চলের জমিদার দত্তবংশের নায়ক ভগদত্ত বারটি তীর্থে গিয়া পবিত্র সলিল সংগ্রহ করিয়া নিজ-রাজ্যে বিরাট দীঘি খনন করান এবং ঐ দীঘিতে বারতীর্থের জল সিঞ্চন করেন। তাঁহার অনুপস্থিতির কালে কনিষ্ঠ ভ্রাতা রামচন্দ্র অত্যন্ত যোগ্যতার সঙ্গে রাজ্যশাসন করিলেও অকৃতজ্ঞ প্রজারা ভগদত্ত তীর্থ হইতে ফিরিয়া আসিলে বিনাকারণে রামচন্দ্রের বিরুদ্ধে অভিযোগ করে। ইহাতে রামচন্দ্র ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হইয়া অভিশাপ দেন—এই দেশ জঙ্গলে পরিণত হইবে, প্রজারাও চিরদুঃখী হইবে। তাহার পরেই নাকি এই রাজ্য ও দীঘিকার মহিমা বিনষ্ট হয়। এখনও মধুপুরের দুর্ভেদ্য জঙ্গলের[১৬২] মধ্যে বিরাট পরিত্যক্ত পুরীর ধ্বংসাবশেষ দেখিতে পাওয়া যায়। মুসলমান কৃষক কবি রচনার ঢঙে ছড়া ও পালাগানের সুরটি চমৎকার রক্ষা করিয়াছেন। যথা—

---

১৬২. 'মধুপুর জঙ্গলের কঠিন রক্তবর্ণ ভূমি ঢাকা হইতে আরম্ভ করিয়া জামালপুর পর্যন্ত বিস্তৃত।" পূ. ব. গী. ৩।২, পৃ. ৫০৯

রাজা গেছে প্রজা গেছে গেছে রে ভাই-ঠমক।
উজার ভিটা পইরা রইছে এ্যাহন শিয়ালের বৈঠক॥
হে-হে-হে।

কবি মুসলমান ছিলেন বলিয়া হিন্দুর তীর্থধর্মের প্রতি কিঞ্চিৎ বিদ্রূপ করিতে কসুর করেন নাই। তিনি বলিতেছেন, বারতীর্থের জলপূত দীর্ঘিকার জল পান করিলে নাকি হিন্দুরা স্বর্গে যায়। তবে স্বর্গে যাক আর নাই যাক, ওলাউঠায় যে আক্রান্ত হয় তাহাতে সন্দেহ নাই :

এইখানেতে চান করিলে হিন্দু লোকেরা ভেস্তে যায়।
প্যাকের পানি খাইয়া তারা ওলাটা নাগায়॥
হে-হে-হে।

বৈষ্ণবী ও অন্যান্য সুন্দরী স্ত্রীলোকেরা এই তীর্থে স্নান করিতে আসে। লাভের মধ্যে দুষ্ট-লোকের হাতে পড়িয়া তাহাদের জাতি যায় :

বৈষ্টমী আর এব্যাসেবা মাইয়া লোকেরা ছান করে।
দুষ্ট লোকের হস্তে পৈরা জাইত বদল করে॥
হে-হে-হে।

পূর্ববঙ্গ গীতিকার সর্বশেষ খণ্ড চতুর্থ খণ্ডে (দ্বিতীয় সংখ্যা)[১৬৩] মোট উনিশটি পালা সংগৃহীত হইয়াছে :—(১) নছর মালুম, (২) শীলাদেবী, (৩) রাজা রঘুর পালা, (৪) নুরন্নেহা ও কবরের কথা, (৫) মুকুট রায়, (৬) ভারাইয়া রাজার কাহিনী, (৭) আন্ধাবন্ধু, (৮) বগুলার বারমাসী, (৯) চন্দ্রাবতীর রামায়ণ, (১০) সন্নমালা, (১১) বীরনারায়ণের পালা, (১২) রতনঠাকুরের পালা, (১৩) পীরবাতাসী, (১৪) রাজা তিলকবসন্ত, (১৫) মলয়ার বারমাসী, (১৬) জিরালনী, (১৭) পরীবানুর হাঁহলা, (১৮) সোনারায়ের জন্ম, (১৯) সোনাবিবির পালা। ইহার অন্তর্ভুক্ত চন্দ্রাবতীর রামায়ণ সম্পর্কে পূর্বে কিছু আলোচনা করিয়াছি।[১৬৪] এই উনিশটি পালার মধ্যে অধিকাংশই বিশেষত্ব বর্জিত। শীলাদেবী, ভারাইয়া রাজার কাহিনী, পরীবানুর হাঁহলা ইত্যাদি পালাগুলি কিঞ্চিৎ উল্লেখযোগ্য। ইহার অধিকাংশ পালাই চন্দ্রকুমার দে সংগ্রহ করেন, বাকিগুলি আশুতোষ

১৬৩. ইহা Eastern Bengal Ballads (Vol. IV, part I)-এ অনূদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে।

১৬৪. তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য।

চৌধুরীর সংগ্রহ। 'লীলাদেবীর পালা' পূর্বে 'আরতি' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল—সেইটি অধিকতর পুরাতন। চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত পালায় আধুনিক হস্তক্ষেপ অতি স্পষ্ট।

গীতিকার বিষয়বস্তু ও কাব্যধর্ম—ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার চারিটি খণ্ডে সংগৃহীত ৫৪টি পালাগানের মধ্যে কয়েকটি পালা ভিন্ন বিষয়ের বলিয়া আলোচনা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে। প্রথম খণ্ডের কাজলরেখার পালা পুরাপুরি রূপকথা জাতীয়—গদ্যেপদ্যে রচিত এই রূপকথাটির এই সংগ্রহে যুক্ত হইবার কোন কারণ নাই। দ্বিতীয় খণ্ডের সাঁওতাল হাঙ্গামার ছড়ার সঙ্গে এই গীতিকা-সাহিত্যের কোন সম্পর্ক নাই। তৃতীয় খণ্ডের গোপিনী-কীর্তন প্রসঙ্গবহির্ভূত রচনা—তাহা আমরা পূর্বেই বলিয়াছি। হাতীখেদার পালা বৈচিত্র্যপূর্ণ হইলেও এই পালাগানের সঙ্গে ইহার যোগাযোগ অতি অল্প। বারতীর্থের গানও পালাগানের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। চতুর্থ খণ্ডের চন্দ্রাবতীর রামায়ণকে এই পালাসংগ্রহ হইতে বাদ দিলে সঙ্গতি রক্ষিত হইত।[১৬৫]

এই পালাগুলিতে বিষয়বস্তুগত তিনটি ধারার পরিচয় পাওয়া যায়—লৌকিক প্রণয়গাথা, ঐতিহাসিক-রোমান্টিক আখ্যান এবং বিশুদ্ধ ঐতিহাসিক আখ্যান। ইহা ছাড়াও বিবিধ বিষয় লইয়া দুই একটি পালা রচিত হইয়াছিল—যেমন, হাতীখেদা। লৌকিক প্রেম এবং তাহার বাধাবিপত্তি ও পরিণাম লইয়াই অধিকাংশ পালা রচিত হইয়াছে এবং শ্রেষ্ঠ পালাগুলি এই শ্রেণীর অন্তর্গত। মহুয়া, মলুয়া, কঙ্ক ও লীলা, দেওয়ানা মদিনা, ধোপার পাট, কাঞ্চন-মালা প্রভৃতি পালাগুলিতে নারীর অত্যাজ্য প্রেম, প্রেমের জন্য যে-কোন ত্যাগ-

১৬৫. ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল (Dr. Dusan Zbavitel) রচিত *Bengali Folk Ballads from Mymensingh and the Problem of their Authenticity* (1963)-তে দস্যু কেনারামের পালাকে ব্যালাড বলিয়া গ্রহণ করিতে চাহেন না, এবং এই জন্যই তাঁহার গ্রন্থে এ বিষয়ে আলোচনা করেন নাই। কেনারামের পালায় কিছু উচ্চ তত্ত্বকথা ও দার্শনিক ইঙ্গিত আছে; দুর্দান্ত ডাকাতের চরিত্রের আমূল পরিবর্তন অনেকটা ধর্মভাবের অনুগত। তাই বলিয়া ইহাকে ব্যালাডের অন্তর্ভুক্ত কেন করা যাইবে না তাহা বুঝা যাইতেছে না। নেজাম ডাকাতের পালাও (পূ. ব. গী. ২।২) একই প্রকার; তাই বলিয়া তাহাকে কি এই গাথা-গীতিকা হইতে বাদ দেওয়া যায়?

স্বীকার এবং প্রেমের স্বর্গীয় প্রবাহে জাতিসম্প্রদায়ের সঙ্কীর্ণতা লোপের ছবি চমৎকার ফুটিয়াছে। তন্মধ্যে মহুয়ার গল্পটি পূর্ব-পশ্চিমবঙ্গ নির্বিশেষে সর্বত্র চলিয়াছে, আধুনিক কালের দর্শক-শ্রোতাও ইহাকে আধুনিক যুগের উপযোগী অভিনয় ও চলচ্চিত্রের মাধ্যমে গ্রহণ করিয়াছেন। বস্তুতঃ পূর্ববঙ্গ-গীতিকার প্রথম পর্ব 'ময়মনসিংহগীতিকা'র অনেকগুলি পালাতেই অতি উৎকৃষ্ট কবিত্ব, শিল্পগুণ, মানবরস ও উদার-অসাম্প্রদায়িক ভাব লক্ষ্য করা যায়। পাশ্চাত্ত্য প্রেমঘটিত ব্যালাডে অনেক সময় ব্যর্থ প্রণয়ের জন্য তীব্র প্রতিহিংসা, ঘৃণা, হানাহানি ফুটিয়া উঠিয়াছে। কিন্তু এই গীতিকাগুলির হিন্দু-মুসলমান নারীচরিত্রে কোমলতা, প্রেমের জন্য সুকঠোর আত্মত্যাগ প্রভৃতি বৈশিষ্ট্য কৃষক কবিগণ আশ্চর্য দক্ষতার সঙ্গে বর্ণনা করিয়াছেন। ইঁহাদের প্রায় কেহই পুঁথিগত বিদ্যার অধিকারী ছিলেন না, সকলেই কৃষিকার্য, মাছধরা, নৌকা বাওয়া ইত্যাদি সামান্য কর্মের দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করিতেন এবং কাজকর্মের স্বল্প অবকাশে কেহ স্থানীয় আত্মত্যাগ বা দ্বন্দ্বকলহ লইয়া ছড়াগান বাঁধিতেন, কেহ-বা তাহা গাহিয়া শ্রোতাদের আনন্দ দিতেন। কেহ কেহ এই সমস্ত পালাগান গাহিয়াই জীবিকা নির্বাহ করিতেন।

পালাগানগুলিতে কোনও প্রকার ধর্মীয় গণ্ডী মানা হইত না, মুসলমান কাজী বা জমিদার কর্তৃক হিন্দু ললনা অপহরণের অপরাধমূলক কাহিনী বর্ণনায় মুসলমান কৃষক কবি কিছুমাত্র সঙ্কুচিত হন নাই। মুসলমান গৃহস্থের বাড়ীতেও সে গান অনুষ্ঠিত হইত। অবশ্য রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ সমাজে এই সমস্ত কাহিনী ও গানের বোধ হয় ততটা জনপ্রিয়তা ছিল না। সে যাহা হউক এই পালাগীতিকাগুলির রচনারীতিতে অনেক ত্রুটি থাকিলেও বক্তব্য বিষয়টি অতীব প্রশংসনীয় তাহাতে সন্দেহ নাই। মধ্যযুগের শেষভাগে দেবদেবীর কথা বাদ দিয়া পাঁচালী-ছড়া-গাথাকারেরা যে মর্ত্যজীবী নরনারীর বিরহ-মিলনের কথাকে এতটা সহানুভূতির রসে আর্দ্র করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার জন্য তাঁহারা ধন্যবাদার্হ। তবে কেহ কেহ এবিষয়ে সন্দেহ প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন, "এ দেশের পারিবারিক পরিবেশে স্বাধীন ভালোবাসা কোন দিন প্রশ্রয় পায় নি, তাই পরকীয়াবাদকে এদেশে ধর্ম বলে চালাতে হয়েছে। তাই বিদ্যাসুন্দরকেও শেষপর্যন্ত কালীমাহাত্ম্য দিয়ে বাঁচাতে হয়েছে। এই দেশে বর্ণাশ্রমবিরুদ্ধ প্রেম এবং তার জন্তে সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ…

এ সত্যই অদ্ভুত। আর এ থেকেই সন্দেহ জাগে গীতিকার প্রাচীনতা নিয়ে।"[১৬৬] তাই কোন কোন সমালোচক সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন যে, গীতিকাগুলি পুরাতন বাংলা সাহিত্য নহে, আধুনিক কালে কেহ পুরাতন গাথার ঢঙে আধুনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দ্বারাই রচনা করিয়াছেন। এ বিষয়ে আমরা পরবর্তী উপচ্ছেদে পালাগানগুলির প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে আলোচনা করিব। উপস্থিত প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে, এই গীতিকাগুলি পূর্ববাংলার একটি বিশেষ ভৌগোলিক অঞ্চলে ময়মনসিংহ জেলার পূর্বভাগে প্রচলিত আছে। এই অঞ্চলে অনতিপূর্বে সংঘটিত কোন ঘটনা, চরিত্র ও স্থানের নামধাম এই পালাগুলিতে ব্যবহৃত হইয়াছে।[১৬৭] পূর্ব-ময়মনসিংহের নদনদীবেষ্টিত জলাভূমি (হাওর<হাবড়) এই আখ্যান-সমূহের পটভূমি। দীনেশচন্দ্রের মতে, "উত্তরে সুষঙ্গ, দুর্গাপুর ও দক্ষিণে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জের অন্তর্বর্তী পল্লীসমূহ বর্ণিত অধিকাংশ ঘটনার অভিনয় ক্ষেত্র।"[১৬৮] এখন দেখা যাক, বাংলার আর সমস্ত অঞ্চল বাদ দিয়া শুধু এই অঞ্চলেই কেন লৌকিক প্রেমের গাথা রচিত ও প্রচারিত হইয়াছে। ঐতিহাসিকের মতে দুর্গম ময়মনসিংহ, বিশেষতঃ ইহার পূর্বভাগে বহুদিন রক্ষণশীল ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি প্রবেশ করিতে পারে নাই, এখানে নানাপ্রকার আদিবাসী ও পাহাড়ী জাতির নিত্য আনাগোনা চলিত, মুসলমান ধর্মান্তরী-করণ এই অঞ্চলে পুরাদমে চলিয়াছিল। সুতরাং স্থানীয় হিন্দুদের মধ্যে রক্ষণশীল মনোভাব ততটা ছিল না, থাকিলে ব্যর্থপ্রেমে হিন্দু-রমণীর আজীবন কুমারী থাকিবার কাহিনী এবং অসবর্ণ বিবাহের গল্প শ্রোতৃসমাজে কখনও জনপ্রিয় হইতে পারিত না। মহুয়া, কঙ্ক ও লীলা প্রভৃতির আখ্যানে দেখা যাইতেছে হিন্দুদের জাতিভেদপ্রথা ও ছুঁৎমার্গ এই আখ্যানগুলিতে নাই। দীনেশচন্দ্রের ভাষায়, "নব ব্রাহ্মণ্যধর্ম সেই প্রদেশে জয়ডঙ্কা বাজাইতে পারে

---

১৬৬. নন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা, পৃ. ৪৭। অবশ্য এই ধরনের পালাগান বা ব্যালাড ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্যেও আছে। খ্রীঃ ১৮শ শতাব্দীতে মারাঠী সাহিত্যে ঐতিহাসিক যুদ্ধবিষয়ক অনেক ছড়াগান ('পেয়াদা') এবং প্রেমপ্রণয়বিষয়ক গাথা ('লাবনী') রচিত হইয়াছিল।

১৬৭. "পালাগানের অধিকাংশই পূর্বময়মনসিংহের কোন যথার্থ ঘটনা অবলম্বন করিয়া রচিত হইয়াছে।" ময়মনসিংহ গীতিকা, ১মা২য়, পৃ. ।/০

১৬৮. ময়মনসিংহ গীতিকা, ১মা২য়, পৃ. ।৶০

নাই, এই জন্য আদিম আদর্শের গৌরবশ্রী সেখানে অনেক দিন পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ ছিল।"[১৬৯] অবশ্য এসব কথা ইতিহাসসম্মত কিনা তাহা ঐতিহাসিকেরা বিবেচনা করিবেন। পূর্ব-ময়মনসিংহে ব্রাহ্মণ্য সংস্কার প্রবেশ করিতে পারে নাই—প্রাচীন ভাবধারা দীর্ঘকাল বজায় ছিল, এসমস্ত কথা যথেষ্ট তথ্যসঙ্গত নহে। কারণ ঐ অঞ্চলে ব্রাহ্মণ্যসংস্কার দুই চারিশত বৎসর পূর্বে যেমন ছিল অষ্টাদশ-উনবিংশ শতাব্দীতেও সেই প্রকার ছিল। সুতরাং গোটা বাংলার মধ্যে একমাত্র পূর্ব-ময়মনসিংহের ভালে 'ব্রাত্যে' তিলক আঁকিয়া দিয়া স্বতন্ত্র মর্যাদা দিবার প্রয়োজন নাই। এইরূপ লৌকিক প্রেমের গল্প একদা সমস্ত বাংলা দেশেই প্রচলিত ছিল—রূপকথাগুলি তাহার দৃষ্টান্ত। পশ্চিমবঙ্গের অনেক রূপকথায় নিছক লৌকিক প্রেমের কথাই বলা হইয়াছে। এই রূপকথাগুলি বহু প্রাচীনকাল হইতে বৃদ্ধ-বৃদ্ধাদের মুখে মুখে চলিয়া আসিতেছে। আসলে গল্প শুনিবার বাসনা মানুষের চিরন্তন। ধর্ম ও দেবতাকে কেন্দ্র করিয়া যেমন একশ্রেণীর আখ্যা-আখ্যায়িকা গড়িয়া ওঠে, তেমনি লৌকিক জীবনধারাকে অবলম্বন করিয়া কিছু কিছু লোকসাহিত্যের সৃষ্টি হইয়াছে। উদাহরণস্বরূপ—সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর মল্লরাজাদের অনুগ্রহভাজন ফকিররাম কবিভূষণের 'সখীসোনা' বা 'সখীসেনা'র কাহিনী উপকথাকে কেন্দ্র করিয়াই গড়িয়া উঠিয়াছে—ইহার একাধিক পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। কয়েকবার ইহা ছাপাও হইয়াছে। গল্পটি এইরূপ:—রাজকুমারী সখীসোনা কোটালপুত্রের সঙ্গে একই গুরুর নিকট পড়িত। রাজকুমারীর করচ্যুত লেখনীটি কোটালপুত্র কয়েকবার তুলিয়া দিয়া তাহার প্রতিদানস্বরূপ রাজকুমারীর কর দাবি করে—যাহা হউক উভয়ের মধ্যে প্রণয় সঞ্চার হয়। সেই রূপকথার কাহিনী ফকিররাম কয়েকশত বৎসর পূর্বে পয়ারত্রিপদীতে রচনা করিয়াছিলেন, তাহাতে মর্ত্যপ্রেমের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।[১৭০] কবি সরূফের 'দামিনী চরিত্র'[১৭১] (অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের পুঁথি), 'নীলার বারমাসি' (উত্তরবঙ্গ হইতে গ্রীয়ার্সন সংগৃহীত)[১৭২] প্রভৃতিতে লৌকিক

১৭০. ঐ, পৃ, ৮৶০

১৭১. দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত বঙ্গ-সাহিত্য-পরিচয়, ২য় খণ্ড, পৃ. ১৩৫২—৬৫

১৭২. বিশ্বভারতী পত্রিকা, ৪র্থ বর্ষ, ২য় সংখ্যা।

১৭৩. J. R. A. S. B, 1877 (গ্রীয়ার্সনের সংগ্রহ)

কাহিনীই অনুসৃত হইয়াছে। সুতরাং পূর্ব-ময়মনসিংহের মাটির গুণেই যে গীতিকাগুলির উদ্ভব হইয়াছে সেরূপ সিদ্ধান্ত পুরাপুরি তথ্যসঙ্গত নহে। কারণ পূর্ব-ময়মনসিংহ ছাড়াও পূর্ববঙ্গের ফরিদপুর, নোয়াখালি, চট্টগ্রাম প্রভৃতি অঞ্চল হইতেও ঐরূপ গীতিকা পাওয়া গিয়াছে। তবে পূর্ব-ময়মনসিংহের পালাগুলির কাব্যধর্ম অধিকতর প্রশংসনীয় তাহা স্বীকার করিতে হইবে।

ময়মনসিংহ গীতিকার প্রায় সমস্ত পালায় স্ত্রীচরিত্রের প্রাধান্য, কিন্তু পূর্ব-বঙ্গে অন্য স্থান হইতে সংগৃহীত অনেক পালায় পুরুষচরিত্রেরও গৌরব স্বীকৃত হইয়াছে। ময়মনসিংহ গীতিকার নারীচরিত্রে যে আদর্শ ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা যেন আধুনিক কালের কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্রের উপন্যাসের ব্যালাড-রূপ বলিয়া মনে হয়। একনিষ্ঠ প্রেম, যাহার প্রভাবে জাতিসম্প্রদায়-আভিজাত্য ধুলায় মলিন হইয়া যায়—তাহাই তো মহুয়া, মলুয়া, মইষালবন্ধু প্রভৃতি পালায় বিকাশলাভ করিয়াছে। পবিত্র প্রেমের অপূর্ব লিপিচিত্র অঙ্কন করিতে গিয়া পল্লীর নিরক্ষর কবিগণ পুঁথিপত্র, শাস্ত্রসংহিতা ও মৌলবী-পুরোহিতের পাঁতি লইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই; অন্তরের স্বতঃস্ফূর্ত আবেগকেই তাঁহারা রত্নদীপের অচঞ্চল শিখার মতো মনে করিয়াছেন। এই প্রেমে প্রতারণা আছে, আঘাত আছে, বিরহের পীড়ন আছে—আর তাহার সঙ্গে আছে নারীর সর্বসমর্পণমূলক আত্মনিবেদন, প্রিয়তমের জন্য জাতিকুল খোয়াইবার অবিস্মরণীয় কাহিনী। কবিগণ কাহিনীকে কখনও বিবৃতিমূলক ঘটনার মতো দৌড় করাইয়াছেন, কখনও গীতিকবিতার মতো ভাবাবেগে মন্থর করিয়া তুলিয়াছেন, কখনও-বা নাটকীয় পঞ্চসন্ধির অস্থি-সন্ধিতে তীব্র ঘটনাবেগ, অসাধারণ চরিত্রদ্বন্দ্ব, মনস্তত্ত্বের নিপুণ পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন—এইজন্য তাঁহাদের 'অশিক্ষিত পটুত্ব' বিশেষ প্রশংসার যোগ্য। গায়েনদের নামের আড়ালে এইরূপ কত অখ্যাত কবির নামপরিচয় হারাইয়া গিয়াছে। ময়মনসিংহ গীতিকার অধিকাংশ পালা এবং পূর্ববঙ্গ গীতিকার কয়েকটি পালায় যে গাথাকাব্যের বিস্ময়কর দৃষ্টান্ত পাওয়া যায় তাহা স্বীকার করিতে হইবে। ভাষা ও বর্ণনায় গ্রাম্য মাটির স্পর্শ থাকিলেও শব্দকল্প ও উপমানির্বাচনে[১৭৩] অশিক্ষিত কবিগণ বিশেষ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন।

১৭৩. ডঃ দুশান জ্‌বাভিতেলের *Bengali Folk Ballads*-এ এ বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করা হইয়াছে। দ্রষ্টব্য: উক্ত গ্রন্থের পৃঃ ১৫২—২০১

কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি॥

প্রভৃতি পংক্তির রচনাচাতুর্য বিস্ময়কর। এখানে এইরূপ উৎকৃষ্ট কাব্যধর্মী কয়েক পংক্তির উদাহরণ দেখা যাইতেছে:

(১) মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
(২) সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।
(৩) আশমানের চাঁন্দ যেমন জমিনে পড়িয়া।
(৪) দরিয়ায় গলিয়া পড়ে আমার গলার হার।[১৭৪]
(৫) দিনে দিনে ফোটে কন্যার যৌবনের কলি।
(৬) চান্দের সমান রূপে করে ঝলমল।
(৭) মধু না আসিতে ফুলে নাহি আসে অলি।
(৮) সুন্দর বদন যেমন মহুয়ার ফুল।
(৯) দেশেতে ভমরা নাই কি করি উপায়।
(১০) গোলাপের মধু তায় গোবরিয়া খায়॥
(১১) আমার সোয়ামী যেন পর্বতের চূড়া।
(১২) সকল থাক্যা অধিক মিঠা বিরহে মিলন।

নানা গীতিকায় অতি আশ্চর্য ধরনের অলঙ্কারের দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়, যাহাতে চলিত জীবনচিত্র ও ক্লাসিক বাকরীতি একসঙ্গে মিশিয়া গিয়াছে। কোন কোন স্থলে কবিগণ অতি চমৎকার নাট্যরস ও গীতিরস সৃষ্টি করিয়াছেন। স্বামীর কলঙ্ক দূর করিবার জন্য স্বামী-সপত্নীকে রাখিয়া গহীন সমুদ্রে মলুয়ার তরী ভাসাইবার বর্ণনাটি অতি চমৎকার হইয়াছে:

পুবেতে উঠিল ঝড় গর্জিয়া ওঠে দেওয়া।
এই সাগরের কূল নাই ঘাটে নাই খেওয়া॥
"ডুবুক ডুবুক নাও আর বা কতদূর।
ডুইব্যা দেখি কতদূরে আছে পাতালপুর॥"
পুবেতে গর্জিল দেওয়া ছুটল বিষম বাও।
কইবা গেল সুন্দর কন্যা মনপবনের নাও॥

মলুয়া পালার সমাপ্তিতে এইরূপ একটি বিষণ্ণ বেদনার সুরে সমুদ্রের উন্মত্ত পবন কাঁদিয়া উঠিয়াছে, পুবালি ঝড়ে মলুয়ার মনপবনের নাও কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে। কিন্তু মলুয়ার আত্মত্যাগ পাঠকের মনে চিরজীবী হইয়া রহিল।

১৭৪. অর্থাৎ মহুয়া বলিতেছে নদীর মধ্যে তাহার গলার হার অর্থাৎ নদের চাঁদ ডুবিয়া গিয়াছে।

'মহুয়ার নাট্যরসোজ্জ্বল[১৭৫] আখ্যানটিও সমগ্র পালাসাহিত্যের মধ্যমণি স্বরূপ গণ্য হইতে পারে। কাল্পনিক আখ্যায়িকা হইলেও ইহার চারিদিকে ভৌগোলিক বর্ণনায় দুরস্মৃত গ্রাম-জনপদের যথার্থ পরিচয় আছে। পালায় বর্ণিত বামনকান্দি, বাইদার (<বাদিয়ার) দীঘি, ঠাকুরবাড়ীর ভিটা, উলুয়াকান্দি প্রভৃতি গ্রাম, দীঘি ও স্থানের এখনও অস্তিত্ব আছে। কিছুদিন পূর্বেও নেত্রকোণার গ্রামে এই পালাগান গাহিবার জন্য মুসলমান গায়কদের দল ছিল।[১৭৬] এই গানের করুণ বিষাদান্ত পরিণতি অতিশয় হৃদয়গ্রাহী, জাতিধর্মনির্বিশেষে এমন বিশুদ্ধ মানবীয় রস মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যে একপ্রকার দুর্লভ বলিলেই হয়। নাটকীয় গুণযুক্ত এই কাহিনীও পালাগানের রীতিতে গ্রথিত হইয়া বেশ সংহত আকার ধারণ করিয়াছে। দ্বিজ কানাই নামে কোন এক কবি নাকি তিনশত বৎসর পূর্বে ইহা রচনা করেন। এ সম্বন্ধে অবশ্য আমাদের বিশেষ সন্দেহ আছে, কারণ ময়মনসিংহের স্থানীয় ভাষার প্রভাব সত্ত্বেও ইহার রচনাভঙ্গিমা ও অন্যান্য ভাষাবৈশিষ্ট্য আদৌ পুরাতন নহে। সংগ্রাহক চন্দ্রকুমার নেত্রকোণা মহকুমার অন্তর্গত মসকা গ্রামের শেখ আলি ও উমেশচন্দ্র দে এবং গোরালী গ্রামের নসু সেখের নিকট হইতে এই পালা সংগ্রহ করিয়া ১৯২১ সালে দীনেশচন্দ্রকে পাঠাইয়া দেন। প্রাপ্ত পালায় অনেক অসঙ্গতি দেখিয়া দীনেশচন্দ্র ইহার পাঠ সংশোধন ও পুনর্বিন্যাসের পর 'ময়মনসিংহ গীতিকা'র প্রথম পালারূপে প্রকাশ করিয়াছিলেন।[১৭৭] কাহিনীটি সংক্ষেপে এইরূপ :—

১৭৫. সংগ্রহকার চন্দ্রকুমার দে মহুয়া পালার শুধু গীতিকাটুকু সংগ্রহ করেন, গায়কেরা ইহাতে যে নাটকীয় গদ্যসংলাপ জুড়িয়া দিতেন, অনেক স্থলে অভিনয়ের রীতিও গ্রহণ করিতেন, চন্দ্রকুমার বাহুল্যবোধে তাহা সংগ্রহ করেন নাই। কিন্তু ময়মনসিংহ নিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ যে 'বাস্তানীর গান' সংগ্রহ করিয়া কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন (১৯৪৪), তাহাতে তিনি এই মহুয়া গীতিনাট্যের নাটকীয় অংশ মুদ্রিত করিয়াছিলেন। ফলে দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ পালাগানে নাটকীয়তাও প্রচুর ছিল—অর্থাৎ এই জাতীয় গীতিকাগুলি একদা লোকনাট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। পরে মহুয়ার প্রামাণিকতা প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আলোচনা করা হইয়াছে।

১৭৬. ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ. ১৷৶০

১৭৭. পূর্বোল্লিখিত পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য ১২৯১—৯২ সালে তাঁহার বাল্যকালে ময়মনসিংহের মাসোয়া গ্রামে বাড়ীর আঙিনায় সর্বপ্রথম 'বাস্তানীর গান' শুনেন—গায়কের নাম শেখ কাঙালী,

পাহাড়ী বেদিয়া জাতির অন্তর্ভুক্ত হুমরা বেদে গারো পাহাড়ে ডাকাতি করিয়া জীবিকা নির্বাহ করিত। সে এক বৃদ্ধ ব্রাহ্মণের ছয়মাসের শিশুকন্যা চুরি করিয়া পলাইয়া যায়। তাহাকে সে নিজ কন্যার মতো লালনপালন করিতে লাগিল। ক্রমে সেই কন্যার বয়স হইল ষোল, তাহার নাম দেওয়া হইল মহুয়া।[১৭৮] সে অপূর্ব সুন্দরী হইয়া উঠিল, তাহাকে সঙ্গে লইয়া দলবলসহ হুমরা নানাস্থানে বাজি দেখাইয়া বেড়ায়। বাজি দেখাইতে দেখাইতে তাহারা ময়মনসিংহের বামুনকান্দা গ্রামে উপস্থিত হইল এবং নদের চাঁদ নামক এক ব্রাহ্মণ যুবার বাড়ীতে বাজি দেখাইতে গেল। মহুয়ার খেলা দেখিয়া নদের চাঁদ মুগ্ধ হইল, ক্রমে গোপনে সাক্ষাতের পর উভয়ের মধ্যে আকর্ষণ জন্মিল। ব্রাহ্মণ-কুমার একদিন জলের ঘাটে মহুয়ার নিকট নিজের অভিলাষ জ্ঞাপন করিল, "তোমার মত নারী পাইলে করি আমি বিয়া।" মহুয়াও চন্দ্র-সূর্যকে সাক্ষী করিয়া নিজের বান্ধবী পালংসখীর নিকট ঘোষণা করিল, "নদ্যার ঠাকুর হইল আমার প্রাণের সোয়ামী।" হুমরা বেদে ইহা জানিতে পারিয়া মহুয়াকে লইয়া সে গ্রাম ছাড়িবার সিদ্ধান্ত করিল। বাধ্য হইয়া মহুয়া নদের চাঁদের নিকট চোখের জলে বিদায় লইল। বেদের দল চলিয়া গেলে নদের চাঁদ মহুয়ার বিরহে উন্মাদের মতো হইয়া পড়িল—শেষে মহুয়ার খোঁজে সে গ্রাম ছাড়িয়া নিরুদ্দেশ হইল। পথের পথিককে ডাকিয়া সে জিজ্ঞাসা করে :

> মেঘের সমান কেশ তার তারার সম আঁখি।
> এই দেশে নি উইড়া আইছে আমার তোতাপাখী॥

ক্রমে সে কংসাই নদীর তীরে বেদিয়া দলের সন্ধান পাইল এবং নদীর ঘাটে

এক মুসলমান চৌকিদার। পরে ১৩২১-২২ সালে তিনি পালাটিকে সংগ্রহ করেন এবং ইহার অনেক দিন পরে ১৩৫১ সালে তাহা কলিকাতা হইতে প্রকাশ করেন। মহুয়া পালা এবং বাস্তানীর গান একই বিষয় লইয়া রচিত—উভয়ের মধ্যে রচনারীতিগত বহু সাদৃশ্য আছে। তবে বাস্তানীর গানে অনেক নাটকীয় গদ্যসংলাপ আছে, মহুয়া পালায় তাহা নাই। মনে হয়, একই কাহিনী লইয়া নানা গ্রামে নানা প্রকার পালাগান প্রচলিত ছিল। এক দলের গীত পালার সঙ্গে অপর দলের পালার কিছু পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। অবশ্য এই পার্থক্যের কারণ হিসাবে কেহ কেহ গুরুতর সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন। পরে পালাগানগুলির প্রাচীনতা প্রসঙ্গে এ বিষয়ে আমরা আলোচনা করিয়াছি।

১৭৮. পূর্ণচন্দ্রের সংগৃহীত কাহিনীতে 'বাস্তানীর গানে' হুমরা বেদের নাম উজিরা বাস্তা, মহুয়ার নাম মেওয়া। এ বিষয়ে পরে আলোচনা করা হইয়াছে।

মহুয়ার সাক্ষাৎ লাভ করিল—"সাপে যেমন পাইল মণি পিয়াসী পাইল জল।" সমস্ত ব্যাপার জানিতে পারিয়া হুমরা বেদে একদিন রাত্রে মহুয়ার হাতে একখানি ছুরি দিয়া বলিল, "শুইয়া আছে নদীয়ার ঠাকুর মাইরা আইস তারে।" মহুয়া গভীর রাত্রে নদীর চাঁদের নিকট উপস্থিত হইয়া সব কথা জানাইল। পরে তাহারা দুইজনে বেদিয়ার দল ছাড়িয়া দূরে পলাইয়া গেল। তাহারা এক বণিকের নৌকায় ঠাঁই করিয়া লইল। কিন্তু সেই বণিক মহুয়ার রূপে মুগ্ধ হইয়া তাহাকে হস্তগত করিবার অভিপ্রায়ে নদের চাঁদকে অতর্কিতে নৌকা হইতে ঠেলিয়া জলে ফেলিয়া দিল। মহুয়া কৌশলে বিষমিশ্রিত পান খাওয়াইয়া বণিক ও মাঝিমাল্লাকে অচৈতন্য করিয়া নৌকা ডুবাইয়া দিয়া কোনও প্রকারে তীরে উঠিল এবং নদের চাঁদকে খুঁজিতে লাগিল। অসুস্থ নদের চাঁদকে সে খুঁজিয়া পাইল এবং এক সাধুর সাহায্যে স্বামীকে বাঁচাইল। কিন্তু অসাধুপ্রকৃতির সন্ন্যাসী মহুয়ার প্রতি প্রলুব্ধ হইলে সে অসুস্থ স্বামীকে কাঁধে করিয়া অরণ্যপথে পলায়ন করিল। ক্রমে নদের চাঁদ মহুয়ার সেবায় সুস্থ হইয়া উঠিল, দুইজনে আবার মহানন্দে অরণ্য পর্বতের পটভূমিকায় ভ্রমণ করিয়া ফিরিতে লাগিল। কিন্তু বেশীদিন এ সুখ সহিল না। সেখানে ঘুরিতে ঘুরিতে আবার হুমরা বেদের দল হাজির হইল। এবার হুমরা মহুয়াকে সক্রোধে বলিল :

প্রাণে যদি বাঁচ কন্যা আমার কথা ধর।
বিষলক্ষের ছুরি দিয়া দুষমনেরে মার।

একদিকে পালকপিতার আদেশ, আর একদিকে স্বামীর প্রতি প্রেম—উভয়ের মধ্যে সামঞ্জস্য করিতে না পারিয়া সে নিজের বুকেই সেই 'বিষলক্ষের ছুরি' বিঁধাইয়া দিয়া প্রাণত্যাগ করিল। হুমরাও সক্রোধে নদেরচাঁদকে মারিয়া ফেলিল, তারপর কবর খুঁড়িয়া দুইজনকেই এক কবরে মাটি দিল। সকলে চলিয়া গেল, শুধু মহুয়ার প্রাণের সখী পালংসই সেই কবরের পাশে পড়িয়া রহিল, তাহার চোখের জলে কবরের মাটি ভিজিয়া উঠিল।

এই করুণরসের সংক্ষিপ্ত কাহিনীটি একটি উৎকৃষ্ট পল্লীগাথা রূপে স্বীকৃতি পাইবার যোগ্য। বেদিয়ার পালিত ব্রাহ্মণকন্যা মহুয়া ও ব্রাহ্মণকুমার নদের-চাঁদের এই অপূর্ব কাহিনী বিশ্বের যে কোন উৎকৃষ্ট ব্যালাডের সমকক্ষ।

ইহার স্নিগ্ধমধুর ও বেদাবিধুর মানবরস ভারতবর্ষের বাহিরেও অনেকের প্রশংসা উদ্রেক করিয়াছে।

মলুয়া, রূপবতী, কঙ্ক ও লীলা, ধোপার পাটের নায়িকা কাঞ্চনমালা প্রভৃতি চরিত্রগুলি গ্রাম্য জীবনের পটভূমিকায় গ্রাম্য কবি কর্তৃক রচিত হইলেও রসের দিক হইতে ইহাতে চিরন্তনের সুর বাজিয়াছে। মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের পুঁথি-আশ্রয়ী-দেবপ্রভাবিত সাহিত্যের পার্শ্বে এই গ্রাম্য সাহিত্য এবং গ্রাম্য নায়িকাদের চরিত্র একটা বিচিত্র বিস্ময় সৃষ্টি করিয়াছে।

দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম রসিকের দৃষ্টি লইয়া এই সমস্ত নারী চরিত্রের বিশ্লেষণ করেন এবং গাথাসাহিত্যের কাব্যরূপ বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে ইহাদিগকে তথাকথিত 'ভদ্রসাহিত্যের' উপরে স্থান দান করেন। তাঁহার এই মন্তব্য যুক্তিসঙ্গত, "বাঙ্গালা সাহিত্যে পৌরাণিক উপাখ্যানগুলি সংস্কৃত শব্দের সোনালী চুম্‌কী দেওয়া বেনারসী চেলী পরিয়া ঝলমল করিতেছে—কিন্তু পাড়াগাঁয়ের এই সকল সরল কথা, যাহাতে সংস্কৃতের একটুও ধারকরা শোভা নাই, যাহা নিজ স্বাভাবিক রূপে অপূর্ব সুন্দর—তাহার নমুনা আমরা কোথায় পাইতাম।......ইহা স্বর্গ হইতে আহৃত অমৃত ভাণ্ড নহে, ইহা আমাদের দেশের আমগাছের মৌচাক, এজন্য এই খাঁটি মধুর আস্বাদ আমাদের নিকট এত ভাল লাগিয়াছে।"[১৭৯] তাঁহার এই মন্তব্য একটু ভক্তিবিগলিত হইলেও

১৭৯. ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ ।• দ্রষ্টব্য। দীনেশচন্দ্র এই সমস্ত গাথাকে এত উচ্চ-শ্রেণীর বলিয়া মনে করিতেন যে, পুরাণকেন্দ্রিক বাংলাসাহিত্যকে তুচ্ছ করিয়া ইহাদের গৌরবধ্বজা সু-উচ্চ করিয়া তুলিয়াছিলেন। তাঁহার মতে কেবল উৎকৃষ্ট বৈষ্ণবপদাবলী এই সমস্ত গাথার সমকক্ষতা করিতে পারে—"বঙ্গভারতী বৈষ্ণবগীতিকার রক্ত শতদলে বসিয়াছিলেন—এবার তাঁহাকে শুভ্র কুন্দলাসীনা দেখিলাম।" *Eastern Bengal Ballads* (Vol. I, Part I)-এ তাঁহার মনোভাব এইরূপ—"Some of them at least, I believe, will rank next only to the most beautiful of the Vaishnava songs in our literature." ভক্তির উচ্ছ্বাস বশতঃ দীনেশচন্দ্র মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্রের গ্রন্থাদি অপেক্ষা এই পালাগানে অধিকতর আনন্দ ও বিস্ময় খুঁজিয়া পাইয়াছেন। তাঁহার মন্তব্য, "প্রথম যেদিন বঙ্কিমবাবুর বিষবৃক্ষ, রবীন্দ্রনাথের নৌকাডুবি ও শরৎচন্দ্রের রামের সুমতি পড়িয়াছিলাম, তাহারও পূর্বে যেদিন মধুসূদনের মেঘনাদের ডমরুর ধ্বনি কর্ণরন্ধ্রে মন্দ্রিত হইয়াছিল সেই সকল দিনের কথা আমার মনে আছে, তাহা কখনই ভুলিব না। এই পালাগানের শ্রেষ্ঠগানগুলি পাঠকালে আমার মনের উপর ততোধিক বিস্ময় ও আনন্দের প্রবাহ চলিয়া গিয়াছিল।"—পূর্ববঙ্গগীতিকা, ৩য়/২য়, পৃ. ১৮৶•

অযৌক্তিক নহে। কিন্তু ভাবের আবেগে তিনি সুর চড়াইতে চড়াইতে পল্লী-গীতিকাগুলিকে শীর্ষ স্থানে বসাইতে গিয়া পৌরাণিক ভারত-সংস্কৃতির সীতা-সাবিত্রীকেও নস্যাৎ করিয়া বলিয়াছেন, "এগুলি জানিতাম না বলিয়া আমরা এতকাল শুধু সীতাসাবিত্রীকে লইয়া গৌরব করিয়াছি—এখন আমরা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে লইয়া তদপেক্ষা বেশী গৌরব করিতে পারি—যেহেতু তাহারা ঘাগরা পরা বিদেশিনী নহে, শাড়ী পরা আমাদেরই ঘরের মেয়ে।"[১৮০] বলাবাহুল্য এ মন্তব্য অপ্রাসঙ্গিক, অযৌক্তিক ও হাস্যকর। দীনেশচন্দ্র পৌরাণিক ভারত-ঐতিহ্যকে উড়াইয়া দিয়া মহুয়া-মলুয়া-মদিনাকে অধিকতর গৌরবময় স্থানে স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন এবং সীতা-সাবিত্রীকে 'ঘাগরা পরা বিদেশিনী' আখ্যা দিয়া তাঁহাদিগকে বাংলা সাহিত্যে ও বাঙালীর হৃদয় হইতে মুছিয়া ফেলিতে মনস্থ করিয়াছেন। ইংরাজী ও স্কটিশ ব্যালাডকে শেক্সপীয়র-মিল্টনের মাথার উপরে বসাইয়া দিলে যেরূপ অবস্থা হয়, দীনেশ-চন্দ্রের এই প্রচেষ্টাও সেই রূপ উপহাসের বিষয় হইবে। পল্লীগীতিকার একটা স্বতন্ত্র মাধুর্য আছে, তাই বলিয়া সীতা-সাবিত্রীকে হঠাইয়া দিয়া সেই স্থানে মহুয়া-মলুয়াকে স্থাপন করিতে যাওয়া ডঃ শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের ভাষায়—"আদিক্ষেতা, অর্থাৎ বিশেষ এক প্রকার ভাববিলাসের আতিশয্য।"[১৮১] এ বিষয়ে ডঃ চট্টোপাধ্যায়ের সুদীর্ঘ মন্তব্যটি অতিশয় যুক্তিপূর্ণ বলিয়া এখানে উদ্ধৃত হইল :

"বাঙ্গালা পল্লীগাথার মলুয়া, মদিনা ও কমলার চরিত্র লইয়া আমরা গর্ব করিবই—এই অপূর্ব নারীচরিত্রগুলি আমাদের বাঙ্গালারই পল্লীজীবনের সৃষ্টি, কিন্তু উমা, সীতা ও সাবিত্রীকে লইয়া কম গৌরব করিব না, কারণ সমগ্র ভারতবর্ষের উমা-সীতা-সাবিত্রী বাঙ্গালার বিশেষকে অতিক্রম করিয়া বাঙ্গালারই অন্তর্নিহিত প্রাণের সহিত অচ্ছেদ্য স্নেহ ও শ্রদ্ধার সূত্রে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত হইয়া বাঙ্গালীর জীবনে শ্রেষ্ঠতম নারীর প্রতীক হইয়া বিরাজ করিতেছেন ;—আদি আর্যভাষাকে বাদ দিলে যেমন বাঙ্গালা ভাষাই থাকে না, অর্থাৎ আদি-আর্যযুগের বা সংস্কৃত যুগের ঐতিহ্য ও আদর্শকে বাদ দিলে বাঙ্গালার সংস্কৃতি বলিয়া আমরা কোনও জিনিসের কল্পনা করিতে পারি না।

১৮০. ময়মনসিংহ গীতিকা, ১ম/২য়, পৃ. ।০

১৮১. ডঃ সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়—জাতি-সংস্কৃতি ও সাহিত্য, পৃ. ১০

রায় বাহাদুর ডাক্তার শ্রীযুক্ত দীনেশচন্দ্র সেন মহাশয় সীতাসাবিত্রীকে "ঘাঘরা পরা বিদেশিনী" এই আখ্যা দান করিয়া বাঙ্গালার হৃদয় হইতে নামাইয়া দিতে চাহেন, বা হৃদয় হইতে দূর করিয়া দিতে চাহেন; তাঁহাদের স্থানে নবাবিষ্কৃত বাঙ্গালা পল্লীগাথাবলীর নায়িকা মলুয়া, মদিনা ও কমলাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে চাহেন। সীতাসাবিত্রীর সত্যকারের পোষাক যাহাই থাকুক (তবে প্রাচীন আর্য্যযুগের মেয়েরা যে ঘাঘরা পরিত না, এ বিষয়ে সন্দেহ নাই), বাঙ্গালার মাটিতে তাঁহারা কোনও এক অজ্ঞাত পুণ্যমুহূর্ত্তে পাদক্ষেপ করা মাত্রই আমরা তাঁহাদের বাঙ্গালী ধরনের সাড়ী পরাইয়া আমাদের নিতান্ত আপনার জন করিয়া লইয়াছি, ঘরের মধ্যেই তাঁহাদের পাইয়া আমরা ধন্য হইয়াছি।" ('জাতি, সংস্কৃতি ও সাহিত্য', পৃঃ ৯-১০)

প্রসঙ্গক্রমে এইরূপ প্রেম, ত্যাগ, তিতিক্ষার পালাগান এবং শ্রেষ্ঠ নর-নারী চরিত্র সম্বলিত নানা ধরনের গীতিকার কথাও উল্লেখ করা যাইতে পারে। উদাহরণ স্বরূপ দস্যু কেনারামের পালাটি গ্রহণ করা যাইতে পারে। ডাকাইত কেনারামের অদ্ভুত পরিবর্তনের আখ্যায়িকার পশ্চাদপটে পৌরাণিক রামায়ণের রত্নাকরের আখ্যানের প্রভাব থাকিলেও ইহাতেও উৎকৃষ্ট আখ্যানধর্ম রক্ষিত হইয়াছে। নরঘাতক দস্যু কেনারাম মনসার পাঁচালী-গায়ক বংশীদাসকে মারিতে উদ্যত হইয়াছিল। মৃত্যুর আগে বংশীদাস মা মনসার গান গাহিবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। দস্যু রাজী হইলে তিনি অতি করুণস্বরে বেহুলার দুঃখ বেদনার গান গাহিতে লাগিলেন। এই গানে নির্মম দস্যুর হৃদয় গলিল, বেহুলার শোকে সেও মুহ্যমান হইয়া পড়িল। অতঃপর কেনারাম হাতের খাঁড়া ফেলিয়া দিয়া বংশীদাসের পা জড়াইয়া কাঁদিয়া উঠিল, "গুরু গো কি গান শুনাইলা গুরু ফিরে কও শুনি।" সে মানুষ মারিয়া যত ধনসম্পত্তি সংগ্রহ করিয়াছিল, তাহার সমস্তই বংশীদাসকে দিয়া পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে চাহিল। কিন্তু ভক্ত বংশীদাস নরঘাতক ডাকাতের পাপের ধন লইতে অসম্মত হইলেন। অতঃপর নির্মমহৃদয় ডাকাত কেনারামের অভূতপূর্ব মানসিক পরিবর্তন হইল। সে যখন নিজের খাঁড়ায় নিজেই আত্মঘাতী হইতে গেল, তখন তাহাকে যথার্থ অনুতপ্ত দেখিয়া বংশী-দাস তাহাকে শিষ্য করিয়া লইলেন। ভয়ালদর্শন ডাকাত-কেনারাম ভক্ত-কেনারাম হইল, গুরুর সঙ্গে গ্রামে গ্রামে সুমধুরকণ্ঠে মনসার ভাসান গাহিয়া

বেড়াইতে লাগিল, তাহার গানে পাষাণ গলিয়া যায়, গাছের পাতাও ঝরিয়া পড়ে—"কেনারাম গায় গীত ঝরে বৃক্ষের পাতা।" যদিও এই পালাটি নরনারীর প্রেম সংক্রান্ত নহে, ইহাতে দেবীমহিমা ও ভক্তিবাদের প্রাধান্য, তথাপি রচনার প্রকরণটি উৎকৃষ্ট গাথার মতোই। পূর্ববঙ্গগীতিকার (২য় খণ্ড, ২য় সংখ্যা) 'নেজাম ডাকাইতের পালা'ও কতকটা এইরূপ। ইহার ভণিতা হইতে বংশীদাস-কন্যা চন্দ্রাবতীই ইহার রচনাকার মনে হইতেছে। কিন্তু ভাষাতে প্রাচীনত্বের কোন চিহ্ন নাই, স্থানে স্থানে পশ্চিমবঙ্গীয় চলিত শব্দেরও প্রয়োগ আছে।

ঐতিহাসিক ঘটনা লইয়া, বিশেষতঃ জঙ্গল বাড়ীর সামন্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা ঈশা খাঁয়ের চরিত্র লইয়া একাধিক পালাগান রচিত হইয়াছিল। এই সমস্ত আখ্যানে (দেওয়ান ঈশা খাঁ মসনদ আলি, ফিরোজ খাঁ দেওয়ান) ইতিহাস, লোকশ্রুতি, রোমান্স, জমিদারদের সংঘর্ষ প্রভৃতি স্থান পাইয়াছে। তবে হিন্দু জমিদার পরিবারের কাহিনী সংক্রান্ত 'চৌধুরীর লড়াই' পালাটি পূর্ববঙ্গে অত্যন্ত জনপ্রিয় হইয়াছিল বলিয়া এখানে সংক্ষেপে সে সম্বন্ধে দুই এক কথা আলোচনা করা যাইতেছে। এই আখ্যানটির পশ্চাতে ঐতিহাসিক ঘটনা আছে। যদিও হিন্দু জমিদার বংশকে কেন্দ্র করিয়া এই ঘটনা আবর্তিত হইয়াছে, কিন্তু ইহার রচনাকার ও শ্রোতা অধিকাংশই মুসলমান। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্বে নোয়াখালির জমিদার চৌধুরীবংশের পারিবারিক দুর্ঘটনা লইয়া এই ছড়াগান রচিত হইয়াছিল। নোয়াখালির তরুণ জমিদার রাজচন্দ্র চৌধুরী লাম্পট্যের জন্য অতি কুখ্যাত হইয়াছিলেন। তাঁহার খুড়া রাজেন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীও জমিদার ছিলেন। তিনি ভাইপোর চারিত্রিক শিথিলতা মোটেই সমর্থন করিতেন না। রামচন্দ্র বহু স্ত্রীলোকের সর্বনাশ করিয়াছিলেন। নিজের অপকর্মে তিনি কিছুমাত্র লজ্জিত হইতেন না। একদা তাঁহার নিযুক্ত এক বৈষ্ণবী কুট্টিনী রঙ্গমালা নাম্নী এক মটজাতীয়া (নীচজাতীয়া) তরুণীর সংবাদ আনিল। রঙ্গমালার বিবাহ হইলেও সে স্বামীর ঘর করিত না। তাহার রূপযৌবনের বর্ণনা শুনিয়া রাজচন্দ্র তাহাকে হস্তগত করিতে সচেষ্ট হইলেন। রঙ্গমালা সহজেই ধরা দিল এবং রাজচন্দ্রকে দিয়া যাহা ইচ্ছা তাহাই করাইয়া লইতে লাগিল। একবার সে আবদার ধরিল—৪৫০ বিঘা পরিমাণ একটি দীঘি কাটাইতে হইবে এবং তাহার বাপের

নামে সেই দীঘির নামকরণ করিতে হইবে। রাজচন্দ্র একটু ছোট মাপের (৫০ বিঘা কালি) পুষ্করিণী খনন করাইয়া প্রতিষ্ঠার সময় যাবতীয় ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিলেন। তিনি লম্পট ও কদাচারী ছিলেন বলিয়া ভদ্রসমাজে তাঁহার স্থান বড় ছোট হইয়া গিয়াছিল। নীচজাতীয়া রঙ্গমালার বাপের নামে পুকুর প্রতিষ্ঠায় ভদ্রলোক নিমন্ত্রিত হইয়া আসিলে তাঁহাদের চূড়ান্ত অপমান হইবে, রাজচন্দ্রের প্রতিহিংসাও চরিতার্থ হইবে। তিনি আরও মতলব করিলেন বৃদ্ধ খুড়া রাজেন্দ্রনারায়ণকে উক্ত নীচজাতীয় ব্যক্তির বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাওয়াইলে তাঁহারও যথেষ্ট অপমান হইবে। রাজেন্দ্র-নারায়ণ গুণধর ভাইপোর আমন্ত্রণলিপি পাইয়া জাতি যাইবার ভয়ে ভীত হইয়া বিলাপ করিতে লাগিলেন। তখন চাঁদ ভাণ্ডারী নামে তাঁহার এক সেনাপতি এই অপমানের প্রতিবিধান করিতে গিয়া রঙ্গমালার বাটীতে উপস্থিত হইল এবং ভীতা ব্যাকুলা সুন্দরী রঙ্গমালার অনুরোধ উপরোধ উপেক্ষা করিয়া তাহার মুণ্ড কাটিয়া ফেলিল। তাহার ভাইকেও মারিয়া ফেলিয়া সে তাহাদের ঘরবাড়ীতে আগুন লাগাইয়া এবং রঙ্গমালার কাটামুণ্ড লইয়া রাজেন্দ্রনারায়ণের কাছে উপস্থিত হইল। এরূপ অপূর্ব সুন্দরী হত্যার জন্য রাজেন্দ্রনারায়ণ বড়ই দুঃখিত হইলেন। এদিকে রাজচন্দ্র এই ব্যাপার জানিতে পারিয়া খুল্লতাতের বিরুদ্ধে প্রতিশোধ লইবার জন্য পার্শ্ববর্তী গ্রামের মুসলমান জমিদার ইঙ্গা চৌধুরীর সাহায্য গ্রহণ করিলেন। কিন্তু চাঁদ ভাণ্ডারীর গুপ্ত আক্রমণে ইঙ্গা চৌধুরী ও তাঁহার একটি পুত্র ছাড়া তাঁহার পক্ষের আর সকলেই নিহত হইল। ইঙ্গার পুত্রটি পলাইয়া গিয়া মাতুল মনোহর গাজির আশ্রয় গ্রহণ করে। মনোহর তখন রাজেন্দ্রনারায়ণের বাটী আক্রমণ করিয়া তাঁহাকে তাড়াইয়া দেয়। অতঃপর রাজচন্দ্র পিতৃব্যের জমিদারিও অধিকার করেন। অবশ্য শেষে খুড়া ভাইপোর মধ্যে আবার মিলন হয়, বৃদ্ধ রাজেন্দ্র-নারায়ণ কাশীবাসী হন। এই কাহিনীটি একদা নোয়াখালি অঞ্চলে ব্যাপক-ভাবে প্রচারিত হইয়াছিল।[১৮২] পালায় উল্লিখিত স্থানগুলির ধ্বংসাবশেষ এখনও দেখিতেও পাওয়া যায়। চৌধুরীদের দুর্গের ধ্বংসাবশেষ, রাজেন্দ্র-নারায়ণ চৌধুরী এবং রঙ্গমালার দীঘি এখনও আছে। অবশ্য এই পালাগানে

---

১৮২. নোয়াখালি গেজেটিয়ারে বাবুপুর পরগণার ইতিবৃত্ত প্রসঙ্গে রাজচন্দ্র ও রঙ্গমালার কাহিনীর উল্লেখ আছে।

যুদ্ধ বিগ্রহের বাস্তব বর্ণনা ভিন্ন বিশেষ কোন কাব্যগুণ নাই। কিন্তু বিষয়-বস্তুর অভিনব বৈচিত্র্যের জন্য এখানে আমরা কাহিনীটির সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিলাম। যাহা হউক যুদ্ধবিগ্রহের কাহিনী অপেক্ষা প্রেম-প্রণয়ঘটিত কাহিনী-গুলি (মহুয়া, মলুয়া, কমলা, কঙ্ক-লীলা, ধোপার পাট, মইষাল বন্ধু, কাঞ্চন-মালা, ভেলুয়া, মাঞ্জুর মা, আয়নাবিবি প্রভৃতি পালা) অধিকতর চিত্তাকর্ষী ও কাব্যরসে রমণীয় হইয়াছে, বিশেষতঃ ময়মনসিংহ গীতিকার কয়েকটি পালায় মুক্ত প্রেম, প্রেমের জন্য নারীর সুকঠোর ত্যাগ স্বীকার ও কৃচ্ছ্র সাধনা অত্যন্ত সহৃদয়তার সঙ্গেই অঙ্কিত হইয়াছে। কয়েকটি চরিত্র পরিকল্পনাতেও অশিক্ষিত কৃষক কবিগণ আশ্চর্য লিপিকুশলতা ও মনস্তত্ত্ব জ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন। ভাষাভঙ্গিমার অনেক স্থলে স্থানীয় উপভাষার প্রভাব আছে, বহুস্থলে গ্রাম্যধরনের বাকরীতিও আছে। কিন্তু বহু পালায় যে গ্রামীণ জীবন, রস ও সংস্কৃতির প্রভাব দেখা যায়, হিন্দু মুসলমানের সম্প্রীতি লক্ষ্য করা যায়, কাব্যের অতিরিক্ত তাহারও একটা মূল্য আছে। এই পালাগুলিকে বিস্মৃতির কবল হইতে রক্ষা করিয়া দীনেশচন্দ্র বাংলা সাহিত্যের মহদুপকার করিয়াছেন। তাঁহার কৃত গীতিকাগুলির ইংরাজী অনুবাদ পাঠ করিয়া পাশ্চাত্ত্যের পণ্ডিত-মনীষীরা তাঁহাকে উচ্ছ্বসিত ভাষায় অভিনন্দন জানাইয়াছিলেন। তাহার কারণ এই পালাগুলিতে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের ধর্মবিরহিত লোকযাত্রা, আশা-আকাঙ্ক্ষা, আনন্দ-বেদনার যে চিত্র আছে তাহার ঐতিহাসিক মূল্য য়ুরোপীয় পণ্ডিতগণের বিস্ময় উদ্রেক করিয়াছিল। রোমাঁ রোলাঁ মদিনা, মহুয়া, চন্দ্রাবতী এবং লীলা ও কঙ্কের উচ্চ প্রশংসা করিয়া লিখিয়াছিলেন, "I was specially delighted with the touchiug story of Madina which although only two centuries old is an antique beauty and a purity of sentiment which art has rendered faithfully without changing it. Chandravati is a very noble story, and Mahua, Kanka and Lila are Charming (to mention only those ones)." লর্ড রোনাল্ড্‌শে, সিলভাঁ লেভি, পার্জিটার, জুল ব্লখ, প্রভৃতি বিশ্বের মনীষি-বর্গ একবাক্যে এই গীতিকাগুলির উচ্চ প্রশংসা করেন এবং দীনেশচন্দ্রের এই বিষয়ে অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য তাঁহারা তাঁহাকে অভিনন্দিত করেন। কিন্তু

বাংলা দেশের গবেষক ও পণ্ডিতসমাজ এই গাথাসম্বন্ধে এতটা উচ্ছ্বসিত প্রশংসাবাণী ব্যবহার করেন নাই—কেন করেন নাই, এইবার আমরা সেই প্রসঙ্গে আসিতেছি।

গীতিকাসমূহের প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা—ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকা প্রকাশিত হইলে বাংলাদেশে কিছু আলোড়ন শুরু হইয়াছিল, তবে তাহা অবিমিশ্র প্রশংসাবাণী নহে। পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিতেরা, যাঁহারা এই গীতিকা-গুলির উচ্চ প্রশংসা করিতেন, তাঁহাদের মধ্যে একমাত্র গ্রীয়ার্সন ছাড়া আর কেহ উক্ত গাথা বুঝিবার মতো বাংলা জানিতেন না, ইঁহাদের অনেকেই ইংরাজী অনুবাদ ভিন্ন কোন বাংলা গ্রন্থ পড়েন নাই।[১৮৩] সুললিত ইংরাজীতে অনূদিত হওয়ার জন্য[১৮৪] এবং ইহাতে দেবদেবী ও হিন্দুধর্মের বিশেষ কোন প্রত্যক্ষ প্রভাব না থাকার জন্য পাশ্চাত্ত্য পণ্ডিত মহলে ইহার বিশেষ সমাদর হইয়াছিল। যাহা হউক এই গীতিকাগুলির প্রকাশের পর বাংলা-দেশের নানা মহলে ইহার প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা লইয়া বিশেষ সংশয় সন্দেহ উত্থাপিত হইয়াছিল। দীনেশচন্দ্র এই সমস্ত গাথাকে যতটা প্রাচীন

১৮৩. রোমাঁ রোলাঁ ইংরাজী জানিতেন না, তাঁহার ভগিনী মেডেলাইন রোলাঁ *Eastern Bengal Ballads*-এর প্রথম খণ্ডটির ফরাসী অনুবাদ করেন, রোলাঁ তাহা হইতেই পূর্ববঙ্গ-গীতিকা সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহ করেন। ভগিনী নিবেদিতাও উক্ত গীতিকার ইংরেজী অনুবাদ পড়িয়াই দীনেশচন্দ্রকে বলিয়াছিলেন, "বড় বড় লম্বা শব্দ লাগাইয়া যাঁহারা মহাকবির নাম কিনিয়াছেন, পল্লীগাথার অমার্জিত ভাষার মধ্যে অনেক সময় তাঁহাদের অপেক্ষা ঢের গভীর ও প্রকৃত কবিত্ব আছে···তাহাদের মেঠো সুরে রাগিণী না থাকিলেও প্রাণ আছে, আর তাদের কুঁড়ে ঘরে সোনারূপার থাম না থাকিলেও আঙ্গিনায় সিউলি ও মল্লিকাফুলের গাছ আছে।" —দীনেশচন্দ্র সেন—ঘরের কথা ও যুগসাহিত্য, পৃ. ৩৭০

১৮৪. সম্প্রতি ডঃ দুসান জ্বাভিতেল এই অনুবাদ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন, "However great its merit may have in presenting the ballads to non-Bengali readers, it must be said that this translation does not faithfully reproduce the Bengali Text." (*Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, p. 38, foot note) এ অভিযোগ মিথ্যা নহে। দীনেশচন্দ্র পালার কাহিনী যেভাবে ইংরাজী গদ্যে বিবৃত করিয়াছেন তাহাতে মূলের স্বাদগন্ধ, ভাষা প্রভৃতি কিছুই রক্ষিত হয় নাই। *Eastern Bengal Ballads* ও ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ গীতিকার, সম্পর্কটি অনেকটা ল্যাম্বের *Tales from Shakespeare*-এর সঙ্গে মূল সেক্সপীয়রের নাটকের সম্পর্কের মতো।

বলিয়া মনে করিতেন, ইহারা যে ততটা প্রাচীন নহে তাহা সকলেই স্বীকার করিবেন। গাথাগুলিতে হিন্দুমুসলমান-সংক্রান্ত যে সমস্ত কাহিনী আছে, তাহাতে মনে হইতেছে, পালাগুলির জড় তিন চারি শত বৎসর পূর্বে যাইতে পারে। কিন্তু যে ভাষায় ইহাদের পাওয়া গিয়াছে তাহাতে ময়মনসিংহ ও পূর্ববঙ্গের অন্যান্য অঞ্চলে আধুনিক ভাষার কিঞ্চিৎ প্রভাব আছে। কিন্তু গোল বাধিয়াছে অন্য স্থানে। ময়মনসিংহ গীতিকাব সব পালা চন্দ্রকুমার দের সংগ্রহ—এবং এই পালাগুলির ভাষায় পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দপ্রয়োগ, সূক্ষ্ম কবিত্বরস, বর্ণনায় আধুনিক লক্ষণ এতই প্রকটভাবে ধরা পড়িয়াছে যে, অনেকে সন্দেহ করিয়া থাকেন, এগুলিতে চন্দ্রকুমারের প্রচুর হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছিল। কেহ গুরুতর সংশয় উত্থাপন করিলেন। তাঁহাদের মতে, এই সমস্ত পালাগানের মধ্যে যেগুলি অতি উৎকৃষ্ট সেগুলি অশিক্ষিত কৃষকের রচনা হইতেই পারে না। পালাগুলিতে আধুনিক কালের কবির লেখনীসঞ্চালন লক্ষ্য করা যাইতেছে।

ছাপার অক্ষরে একই বৎসরে দুইজনে এই সংশয়ের ভাষা জোগাইয়াছিলেন। ১৯৪০ সালে ডঃ সুকুমার সেন মহাশয়ের 'বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস' এবং শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা' প্রকাশিত হয়। দুই জনেই একাধিক দিক হইতে ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার পালাগুলির প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সংশয় উত্থাপন করেন। ডঃ সেন স্পষ্টতঃ বলিয়াছেন, "অধিকাংশ পালা শ্রীযুক্ত চন্দ্রকুমার দে মহাশয় কর্তৃক সংগৃহীত। পালাগুলিতে স্থানীয় উপভাষার রূপ বজায় রাখিবার চেষ্টা সত্ত্বেও সাধুভাষার এবং কলিকাতা অঞ্চলের কথ্যভাষার প্রভাব বিশেষ লক্ষণীয়। মধ্যে মধ্যে আবার পশ্চিমবঙ্গের উপভাষার (এবং সাধুভাষার) শব্দগুলিকে পূর্ববঙ্গীয় রূপ দিবার চেষ্টা প্রকট হইয়া উঠিয়াছে। ইহাতে সন্দেহ হওয়া খুবই স্বাভাবিক যে, পালাগুলি সর্বাংশে অকৃত্রিম নয়।" তারপরে তিনি মুদ্রিত মহুয়া পালার অনেকগুলি পশ্চিমবঙ্গীয় শব্দের দৃষ্টান্ত দেন। অতঃপর তিনি দেখাইলেন যে, কোন কোন পংক্তি নিতান্তই আধুনিক কালের রচনা। যেমন—"ভিন্‌দেশী অতিথির মুখ দেখয়ে স্বপন", কিংবা, "ওই শুন বাজে বাঁশী দূরে শুনা যায়।" সন্ধান করিলে ময়মনসিংহ গীতিকা হইতে আধুনিক দৃষ্টান্ত আরও পাওয়া যাইতে পারে। ভাষার কথা ছাড়িয়া দিলেও অনেক পালাতে পুনর্বিন্যাস বা হস্তক্ষেপের চিহ্ন সুস্পষ্ট। কোন কোন সংক্ষিপ্ত

পালাতে "অন্য গল্পের অংশ যোগ করিয়া অথবা অন্তরূপে কাহিনীকে পরিবর্ধিত ও পরিবর্তিত করিয়া রোমান্টিক রূপ দেওয়ার চেষ্টা হইয়াছে।" ডঃ সেনের মতে এই সমস্ত পালা কখনও সুবিন্যস্তরূপে গীত হইত না। সংগ্রাহক এই সমস্ত বিশৃঙ্খল পালাকে নিজ জ্ঞানবুদ্ধি মতো পরিবর্ধিত বা পরিবর্তিত করিয়াছেন। বিশেষতঃ "গীতিকাগুলির মধ্যে যেগুলি সাধারণ শিক্ষিত পাঠকের মনোহরণ করিয়াছে সেগুলির কোনটিকেই সর্বাংশে অকৃত্রিম গণ্য করা যায় না।"

শ্রীযুক্ত নন্দগোপাল সেনগুপ্ত পালাগানগুলির প্রামাণিকতা ও প্রাচীনতা সম্পর্কেও কিঞ্চিৎ সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন ('বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা')। তাঁহার যুক্তিটি এইরূপ:—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্য দেবলীলাপ্রধান। মানুষের যে সমস্ত কাহিনী বা চরিত্র আছে তাহাও দেবদেবীর কৃপা-অকৃপা দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এরূপ অবস্থায় শুধু ময়মনসিংহ গীতিকা ও পূর্ববঙ্গ গীতিকায় দেবভাববর্জিত মর্তজীবনের সুখদুঃখের কথা, বিরহমিলনের বাণী এতটা প্রাধান্য পাইল কি করিয়া?[১৮৫] অর্থাৎ তিনিও সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন, এই গীতিকায় হয়তো কিছু হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে।[১৮৬] কবি জসিমুদ্দিন (যিনি একদা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য গাথা-গীতিকা সংগ্রহ করিতেন) কিন্তু অনেক পূর্বে এইরূপ সংশয় উত্থাপন করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রের নিকট তিনি খুব সম্ভব চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালা গান সম্বন্ধে সন্দেহের কথা ব্যক্ত করিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্র তাঁহার 'পুরাতনী' (১৯৩৯) গ্রন্থে এই প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন, "কবি জসিমুদ্দিন এত সুন্দর গানগুলি খাঁটি কিনা এ জন্য প্রথমত একটা দ্বিধাযুক্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু শেষে নিজ পল্লীতে ঘুরিয়া অনেক গান নিজে শুনিয়া আমাকে লিখিয়াছিলেন, "আমার পূর্বে সন্দেহ

---

১৮৫. শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত—বাংলা সাহিত্যের ভূমিকা (নূতন সংস্করণ, পৃ. ৪৭)। শ্রীযুক্ত সেনগুপ্তের মনে "গীতিকার প্রাচীনতা নিয়ে সন্দেহ" জাগিলেও কাব্যধর্মে তিনি গীতিকার উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন। অবশ্য "এর তুলনা ফরাসী ত্রুবাদুর কাব্যে এবং স্কচ ব্যালাডে আছে"—তাঁহার এই মন্তব্য একটু উচ্ছ্বসিত মনে হইতেছে।

১৮৬. নন্দগোপাল বাবুর মতটি প্রণিধানযোগ্য, "গীতিকার গল্পগুলি পুরাতন, কিছু কিছু অংশও পুরাতন, কিন্তু তাকে ঘষে মেজে যথাসম্ভব প্রাচীন সাজে সাজিয়ে একালেই লেখা হয়েছে, এ কালের অনুযায়ী ব্যঞ্জনা দিয়ে।"—ঐ গ্রন্থ, পৃ. ৪৬

হইয়াছিল তাহাই আমার দোষ। আর এখন যে আমি এ গান শুনিয়া কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া আসিয়াছি তাহা কি কেহ দেখিবে না? গীতিকার মত গান রবীন্দ্রনাথও রচনা করিয়া গৌরব করিতে পারেন। সন্দেহ না করিলে সত্যকে পাওয়া যায় না। স্বয়ং মহাপ্রভুকে অদ্বৈতের মত জ্ঞানবান ব্যক্তি সন্দেহ করিয়া নানারূপ পরীক্ষা করিয়াছিলেন।"[১৮৭] দীনেশচন্দ্রের গ্রন্থে ('পুরাতনী') উল্লিখিত কবি জসিমুদ্দিনের এই পত্র হইতে মনে হইতেছে, প্রথম দিকে জসিমুদ্দিন চন্দ্রকুমার সংগৃহীত গীতিকাগুলির প্রামাণিকতায় বিশেষ সন্দিহান হইয়াছিলেন। কিন্তু পরে স্বয়ং ময়মনসিংহে গিয়া নিজকর্ণে শুনিয়া ঐ গানগুলির প্রমাণ পান, ইহাদের কবিত্বে মুগ্ধ হন, ইহাদিগকে প্রামাণিক বলিয়া সাগ্রহে স্বীকার করেন এবং সম্ভবতঃ চন্দ্রকুমারকে অনৃতাচারের অভিযোগ হইতে মুক্তি দেন। কিন্তু ব্যাপারটি এত সহজে মীমাংসা হইবার নহে। তাই জটিল ব্যাপার জটিলতর করিবার জন্যই যেন ময়মনসিংহের মাসোয়া গ্রামনিবাসী পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য বিদ্যাবিনোদ ১৩৫১ সালে (১৯৪৪) নিজ সংগৃহীত একটি পল্লীগাথা 'বাদ্যানীর গান' (বেদেনীর গান) প্রকাশ করিলেন।

'বাদ্যানীর গান' মহুয়া পালারই গ্রাম্যরূপ। উক্ত সংগ্রহের মুখবন্ধে সংগ্রাহক পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য যাহা বলিয়াছেন তাহা হইতে দেখা যাইতেছে, ১২৯১/৯২ সালে ভট্টাচার্য মহাশয় অতি অল্পবয়সে তাঁহাদের গ্রামের বাটীতে (ময়মনসিংহের মাসোয়া গ্রাম) 'বাদ্যানীর গান' ও 'কৌড়াশিকারীর গান' শুনিয়াছিলেন। শেখ কাঙালী নামে এক মুসলমান পল্লীগায়ক ঐ অঞ্চলে মহুয়া-সংক্রান্ত বাদ্যানীর গান প্রচার করিয়াছিল। জঙ্গলবাড়ীর প্রসিদ্ধ ভূস্বামী সৌখীন প্রকৃতির সোহাবান দাদখাঁ সাহেব (ঈশাখাঁর বংশধর) সখের পালাগানের দল তৈয়ারী করিয়াছিলেন। শেখ কাঙালী চৌকিদার তাঁহার দলে বাদ্যানীর গান গাহিত। জমিদার সাহেবের গানের দল উঠিয়া গেলে উক্ত শেখ কাঙালী শেখ জহর আলি, শেখ মনীর, তারিণী দে প্রভৃতির সাহায্যে গ্রামে গ্রামে লোকাভিনয় ও পাঁচালীর সংমিশ্রণে বাদ্যানীর গান গাহিয়া বেড়াইত। বাল্যকালে পূর্ণচন্দ্র নিজেদের বাড়ীতে উহাদের গীত বাদ্যানীর গান শুনিয়াছিলেন। তখন হইতেই তিনি পালাগানটি সংগ্রহের

১৮৭. দীনেশচন্দ্র—পুরাতনী. পৃ. ৯

চেষ্টায় ছিলেন। ১৩২১।২২ সালের দিকে তিনি গায়কদের মুখ হইতে শুনিয়া পালাটি লিখিয়া লইয়াছিলেন। নানা অসুবিধার জন্য তিনি সংগৃহীত পালাগান মুদ্রিত করিতে পারেন নাই। ইতিমধ্যে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে ময়মনসিংহ গীতিকা প্রকাশিত হইলে তিনি দেখিলেন, তাঁহার সংগৃহীত 'বাগ্যানীর গান' এবং ময়মনসিংহ গীতিকার মহুয়া পালা একই। তফাতের মধ্যে, তাঁহার পালাগান গ্রাম্য কবির রচনা, গ্রাম্য গায়কের গান, আর চন্দ্রকুমার দে সংগৃহীত ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশিত মহুয়ার পালা আধুনিক রুচির উপযোগী, আধুনিক ধরনের বাগ্‌বিন্যাসে পূর্ণ। তাঁহার পালার নায়িকার নাম মহুয়া নহে, মেওয়া। মহুয়ার পালকপিতার নাম হুমরা বেদে নহে, উন্দরা বেদে। মহুয়া সম্বন্ধে তাঁহার মন্তব্য—"মহুয়া শব্দটা এদেশের আধুনিক শিক্ষিতের বাপদাদারাও জানিতেন না, বাজে লোকের তো কথাই নাই।" কারণ মহুয়া গাছ পূর্ববঙ্গের কোথাও জন্মে না, ইহা পশ্চিমবঙ্গের বৃক্ষ। সুতরাং নায়িকার নাম মহুয়া হয় কি প্রকারে? বরং মেওয়া হইতে পারে, কারণ পূর্ববঙ্গে মেওয়া-মিশ্রি সমাদৃত, পাড়ার ছেলেমেয়েদের নাম রাখা হয় মেওয়া। সুতরাং ভট্টাচার্য মহাশয়ের মতে মহুয়া নামটি সংগ্রাহকের সংযোজন, নায়িকার প্রকৃত নাম মেওয়া।[১৮৮] এ বিষয়ে আমাদের মনে হয়, পূর্ববঙ্গে মহুয়া শব্দ অজ্ঞাত নহে (পাদটীকা দ্রষ্টব্য)। পূর্ণচন্দ্র নায়িকার নাম মেওয়া শুনিয়াছিলেন। মহুয়া শব্দ ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে (মহুয়া>মউয়া>মেওয়া) অথবা উচ্চারণ বিকৃতির জন্য 'মেওয়া' হইতে বাধা নাই। সুতরাং চন্দ্রকুমার দে-র সংগ্রহে মহুয়া আছে বলিয়া চিন্তিত হইবার কারণ নাই। হোমরা (হুমরা) বেদের নামটি পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহে দেখা যাইতেছে উন্দরা বেদে। এ বিষয়ে সুরসিক ভট্টাচার্য মহাশয় অম্লরসসিক্ত মন্তব্য করিয়াছেন, "হোমরা-চোমরা পশ্চিমবঙ্গ হইতে রেলে ষ্টিমারে এ দেশের শিক্ষিত ঘরে আসিয়াছে—গ্রামে যায় নাই। কাঙালীর দলে হোমরা ছিল না। খাঁটি নামটিই ছিল—উন্দরা বাদ্যা।" এ সম্বন্ধে আমাদের মনে হয়, হোমর (হুমরা) শব্দটিও ধ্বনিতাত্ত্বিক পরিবর্তনে বা উচ্চারণ বিকৃতির জন্য উন্দরা শব্দে রূপান্তরিত হইতে পারে। অর্থাৎ

১৮৮. কিন্তু মলুয়া পালায় মহুয়া ফুলের উল্লেখ আছে—"সুন্দর বদন যেন মহুয়ার ফুল।" পূর্ববঙ্গে মহুয়া গাছ না জন্মাইলেও মহুয়ার নাম অজানা ছিল না।

বিভিন্ন স্থানের পালাগায়কদের মুখে পড়িয়া নামের অল্পাধিক রূপান্তর হওয়া বিচিত্র নহে। সুতরাং আমরা চন্দ্রকুমারকে মহুয়া ও হোমরা নামের জন্য না হয় নাই অভিযুক্ত করিলাম। কিন্তু চন্দ্রকুমার সংগৃহীত সমগ্র পালা সম্বন্ধে পূর্ণচন্দ্র গুরুতর অভিযোগ আনিয়াছেন। তিনি গ্রাম হইতে যে পালা সংগ্রহ করেন তাহাই খাঁটি, কারণ তাহাতে গ্রাম্য শব্দাদি আছে, আধুনিক পশ্চিমবঙ্গীয় পরিমার্জনের কোন চিহ্ন নাই। এখানে পূর্ণচন্দ্র ও চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের দুইচারি পংক্তির তুলনামূলক আলোচনা করা

চন্দ্রকুমারের সংগ্রহ—

পাইয়া সুন্দরী কইন্যা হুমরা বাইদ্যাব নারী।
ভাব্যা চিন্তা নাম থাথল মহুয়া সুন্দরী॥

পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ—

এই না কইন্যা কোলে লইয়া উন্দরা বাদ্যার নারী।
বাছগুচ্ছ্যা নাম থৈল মেওয়া না সুন্দরী॥

চন্দ্রকুমারের সংগ্রহ—

সইন্ধ্যা বেলা জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসী কান্ধে তোমার তুল্যা দিব আমি॥

পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ—

সন্ধ্যা বেলায় জলের ঘাটে একলা যাইও তুমি।
ভরা কলসি কান্ধে তোমার তুল্যা দিবাম আমি॥

চন্দ্রকুমারের সংগ্রহ—

লজ্জা নাই নির্লজ্জ ঠাকুর লজ্জা নাই রে তর।
গলায় কলসী বাইন্দা জলে ডুব্যা মর॥
কোথায় পাব কলসী কইন্যা কোথায় পাব দড়ী।
তুমি হও গহীন গাঙ আমি ডুব্যা মরি॥

পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহ—

লাজধর্ম সকল ছাড়ছ ছাড়ছ দেশের ডর।
গলায় কলসী বান্ধ্যা জলে ডুব্যা মর।
কৈ পাইবাম কলসী রে কন্যা কৈ বা পাইবাম দরি।
তুমি হও গহিন গাঙ আমি ডুব্যা মরি॥

এই সমস্ত দৃষ্টান্ত হইতে দেখা যাইতেছে, দুইজনের সংগ্রহের মধ্যে বেশ মিল

আছে, তবে চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের ভাষা অধিকতর মার্জিত ও কাব্যগুণান্বিত। অবশ্য পূর্ণচন্দ্রের সংগ্রহের ভাষাতেও যে সংগ্রাহকের একটু-আধটু পালিশ পড়ে নাই তাহা বলা যায় না। তবে চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের ভাষায় মাজাঘষা একটু অধিক হইয়াছিল, তাহা 'বাণ্যানীর গান' ও মহুয়ার পালার ভাষার তুলনামূলক আলোচনা হইতেই বুঝা যাইবে।[১৮৯]

সম্প্রতি এই বিষয় লইয়া আবার বিতর্কের সৃষ্টি হইয়াছে। কবি জসিমুদ্দিন ('যাদের দেখেছি', ঢাকা, ১৯৫২) এবং রৌসন ইজদানি ('মোমেনশাহীর লোকসাহিত্য') পূর্ব পাকিস্তান হইতে পরলোকগত চন্দ্রকুমার দের বিরুদ্ধে আবার নূতন করিয়া কিছু অনৃতাচারের অভিযোগ আনিয়াছেন। বহু পূর্বে জসিমুদ্দিন এই পালাগানের প্রামাণিকতা সম্বন্ধে সন্দিহান হইলেও বিশেষ কোন গূঢ় কারণবশতঃ পালাগুলির প্রতি তাঁহার বিশ্বাস আবার ফিরিয়া আসে। কারণ তিনি ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চলে সেই সমস্ত গান শুনিয়া নাকি কাঁদিয়া বুক ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। দীনেশচন্দ্রকে সেই মর্মেই তিনি চিঠি লিখিয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পূর্বে প্রকাশিত 'যাদের দেখেছি' গ্রন্থে তিনি আবার পুরাতন অভিযোগ জীয়াইয়া তুলিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে আলোচনাতেও জসিমুদ্দিন এই একই সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছিলেন। উক্ত পালাগান প্রকাশিত হইবার পর তিনি ময়মনসিংহের নানা স্থান ঘুরিয়াও কোথাও ঐ পালাগান বা চন্দ্রকুমার উল্লিখিত কোন পালাগায়কের সন্ধান পাইলেন না। অবশ্য ঐ ধরনের পালাগান তখনও গ্রামাঞ্চলে লোকমুখে চলিত বটে, কিন্তু তাহার ভাবভাষা সম্পূর্ণ অন্যপ্রকার—গ্রাম্য কবি ও শ্রোতার উপযুক্ত। তখন জসিমুদ্দিন সাহেবের ধারণা হইল, চন্দ্রকুমার দে পল্লীগীতিকাগুলি সংগ্রহ করিয়া গ্রাম্য কাঠামোর উপর নিজেই মেদমাংস সংযোজনা করিয়া দীনেশচন্দ্রের নিকট উপস্থিত করেন। তাঁহার মতে চন্দ্রকুমার গ্রাম্যগাথার কিছু কিছু লইয়া নিজ ভাবভাষা দিয়া পালাগুলিকে সুসজ্জিত করিয়াছিলেন। চেকোস্লোভেকিয়ার

১৮৯. ডঃ সুকুমার সেন মনে করেন, মূল কাহিনীর শেষে মহুয়ার আত্মহত্যার ঘটনা ছিল না—এই অতিনাটকীয় আধুনিক ব্যাপার কোন আধুনিক ব্যক্তির সংযোজনা। কিন্তু তাঁহার এ অনুমান ঠিক নহে। কারণ পূর্ণচন্দ্রের সংগৃহীত তথাকথিত "গায়কমুখে যথাশ্রুত একটি খাঁটি সংস্করণ" বাদ্যানীর গানের শেষেও মহুয়ার আত্মহত্যার কথাই আছে।

প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল ১৯৬০ খ্রীঃ অব্দে 'উনেস্কোর' বৃত্তি লইয়া পূর্ববঙ্গের গাথা সম্বন্ধে গবেষণা করিবার অভিপ্রায়ে সরেজমিনে তদন্ত করিবার জন্য ময়মনসিংহের গ্রামাঞ্চল পরিভ্রমণ করেন, সঙ্গে ছিলেন কবি জসিমুদ্দিন। তাঁহারা বহু গ্রামে ঘুরিয়াও চন্দ্রকুমার সংগৃহীত কোন পালা বা পালাগায়কের সন্ধান পাইলেন না।[১৯০] ডঃ জ্‌বাভিতেলের মতে এখন উক্ত পালাগান ও গায়েনের সন্ধান না পাইবার কারণ, চন্দ্রকুমার ও অন্যান্য সংগ্রাহকদের দ্বারা ছড়াগানগুলি সংগৃহীত হইবার পর ক্রমে ক্রমে এই পালাগায়কেরা মরিয়া যায়, গানগুলিও লুপ্ত হইয়া যায়। পাকিস্তান হইবার পর এই জাতীয় গানের যে দ্রুত অপসারণ হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি?

রৌসন ইজদানি তাঁহার 'মোমেনশাহীর লোকসাহিত্যে' বলিয়াছেন যে, তিনি স্বগ্রামবাসী চন্দ্রকুমার দে-কে চিনিতেন। তাঁহার মতে, চন্দ্রকুমার ময়মনসিংহ হইতে যে সমস্ত পালাগান সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহার কিছু কিছু পরিবর্তিত করিয়াছিলেন—বিশেষতঃ নামগুলি। স্বয়ং চন্দ্রকুমার একদা নিজেই ইজদানি সাহেবের নিকট একথা স্বীকার করিয়াছিলেন। চন্দ্রকুমার সংগৃহীত মহুয়ার পালার আসল নাম—'বাদ্যানীর গান'। হুমরা বেদে পালাগানে উনুবা বেদে নামে উল্লিখিত, 'দেওয়ানা মদিনা'র পালার আসল নাম—'আলাল-দুলাল'। অবশ্য ইজদানি সাহেবের মতে, মূল আখ্যানে দে-মহাশয় বিশেষ হস্তক্ষেপ করেন নাই। এখানে-সেখানে এবং নামধামে দুই চারিটি পরিবর্তন করিলেও সেজন্য চন্দ্রকুমারকে অপরাধী সাব্যস্ত করা ঠিক নহে—ইজদানি সাহেবের ইহাই অভিমত।

উল্লিখিত তথ্য হইতে দেখা যাইতেছে, সংগৃহীত পালায় কিছু কিছু হস্তক্ষেপ করিলেও চন্দ্রকুমার পালাগুলির আদ্যন্ত পাল্টাইয়া ফেলেন নাই। কবি জসিমুদ্দিন যে সন্দেহ প্রকাশ করিয়াছেন (অর্থাৎ পালাগুলি চন্দ্রকুমারের রচনা) তাহা বোধ হয় ঠিক নহে। কারণ উক্ত আখ্যানগুলি যে কিছুকাল পূর্বে ময়মনসিংহে প্রচলিত ছিল তাহার বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ আছে। ইতিপূর্বে পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্যের সংগৃহীত 'বাদ্যানীর গানে'র উল্লেখ করা

১৯০. Dr. Dusan Zbavitel—*Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*. pp. 7—8

হইয়াছে। পুরাতন 'সৌরভ' পত্রিকায় (১৬ বর্ষ, ১০ম সংখ্যা) যতীন্দ্রনাথ মজুমদার লিখিয়াছেন যে, তিনি বাল্যকালে নিম্নবর্ণের জনসাধারণের মধ্যে বাত্যানীর গান, ভেলুয়ার গান, কাঞ্চনমালার গান, মাঞ্জুর মার গান প্রভৃতি গীতিকার প্রচলন দেখিয়াছিলেন। কিছুকাল পূর্বেও ময়মনসিংহের অধিবাসীরা মহুয়ার পালা শুনিতে অভ্যস্ত ছিলেন। ঢাকার আজহাউল ইসলাম ১৯৩৪ সালেও মহুয়ার গানের প্রচলন দেখিয়াছিলেন। এরূপ ধরনের পালাগান চন্দ্রকুমারের সংগ্রহের পূর্বেও চট্টগ্রাম নোয়াখালির মুদ্রা-যন্ত্র হইতে ছাপা হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। যেমন ভেলুয়ার গান, চৌধুরীর লড়াই, হাতীখেদার গান প্রভৃতি।[১৯১] এমন কি এখনও পূর্ববঙ্গে এই ধরনের পালাগানের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়। শ্রীযুক্ত চিত্তরঞ্জন দেব এইরূপ কিছু কিছু ছড়া-পাঁচালী সংগ্রহ করিয়া তাঁহার 'পল্লীগীতি ও পূর্ববঙ্গে' প্রকাশ করিয়াছেন।[১৯২] সুতরাং চন্দ্রকুমার সংগৃহীত পালাগানগুলির অস্তিত্বে অবিশ্বাস করার কোন যুক্তিসঙ্গত কারণ নাই।

কিন্তু তিনি যে সংগৃহীত পালায় হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন, সে বিষয়ে পরোক্ষ প্রত্যক্ষ উভয় প্রমাণই পাওয়া গিয়াছে। প্রত্যক্ষ প্রমাণ—পূর্ণচন্দ্র ভট্টাচার্য সংগৃহীত 'বাত্যানীর গান' ও চন্দ্রকুমার সংগৃহীত মহুয়ার পালার তুলনামূলক আলোচনা। 'বাত্যানীর গানে'র মোট ছত্রসংখ্যা—দেড় হাজার। কিন্তু মহুয়ার পালার ছত্র সংখ্যা সাড়ে সাত শতের কিছু বেশী। মনে হইতেছে, গাথা সংগ্রহ করিবার সময় চন্দ্রকুমার অনেক পংক্তি যথেষ্ট কবিত্ব

১৯১. ১৮৭৭ সালে বরিশাল হইতে মহম্মদ রাজিউদ্দিন 'জয়ানন্দ-বিবাহ' পালা প্রকাশ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য ইহা ময়মনসিংহ গীতিকার অন্তর্ভুক্ত 'চন্দ্রাবতী'র পূর্বরূপ। (ডঃ সুকুমার সেন—বা. সা. ই. পরার্ধ, পৃ. ৫৭৬, পাদটীকা)

১৯২. শ্রীযুক্ত দেব এক মুসলমান বৃদ্ধার নিকট 'আত্তাপসন্তাপের গান' শীর্ষক যে পালাগান সংগ্রহ করিয়াছেন তাহা স্বচ্ছন্দে পূর্ববঙ্গ গীতিকায় স্থান পাইতে পারিত। একটু দৃষ্টান্ত :

আমি ত অবলা নারী বন্ধু হইলাম অন্তরপুরা।
কূল ভাঙ্গিলে নদীর জল মধ্যে পড়ে চড়া॥
রে বন্ধু মধ্যে পড়ে চড়া॥
বইড্ডা কান্দে ফুলের ভ্রমর উইড়্যা কান্দে কাগা।
শিশুকালে করলাম পিরীত যৌবনকালে দাগা॥
রে বন্ধু যৌবনকালে দাগা॥

পূর্ণ নহে বলিয়া পরিত্যাগ করিয়াছিলেন।[১৯৩] চন্দ্রকুমার যে পালাগানের প্রকৃত পংক্তি বা ভাষা বদলাইয়া ফেলিতেন তাহার প্রমাণ স্বয়ং দীনেশচন্দ্রও রাখিয়া গিয়াছেন। 'মদনকুমার ও মধুমালা' পালার (পূর্ববঙ্গ গীতিকা, ২।২) স্থানে স্থানে তিনি বদলাইয়া ফেলিয়াছিলেন, দীনেশচন্দ্র তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তবে তাঁহার মতে চন্দ্রকুমার এই পালায় কিছু হস্তক্ষেপ করিলেও চাষার ভাষা অনেকটা বজায় রাখিয়াছেন।[১৯৪] 'কমলারাণী'র ভূমিকায় (পূ. ব. গী. ২।২, পৃ. ২৪) দেখা যাইতেছে চন্দ্রকুমার এই পালার সবটা সংগ্রহ করিতে পারেন নাই, যাহাও সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহাও যথাযথ পাঠান নাই, "সারাংশ লিখিয়া পাঠান।"[১৯৫] সুতরাং সিদ্ধান্ত করিতে হয়, সংগৃহীত পালাগানে কলম চালাইয়া চন্দ্রকুমার অনেক কিছু বাদ দিয়া শুধু সারাংশটুকু দীনেশচন্দ্রকে পাঠাইয়াছিলেন। পালাগান সংগ্রাহকেরা যে অনেক সময়ে দীনেশচন্দ্রের নির্দেশ উপেক্ষা করিয়া গ্রাম্য শব্দাদি পাল্টাইয়া কলিকাতার সমাজের উপযোগী সাধু-শিষ্ট শব্দ জুড়িয়া দিতেন, দীনেশচন্দ্র তাহা অস্বীকার করেন নাই।[১৯৬] 'শ্যামরায়ের পালা' (পূ. ব. গী. ৩।২) প্রসঙ্গে তিনি বলিয়াছেন যে, এই পালাটিতে যে মাঝে মাঝে ঘটনাগত শিথিলতা দেখা যায়, ইহার কারণ—"হয়ত কবি-হৃদয়ে ঘটনাগুলি এতই স্পষ্টরূপে প্রতিবিম্বিত হইয়াছিল যে, তিনি শুধু কবিত্বময় অংশগুলি রাখিয়া অপেক্ষাকৃত নীরস ঘটনার অংশ বাদ দিয়া গিয়াছেন।"[১৯৭] কিন্তু এখানে কবির উপর এ অভিযোগ চাপানো উচিত হইবে না। গীতিকার কবিরা মূলতঃ আখ্যান-কাব্যের কবি, তাঁহারা অনেক সময় গল্পের ঝোঁকে অপ্রাসঙ্গিক আখ্যানও ফাঁদিয়াছেন। সুতরাং এই আখ্যানের কবি নীরস বলিয়া আখ্যানের

১৯৩. ডঃ সুকুমার সেন—পূর্বোল্লিখিত গ্রন্থ, পৃ. ৫৮২

১৯৪. "শিক্ষিত লোকের লেখনী মাঝে মাঝে, চাষার কথার প্রতি ঘৃণার দরুণই হউক অথবা অভ্যাসগত অনবধানতা বশতই হউক, প্রাচীন রচনার উপর অনেকটা সংশোধনকার্য করিয়া থাকে। কয়েক স্থানে বর্তমান সংগ্রাহক এই দোষ এড়াইতে পারেন নাই।" (পূ. ব. গী. ২।২ পৃ. ৩৪)

১৯৫. ঐ, পৃ. ২৪

১৯৬. "পালাগান-সংগ্রাহকেরা আমার উপদেশ সত্ত্বেও সর্বদা সাধুভাষার প্রভাব কাটাইয়া চলিত শব্দ ও কথিত ভাষা ব্যবহার করেন নাই।" (পূ. ব. গী. ৩,২, পৃ. ১/০)

১৯৭. পূ. ব. গী. ৩।২, পৃ. ২৭০

কিয়দংশ ছাড়িয়া যাইবেন—তাহা মনে হয় না। সম্ভবতঃ চন্দ্রকুমার সে-ই কলিকাতার শিষ্টসমাজে পালাগানের বিস্ময়কর কবিত্বরস জাহির করিবার জন্য এবং দীনেশচন্দ্রের প্রশংসা কুড়াইবার জন্য অনেক পালার এরূপ অনেক 'নীরস' অংশ বেমালুম বাদ দিয়া গিয়াছেন। ইতিপূর্বে রামায়ণ অংশের আলোচনায়[১৯৮] চন্দ্রাবতীর রামায়ণ প্রসঙ্গে আমরা চন্দ্রকুমারের পালা বদলানো বা নূতন করিয়া লিখিবার অভ্যাসের কথা বলিয়াছি। এখন কথা হইতেছে, পালাগান লিখিবার মতো বা পরিবর্তন করিবার মতো কবিত্ব কি তাঁহার আয়ত্ত ছিল? তাঁহার যে খানিকটা কবিত্বশক্তি ও লিখিবার কলাবিদ্যা আয়ত্ত হইয়াছিল তাহা স্বীকার করিতে হইবে। পুরাতন 'সৌরভ' পত্রে তাঁহার যে সমস্ত প্রবন্ধ মুদ্রিত হইয়াছে, সেগুলি বেশ সুখপাঠ্য, ভাষার মধ্যে কবিজনোচিত বাঁধুনি ও ঝঙ্কার দুর্লভ নহে। দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকায় দেখাইয়াছেন যে, চন্দ্রকুমার মহাকাব্য, প্রবন্ধ ও উপন্যাস রচনায় বিশেষ উৎসাহী ছিলেন, একখানি উপন্যাস ও মহাকাব্য আরম্ভও করিয়াছিলেন।[১৯৯] সুতরাং ঐ অঞ্চলের অধিবাসী এবং কবিত্বগুণসম্পন্ন চন্দ্রকুমার মূল পালায় দুই চার পংক্তি জুড়িয়া দিলে বিস্ময়ের কিছু নাই। কিন্তু কেহ যদি প্রশ্ন করেন, হঠাৎ তিনি জোড়াতাড়া দিয়া পালাগানের চেহারা পাল্টাইয়া দিবেন কেন? তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক্ পালা-সংগ্রাহক ছিলেন—তাঁহার কর্তব্য—"যদ্দৃষ্টং তল্লিখিতং"। তাহা না করিয়া কোন্ স্বার্থের বশে তিনি এইরূপ অপকর্মে প্রবৃত্ত হইবেন? তাহারও সঙ্কেত ময়মনসিংহ গীতিকার ভূমিকা হইতে পাওয়া যাইবে। দীনেশচন্দ্র সর্বপ্রথম ১৯১৯ সনে যখন কলিকাতায় চন্দ্রকুমারের সঙ্গে পরিচিত হইলেন, তখন তিনি দেখিলেন, পল্লীগাথা অপেক্ষা পৌরাণিক সাহিত্য সংগ্রহের দিকেই

১৯৮. তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্ব দ্রষ্টব্য।

১৯৯. এ বিষয়ে চন্দ্রকুমার দীনেশচন্দ্রকে জানাইয়াছিলেন, "সৌরভে চন্দ্রাবতীর উপাখ্যান আমার প্রথম উদ্যম। ইহার পরে 'লোহার বাসর' নামে একখানি কাব্য লিখিতে আরম্ভ করি। বলা বাহুল্য ইহা চাঁদসদাগর এবং বেহুলা-লখীন্দরের কাহিনী। ইহা সপ্তম সর্গ পর্যন্ত লেখা আছে। শেষ করিতে পারি নাই। এই সময় শরীরের দিকে দৃক্‌পাত না করিয়া গুরুতর পরিশ্রম করিতাম। প্রাতে পত্রিকার জন্য গদ্য, বিকালে উপন্যাস ও গভীর রাত্রে লোহার বাসর লিখিতাম।" (ময়মনসিংহ গীতিকা, ১।২, ভূমিকা)

চন্দ্রকুমারের অধিক ঝোঁক। পালাগানগুলি ভালবাসিলেও চন্দ্রকুমার পৌরাণিক পুঁথিসাহিত্যকে অধিকতর শ্রদ্ধা করিতেন। পালাগুলি তিনি সংগ্রহ করিতেন বটে, কিন্তু গীতিকাগুলির প্রতি দীনেশচন্দ্রের যেমন অপরিসীম মমতা ছিল, চন্দ্রকুমারের ততটা ছিল না বলিয়াই মনে হয়।[২০০] কারণ তিনি কয়েকটি পালাগান সংগ্রহ করিতে গিয়া দীনেশচন্দ্রকে লিখিয়াছিলেন, "এগুলি এত প্রাচীন ও ইহাদের ভাষা এমন পাড়াগেঁয়ে যে শুনিলে হাসি পায়।" "পাড়াগেঁয়ে" ভাষায় লিখিত পালাগানগুলি যদি চন্দ্রকুমারের হাস্য উদ্রেক করিয়া থাকে, তবে তিনি তাহার প্রতিষেধক হিসাবে কিসের সাহায্য লইয়াছিলেন? গ্রাম্যভাষায় গ্রথিত কৃষক-কবিদের বিকৃত ভাষাকে রাজধানীর বিদ্বজ্জনের সভায় পেশ করিবার সময় তিনি নিশ্চয় ইহাকে মাজিয়া ঘষিয়া ও চাঁছিয়া ছুলিয়া বেশ 'সভ্যভব্য' করিয়া তুলিয়াছিলেন। সুতরাং ইহাতে দ্বিমত নাই যে, সংগৃহীত পালার ভাষায় গ্রাম্যতা ও হাস্যকর কিছু থাকিলে চন্দ্রকুমার তাহা তুলিয়া দিয়া কোন কোন স্থানে নিজের ভাষা ও শব্দ যোগ করিয়া দিয়াছেন—দীনেশচন্দ্র সে কথা গোপন করেন নাই।

কিন্তু পালাগানের ভাষা ও বিন্যাসে অযথা হস্তক্ষেপের অপরাধ শুধু চন্দ্রকুমারের একার স্কন্ধে চাপাইলে অবিচার করা হইবে। এ বিষয়ে স্বয়ং দীনেশচন্দ্রকেও কি বেকসুর খালাস দেওয়া যায়? দীনেশচন্দ্র ময়মনসিংহ-গীতিকা, পূর্ববঙ্গগীতিকা ও *Eastern Bengal Ballads*-এর ভূমিকায় তাহা স্বীকার করিয়াছেন। চন্দ্রকুমার ও অন্যান্য পালা-সংগ্রাহকেরা তাঁহার কাছে যেভাবে পালাগুলি পাঠাইতেন, তিনি সেগুলিকে সেভাবে ছাপাইতেন না, প্রাপ্ত পালাগুলিকে নিজের জ্ঞানবুদ্ধিমতো সাজাইয়া গুছাইয়া নানাভাবে বিন্যস্ত করিয়া তবে প্রকাশ করিতেন। বক্তব্যের নাটকীয় গতি হিসাবে দীনেশচন্দ্র পালাগুলিকে অনেকগুলি উপচ্ছেদে বিভক্ত করিতেন। এবিষয়ে তাঁহার উক্তি উল্লেখযোগ্য: "চন্দ্রকুমার দে প্রেরিত মহুয়ার পালায়

২০০. ময়মনসিংহ হইতে চন্দ্রকুমার রাধাকৃষ্ণ ও উমামেনকা সম্পর্কীয় কবিগানের সংগ্রহের জন্য ব্যগ্র হইলে দীনেশচন্দ্র চন্দ্রকুমারের "এই উৎসাহ খুব সতেজ" হইতে দেন নাই। চন্দ্রকুমার-কে তিনি পল্লীর মৌখিক পালাগান সংগ্রহ করিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। কিন্তু মার্জিত ধরনের মঙ্গলকাব্যাদির পুঁথির প্রতি চন্দ্রকুমারের বিশেষ আকর্ষণ ছিল। ছড়া ও পালাসংগ্রহের ফাঁকে ফাঁকে তিনি বহু কবিগান ও যাত্রাগানের পালা সংগ্রহ করিয়াছিলেন। (ময়মনসিংহগীতিকা, ভূমিকা, পৃ. ৷/০) তাহার সামান্যই ছাপা হইয়াছে—যথা 'গোপিনীকীর্তন'।

কতকগুলি গোড়ার পদ ও শেষের পদ বিশৃঙ্খলভাবে দেওয়া ছিল। তিনি যেমন শুনিয়াছিলেন তেমনই সংগ্রহ করিয়া পাঠাইয়াছিলেন। আমি সেগুলি যথাসাধ্য শৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়াছি।"[১] ইতিপূর্বে আমরা 'বাউনীর গান' প্রসঙ্গে দেখিয়াছি চন্দ্রকুমার মূল পালাতে যথেষ্ট হস্তক্ষেপ করিয়াছিলন, দীনেশচন্দ্র তাহার উপর আবার কিছু কলম চালাইয়াছিলেন। এই লেখনী সঞ্চালনের পরিমাণ কতটুকু, তাহা নির্ধারণ করা সহজ নহে। তিনি কি শুধু শব্দের বর্ণাশুদ্ধি সংশোধন করিয়াছিলেন? কিংবা ভাষা ও বর্ণনাতেও হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন? এই বিষয়ে নিশ্চিন্ত হইবার জন্য ডঃ দুসান জ্‌বাভিতেল দীনেশচন্দ্রের বাটীতে গিয়া সংগৃহীত পালাগুলির পাণ্ডুলিপি পরীক্ষার চেষ্টা করেন, কিন্তু যে-কোন কারণেই হোক তিনি সেগুলি দেখিবার অনুমতি পান নাই।[২] পালাগুলির পাণ্ডুলিপি লোকলোচনের সম্মুখে আনা সম্ভব হইলে সংগৃহীত পালা ও সম্পাদিত পালার তুলনামূলক আলোচনা করিয়া দেখা

১. মহুয়া পালা সম্বন্ধে তিনি আরও একস্থলে বলিয়াছেন, "চন্দ্রকুমার যে যেভাবে গীতিটি পাঠাইয়াছিলেন, তাহাতে অনেক অসঙ্গতি ছিল, গোড়ার গান শেষে আর শেষের গান গোড়ায়—এইভাবে গীতিকাটি উলট-পালট ছিল, আমি যথাসাধ্য এই কবিতাগুলি পুনঃ পুনঃ পড়িয়া পাঠ ঠিক করিয়া লইয়াছি।' (ম. সি. গীতি, পৃ. ১।৵০) *Eastern Bengal Ballads*-এ (Vol. I, pt. I) তিনি ইহার প্রতিধ্বনি করিয়া লিখিয়াছেন: "The songs embodying these were found strewn at random over the whole collection in a quite unconnected way. I had to take great pains to re-arrange the poem by a close and careful study of the text." (Preface to Mahua. p. ii) অনুবাদের সময়ে তিনি সব সময়ে আক্ষরিক অনুবাদ করিতেন না। দীর্ঘ বর্ণনা ছাঁটিয়া দিয়া পাশ্চাত্য পাঠকের উপযোগী করিয়া কাহিনীটিকে পরিবেশন করিতেন। কেনারামের পালার অনুবাদ প্রসঙ্গে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, "I have greatly abridged the story of Manasar Bhasan introduced in Canto V, in my English translation, giving the mere gist to enable my readers to follow the incidents of Kenaram's reformation. I have curtailed passages here and there, but nowhere introduced any idea that is not to be found in the text." (*Eastern Bengal Ballads*, Vol I, p. 167)

২. ডঃ জ্‌বাভিতেলের মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য: "To ascertain the truth and to find out to what extent the editor re-arranged some parts of the individual ballads, as he mentioned in his Prefaces, I tried to see the colleotor's manuscripts; they are in the keeping of one of Prof. D. C. sen's sons. Unfortunately, I was able only to ascertain that they still exists, but was not given the opportunity to read them." (*Bengali Folk-Ballads from Mymensingh*, p 59. foot note)

যাইত—চন্দ্রকুমার দে, আশুতোষ চৌধুরী প্রভৃতি সংগ্রাহকদের প্রেরিত পালায় দীনেশচন্দ্র কোনও প্রকার হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন কিনা। যাহা হউক, উপসংহারে একথা অসঙ্কোচেই বলা যাইতে পারে যে, ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ গীতিকার কোন কোন অংশ চিত্তাকর্ষী হইলেও উহাতে প্রাচীন গাথাগীতিকা সংগ্রহের বৈজ্ঞানিক রীতি অনুসৃত হয় নাই। বিশ্ববিদ্যালয়ের বেতনভুক কর্মচারীরা এবং স্বয়ং দীনেশচন্দ্রের মতো প্রাচীন সাহিত্যের বিচক্ষণ বোদ্ধাও গ্রাম্য গাথাসাহিত্য সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও সম্পাদনের রীতি সম্বন্ধে সম্যক অবগত ছিলেন না। তাই পালাসংগ্রাহকের হাতে গাথাগুলিতে 'একমেটে' রং ধরিয়াছে, দীনেশচন্দ্রের হস্তে 'দোমেটে' হইবার পর গীতিকাগুলি ছাপার অক্ষরে প্রকাশিত হইয়া দিব্য শ্রীছাঁদ লাভ করিয়াছে। ইহাতে সংগ্রাহক ও সম্পাদকের অযথা হস্তক্ষেপ ঘটিয়াছে—পরিবর্জন ও পরিবর্ধনের চিহ্নও দুষ্প্রাপ্য নহে। তাই এই সুখপাঠ্য পালাগুলিকে নির্ভেজাল পল্লী সাহিত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে কিঞ্চিৎ দ্বিধা জন্মায়।[৩]

উপসংহার ॥

খ্রীষ্টীয় দশম হইতে অষ্টাদশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রাচীন ও মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের ইতিবৃত্ত আমরা বক্ষ্যমাণ গ্রন্থের তিন খণ্ডে (তৃতীয় খণ্ডের দুই পর্ব) সমাপ্ত করিলাম। এই জাতির ইতিহাস, মনঃপ্রকৃতি, অধ্যাত্মচেতনা, দৈনন্দিন জীবন এই আটশত বৎসরের বাংলা সাহিত্যের ইতিহাসের মধ্যে কিরূপ প্রতি-ফলিত হইয়াছে, তাহা বিশ্লেষণ প্রসঙ্গে পুরাতন বাংলা সাহিত্যের বিস্তারিত ইতিহাস আলোচনা করা হইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি বাঙালীর মধ্য-যুগীয় জীবন ধারা, সামন্ততান্ত্রিক শাসনপ্রণালী, গ্রামীণ বৈশিষ্ট্য, অনাগরিক ও অনাধুনিক মনোভাব ধীরে ধীরে লোপ পাইয়া গেল। পাশ্চাত্ত্য জাতির সংস্পর্শে আসিয়া ঊনবিংশ শতাব্দী হইতে বাঙালীর জাতি-মানস ও শিল্প-সাহিত্যের যে অভাবনীয় পরিবর্তন ও বিকাশ হইল তাহা পরবর্তী যুগের বাংলা সাহিত্যে প্রতিফলিত হইয়াছে। অতঃপর পুরাতন জীবনধারা ও সাহিত্যসংস্কৃতির এইখানে অবসান, আমাদের মধ্যযুগীয় সাহিত্যের দীর্ঘ পথপরিক্রমারও পরিসমাপ্তি ॥

---

৩. সম্প্রতি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র মৌলিক কয়েকটি খণ্ডে 'প্রাচীন পূর্ববঙ্গ গীতিকা' নামে যে সংগ্রহ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার আখ্যান দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত ময়মনসিংহ গীতিকা-পূর্ববঙ্গ-গীতিকার অনুরূপ, কিন্তু ভাবে ভাষায় এক নহে। এই জন্য দীনেশচন্দ্র সম্পাদিত উক্ত খণ্ডগুলিকে নির্ভেজাল বলিয়া গ্রহণ করা যায় না।

চতুর্থ অধ্যায়

দ্বিতীয় পর্বের পরিশিষ্ট

সমকালীন য়ুরোপীয় ও ভারতীয় সাহিত্য

অষ্টাদশ শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের পরিচয় প্রসঙ্গে আমরা দেখিয়াছি যে, মৌলিক বৈশিষ্ট্য, রচনারীতি ও বিষয়বস্তুগত বৈচিত্র্য—সাহিত্যের বিষয়, রূপ ও রীতির আর বিশেষ কোন নূতনত্ব দেখা দেয় নাই। ভারতচন্দ্রগোষ্ঠীর কিছু রীতিগত নূতনত্ব, শাক্ত-বাউল গান এবং গাথা ও গীতিকাসাহিত্য—ইহাই অষ্টাদশ শতাব্দীর একমাত্র উল্লেখযোগ্য পরিচয়। সেই দিক দিয়া দেখিলে মনে হয়, পূর্ববর্তী শতাব্দীতে বাংলা সাহিত্যের যে ঐশ্বর্য ও বিকাশ দেখা গিয়াছিল, অষ্টাদশ শতাব্দীতে সেরূপ প্রাণের লক্ষণ আর ফুটিয়া উঠে নাই। তখন মধ্যযুগ শেষ হইয়া আসিতেছে, অতিদ্রুত রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের পট পরিবর্তিত হইতেছে—মধ্যযুগীয় বাংলা সাহিত্যের আয়ুও ক্রমে হ্রস্ব হইয়া আসিতেছে। সাহিত্যেও সেই ক্ষয়িষ্ণুতার লক্ষণ ক্রমেই ফুটিয়া উঠিয়াছে। যাহা হউক, এখন দেখা যাক পাশ্চাত্য ও ভারতের অন্যান্য প্রদেশের সাহিত্যে কিরূপ বৈশিষ্ট্য আত্মপ্রকাশ করিয়াছে।

য়ুরোপীয় সাহিত্য ॥

ইংরাজী সাহিত্য—প্রথমে ইংরাজী সাহিত্যের কথা ধরা যাক। অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যে যে বিস্ময়কর সৃষ্টির চিহ্ন ফুটিয়া উঠিয়াছে তাহা নহে। কাব্যের দিকে ক্লাসিক ধরনের বুদ্ধিপ্রধান কাব্য-কবিতা—যাহার নায়ক ছিলেন আলেকজাণ্ডার পোপ, এবং গদ্যসাহিত্যের প্রধান ব্যক্তি ডক্টর স্যামুয়েল জনসন—এই দুইজন সারস্বত সাধক অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যম শ্রেণীর সাহিত্যের নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। ইংলণ্ডের রাষ্ট্র, সমাজ ও সংস্কৃতিতে কিন্তু নানা-প্রকার নূতন বৈশিষ্ট্যের সূচনা হইয়াছিল।

নিঃসন্তান তৃতীয় উইলিয়মের মৃত্যুর পরে দ্বিতীয় জেমসের দ্বিতীয়া কন্যা

অ্যান ইংলণ্ডের রাণীর পদে অধিষ্ঠিত হইলেন। এই সময়ে স্পেন ও ফ্রান্সের সহিত সংঘর্ষে ইংরাজের বিজয়গৌরব য়ুরোপেরও খ্যাতি সম্প্রসারিত করিল, জিব্রাল্টারে ইংরাজদের আধিপত্য সুদৃঢ় হইল। ১৭১৩ খ্রীঃ অব্দে উট্রেখ্ট্ সন্ধির পর ইংলণ্ডে ঔপনিবেশিক সত্তা ও শক্তি ধীরে ধীরে মাথা চাড়া দিয়া উঠিতে লাগিল। ইতিপূর্বে (১৭০৭) ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের সমন্বয়ের ফলে এই দ্বীপ গ্রেটব্রিটেন নামে সকলের ঈর্ষা উদ্রেক করিয়াছিল। এই সময়ে ইংলণ্ডের ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রভূত উন্নতি, ঔপনিবেশিক ঐশ্বর্যের সূচনা প্রভৃতির সঙ্গে পার্লামেন্টের সহিত জনতার যোগাযোগ, টোরি-হুইগ পার্টির দ্বন্দ্বে মুদ্রাযন্ত্র ও চিন্তার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক অধিকারবোধ প্রভৃতি প্রগতিশীল ব্যাপার জনচিত্তকে গভীরভাবে আকর্ষণ করিল।

রাণী অ্যানের আকস্মিক মৃত্যুর (১৭১৪) পর হ্যানোভার রাজবংশের উত্থান এবং রাজা প্রথম জর্জ (রাজত্বকাল—১৭১৪—২৭), দ্বিতীয় জর্জ (রাজত্বকাল—১৭২৭—৬০), তৃতীয় জর্জের (রাজত্বকাল—১৭৬০—১৮২০), শাসনকালে ইংলণ্ডের উপর দিয়া প্রবল পরিবর্তন, উত্তেজনা ও বিষণ্ণতার স্রোত বহিয়া গিয়াছে। আমেরিকার স্বাধীনতা যুদ্ধ, ইংলণ্ডের শিল্প-বিপ্লব, ফারসী বিপ্লব, নেপোলিয়নের উত্থান প্রভৃতি ঘটনায় ইংলণ্ডের রাজশক্তি ও জনশক্তি সমভাবে উচ্চকিত হইয়া উঠিল, আর সেই চেতনা ইংরাজী সাহিত্যে—বিশেষতঃ গদ্যসাহিত্যের নূতন দিক নির্দেশ করিল।

ইতিপূর্বে আমরা দেখিয়াছি, অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে কবি আলেকজাণ্ডার পোপ এবং দ্বিতীয়ার্ধে চিন্তাশীল প্রাবন্ধিক ডঃ জনসন নেতৃত্ব করিয়াছিলেন। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীতে আলেকজাণ্ডার পোপের প্রভাবে ক্লাসিকধর্মী, সংহতগঠন, কৃত্রিম মাপের যে কাব্যকবিতা রচিত হইয়াছে তাহাতে ভাবাবিন্যাসগত সংযম রক্ষিত হইলেও কল্পনার শীর্ণতা ও আবেগের দীনতার জন্য এই ক্লাসিকযুগের কাব্যসাহিত্যে চিরন্তনের স্বাক্ষর ফুটিয়া উঠিতে পারে নাই। পোপের ব্যঙ্গকাব্য *The Rape of the Lock*, *Dunciad*, তত্ত্বকাব্য *Essay on Man*, *Essay on Criticism* প্রভৃতিতে বিচিত্র কলাকৌশল, উত্তরোল রঙ্গ ও বিষাক্ত ব্যঙ্গ থাকিলেও তাহাতে মানবহৃদয়ের কোন গভীর ইঙ্গিত নাই, জীবন সম্বন্ধে কোন প্রত্যয় নাই—নিষ্প্রাণ নীরস বুদ্ধির কেরামতি এবং ক্লাসিক রোমান প্রভাবে চাঁছাছোলা ও মাপা-

জোখা বাগ্‌বিন্যাসই ছিল পোপ এবং তাঁহার সমকালীন ও উত্তরসূরীদের একমাত্র মূলধন। পার্লামেণ্ট, রাজনীতি, নাগরিকতা প্রভৃতি ব্যাপার লইয়া তাঁহারা এমন মাতিয়া উঠিয়াছিলেন যে, হৃদয় নামক বস্তুটিকে কিছুদিনের জন্ত শিকায় তুলিয়া রখিয়াছিলেন। স্যামুয়েল গার্থ (১৬৬১—১৭১৯), প্রায়র, ব্ল্যাকমুর—ইঁহারা অগভীর রঙ্গরসের ব্যাপার লইয়া ব্যস্ত ছিলেন, তাহাতে ড্রাইডেন-পোপের অনুসরণ ব্যতীত বিশেষ কোন নূতনত্বের আভাস ফুটে নাই। কিন্তু অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কিছু পূর্বে ইংরাজী কাব্যে কিছু পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। পরিবর্তনের বাণী বহন করিয়া আনিলেন দুইজন কবি—জেমস্ টমসন এবং উইলিয়ম কুপার। টমসনের ঋতুবিষয়ক কবিতাগুলি (*The Seasons—1726-30*) মর্ত্যজীবনের আবেগ ও চিত্রে ভরপুর। কলিন্‌স্, গ্রে—ইঁহারাও কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার পরিচয় দিয়াছিলেন। কিন্তু যথার্থ নূতনত্বের ভাণ্ডারী হইলেন উইলিয়ম কুপার। যদিও তিনি রচনা-ভঙ্গীতে পুরাতন বাঁধাছাঁদা রীতিপ্রকরণ পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই, তথাপি প্রেম, প্রকৃতি ও জীবনের বিচিত্র রহস্য তাঁহার কাব্যকবিতায় ধরা পড়িয়াছে। ব্যক্তিগত জীবনের দুঃখ ও বিষণ্ণতা তাঁহার কবিজীবনের কিয়দংশ আচ্ছন্ন করিয়াছিল। তথাপি *The Task, The Winter Walk, On the Receipt of my Mother's Picture* প্রভৃতি কবিতা হইতে বুঝা যাইতেছে যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগে পোপ-ড্রাইডেনের ভারী আবহাওয়া ও রঙ্গরসের চটুলতা ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল, পরবর্তী যুগের গীতিপ্রবণতা ধীরে ধীরে আত্মপ্রকাশ করিতেছিল। ক্র্যাব নিঃস্পৃহ ও নিরুৎসুকভাবে ইংলণ্ডের বিবর্ণ পল্লীজীবনের নীরস, বাস্তব ও আবেগবর্জিত চিত্র অঙ্কন করিলেও কুপার প্রকৃতি ও মানবজীবনের স্নিগ্ধমধুর রহস্যময়তা ও বিষণ্ণ বিধুরতার যে মর্মগ্রাহী সুর বাঁধিয়া দিয়াছিলেন, তাহাই ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ ও কোলরীজের *The Lyrical Ballads*-এর মধ্য দিয়া পরবর্তীযুগে সহস্রধারায় প্রবাহিত হইল, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী কাব্যকবিতা আইনকানুনের বাঁধাবাঁধি শৃঙ্খলা হইতে মুক্ত হইল—কুপারের কবিতা তাহারই সাক্ষী পাঠ করিয়াছে।

নাটকের দিকেও অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিশেষ কাহাকে লইয়া গর্ব করিবার কিছু নাই। স্বয়ং ড্রাইডেন প্রায় ত্রিশখানি মধ্যম শ্রেণীর নাটক লিখিয়া-

ছিলেন—অনেক সময় ফরাসী কমেডির অনুকরণে। ভ্যাডওয়েল, উইচারলি কনগ্রীভ, গোল্ডস্মিথ এবং সেরিডান—ইহারা অনেকগুলি বুদ্ধিদীপ্ত কমেডি লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু এই ধরনের কৃত্রিম নাটকের সাহিত্যগত মূল্য অধিক নহে। এই যুগে দুই চারিখানি ট্র্যাজেডিও রচিত হইয়াছিল, তন্মধ্যে টমাস অটোয়ের *Venice Preserved* ট্র্যাজেডি হিসাবে একযুগে বিশেষ প্রশংসা লাভ করিয়াছিল। যাহা হউক অষ্টাদশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডি ও কমেডি—কোন নাটকই দীর্ঘস্থায়ী যশ লাভ করিতে পারে নাই। এই যুগ কৃত্রিম কাব্যকলার যুগ, আবেগ তখন মন্দীভূত হইয়া পড়িয়াছে। নিপুণ রচনাকৌশলই তখন একমাত্র কবিত্ব বলিয়া স্বীকৃতি লাভ করিয়াছে। এরূপ ক্ষেত্রে কমেডি ও লঘুরসের নাটক তবু কিছু আসর জমাইতে পারে, কিন্তু ট্র্যাজেডির আবেগ, গাম্ভীর্য ও স্তব্ধ বেদনার সীমাহীন আর্তনাদ অষ্টাদশ শতাব্দীর সম্পূর্ণ অনুপযোগী। তাই অষ্টাদশ শতাব্দীর ট্র্যাজেডিগুলি এত নিষ্প্রাণ মনে হয়।

ইংরাজী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীর যদি কোন ঐতিহাসিক মূল্য থাকে তবে তাহা উপন্যাস ও প্রবন্ধ-নিবন্ধ। ইতিপূর্বে উপন্যাসের সূচনা হইলেও অষ্টাদশ শতাব্দীর পূর্বে যথার্থ উপন্যাস রচিত হয় নাই। স্যামুয়েল রিচার্ডসন (১৬৮৯-১৭৬১), হেনরি ফিল্ডিং (১৭০৭-৫৪), টোবিয়াস স্মোলেট (১৭২১-৭১), লরেন্স স্টার্ন (১৭১৩-৬৮), কয়েকজন মহিলা ঔপন্যাসিক (আফ্রা বেন, মান্‌লি, ফিল্ডিং ভগিনী, নাট্যকার সেরিডানের মাতা ফ্রান্সিস সেরিডান, হানা মুর, ফ্যানি বার্নি প্রভৃতি) অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যকে কৃত্রিম কাব্যকলা ও তুচ্ছ কমেডি হইতে রক্ষা করেন। রিচার্ডসনের পামেলা, ক্লারিসা হার্লো প্রভৃতি উপন্যাসে নীতির দিকটা প্রাধান্য পাইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কাহিনীগুলিতে স্বাভাবিক আবেগের যথাযথ প্রকাশ ঘটিয়াছে বলিয়া একদা এই সমস্ত উপন্যাসের এত চাহিদা ছিল। ফিল্ডিং-এর জোসেফ এ্যাণ্ড্রুস, জোনাথান ওয়াইল্ড, আমেলিয়া—তিনখানি উপন্যাসে কোথাও ব্যঙ্গরস, কোথাও জীবনের গভীর অনুভূতি ও বেদনা নরনারীর নূতন মূর্তি অঙ্কন করিয়াছে। স্মোলেট ও স্টার্ন উপন্যাসে বাস্তব অভিজ্ঞতা ও জীবন্ত ভাব সঞ্চার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর গদ্য নিবন্ধসাহিত্য ও রম্যরচনাবলী ইংরাজী সাহিত্যের

শ্রেষ্ঠ ঐতিহ্য দাবি করিতে পারে। চিন্তানায়ক ডঃ জনসন (১৭০৯-৮৪) অষ্টাদশ শতাব্দীর চিন্তাশীল গদ্য সাহিত্যে ও ইংলণ্ডের মনীষায় মানদণ্ড স্বরূপ বিরাজ করিতেছেন। তাঁহার অনুচর বিশ্ববিখ্যাত বসওয়েল প্রণীত তাঁহার জীবনচরিতে এই বিরাট ব্যক্তির জীবনাদর্শ, মনঃপ্রকৃতি ও গদ্যশিল্পীর স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে। জনসনের চিরস্মরণীয় কীর্তি ইংরাজী ভাষার অভিধান সঙ্কলন (*Dictionary of the English Language*)। কবিতা ও নাটকেও তিনি কিঞ্চিৎ হাত পাকাইয়া গদ্যনিবন্ধে আত্মপ্রকাশ করেন। তাঁহার নীতি-মার্গীয় উপন্যাস 'রাসেলাস' একযুগে গণপাঠ্য কথাগ্রন্থ হিসাবে অভিনন্দিত হইয়াছিল। এমনকি উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই বাংলাদেশে ইহার একাধিক অনুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। ইহাতে কিছু কিছু চিত্তাকর্ষী আখ্যান থাকিলেও ইহার গুরুগম্ভীর 'জনসনীয়' বাচনরীতি ও বিশুদ্ধ নীতি প্রচার এ যুগের পাঠকের ভাল লাগিবে না। ডঃ জনসন একাধিক পত্র-পত্রিকা স্থাপন ও প্রচার করিয়া ইংলণ্ডের বুদ্ধিজীবী সমাজের নেতৃত্ব করিয়া-ছিলেন। তাঁহার *Lives of the Poets* সমালোচনা-সাহিত্যে বিশেষভাবে স্মরণীয়। তবে জনসন যে পরবর্তীকালে এত বিখ্যাত ও স্মরণীয় হইয়াছেন তাহার অন্যতম কারণ—তাঁহার অনুরাগী বসওয়েলকৃত *Life of Samuel Johnson*—ইহাতে প্রকাশিত তাঁহার অভিমত, আদর্শ, মন্তব্য ইত্যাদি বিষয় ইংরাজী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তাঁহাকে অক্ষয় স্থানে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যমশ্রেণীর ইংরাজী সাহিত্যের মধ্যে একমাত্র প্রথম-শ্রেণীর ব্যতিক্রম—নিবন্ধ সাহিত্য। জোসেফ এ্যাডিসন (১৬৭২-১৭১৯), রিচার্ড ষ্টিল (১৬৭২-১৭২৯), ডানিয়েল ডিফো (১৬৬১-১৭৩১), জোনাথান সুইফ্‌ট্‌ (১৬৬৭-১৭৪৫), অলিভার গোল্ডস্মিথ (১৭২৮-৭৪) প্রভৃতি প্রাবন্ধিক, রম্যরচনাকার ও রঙ্গ-সাহিত্যের স্রষ্টারা ইংরাজী গদ্যসাহিত্যকে যথার্থই য়ুরোপীয় গদ্যসাহিত্যের সমকক্ষ, কোথাও বা উৎকৃষ্টতর মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন।* তন্মধ্যে ডিফোর 'রবিন্সন ক্রুশো' এবং সুইফ্‌টের

* ইতিপূর্বে এই গ্রন্থের তৃতীয় খণ্ডের প্রথম পর্বে ইহাদের উল্লেখ করা হইয়াছে। কারণ ইহাদের সাহিত্যজীবন কোন কোন ক্ষেত্রে সপ্তদশ শতাব্দীতেই আরম্ভ হইয়াছিল। তাই ইহাদের সাহিত্য-প্রতিভার কিয়দংশ সপ্তদশ শতাব্দীর সাহিত্যের সঙ্গে আলোচিত হইয়াছে।

গালিভারস্ ট্র্যাভেল সমগ্র য়ুরোপে ক্ল্যাসিক সাহিত্য বলিয়া এখনও সম্মানিত। অ্যাডিসন, ষ্টিল, গোল্ডস্মিথ প্রভৃতি নিবন্ধকারেরা ইংরাজী গদ্যসাহিত্যের যথার্থই পরিপোষ্টার পদ দাবি করিতে পারেন। তাঁহাদের নিবন্ধগুলিতে মনীষা, সরসতা, ভূয়োদর্শন, জীবনের প্রতি ঔদার্য ও সূক্ষ্ম গীতিপ্রবণতার যে অপূর্ব সমাবেশ হইয়াছে, তাহা ষোড়শ শতাব্দীর ফরাসী নিবন্ধকার মন্তেঁই এবং পরবর্তী কালের বিখ্যাত ইংরাজী রচনাকার ল্যামের সমগোত্র। এই নিবন্ধগুলিতে বিশেষ ধরনের ইংরাজ-মন ব্যক্ত হইলেও তাহাতে কোনও প্রকার সঙ্কীর্ণতা নাই। এই নিবন্ধসাহিত্য রচিত না হইলে অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরাজী সাহিত্যের বিবর্ণতা ঘুচিত না। এই শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতে ইংলণ্ডের বাহিরের অনেক ঘটনা এবং ইংলণ্ডের ঘরোয়া ব্যাপার জনসাধারণকে এতটা সচেতন করিয়া তুলিয়াছিল যে, নানাপ্রকার আন্দোলনের বাহন হিসাবে গদ্যসাহিত্যের ডাক পড়িয়াছিল—এবং অতি দ্রুত ইংরাজী প্রবন্ধনিবন্ধ সাহিত্যের উন্নতির একটা প্রধান কারণ, তৎকালীন রাজনৈতিক, সামাজিক ও আন্তর্জাতিক ঘটনাবলী। গদ্য নিবন্ধগুলিতে মননের সঙ্গে শিল্পরূপের এমন চমৎকার মিলন পরবর্তী কালের ইংরাজী সাহিত্যেও খুব বেশী নাই।

ফরাসী সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যকে 'প্রজ্ঞা'র সাহিত্য ('Enlightenment') বলে। এই একটি শতাব্দীতে ফরাসী জাতি, সমাজ, রাষ্ট্র ও সাহিত্যের যে কিরূপ পরিবর্তন হইয়াছিল তাহা ভাবিলে অবাক হইতে হয়। বস্তুতঃ অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশ, সংস্কৃতি ও সাহিত্য সারা য়ুরোপকেই নবজীবনের বার্তা শুনাইয়াছে। ১৭১৫ খ্রীঃ অব্দে স্বেচ্ছাচারী ফরাসী সম্রাট চতুর্দশ লুইয়ের মৃত্যু হইলে লোকে কিঞ্চিৎ আশ্বস্ত হইলেও পঞ্চদশ লুইয়ের রাজত্বকালও কোন আশার বাণী বহিয়া আনিল না। স্পেনযুদ্ধ (১৭০১-১৭১৩), অস্ট্রিয়া যুদ্ধ (১৭৪১-৪৮), 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধ' (১৭৫৬-৬৩) প্রভৃতি ব্যাপারে জড়াইয়া পড়ার ফলে এবং স্বেচ্ছাচারী রাজতন্ত্র, আমলাচক্র, ধনিসমাজ এবং ধর্মধ্বজীদলের মূঢ় আচরণের প্রতিক্রিয়ায় একদিকে যেমন রাজকোষ শূন্য হইতেছিল, তেমনি আর এক দিকে অত্যাচারিত জনসাধারণ ও মধ্যবিত্ত বুদ্ধিজীবী-সম্প্রদায় এই কুশাসন

ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে অসহিষ্ণু হইয়া উঠিতেছিল। অত্যাচারী পঞ্চদশ লুই ভবিষ্যৎ বিচারের দৃষ্টিশক্তি হারাইয়া ফেলিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত দাম্ভিক উক্তি "Apre's moi le deluge" (After me the deluge)—ইহার দ্বারাই তাঁহার মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যাইবে। তাঁহার মৃত্যুর পর ষোড়শ লুইও (শাসনকাল—১৭৭৪-৮৯) অধঃপতনের সোপানসমূহ আরও স্পষ্ট করিয়া তোলেন। তাঁহার রাণী ম্যারিয়া আঁতোয়ানেৎ শুধু জনসাধারণের ঘৃণাই কুড়াইয়াছিলেন। রুসো, দিদেরো প্রভৃতি বুদ্ধিজীবীরা বিপ্লবী রচনাদির সাহায্যে মানুষের সাম্যমৈত্রীর বাণী প্রচার করিতে লাগিলেন, ফলে জনসাধারণের মধ্যে প্রচণ্ড বিপ্লবী শক্তি সঞ্চারিত হইল, আর তাহার রক্তচিহ্ন ফুটিয়া উঠিল ১৭৮৯ খ্রীঃ অব্দে জনসাধারণের দ্বারা ব্যাষ্টিল দুর্গ পতনের পর। এই বৎসরই রাজারাণীর শিরশ্ছেদ হইল। ইহার ছয়বৎসর পরে কর্সিকার বীর নেপোলিয়ন কনসাল পদে অধিষ্ঠিত হইলেন, তারপর ১৮০৪ খ্রীঃ অব্দে নিজেই শিরে মুকুট ধারণ করিয়া ফরাসী দেশের সিংহাসনে পুনরায় রাজারূপে অধিষ্ঠিত হইলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী দেশে শুধু গণতন্ত্র ও জনশক্তির জয় ঘোষণাই প্রধান ঘটনা নহে। এই যুগে যেমন নানা প্রতিষ্ঠান ও পরিবারকে কেন্দ্র করিয়া সাহিত্যালোচনা প্রাধান্য পাইতে লাগিল, তেমনি চিন্তার স্বাধীনতা, বাস্তববোধ, প্রশ্নমনস্কতা, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি-শক্তি, বৈজ্ঞানিক চেতনা সাহিত্যকে বিশেষভাবে আকর্ষণ করিলে শিক্ষিত সমাজে বিপ্লবী চিন্তা প্রচার লাভ করিতে লাগিল। বৈজ্ঞানিক ও মানববাদী আদর্শও সাহিত্যিক ও দার্শনিকের মন জয় করিয়া লইল। প্রথা, সংস্কার, ধর্মপ্রণালী, রাজতন্ত্র—সব কিছুকে ম্লান করিয়া মানুষের স্বাধীন বুদ্ধি ও বিবেক ফরাসী মননধর্মকে নূতন আন্দোলনের দিকে উন্মুখ করিয়া তুলিল। ইহাই প্রভাস্বর প্রজ্ঞার যুগ ("The age of Enlightenment")। আত্মপ্রত্যয়সিদ্ধ ও বিবেকবুদ্ধিসমর্থিত ন্যায়বোধ এই যুগে মানুষের নিয়ামক শক্তি বলিয়া স্বীকৃত হইল—এক কথায় য়ুরোপের মানসমুক্তির তোরণদ্বার অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী কবি, সাহিত্যিক, সমাজবিপ্লবী ও বৈজ্ঞানিকগণই সর্বপ্রথম খুলিয়া দেন। সমস্ত কিছুর মূলীভূত কারণ হইল মানুষের প্রাধান্য, মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব। রুসো ও ভোলতেয়রই যুগনায়ক বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। ভোলতেয়র (১৬৯৪-১৭৭৮)

এবং রুসো (১৭১২-১৭৭৮)—ইহারা একাধারে কবি, নিবন্ধকার, নাট্যকার, দার্শনিক ও রাষ্ট্রনায়ক। ভোলতেয়রকে প্রজ্ঞাযুগের প্রতীক বলিয়া গ্রহণ করা হয়। অভিজাত সমাজকে খোঁচা দিবার ফলে প্রথম জীবনে তাঁহাকে কারাবাস করিতে হইয়াছিল, পরে ইংলণ্ডে পলাইয়া গিয়া কিছুকাল প্রগতিশীল ইংরাজ জননায়কদের সঙ্গে পরিচিত হইলে তাঁহার মানসিক আকাশের সীমা আরও বাড়িয়া যায়। বিচিত্র প্রতিভাধর ভোলতেয়র নাটক (ঐতিহাসিক ও গ্রীকপুরাণধর্মী), কাব্য (১৭২৮ সালে রচিত 'আঁরিয়াদ' নামক মহাকাব্য) ইতিহাস ও রাজবংশের জীবনী, দর্শন, সমালোচনা (কর্ণেইলের সাহিত্য-জীবন বিশ্লেষণ) প্রভৃতি সাহিত্যের নানা বিভাগে অবাধে বিচরণ করিয়াছেন। এই সমস্ত রচনার মধ্য দিয়া একটি প্রচণ্ড বিপ্লবী প্রাণশক্তিই সর্বদা আত্ম-প্রকাশের পথ খুঁজিয়াছে। চিন্তা ও মননের ক্ষেত্রে অভূতপূর্ব পরিবর্তন আনিতে সক্ষম না হইলেও অন্যায়, অবিচার, সঙ্কীর্ণতা, অনুদারতা, কুসংস্কার প্রভৃতির চিরশত্রু, বিপ্লবের বন্ধু ভোলতেয়র ফরাসী সাহিত্যে অননুকরণীয় স্থান অধিকার করিয়া আছেন তাহা কেহ অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আর একটি অগ্নিস্ফুলিঙ্গ জাঁ জ্যাক রুসো। ব্যক্তিগত জীবনে বেপরোয়া বোহেমিয়ান, চিন্তার জগতে বিপ্লবী, হৃদয়ের দিক হইতে উগ্র রোমান্টিক, স্বপ্নালুতার দিক হইতে প্রাচীনত্ববিলাসী—এই বিচিত্র প্রতিভাধর ব্যক্তিটি একদা সারা পশ্চিমবিশ্ব তোলপাড় করিয়াছিলেন, ইহার ঢেউ তাহার অর্ধশত বৎসর পরে পূর্বদেশে, বাংলার শ্যামল প্রান্তরেও আঘাত করিয়াছিল। আধুনিক যুগের আদি-রোমান্টিক রুসো সমাজ, রাজনীতি, নীতি—যাহা লইয়াই ব্যস্ত থাকুন না কেন, আসলে তিনি ছিলেন পুরাদস্তুর আবেগবাদী, কল্পনাপ্রবণ মনীষী। তাঁহার দর্শন ও চিন্তাপ্রণালীর অনেকটাই যুক্তির ধোপে টিঁকে নাই; কিন্তু মানুষের চেতনাকে তিনি যেরূপ সবলভাবে আকর্ষণ করিয়াছিলেন, য়ুরোপের কোন ব্যক্তিই তাহার অনুরূপ মানসিক শক্তির পরিচয় দিতে পারেন নাই। বিজ্ঞান, সমাজতত্ব, উপন্যাস এবং আত্মজীবনী রচনা করিয়া তিনি রোমান্টিক মানসিকতাকে বিচিত্র সাহিত্যকর্ম ও বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধিৎসায় প্রয়োগ করিয়াছিলেন। প্রচণ্ড আবেগ, অপার্থিব স্বপ্নবিলাস এবং অদ্ভুত কল্পনাশক্তির উন্মত্ত বন্যাপ্রবাহে তিনি মানুষের যুক্তিবুদ্ধিকে ভাসাইয়া দিয়াছিলেন। তাঁহার সমাজ ও রাষ্ট্র ঘটিত

ভবিষ্যদ্বাণীই ফরাসী বিপ্লবকে ত্বরান্বিত করিয়াছিল। তাঁহার আবেগোন্মত্ত অনেক কথা আজ অর্থহীন ও যুক্তিবিরোধী মনে হইলেও এই বেপরোয়া ব্যক্তিটি তাঁহার কালে এবং পরবর্তী দুই শতাব্দী ধরিয়া মানব-মনীষায় অসাধারণ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

প্রবন্ধনিবন্ধে মঁতেস্কু (১৬৮৯-১৭৫৫) যে বৈপ্লবিক চিন্তাধারার সমাবেশ ঘটাইয়াছিলেন তাহাই 'এনসাইক্লোপীডিস্ট্' আন্দোলনে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিয়াছিল। দেনি দিদেরো (১৭১৩-৮৪) এই বিশ্বকোষের প্রধান সম্পাদক হইয়া (ইহার প্রকৃত নাম—'Encyclopaedia or Practical Dictionary of the Sciences, of the Arts and of the Trades') ৩৪ খণ্ডে নানা জ্ঞানবিজ্ঞান, দর্শন-রাজনীতি ও সমাজতত্ত্ব বিষয়ক পুস্তিকা প্রকাশ করেন। ভোলতেয়র, দ'লেমবার, রুসো, মঁতেস্কু প্রভৃতি পণ্ডিত, মনীষী ও চিন্তাবিপ্লবীরাও এই গ্রন্থমালায় মূল্যবান প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন—বস্তুতঃ ফরাসীবিপ্লবের বেদমন্ত্র এই 'এনসাইক্লোপীডিস্ট' আন্দোলন হইতেই উদ্গীত হইয়াছিল।

এই যুগে কিছু কিছু নাটক, রঙ্গনাট্য ও ট্র্যাজেডি রচিত হইয়াছিল বটে, কিন্তু গুণগত উৎকর্ষে তাহার মূল্য বেশী নহে। এই প্রসঙ্গে রুসোর শিষ্য সেণ্ট পিয়েরির নাম করা যাইতে পারে। রোমান্টিক কিশোর-কিশোরীর স্নিগ্ধমধুর প্রেমের উপাখ্যান লইয়া তিনি 'পল এত্ ভার্জিনি' নামক গদ্য আখ্যান রচনা করিয়াছিলেন। পরবর্তী কালে য়ুরোপের রোমান্টিক গল্প-আখ্যানের ক্রমবিকাশে এই কথাগ্রন্থটির বিশেষ প্রভাব স্মরণীয়। বাংলা-দেশেও উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই উপন্যাসের একাধিক বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছিল। যাহা হউক, অষ্টাদশ শতাব্দীর ফরাসী সাহিত্যে কাব্য, নাটক ও কথাসাহিত্য অভূতপূর্ব বিস্ময় সৃষ্টি করিতে না পারিলেও চিন্তামূলক নিবন্ধসাহিত্যে যে সুগভীর রেখা মুদ্রিত করিয়াছিল, তাহা আজ দীর্ঘ দুই শত বৎসরের ব্যবধানেও অস্পষ্ট হইয়া যায় নাই। চিন্তার স্বাধীনতা, বিবেকবুদ্ধির জাগরণ, সংস্কারের বন্ধনমোচন, মানুষের বাস্তব বাসনাকামনার প্রাধান্য প্রভৃতি শুধু যে গদ্যসাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছে তাহা নহে—সমস্ত যুগটিকেই প্রজ্ঞার যুগরূপে চিহ্নিত করিয়া পশ্চিমবিশ্বের ইতিহাসে নবজীবন-চেতনা সৃষ্টি করিয়াছে।

জার্মান সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখা যাইবে, এই শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মান সাহিত্যে অনুকরণের অভিশাপ ঘুচে নাই। অবশ্য রাজনৈতিক দিক হইতে বিচার করিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানীর জীবনে প্রভূত উন্নতি আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল। অনেকগুলি ক্ষুদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টি হইলেও ইহাদের মধ্য হইতে প্রাসিয়ার প্রাধান্য লাভ জার্মান সংস্কৃতির উন্নতির কারণ বলিয়া বিবেচিত হয়। প্রাসিয়ার প্রাধান্য লাভের ফলে গোটা জার্মান জাতির অন্তরে জাতীয় উদ্দীপনার সঞ্চার হয়। 'সপ্তবর্ষব্যাপী যুদ্ধে' (১৭৫৬-৬৩), দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের (রাজত্বকাল: ১৭৪০-৮৬) নেতৃত্বে ও সুশাসনে ফ্রান্স, অস্ট্রিয়া ও রাশিয়ার আক্রমণ প্রাসিয়া কৃতিত্বের সঙ্গে সহ্য করিয়াছিল। চিন্তাশীল সমাজে যুক্তিবাদ প্রভাব বিস্তার করিলেও রুসোর আবেগবহুল রোমান্টিকতা এই যুক্তিবাদকে বেশ কিছুটা খর্ব করিয়া রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহার ফলে জার্মান সাহিত্য ও চিন্তাধারাও নূতনবেশে সজ্জিত হইয়াছিল। রুসোর রোমান্টিক আদর্শ-বাদের প্রভাবে সাহিত্যিক ও চিন্তাশীল মহলে যে সংস্কৃতি লাভের উদগ্র আকাঙ্ক্ষা জাগিয়াছিল, তাহার ফলে সাহিত্য, সমাজ, সংস্কৃতি ও রাষ্ট্র-ব্যাপারে নবজীবনজ্ঞাপক একটি নূতন ভাবাদর্শের জন্ম হয়। ইহা জার্মান সাংস্কৃতিক জীবনে *Sturm und Drang* অর্থাৎ ঝড়ঝঞ্ঝার আন্দোলন নামে পরিচিত। এই আন্দোলনের মূল লক্ষ্য ছিল—রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রগতি এবং জার্মান সাহিত্যের নবজীবন লাভের আকাঙ্ক্ষা। বৃথা নিয়মকানুন ও অনুকরণে যখন জার্মান জাতির সংস্কৃতি ও সাহিত্যের বিকাশ স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল তখন *Sturm und Drang* আন্দোলনের দ্বারা সাহিত্য ও ব্যক্তি-চিত্তের স্বাধীনতা সৃষ্টির আকাঙ্ক্ষা সাহিত্যিক ও মনীষীদের চিত্তকে অধিকার করিল। অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এই আন্দোলনের ফলস্বরূপ জার্মান সাহিত্যের যে বিচিত্র বিকাশ লক্ষ্য করা গিয়াছে, সমগ্র জার্মান সাহিত্যের ইতিহাসে তাহার তুলনা পাওয়া যায় না। ১৭০০-১৭৫০ খ্রীঃ অব্দের মধ্যে উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন গ্রন্থ জার্মান সাহিত্য অলঙ্কৃত করে নাই। ১৭২৫ খ্রীঃ অব্দের দিকে জোহান ক্রিস্টোফ গটশেড (১৭০০-৬৬) জার্মান সাহিত্যের উন্নতির জন্য ফরাসী ক্লাসিক সাহিত্যের আদর্শে ও নৈতিক বিশুদ্ধিকরণের উদ্দেশ্যে সুকঠোর নিয়মানুবর্তিতার কথা ঘোষণা করেন এবং

ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও আবেগের অতিরেক খর্ব করিতে উপদেশ দেন। কিন্তু গটশেড প্রচারিত এই নব্যক্লাসিকতা জার্মান জাতির চিত্ত আকর্ষণ করিতে পারে নাই। অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সম্রাট দ্বিতীয় ফ্রেডারিকের প্রভাবে ও রুসোর মতবাদের আদর্শে সাহিত্য ও সংস্কৃতির কর্ণধারগণের মনে সাহিত্যসংক্রান্ত উদারতর আন্দোলনের ইচ্ছা ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করিতে থাকে এবং ১৭৪৮ সালে উক্ত আন্দোলনের ফলস্বরূপ *Sturm und Drang* আন্দোলন প্রবলভাবে বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকদের সমস্ত প্রচেষ্টা নিয়ন্ত্রিত করিতে শুরু করে। ঔপন্যাসিক উইল্যাণ্ড ও সমালোচক লেসিং অতি দ্রুত জার্মান সাহিত্যের উন্নতি করেন। বিশেষতঃ লেসিং-এর সাহিত্য ও শিল্প-সমালোচনা জার্মান চিন্তামূলক সাহিত্যকে সমগ্র য়ুরোপেই শ্রদ্ধার আসনে প্রতিষ্ঠিত করে।

জন গটফ্রিড হার্ডার (১৭৪৪-১৮০৩) অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক দিকপাল—ইনিই জার্মান সাহিত্যে সর্বপ্রথম আধুনিকতার সূত্রপাত করেন। তাঁহাকে *Sturm und Drang* আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা বলা হয়। রুসোর আদর্শ তাঁহার চিন্তায় সর্বাধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। ক্রিয়াশীল সাহিত্যসৃষ্টি অপেক্ষা সাহিত্যান্দোলনে প্রবল প্রভাব বিস্তার করিয়া তিনি অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মানসাহিত্যে স্মরণীয় হইয়া আছেন।

প্রসিদ্ধ গীতিকবি ক্লপস্টন (১৭২৪-১৮০৫), মহাকবি গ্যয়েঠে (১৭৪৯-১৮৩২) এবং নাট্যকার শিলার (১৭৫৯-১৮০৫) অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্ধে জার্মান সাহিত্যকে বিশ্বসাহিত্যের পর্যায়ে তুলিয়া ধরেন—তাঁহাদের কাব্য ও নাটককে জার্মান প্রতিভার সর্বশ্রেষ্ঠ ফলশ্রুতি বলিয়া গ্রহণ করা হয়। ক্লপস্টক মূলতঃ গীতিকবির প্রতিভা লইয়া জন্মাইলেও মিল্টনের প্রভাবে খ্রীস্টের জীবন অবলম্বনে *Messias* শীর্ষক সুবৃহৎ মহাকাব্য রচনা করেন। তিনি কিছু কিছু নাটকও লিখিয়াছেন—ইহার অনেকগুলির উপাদান বাইবেল হইতে সংগৃহীত। তাঁহার প্রতিভা গীতিকবিতায় অধিকতর বিকাশলাভ করিয়াছে।

পরবর্তী যুগে যাঁহারা নাটকে ফরাসী নিয়মকানুন ছাড়িয়া লেসিং-এর আদর্শ অনুযায়ী নাটক রচনা করিয়া বিশ্ববিখ্যাত হন তাঁহাদের মধ্যে গ্যয়েঠে ও শিলারের নাম সর্বাগ্রে স্মরণীয়। জোহান উল্‌ফ্‌গং ভন গ্যয়েঠে রাষ্ট্র,

সংস্কৃতি, সাহিত্য ও জীবনে অসাধারণত্ব অর্জন করিয়া জার্মান প্রতিভার প্রতীকপুরুষ নামে অভিহিত হইয়াছেন। প্রথম যৌবন হইতে বিরাশি বৎসর পর্যন্ত তিনি অসাধারণ সাহিত্যপ্রতিভার চিহ্নস্বরূপ বহু কাব্য, নাটক, উপন্যাস রচনা করিয়াছেন—তাঁহার গ্রন্থসংখ্যা অন্যূন ১২০ খানি। তাঁহার দুইখানি মহাকাব্য *Hermann Und Dorothea* (*1197*) এবং *Faust* (১৭৬৯-১৮৩২), বিশেষতঃ শেষোক্ত নাট্যধর্মী মহাকাব্য গ্যয়ঠের বিশ্ব-বিস্তারী প্রতিভার স্মারকচিহ্নরূপে বর্তমান। ইহা আকারে নাটক হইলেও, মহাকাব্যের বিস্তার, কবির ব্যক্তিগত অনুভূতির গাঢ়তা, মনীষার গভীরতা ও সূক্ষ্ম প্রতীকতা এই মহাগ্রন্থকে সর্বকালের সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করিয়াছে—ইহার দ্বারা তিনি ব্যাস-বাল্মীকি-হোমারের পার্শ্বেই স্থান পাইয়াছেন। তাঁহার অন্যান্য গ্রন্থেও প্রতিভার অভাব নাই, কিন্তু যাহাকে চিরন্তন সাহিত্য বলে, *Faust* তাহারই সার্থক উদাহরণ।

জোহান ক্রিস্টোফ ফ্রেড্রিক ভন শিলার, শুধু জার্মানীর নহে, পশ্চিম-বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ নাট্যকাররূপে পরিচিত ; য়ুরোপে তিনি প্রায় শেক্সপীয়রের মতোই খ্যাতিলাভ করিয়াছেন। তাঁহার প্রথম জীবনে রচিত নাটকে স্বাধীন চেতনার যে আধিক্য দেখা যায়, সেই মুক্ত বুদ্ধি ও প্রাণশক্তি তাঁহার পরবর্তী নাটকেও রক্ষিত হইয়াছে। দার্শনিক কাণ্টের প্রভাবে তিনি দর্শন ও সৌন্দর্যতত্ত্ব লইয়াও গভীরভাবে চিন্তা করিয়াছিলেন। তাঁহার বিখ্যাত নাটক *Die Rauber* (The Robbers, 1781) এবং *Wallenstein* শ্রেষ্ঠ নাট্য-সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে। প্রতিভায় তিনি শেক্সপীয়র ও গ্যয়ঠের সমকক্ষ না হইলেও জার্মানসাহিত্যে তাঁহার সুগভীর প্রভাব স্বীকার করিতে হইবে। সাহিত্যের গুরুত্ব, উৎকর্ষ, সমগ্র জাতির আত্মিক স্বরূপ প্রভৃতি বিচার করিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর জার্মান সাহিত্যে, বিশেষতঃ এই শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধের সাহিত্যে সমগ্র জার্মান জাতিরই গভীর পরিচয় ফুটিয়া উঠিয়াছে। বস্তুতঃ এই পঞ্চাশ বৎসরের মধ্যেই জার্মান সাহিত্য যথার্থই বিশ্বসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ইটালি, স্পেন ও রুশদেশেও সাহিত্যের কিছু বিকাশ হইয়াছে বটে, কিন্তু বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে তাহার গৌরবময়

ভূমিকা স্বীকৃত হয় নাই। ইটালির নাট্যকার আলফিয়ারি (১৭৪৯-১৮০৩), ঔপন্যাসিক মানজোনি (১৭৮৫-১৮৭৩) এবং গীতিকবি ও সমালোচক লিওপার্দি বিরাট প্রতিভার অধিকারী না হইলেও অষ্টাদশ-ঊনবিংশ শতাব্দীর ইটালির সাহিত্যে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যেও বিশেষ কোন প্রতিভার চিহ্ন পাওয়া যাইতেছে না। মলিয়রের অনুকরণে কিছু কিছু রঙ্গনাট্য এবং যৎসামান্য আখ্যানকাব্য ও ব্যঙ্গকাব্য অষ্টাদশ শতাব্দীর স্পেনীয় সাহিত্যের একমাত্র পরিচয় বহন করিতেছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে ও বিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভ হইতেই স্পেনীয় সাহিত্যে যৎকিঞ্চিৎ আধুনিকতার সূচনা হয়।

এই দিক হইতে রুশ সাহিত্যের বিবর্তন বড় বিচিত্র। যথার্থ রুশ সাহিত্যের বিকাশ ঊনবিংশ শতাব্দী হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। দশম শতাব্দীর দিকে কিয়েভের রাজা ভ্লাদিমির রুশদেশে খ্রীস্টানধর্মের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি করেন, খ্রীস্টানী পুঁথি-সাহিত্যকেও রুশদেশের জনসাধারণের মধ্যে প্রচার করেন। কিন্তু ত্রয়োদশ শতাব্দীর গোড়ার দিক হইতে প্রায় পঞ্চদশ শতাব্দী পর্যন্ত রুশদেশকে অর্ধবর্বর তাতার জাতি করতলগত করিয়া রাখিয়াছিল। ফলে এই সময়ে রুশসাহিত্য ও সংস্কৃতির বিশেষ কোন উন্নতি হয় নাই। সপ্তদশ শতাব্দীর শেষভাগে রুশসম্রাট মহামতি পিটার পুনরায় রুশ জাতি ও দেশকে পাশ্চাত্ত্য জাতি, শিক্ষা ও সংস্কৃতির সঙ্গে পরিচিত করিয়া দেন।

অষ্টাদশ শতাব্দীতে ফরাসী দেশ হইতে আগত গণতন্ত্রের আদর্শ ও সাহিত্যতত্ত্ব রুশদেশে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করে। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত যে দুইচারিখানি কাব্য ও নাটকের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সাহিত্যের দিক হইতে উহার মূল্য অধিক নহে। অষ্টাদশ শতাব্দীতেই রুশ সাহিত্য কিয়ৎ-পরিমাণে স্বাতন্ত্র্য লাভ করে। উপন্যাস, ব্যঙ্গনাটক, গীতিকবিতা প্রভৃতির সংখ্যা বেশী না হইলেও গুণগত উৎকর্ষ তুচ্ছ করিবার মতো নহে। অবশ্য ফরাসী নব্যক্লাসিকতার আদর্শে বিশ্বাসী অষ্টাদশ শতাব্দীর রুশ সাহিত্যিকেরা সাহিত্য ও রচনাসংক্রান্ত নীতিনিয়মের প্রতি অধিকতর গুরুত্ব দিয়াছিলেন বলিয়া তখনও রুশ সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য বিকাশ লাভ করিতে পারে

নাই। উনবিংশ শতাব্দীতেই রুশসাহিত্যের যথার্থ বিকাশ আরম্ভ হইল। যে সমস্ত রুশ সাহিত্যিক বিশ্বসাহিত্যের ইতিহাসে শ্রদ্ধার আসন লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের কাহারও আবির্ভাব উনবিংশ শতাব্দীর পূর্বে হয় নাই। এবার ভারতের কয়েকটি প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্য সম্বন্ধে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করা যাক।

ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য ॥

হিন্দী সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর ভারতের প্রাদেশিক সাহিত্য বিশেষ কোন অভূতপূর্ব গৌরব বহন করিতেছে না। ইহার পরে উনবিংশ শতাব্দী হইতে আধুনিক যুগের সূচনা হয়। তাহার পূর্ববর্তী সাহিত্যধারায় উল্লেখযোগ্য কাব্যগুণের বিশেষ চিহ্ন খুঁজিয়া পাওয়া যায় না।

হিন্দী সাহিত্যে অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রীতির যুগ বা শৃঙ্গারকালের প্রাধান্য বজায় ছিল। মধ্যমশ্রেণীর কবিরা হিন্দু ভূস্বামীদের সভা আশ্রয় করিয়া শৃঙ্গাররসাত্মক কাব্যকাহিনী ও ঋতুবর্ণনের কবিতা রচনায় ব্যস্ত ছিলেন। কেহ কেহ হিন্দী অলঙ্কারশাস্ত্র রচনাপ্রসঙ্গে একটু বিষয়ান্তরের ব্যঞ্জনা দিয়াছিলেন। কবিভূষণের হিন্দী অলঙ্কার শাস্ত্রের দৃষ্টান্তগুলিতে শিবাজীর বীরত্বব্যঞ্জক কাহিনী অনুসৃত হইয়াছে। ইহা একটু অভিনব বটে, কারণ সাধারণতঃ অলঙ্কার শাস্ত্রে আদিরসাত্মক দৃষ্টান্ত দেওয়াই রীতি—সেই দিক হইতে ভূষণ নূতনত্বের সূচনা করেন। বৃন্দ ও গিরিধারী রায় নামক দুইজন কবি নীতিবিষয়ক কিছু কিছু কবিতা লিখিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাহার মূল্য নিতান্তই সাধারণ। মোটকথা অষ্টাদশ শতাব্দীতে মধ্যযুগীয় হিন্দী সাহিত্যের অবসান ঘনাইয়া আসিতেছিল; ভূস্বামিসম্প্রদায় হীনবল হইয়া পড়িয়াছিলেন, মুঘলমহিমা অন্তমিত হইয়া গিয়াছিল, মারাঠাশক্তিও পারস্পরিক বিরোধে অতিশয় দুর্বল হইয়া পড়িতেছিল। ফলে পৃষ্ঠপোষকতার অভাবে এই শতাব্দীর হিন্দী সাহিত্যেরও শ্রীবৃদ্ধি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

গুজরাটী সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর গুজরাটী সাহিত্য জনসাধারণের মধ্যে প্রচলিত ছিল বটে, কিন্তু উহারও মৌলিক সৃষ্টি বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। এই শতাব্দীর মধ্যভাগে আবির্ভূত কবি দয়ারামের কিছু কিছু গর্বা গান

গুজরাটী গীতি-সাহিত্যে উচ্চস্থান অধিকার করিয়া আছে। ইনি ব্রজ-ভাষাতেও বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। গীতিরসের মাধুর্য ও ঝঙ্কারে দয়ারামের গানগুলি এখনও জনপ্রিয়তা রক্ষা করিয়াছে। আরও দুইচারিজন কবি—অনুবাদক ভালন, ঐতিহাসিক কাব্য 'কাহ্নদদে প্রবন্ধে'র কবি পদ্মনাভ, ভাগবতপুরাণের আদর্শে কৃষ্ণকাহিনীর কবি ভীম এবং বৈরাগ্য মার্গের কবি ভোজো—ইহারা গুজরাটী সাহিত্যের ধারা বহন করিয়াছিলেন। 'স্বামী-নারায়ণ' সম্প্রদায়ের ভক্তকবিগণ অনেকটা বাংলার বৈষ্ণব সহজিয়াদের মতো মনবদেহকে মুক্তির প্রধান সোপান মনে করিতেন—তাঁহাদের সাধন-ভজন-সংক্রান্ত অনেক গুজরাটী কবিতা পাওয়া গিয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষভাগের দিকে গুজরাটী সাহিত্যে ধর্ম ও ভক্তিভাবের কবিতার অতিরেক সাহিত্যের সজীবতা অনেকটা নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথা-পালনের মতো কবিগণ জ্ঞান-ভক্তি-বৈরাগ্যের পদ লিখিতেন, রাধাকৃষ্ণের স্বর্গীয় প্রেমের বিষয় গান বাঁধিতেন; কিন্তু বাস্তবজীবনের সঙ্গে এই সাহিত্যের যোগাযোগ ক্রমেই ক্ষীণ হইয়া আসিতেছিল। ১৭৯৯ খ্রীঃ অব্দে সুরাটের নবাবের মৃত্যুর পর গুজরাটী জীবন বৈচিত্র্যহীন ও মন্থর হইয়া পড়িল, আধুনিক যুগ আরম্ভের পূর্বে গুজরাটী সাহিত্যেও প্রাণের লক্ষণ ক্রমে ক্ষীণ হইয়া আসিয়াছিল।

মারাঠী সাহিত্য—এই দিক হইতে মারাঠী সাহিত্যের কিঞ্চিৎ সজীবতা লক্ষ্য করা যাইবে। আধুনিক যুগের অব্যবহিত পূর্বে অধিকাংশ প্রাদেশিক সাহিত্যের বিকাশ প্রায় স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কিন্তু মারাঠী সাহিত্যে কিছু প্রশংসনীয় দৃষ্টান্ত ফুটিয়া উঠিয়াছে।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্যে দুইটি শাখার স্পষ্ট স্বরূপ ধরা পড়িয়াছে—একটি সংস্কৃত-প্রভাবিত ক্লাসিক ধারা, অপরটি লোকসাহিত্যের ধারা। প্রাচীন কবি মুক্তেশ্বরের মহাভারতের মাত্র দু-একটি পর্ব রক্ষা পাইয়াছে। অষ্টাদশ শতাব্দীর কয়েকজন কবি মহাভারতের বাকি পর্বগুলি রচনা করিয়া অসমাপ্ত মহাভারতকে পূর্ণতা দিতে চাহিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে শ্রীধরের সংক্ষিপ্ত মহাভারত 'পাণ্ডবপ্রতাপ' উল্লেখযোগ্য। কবি রামায়ণ অবলম্বনে 'রামবিজয়' এবং ভাগবত অবলম্বনে 'হরিবিজয়' কাব্য লিখিয়া মারাঠী অনুবাদ-সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধি করিয়াছিলেন। অনন্ত তিনি

আক্ষরিক অনুবাদ না করিয়া নিজের ভাষায় কাহিনী বিস্তৃত করিয়াছিলেন। ভাষা, রচনাবলী, আবেগের মাধুর্য ইত্যাদি গুণের জন্য তাঁহার কাব্য তিনখানি মারাঠী সাহিত্যে বিশেষ জনপ্রিয় হইয়াছিল। মাধব মুনি ও অমৃত রায়—অষ্টাদশ শতাব্দীর এই দুই জন কবি মারাঠী সাহিত্যে অপরিচিত নহেন। অষ্টাদশ শতাব্দীর আর এক কবি মহিপতি 'ভক্ত বিজয়' ও 'ভক্ত লীলামৃত' শীর্ষক দুইখানি জীবনী-কাব্যে মহাপুরুষ চরিত্র বর্ণনা করিয়া গুজরাটী সন্ত-সাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে আর একজন বিখ্যাত কবির নাম উল্লেখ করা যাইতে পারে। মোরোপন্থ প্রাচীন সংস্কৃত পুরাণ-মহাকাব্যের আদর্শেই নিজ কাব্যজীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছিলেন; রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবতকে তিনি সহজবোধ্য মারাঠী ভাষায় ও আর্যাছন্দে রূপান্তরিত করিয়া শিক্ষিত সমাজে বিশেষ খ্যাতি অর্জন করিয়াছিলেন। এই কাব্য তিনখানিতে অনুবাদ-সাহিত্যের লক্ষণ ফুটিয়া উঠিয়াছে। তিনি অনেক স্থানে খুব নিষ্ঠার সঙ্গে মূলকে অনুসরণ করিয়াছেন। যদিও তিনি সংস্কৃত ধারায় লালিত হইয়াছিলেন, তবু ভাষার মধ্যে সংস্কৃত প্রাধান্য ত্যাগ করিয়া সরল ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। এমন কি রামায়ণের এক স্থানে তিনি এমন কথাও বলিয়াছেন যে সংস্কৃত অপেক্ষা মারাঠী ভাষায় রামায়ণ রচনা করিলে তাহা জনসমাজে অধিকতর ফলপ্রসূ হইবে—এবং এই জন্যই তিনি জনসাধারণের ভাষা অবলম্বন করিয়াছিলেন। ইহাতে মনে হয়, অষ্টাদশ শতাব্দীতেও রক্ষণশীল মারাঠী পণ্ডিতের দল রামায়ণাদিকে লোকভাষায় অনুবাদের ব্যাপার বিশেষ সুদৃষ্টিতে দেখিতেন না—অনেকটা মধ্যযুগের বাংলা দেশের মতো। এদেশেও কৃত্তিবাস ও কাশীরাম দাসকে সংস্কৃত পণ্ডিতেরা 'সর্বনেশে' বলিতেন। মোরোপন্থ গীতিকবিতায়ও প্রতিভার পরিচয় রাখিয়া গিয়াছেন 'কেকাবলী' কবিতায়।

অষ্টাদশ শতাব্দীর মারাঠী সাহিত্যের প্রধান অংশ যে প্রাচীন পুরাণ-মহাকাব্য প্রভৃতি ক্লাসিক আদর্শের উপর প্রতিষ্ঠিত তাহা স্বীকার করিতে হইবে। সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিতগণের প্রতিকূলতার জন্য মারাঠী কবিরা ক্লাসিক আদর্শ অনুসরণে বাধ্য হইয়াছিলেন। কিন্তু পণ্ডিত ও শিক্ষাভিমানীদের অগোচরে এই শতাব্দীতে আর একটি কাব্যশাখা ক্রমেই লোকসমাজে বিস্তার লাভ করিতেছিল। এই যুগে অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্যে একদল

লোককবির আবির্ভাব হয়। ইহারা 'শাহির' (লোককবি) নামে পরিচিত। ইহারা অবশ্য পুরাদস্তুর কাব্য লিখিয়াছিলেন, যাহাতে অশিক্ষিত মারাঠীরাও বুঝিতে পারে, এইজন্য জনসাধারণের ভাষাই অবলম্বন করিয়াছিলেন। অনেকটা বাংলার ময়মনসিংহ-পূর্ববঙ্গ-গীতিকার মতো পালাগানের আকারে শাহিরগণ দুই ধরনের মারাঠী ব্যালাড বা পালাগান লিখিয়াছিলেন। যে পালাগানে বীরত্বের কাহিনী বর্ণিত হইত, তাহার নাম 'পোয়াদা', আর যাহাতে প্রেমের গান ও প্রণয়কাহিনী স্থান পাইত তাহা 'লাবনী' নামে অভিহিত হইত। শিবাজীর বীরত্বগাথা এবং মারাঠী বীরপুরুষদের কাহিনীই 'পোয়াদা'র প্রধান অবলম্বন। এই জাতীয় বীরত্বের কাহিনীর প্রথম লেখক অগেনদাস একটি গাথায় শিবাজী কর্তৃক আফজল খাঁয়ের নিধন বর্ণনা করিয়াছেন। শিবাজী-অনুচর তানাজী কর্তৃক সিংহগড় দুর্গ আক্রমণ ও অধিকার লইয়া তুলসীদাস নামক এক কবি যে গান রচনা করেন, তাহা কাব্যাংশে উৎকৃষ্ট এবং মহারাষ্ট্রে আজও প্রচারিত। অবশ্য এই সমস্ত বীরত্বের কাহিনী পুরাপুরি লোকসাহিত্যের অন্তর্গত নহে। কারণ ইহার রচনারীতির বাঁধাবাঁধি বন্ধন এবং নির্দিষ্ট রচনাকার থাকিবার জন্য ইহা পুঁথির সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত হইবার যোগ্য। পেশোয়াদের শাসনকালে বীররসাত্মক 'পোয়াদা' গানগুলি বেশ জনপ্রিয় হইয়াছিল।

'লাবনী' গানগুলিই যথার্থ লোকসাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত। অর্ধশিক্ষিত জনসাধারণের মধ্য হইতেই এই শ্রেণীর কবিগায়কের আবির্ভাব হইয়াছিল—যাহাদের বড় একটা পুঁথিগত বিদ্যা ছিল না। সুতরাং তাঁহাদের এই সমস্ত কবিতা ও কাহিনী জনসাধারণের মধ্যে যে অতিশয় জনপ্রিয় হইয়াছিল, তাহাতে কোন সন্দেহ নাই। ক্রমে ক্রমে লোকসাহিত্য শ্রেণীর এই প্রেম-গীতিকা এত জনপ্রিয় হইল যে, প্রসিদ্ধ ব্রাহ্মণকবি রামজোশী, অনন্ত ফন্দি, প্রভাকর—এই 'লাবনী' গানে আত্মনিয়োগ করিয়াছিলেন। বলিতে কি এই ধরনের গানে প্রায় সমস্ত সম্প্রদায়ই যোগ দিয়াছিলেন—এবং ইহাই যথার্থ গণসাহিত্য। এই প্রেমগীতিকার কোন কোনটিতে উচ্চতর তত্ত্ব ও দার্শনিকতাও স্থান পাইয়াছে। ১৮১৬ খ্রীঃ অব্দে পেশোয়া শাসনের অবসান কাল পর্যন্ত প্রাচীন মারাঠী সাহিত্যের সীমা। এই যুগে দুই একখানি গদ্য গ্রন্থও রচিত হইয়াছিল। যথা—'মহানুভব' সম্প্রদায়ের 'লীলাচরিত্র',

পঞ্চতন্ত্রের অনুবাদ এবং দুই চারিটি যুদ্ধবিগ্রহের ঘটনা ও ঐতিহাসিক কাহিনীর যৎসামান্য বিবৃতি। কিন্তু এই গদ্য গ্রন্থগুলির সাহিত্য-মূল্য যৎসামান্য। বস্তুতঃ উনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি হইতেই মারাঠী গদ্য-সাহিত্যের যথার্থ বিকাশ হইতে আরম্ভ হইল। মারাঠী ভাষার প্রথম উপন্যাস 'যমুনাপর্যটক' (১৮৫৭) এবং বাংলা ভাষায় 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হয়।

ওড়িয়া সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর ওড়িয়া সাহিত্যে উপেন্দ্রভঞ্জ, গোপালকৃষ্ণ ও ব্রজনাথ বড়জেনার ক্লাসিক কাব্যধারা ও গীতিকবিতার আদর্শ ওড়িয়াভাষী জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ প্রচার লাভ করিয়াছিল। উড়িষ্যার উপর দিয়া চারি শতাব্দী ধরিয়া বিশৃঙ্খলার ঝড় বহিয়া গিয়াছে, বোধ হয় সেই কারণেই অন্যান্য প্রাদেশিক সাহিত্যের মতো মধ্যযুগের ওড়িয়া সাহিত্য বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। ষোড়শ শতাব্দীর শেষভাগে উড়িষ্যার স্বাধীনতা বিলুপ্ত হয়, তারপর ইংরাজের ভারত ত্যাগের পূর্বে উড়িষ্যার ভাগ্যে আর স্বাতন্ত্র্য লাভ ঘটে নাই। এই কারণে অষ্টাদশ শতাব্দীর উপেন্দ্রভঞ্জের ক্লাসিকধরনের কাব্য এবং গোপালকৃষ্ণের সুমধুর গীতিকা ব্যতীত উল্লেখযোগ্য বিশেষ কোন কাব্যকবিতার উদাহরণ পাওয়া যায় না। তবে এই প্রসঙ্গে ঢেনকানল নিবাসী ব্রজনাথ বড়জেনার 'সমরতরঙ্গ' শীর্ষক ঐতিহাসিক কাব্য বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অষ্টাদশ শতাব্দীতে মারাঠা কর্তৃক ঢেনকানল অভিযান সম্পর্কে ব্রজনাথ এই কাব্য রচনা করেন। ইহাতে তিনি দেখাইয়াছেন, তাঁহার পৃষ্ঠপোষক এক স্থানীয় রাজার বীরত্বে ঢেনকানল হইতে মারাঠা শত্রু বিতাড়িত হইয়াছিল। মধ্যযুগীয় ওড়িয়া সাহিত্যের একমাত্র ঐতিহাসিক কাব্য 'সমরতরঙ্গ' শুধু ইতিহাস নহে, কাব্য হিসাবেও প্রশংসার যোগ্য। বাংলার গঙ্গারামও বর্গীর হাঙ্গামা অবলম্বনে 'মহারাষ্ট্র পুরাণ' লিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাতে অনেক ঐতিহাসিক তথ্য থাকিলেও বিশেষ কোন কবিত্বগুণ নাই।

অসমিয়া সাহিত্য—অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে অসমিয়া সাহিত্যের যৎকিঞ্চিৎ বিকাশ দেখা গেলেও পরবর্তী অর্ধশতকে আসামের রাষ্ট্রব্যবস্থা

যেমন শিথিল হইয়া পড়ে, সাহিত্যও তেমনি নিষ্প্রভ হইয়া যায়। আসাম-রাজ রুদ্রসিংহ এবং তাঁহার সুযোগ্য তিনপুত্র শিবসিংহ, পরমাত্মা সিংহ ও রাজেশ্বর সিংহের (১৬৯৬-১৭৬৯) সময়ে রাজসভার অনুগ্রহভাজন অনেক কবি সংস্কৃত কাব্যের অনুবাদ বা অনুরূপ আখ্যান লিখিয়াছিলেন। রাজা এবং রাজপুত্রেরাও কিঞ্চিৎ কবিপ্রতিভার অধিকারী ছিলেন। রুদ্রসিংহের পৌত্র (রাজেশ্বর সিংহের পুত্র) যুবরাজ চারুসিংহের জন্য কবিশেখর ভট্টাচার্য নামক এক কবি 'হরিবংশ' রচনা করেন। অবশ্য ইহার সঙ্গে পৌরাণিক হরিবংশ এবং হরির কোন সম্পর্ক নাই। গ্রন্থটি নিছক কামশাস্ত্রের পর্যায়ে পড়ে—নববিবাহিত রাজকুমারের প্রীত্যর্থে রচিত হইয়াছিল। এই শতাব্দীতে গীতগোবিন্দ, হস্তিবিদ্যার্ণব, শঙ্খচূড়বধ, ধর্মপুরাণ প্রভৃতি কাব্যের পুঁথি পাওয়া গিয়াছে। এগুলির অধিকাংশই কাব্যধর্ম বর্জিত, কোনটি আবার পুরাতন কাব্যের নকল মাত্র। অষ্টাদশ শতাব্দীতে রাজেশ্বর সিংহের মৃত্যুর পর আসামে যে বিশৃঙ্খলা শুরু হইল তাহা প্রায় ঊনবিংশ শতাব্দীর গোড়ার দিক পর্যন্ত প্রবল বিক্রমে প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। এই প্রকার সামাজিক ও রাজনৈতিক শিথিলতার যুগে সাহিত্যাদি কখনও শ্রীবৃদ্ধি লাভ করিতে পারে না। ফলে অষ্টাদশ শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ হইতে অসমিয়া সাহিত্যের বিকাশ প্রায় সম্পূর্ণরূপে স্তব্ধ হইয়া গিয়াছিল। কেবল সত্যমিথ্যাপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা-সংবলিত 'বুরঞ্জি'গুলি কিঞ্চিৎ প্রচলিত ছিল।

সমকালীন প্রধান প্রধান প্রাদেশিক সাহিত্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লইয়া দেখা গেল যে, অষ্টাদশ শতাব্দীর বাংলা সাহিত্যের তুলনায় প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহে নূতন কোন বৈচিত্র্য ও বৈশিষ্ট্য সঞ্চারিত হইতে পারে নাই। মোটামুটি একই ছক ও ছাঁদ প্রাদেশিক সাহিত্যসমূহেও অনুসৃত হইয়াছে। রামায়ণ-মহাভারত-ভাগবতের অনুবাদ, ভক্তিসাহিত্য, কৃত্রিম ক্লাসিক কাব্য-কলা—এইগুলি প্রায় তাবৎ ভারতীয় সাহিত্যের বৈশিষ্ট্য। বাংলায় যেমন ঊনবিংশ শতাব্দীতে সাহিত্যক্ষেত্রে গদ্যের আবির্ভাব হইয়াছিল, হিন্দী মারাঠী ওড়িয়া প্রভৃতি সাহিত্যেও সেই একই বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়। এইখানে বাংলার সঙ্গে অন্যান্য প্রদেশের আর্যশাখা-সাহিত্যের আত্মীয়তার সম্পর্ক। কতকগুলি বিষয়ে প্রত্যেক প্রদেশের সাহিত্যের নিজস্ব বৈশিষ্ট্য থাকিলেও

প্রধান বিষয় ও মৌলিক সাহিত্যসাধনায় বাংলা, অসমিয়া, ওড়িয়া, মারাঠী, গুজরাটী, হিন্দী—সবই যে একগোত্র হইতে উদ্ভূত হইয়াছে, অষ্টাদশ শতাব্দীর সাহিত্যের ইতিহাস হইতে তাহার প্রমাণ পাওয়া যাইবে।

॥ তৃতীয় খণ্ডের দ্বিতীয় পর্ব সমাপ্ত ॥

নির্ঘণ্ট

[' দ্বারা গ্রন্থের নাম বুঝাইতেছে]